পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুসারে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের
কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্ত লিখিত

উচ্চতর মাধ্যমিক

পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীমন্মথ নাথ রায়

প্রণীত

পুথিপত্র

৪৩ সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
'পুথিপত্র'-এর পক্ষে
শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাহা
৪৩ সূর্য সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
পৌরনীতি অংশ
এ. সিংহ রায়
শ্রীশ্রীকালী প্রেস
৬৫ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯
অর্থনীতি অংশ
শ্রীদেবদাস নাথ
সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
ও
শ্রীসুধাংশু বিকাশ সেন
সত্যনারায়ণ প্রেস
৬বি, গুড়িপাড়া রোড,
কলিকাতা-১৫

মূল্য ৬·৫০

ভূমিকা

বিদ্যালয়ের নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতির গ্রন্থের মোটামুটি অভাব নাই। তৎসত্ত্বেও এই গ্রন্থ কেন লেখা হইল, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার নৈতিক দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিতে পারি না। ভূমিকায় প্রধানতঃ আমি সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করিতেছি।

দীর্ঘ বাইশ বৎসর কাল আমি শিক্ষকতা করিয়াছি—বার বৎসর উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং দশ বৎসর মহাবিদ্যালয়ে। পাঠদান কালে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের কখনও বা উদাস নির্লিপ্ত দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আবার কখনও তাহাদের উৎসাহ-দীপ্ত আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কখনও কখনও উদাস নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে কুতূহল সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়া অধিকতর তৃপ্ত বোধ করিয়াছি। পক্ষবিস্তার করিয়া ঊর্ধ্ব আকাশে বিচরণ করা অপেক্ষা মাটিতে পা রাখিয়া চলিতে পারিলেই যে-শিক্ষাদান কাজে অধিকতর সাফল্যলাভ হয় তাহা আমি প্রত্যক্ষভাবে জানিয়াছি। সেই জ্ঞানকে সম্বল করিয়াই আমি এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ রচনা করিয়াছি।

একথা অনস্বীকার্য যে, তের চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে বিষয়টি দুরূহ। অত্যন্ত সরল এবং সহজ ভাষায় পরিবেশন করিতে না পারিলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর নিকটই বিষয়টি দুরূহই থাকিয়া যায়। আলোচনাকে তথ্যবহুল করিলে ইহা ভারাক্রান্ত হয়, বিষয় অধিকতর জটিল হয়। তাহাতে ছাত্রছাত্রীদের মনে বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য বা নির্লিপ্ততা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই কথা স্মরণ রাখিয়া আমি এই গ্রন্থের ভাষা যথাসম্ভব ঋজু এবং সহজ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অপ্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থের কলেবর অযথা বৃদ্ধি করার এবং সেইভাবে ছাত্রছাত্রীর মনে অযথা ভীতিসঞ্চার করার চেষ্টাকে আমি সর্বপ্রযত্নে বর্জন করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাতে ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি অনুধাবনের পথ সুগম হইয়াছে।

বিষয়টি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য আমাদের ভুলিলে চলিবে না। এই বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া বা এই বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠ গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিষয়ের মূলসূত্রগুলি মোটামুটি অনুধাবন করিয়া যদি সেই সূত্রের আলোকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করিতে পারে, তবেই মূল উদ্দেশ্য সফল হয়। গ্রন্থ রচনার কালে এই উদ্দেশ্যের কথা সকল সময় স্মরণ রাখিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা নিতান্ত অবান্তর বলিয়া মনে হইবে না। শ্রেণীকক্ষে পাঠ-গ্রহণ কালে মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কোন নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের

প্রত্যক্ষ সহায়তা ব্যতিরিকেও অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষকমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে পাঠ্যপুস্তকের প্রত্যক্ষ সহায়তা অপরিহার্য। দুই তিনটি বিষয়ের দুই তিনখানা বৃহদায়তন পাঠ্যপুস্তক বিদ্যালয়ে বহন করিয়া নেওয়া অনেক ছাত্রছাত্রীর পক্ষেই দুঃসাধ্য। কাজেই তাহাদিগকে এক বা একাধিক বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক নিজগৃহে রাখিয়া যাইতে হয় এবং শ্রেণীকক্ষে পুস্তকের সাহায্য ব্যতিরিকেই পাঠ-গ্রহণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতে হয়। ইহাতে তাহাদের পাঠানুসরণে অসুবিধা হয়। গ্রন্থ রচনার কালে একথাও আমি স্মরণ রাখিয়াছি। অযথা জটিল তথ্যের বাহুল্য দিয়া বা সঙ্গে সংক্ষিপ্তসার সংযোজিত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির লোভ আমি সহজে সম্বরণ করিয়াছি। বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য অধিক হইতে বাধ্য। অধিক মূল্য দরিদ্র অভিভাবকদের নিকট ক্লেশদায়ক। এই গ্রন্থের কলেবর অযথা বৃহৎ নয়। মূল্যও তুলনায় কম।

গ্রন্থ রচনার কালে আমি প্রত্যেকটি অধ্যায় অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের পড়িতে দিয়াছি। যেই অংশ তাহাদের নিকট সামান্য জটিল বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, সেই অংশকেই পুনরায় সহজ করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থের যে-কোন অধ্যায় পাঠ করিলে বা সেই অধ্যায়ের সঙ্গে অন্য গ্রন্থের অনুরূপ অধ্যায়ের তুলনা করিলেই শিক্ষকগণ আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সম্ভাব্য প্রশ্ন সংযোজিত করা হইয়াছে, সেই সঙ্গে প্রশ্নের উত্তরেরও সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংযোজিত করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ শব্দের সঙ্গে ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও গ্রন্থশেষে একটি পরিভাষাও সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থ রচনায় নিষ্ঠা সহকারে পর্ষৎ নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসৃত হইয়াছে।

ইতস্ততঃ বিন্যস্ত বিভিন্ন সময়ের লেখাকে সাজাইয়া নিখুঁত একখানা পাঠ্য পুস্তকে পরিণত করার যে কৃতিত্ব প্রকাশকের পক্ষ হইতে আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাহা দেখাইয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই।

বিনীতভাবে বলিতে পারি, এ আমার প্রথম রচনা নহে। ইহার পূর্বে আমি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছি এবং গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। তাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক মূল্যের জন্য সেগুলি পাঠক সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থও অনুরূপ সমাদর লাভ করিলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

১৯৬০

বিনীত
গ্রন্থকার

SYLLABUS FOR CIVICS AND ECONOMICS

A. CIVICS

Class IX

1. The evolution of human society—The Family—The patriarchal and matriarchal families—The Indian joint-family.
2. The State—its origin and characteristics.
3. The Government—Forms of Government—Democracy and Dictatorship—Merits and defects of Democracy—Unitary and Federal Government—Parliamentary and Presidential Government.
4. Organs of Government—Separation of Powers—Departments of Government.
5. Functions of Government.
6. The Individual and Society—Socialism.
7. The Nation—Rights of Self-determination—United Nations.

Class X

8. The Citizen—how citizenship is acquired and lost—qualities of a good citizen—hindrances to good citizenship.
9. The Citizen's Rights—The Right to Vote—its importance and implications.
10. The Citizen's Duties—to the family, to the community, to the State.
11. Rights and Duties.
12. Law and Liberty.
13. Public Services.
14. Public Opinion—Organs of Public Opinion.
15. Political Parties.

Class XI

16. A brief outline of the Constitution of India with special reference to—The Preamble—Fundamental Rights—Directive Principles—The Indian Citizen—Franchise—The Federation of

India—The Distribution of Powers—The President—how he is elected—Powers of the President—The Union Parliament—Control of the Executive by the legislature—The States—The Governor—The State Legislature—Relation between the Central and the States—Heads of Revenues and Expenditures for Union and State Government—The Judiciary—The Supreme Court—The Indian Political Parties.

17. Local Government.
18. Civil Problems—Village Improvement—Community Development Projects—Towns and Cities—Food—Housing—Sanitation—Health.
19. Defence of India—The Army, the Navy and the Air Force—Voluntary Defence Organisations—The National Cadet Corps.

B. ECONOMICS

[*The subject is to be treated with special reference to* **Indian conditions**]

Class IX

1. National Income and its distribution—per capita income—standard of living.
2. Board factors determining national income—factors of production.
3. Population—population and food supply—population and national income—labour supply—unemployment.
4. National resources—land and its productivity.
5. Capital—factors governing the accumulation of capital.
6. Technical skill—its importance—factors governing its formation.
7. Economic structure—main structural features of an under-developed economy—requirements for economic development.

Class X

8. Forms of business organisation—single owner firm—Partnership—Joint-Stock Companies.

   Co-operation—principles—different types of co-operative societies and their main features.

   Small and Large-scale industries.

9. Role of the Government—economic functions of the Government—Government and development planning—Indian 5-Year Plans.
10. Government finances—taxation, expenditure and borrowing —financing of development.
11. Money—functions of money—monetary standards—creation of money—Banks—Commercial Banks—Central Bank—Functions of Banks—Bank money.
12. The General price level—measurement of changes in the general price level—simple index numbers—inflation.

Class XI

13. International Trade—territorial division of labour—Balance of Trade and Balance of Payments—Protection and Free Trade.
14. Markets—forms of markets : Competition and Monopoly.
15. Price determination under different market condition—factors governing demand : price changes and income variations, elasticity of demand—factors governing supply and supply price—increasing and diminishing returns.
16. Different types of factor incomes—wages, interest, rent and profits—Collective bargaining and trade unions.

The objects that have been kept in view in preparing the syllabus are :

(a) to help the students understand and take an intelligent interest in the everyday problems of our economic life,

(b) to prepare them as future citizens to appreciate and to take an intelligent part in the affairs of the country, and

(c) to provide those amongst them who intend to take up the 3-Year Degree Course in Economics with the necessary theoretical background.

সূচীপত্র

পৌরবিজ্ঞান

(নবম শ্রেণীর জন্য)

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

(দশম শ্রেণীর জন্য)

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

[একাদশ শ্রেণীর জন্য]

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অর্থনীতি

[নবম শ্রেণীর জন্য]

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

[দশম শ্রেণীর জন্য]

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ষড়বিংশ অধ্যায়

পৌরবিজ্ঞান

উচ্চতর মাধ্যমিক

পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতি

প্রথম খণ্ড—পৌরবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition) :

'পুর' শব্দের অর্থ 'নগর'। এই 'পুর' শব্দ হইতে 'পৌর' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তদনুসারেই 'পৌর' শব্দের অর্থ 'নাগরিক'। যেই বিজ্ঞান নাগরিকের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে সেই বিজ্ঞানের নাম পৌরবিজ্ঞান।

'নগর' হইতে 'নাগরিক' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ নাগরিক বলিতে যে ব্যক্তি নগরে বা শহরে বাস করে তাহাকে বুঝাইতে পারে। পৌর-বিজ্ঞানের ভাষায় নাগরিক শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক এবং একটু পৃথক। এই বিজ্ঞানের ভাষায় যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে সেই ব্যক্তিই নাগরিক। সমাজবদ্ধ মানুষ নগরে বা শহরে বাস করিলেও যেমন নাগরিক বলিয়া অভিহিত হইবে, পল্লী অঞ্চলে বা গ্রামে বাস করিলেও সেই ব্যক্তি নাগরিক বলিয়াই অভিহিত হইবে। কাজেই আমরা বলিতে পারি, যেই বিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ বা কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করে সেই বিজ্ঞানের নাম পৌরবিজ্ঞান। সমাজে এক নাগরিকের সঙ্গে অন্য নাগরিকের আচরণ, সমাজের প্রতি নাগরিকদের আচরণ এবং নাগরিকদের প্রতি সমাজের আচরণ পৌরবিজ্ঞানের মূল আলোচনার বিষয়।

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Scope) :

সমাজ মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। কোন একজন মানুষকে প্রচুর আহার্য, পরিধেয় বস্ত্র, ধন-দৌলত সঙ্গে দিয়া যদি কোন এক নির্জন দ্বীপে বসবাসের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয় তবে অনতিবিলম্বে সে সমস্ত আহার্য, বস্ত্র, ধন-দৌলতের বিনিময়ে কেবল মানুষের সঙ্গে বাস করিবার সুযোগ প্রার্থনা করিবে। অপরের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সমাজের বাহিরে বাস করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কথা বলিতে তাহার সঙ্গীর প্রয়োজন, খেলা করিতে তাহার সঙ্গীর প্রয়োজন, কাজ করিতে তাহার সঙ্গীর প্রয়োজন, বাঁচিয়া থাকিতে হইলে

তাহার সঙ্গীর প্রয়োজন। সংসারত্যাগী কোন কোন সন্ন্যাসীকে আমরা কথনও কথনও দেখিয়া থাকি। তাঁহারা নির্জন বনে বা গোপন গিরি-গহ্বরে বাস করিয়া থাকেন। মানুষের সাহচর্যে তাঁহাদের কোন প্রয়োজন থাকে না। এই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁহারা অসাধারণ ; সাধারণ মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজের বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন।

সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অপর সকল ব্যক্তি কতগুলি সুবিধা দান করে। এই প্রকারের সুবিধা ভোগ করিতে না পারিলে মানুষের পক্ষে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করা অসম্ভব হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের অপর সকলে নির্বিঘ্নে সম্পত্তি অর্জন এবং ভোগের সুবিধা দান করে। এই ধরনের সুবিধার অন্য নাম সমাজবদ্ধ জীবনের অধিকার বা নাগরিক অধিকার। এক ব্যক্তি নিজে যে সকল অধিকার ভোগের সুযোগ চাহিয়া থাকে এবং পাইয়া থাকে, সমাজে বাস করিতে হইলে অপর ব্যক্তিকেও সেই সকল অধিকার ভোগের সুযোগ তাহাকে দান করিতে হয়। নির্বিঘ্নে নিজ সম্পত্তি ভোগ করিতে চাহিলে অপরকে নির্বিঘ্নে নিজ সম্পত্তি ভোগ করার সুযোগ দান করিতে হয়। এই ধরনের সুযোগ দানের অন্য নাম সমাজবদ্ধ জীবনের কর্তব্য বা নাগরিক কর্তব্য। সমাজবদ্ধ জীবনের অধিকার এবং কর্তব্যের আলোচনা পৌরবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু।

প্রাচীনকালে রাষ্ট্রই ছিল মানুষের একমাত্র সুগঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তখন ব্যক্তিমাত্রই ছিল রাষ্ট্রের সভ্য। তখন রাষ্ট্রের এক সভ্যের সঙ্গে অপর সভ্যের আচরণ রাষ্ট্রের প্রতি সভ্যগণের আচরণ এবং সভ্যগণের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণই ছিল পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

গ্রীক বা রোমক যুগে রাষ্ট্রের পরিধি এক একটি নগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রগুলিকে সাধারণতঃ নগর রাষ্ট্র বলা হইত। কিন্তু এখন আর কোন রাষ্ট্রেরই সীমা একটি নগরের মধ্যে আবদ্ধ নহে। আধুনিক যুগের জাতীয় রাষ্ট্র বৃহদায়তন। আয়তনে বৃহৎ হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের পক্ষে এখন মানুষের সকল প্রকারের সামাজিক প্রয়োজন তৃপ্ত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্র যেই সকল সামাজিক প্রয়োজন মিটাইতে পারিতেছে না, সেই সকল প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাই আধুনিক যুগে দুই শ্রেণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে রাষ্ট্রের পোষকতায় বা সমর্থনে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া

উঠিয়াছে নাগরিকগণের নিজেদের চেষ্টায়। পৌরসভা, পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। সরকার সরাসরি নিজ দায়িত্বে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা করে না, কিন্তু এইগুলির কার্য সরকারের পোষকতায় চলিয়া থাকে। ইহাদের পরিচালনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন সরকার প্রণয়ন করিয়া দেয়। পরিচালন সুষ্ঠু হইতেছে কিনা সরকার তাহা দেখে ; প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্য দান করে। এই সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমাজ-জীবন সুষ্ঠু করিবার জন্য জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এইগুলি মানুষের আজিকার দিনে অপরিহার্য সামাজিক প্রয়োজন। অথচ বৃহদায়তন কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এই ধরনের স্থানীয় সামাজিক প্রয়োজন মিটান সম্ভব নহে।

ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই সকল প্রতিষ্ঠান সমাজবদ্ধ মানুষকে ক্রীড়া, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতির চর্চার সুযোগ দান করে। বৃহদায়তন কোন রাষ্ট্রের পক্ষে নাগরিকগণের এই ধরনের সামাজিক প্রয়োজন মিটান সম্ভব নহে। নাগরিকগণ নিজ চেষ্টায় এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। কখনও কখনও রাষ্ট্রের নিকট হইতে হয় অর্থ সাহায্য তাহারা পাইয়া থাকে। নিজ নিজ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নাগরিকগণ এই সকল প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়।

বর্তমান পৃথিবীতে যে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক অপর রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতে পারে না। এক রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে অপর রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। কোন এক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবর্তন অপর রাষ্ট্রের নাগরিকদের অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপ বদলাইয়া দেয়। কাজেই যে-কোন রাষ্ট্রের নাগরিকের পক্ষে কেবল তাহার নিজ রাষ্ট্রের সমস্যার কথা চিন্তা করাই যথেষ্ট নহে। তাহাকে অন্য রাষ্ট্রের সমস্যার কথাও চিন্তা করিতে হয়, কারণ সেই অবস্থার সঙ্গে তাহার নিজ স্বার্থ জড়িত। বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় এমন কতগুলি সমস্যা আছে যাহা রাষ্ট্রবিশেষ অপর রাষ্ট্রের সহযোগিতা ব্যতিরেকে সমাধান করিতে পারে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের এই ধরনের সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। মানুষকে কখনও কখনও পৃথিবীজোড়া এক রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করিতে হইয়াছে। সেই ধরনের পৃথিবী-জোড়া রাষ্ট্রের উদ্ভব সাপেক্ষে যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এখন গড়িয়া উঠিয়াছে

বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে না হইলে পরোক্ষভাবে সেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য।

উপরের এই আলোচনা হইতে আমরা একথা বুঝিতে পারি যে মানুষ এখন আর একমাত্র রাষ্ট্র নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য নহে। সে পৌরসভা, পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানেরও সদস্য। আবার ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নাগরিকদের নিজ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরও সে সদস্য হইতে পারে। সর্বশেষে মানুষ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। পৌরবিজ্ঞান এই ধরণের বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি, প্রকৃতি গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করে। ইহাই পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

পৌরবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Utility of the study of Civics) :

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্র-শাসিত দেশে প্রত্যেক নাগরিকেরই দেশ-শাসনে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। তাহাকে গুরু দায়িত্ব পালন করিতে হয়। তাহার এই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতার উপরই গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে। যে গণতন্ত্রের নাগরিকেরা এই দায়িত্ব পালনে বেশী সক্ষম সেই গণতন্ত্রই বেশী সাফল্য লাভ করে। পৌরবিজ্ঞান নাগরিকের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে। পৌরবিজ্ঞান পাঠে নাগরিক তাহার অধিকার এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে। ফলে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিয়া এবং অধিকার ভোগ করিয়া নাগরিকগণ গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তুলিতে পারে। কাজেই পৌরবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব বর্তমান সমাজে অনস্বীকার্য।

মানুষের কল্যাণ নির্ভর করে সমাজের কল্যাণের উপর। সমাজ অকল্যাণের পথে চলিয়াছে আর সেই সমাজে বাস করিয়া কোন ব্যক্তি স্থায়িভাবে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতেছে এমন ঘটনা বিরল। কাজেই আপন কল্যাণকামী মানুষকে সমাজের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হইতে হয়। সেই চেষ্টা করিতে হইলে মানুষকে তাহার কতখানি অধিকার আছে তাহাও জানিতে হয়। তাহার কি দায়িত্ব আছে তাহাও তাহাকে জানিতে হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাহার উদ্দেশ্য সাধনে কতখানি সহায়তা করিতে পারে তাহাও তাহাকে জানিতে হয়। তবেই তাহার পক্ষে সমাজের কল্যাণ তথা নিজ কল্যাণ সাধন সহজ হয়।

এই সকল জ্ঞাতব্য তথ্য পৌরবিজ্ঞান পাঠে বা আলোচনায় সে সংগ্রহ করিতে পারে।

আমাদের ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় অনভ্যস্ত দেশে নব প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকে সার্থকভাবে পরিচালনা করিতে হইলে নাগরিকদের নিজ নিজ অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হয়। ভারত সমস্যা-কণ্টকিত দেশ, কাজেই এদেশের নাগরিকের দায়িত্ব অধিক এবং গুরুতর। গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের দেশে নাগরিকদের প্রাথমিক কর্তব্য পৌরবিজ্ঞানের নানা বিষয় পাঠ করা বা আলোচনা করা। যথাসময়ে দেশ-শাসনে সার্থকভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া দেশের এবং নিজের কল্যাণ সাধনে তবেই তাহারা সক্ষম হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা যেমন আজিকার প্রয়োজনে পৌরবিজ্ঞান পাঠ করিবে, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকারা তেমনই ভবিষ্যতের প্রয়োজনে পৌরবিজ্ঞানের মূল তথ্যাদি পাঠ করিবে।

প্রশ্ন

১। পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। (পৃঃ ১) এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কি ? (পৃঃ ২-৪)
২। পৌরবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ কর। (পৃঃ ৪-৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজ ও তাহার প্রকৃতি

সমাজ (Society) :

কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন কয়েকজন লোক মিলিতভাবে কাজ করে, তখন ঐ কয়েকজন লোক একটি সমাজ গঠন করে। সমাজের আসল উপাদান দুইটি। সমাজের একটি উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন। যাহারা কোন সমাজের সভ্য তাহাদের মধ্যে ঐক্যের ভাব বা সংঘবদ্ধতার ভাব বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। কোন অঞ্চলের কয়েকজন ঐক্যবদ্ধ হইয়া সেই স্থানের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যদি কাজ করে তবে তাহারা একটি স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধানকারী সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে বলা যায়। কোন কারখানার বা শিল্পের শ্রমিকগণ তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য যদি মিলিতভাবে কাজ করে তবে তাহারা একটি শ্রমিক-কল্যাণ সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে বলা যায়।

মানুষ সামাজিক জীব। অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা না করিয়া সমাজের বাহিরে সাধারণ মানুষ বাঁচিতে পারে না। বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের খাতিরে মানুষকে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। প্রকৃতির বা ভগবানের নানা বিধানও এই সম্পর্ক রক্ষার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। ভাষা মানুষের কাছে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। এই ভাষার কাজ অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিবার কাজে মানুষকে সাহায্য করা। নিজের প্রয়োজনে এবং প্রকৃতির বিধানে মানুষকে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া সামাজিক জীবন যাপন করিতে হয়।

পৌরাণিক যুগে মুনি ঋষিরা নির্জন বনে বাস করিত। এখনও দুই-একজন মানুষ হয়ত বা জনমানবশূন্য অরণ্যে কিংবা পর্বত-গুহায় তপস্যা করে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এত কম যে, সাধারণ হিসাবের মধ্যে ইহাদের কথা বিবেচনা না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

প্রথমতঃ মানুষকে স্বভাববশতঃ সমাজে বাস করিতে হয়। নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা কঠোর শাস্তি বলিয়া মানুষ মনে করে। প্রতিবেশীর সাহায্য. বন্ধুর ভালবাসা, জনক-জননীর স্নেহ-মমতা ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। এই সকল পাইতে হইলেই মানুষকে অপরের সঙ্গে সমাজে বাস করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ কোন মানুষই তাহার নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজে উৎপাদন করিতে পারে না। পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইলে তাহাকে

অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়, অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিতে হয়। মানুষকে সামাজিক জীবন যাপন করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ জীবন-রক্ষার প্রয়োজনেও মানুষকে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া সমাজে বাস করিতে হয়। আদিম কাল হইতেই মানুষ জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতির সঙ্গে, কখনও কখনও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। এই ধরনের সংগ্রামের জন্য মানুষ সকল সময়ই অপরের সাহায্য লইয়াছে, দলবদ্ধ হইয়াছে, দলবদ্ধভাবে শত্রু দমন করিয়াছে।

কাজেই আমরা দেখি মানুষ স্বাভাবিক কারণে, অর্থনৈতিক কারণে কিংবা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সকল সময়ই দলবদ্ধভাবে বাস করে। এই দলবদ্ধ মানবসমষ্টিই সমাজ।

সমাজের ক্রমবিকাশ (Evolution of Society) :

কেহ সঠিকভাবে বলিতে পারে না কখন কিভাবে সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আগমনের কিছুকালের মধ্যেই পরিবারের উৎপত্তি হইয়াছিল। মানব-শিশুকে জননীর কাছে মানুষ হইতে হইয়াছে। প্রথম হইতেই জনক-জননী এবং তাহাদের শিশুরা এক সঙ্গে বাস করিয়াছে। এক সঙ্গে বাস করিয়া তাহারা পরিবার গঠন করিয়াছে। এক পরিবারের শিশুরা এক সঙ্গে বড় হইয়াছে। তাহারাও আবার শিশুর জনক-জননী হইয়াছে। পরিবারের আয়তন বাড়িয়াছে। এক পরিবার কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হইয়াছে। একই পরিবার হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিবারকে এক সঙ্গে গোষ্ঠী বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

গোষ্ঠী ক্রমে প্রসার লাভ করিয়াছে। একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন গোষ্ঠী গঠন করিয়াছে। এই বিভিন্ন শাখা গোষ্ঠীকে এক সঙ্গে উপজাতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। একই উপজাতির বিভিন্ন শাখা একই ধরনের আচার-আচরণ গ্রহণ করিয়াছে। নিজেদের তাহারা একই পূর্বপুরুষের বংশধর বলিয়া মনে করিয়াছে।

কালক্রমে সমাজবদ্ধ মানুষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মকানুন এবং শৃঙ্খলার প্রয়োজন দেখা দিল। নিয়মকানুন প্রণয়ন করিবার জন্য এবং সেগুলি কার্যকর করিবার জন্য একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হইল। ফলে সরকারের এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইল। এইরূপে পরিবার হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল।

আধুনিক লেখকগণ এই সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে গোষ্ঠীই মানুষের আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সহজাত অভ্যাসে এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ প্রথম হইতেই সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা সংঘবদ্ধভাবে খাদ্য সংগ্রহ করিত। বন-জঙ্গলে ফল-মূল আহরণ এবং পশু শিকার তাহাদের প্রধান কাজ ছিল। কাজের সুবিধার জন্য তাহারা বন-জঙ্গলের নিকটেই বাস করিত। আহরণ করা ফল-মূল বা পশুর মাংস দলের সকলে ভাগ করিয়া খাইত। কোন দ্রব্যের উপরই কাহারও কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। এমন কি শিশুও কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত না। তাহাদের লালন-পালন ছিল গোষ্ঠী বা দলের দায়িত্ব।

এইভাবে দলবদ্ধ জীবন যাপন করিতে গিয়া মানুষকে একটা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইল। ফল আহরণের বা পশু শিকারের স্থান লইয়া বিভিন্ন দলে সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। এই ধরনের সংঘর্ষে দল পরিচালনের জন্য নেতার প্রয়োজন দেখা দিল। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দল একজনকে নেতা বলিয়া মানিয়া লইল। নেতার অধীনে দলের লোকেরা নিজেদের ফল-মূল আহরণের বা পশু শিকারের স্থান রক্ষা করিত বা অপর দলের অনুরূপ স্থান দখল করিত। এই নেতারা সংঘর্ষের সময় যেমন নেতৃত্ব করিতেছিল শান্তির সময়েও দলের নেতৃত্ব করিতে লাগিল। এই নেতাই কালক্রমে রাজকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহার অধীনস্থ সমাজ রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

আধুনিক লেখকদের মতে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে গোষ্ঠী জীবনে পরিবারের উদ্ভব হইয়াছিল। মানুষ গোষ্ঠীজীবন যাপন করিবার সময় তাহাদের খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইতে পশু শিকার করিয়া বেড়াইত। শিকার ছিল অনিশ্চিত। কোন দিন শিকার মিলিত, কোন দিন মিলিত না। যেদিন ফল-মূল বা পশু কোনটাই সংগ্রহ করা সম্ভব হইত না, সেইদিন মানুষকে অনাহারে কাটাইতে হইত। এই অবস্থার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মানুষ পশুপালন আরম্ভ করিল। পালিত পশু হইতে তাহারা নিশ্চিতরূপে মাংস, দুধ এবং পশম পাইতে লাগিল। এইরূপে পশুপালক সমাজের উৎপত্তি হইল। মানুষ তখনও অবশ্য ভ্রাম্যমাণ। কোন একটি স্থানের তৃণভূমির পশু-খাদ্য যোগাইবার ক্ষমতা হ্রাস পাইলে মানুষ অন্য অঞ্চলাভিমুখে রওনা হইত। ফলে তাহাদের বিচরণশীলতা অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল।

কিছুকাল পরে মানুষ কৃষি ও ফসল উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করিল। কৃষিকার্য করিতে হইলে মানুষকে আর বিচরণশীল হইলে চলে না, তাই তাহারা

নির্দিষ্ট স্থানে বাস করা আরম্ভ করিল। কৃষি হইতে সাময়িক প্রয়োজনের অতি-রিক্ত ফসল উৎপন্ন হইলে তাহা ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্ম মানুষ সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিল। মানুষ সঞ্চয়শীল হইল। পশুপালন, কৃষি এবং সঞ্চয়শীলতা হইতে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হইল। এক ব্যক্তি পশুপালন ও কৃষি হইতে যাহা উৎপাদন করিল এবং যাহা সঞ্চয় করিল তাহা তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। এই যুগে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথা প্রচলিত হওয়ার পর রমণীবিশেষ পুরুষবিশেষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে আরম্ভ করিল। বিশেষতঃ শিশুপালনের প্রয়োজনে ইহারা একত্রে বাস করিতে আরম্ভ করিল। স্ত্রী-পুরুষ এবং শিশু সন্তান লইয়া পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল।

মানুষের আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠীই হউক বা পরিবারই হউক তাহাদের পরবর্তী বৃহত্তম সামাজিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র। অবশ্য রাষ্ট্রই যে মানুষের একেবারে শেষ প্রতিষ্ঠান আজ আর সেকথা বলিবার উপায় নাই। মানুষ দীর্ঘ কাল ধরিয়াই বিশ্বব্যাপী এক সামাজিক সংগঠনের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই ধরনের যেই বিশ্বব্যাপী সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার নাম ছিল রাষ্ট্রসংঘ (League of Nations)। কালক্রমে সেই সংঘ লোপ পাইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আবার আর একটি আন্তর্জাতিক সংঘ গড়িয়া উঠিল। ইহার নাম হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)। মানবজাতি সাগ্রহে ইহার বিকাশ ও অগ্রগতি লক্ষ্য করিতেছে।

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার (Patriarchal & Matriarchal Theory):

প্রাচীনকালের পরিবারের গঠন এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ আছে। আমরা এখন দেখিতে পাই প্রত্যেক পরিবারেই একজন প্রধান আছে। সাধারণতঃ তাহার নির্দেশেই পরিবারের বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন হয়। পরিবারের অপর সকলে তাহার নির্দেশ মান্য করিয়া চলে। পিতাই পরিবারের এই প্রধান ব্যক্তি। পিতা যে পরিবারের প্রধান ব্যক্তি কেবল তাহা নহে। পিতার পরিচয়ই পরিবারের পরিচয়। ইহা হইতে স্যার হেনরী মেইন প্রভৃতি মনীষীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালেও পরিবারের প্রকৃতি এবং গঠন এইরূপই ছিল। পিতাই তখন পরিবারের কর্তা ছিল। পিতার পরিচয়ের দ্বারাই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিকে চিনিতে পারা যাইত। এই ধরনের পরিবারের নাম পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সমর্থকরা বর্তমান অবস্থা দেখিয়া অতীত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্ভুল না-ও হইতে পারে। যাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করেন তাঁহারা বলেন, যদি প্রাচীনকালে কোন নারী একই সময়ে মাত্র একজন স্বামী গ্রহণ করিত, তবে পুত্র-কন্যাগণকে কোন পিতার পরিচয়ের সাহায্যে চিনিতে পারা যাইত। পিতার পরিচয়ই বংশ-পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইত। মরগ্যান প্রভৃতি লেখকগণ ইতিহাসের নজির দেখাইয়া বলেন যে, প্রাচীনকালে একই নারীর একই সময়ে একাধিক পতি গ্রহণের রীতি ছিল। ফলে পিতার পরিচয়ে পুত্র-কন্যাগণের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব না হইলেও কঠিন ছিল। কে কোন্ পিতার পুত্র বা কন্যা, ইহা জানা সহজ ছিল না। অথচ কে কোন্ মাতার পুত্র বা কন্যা, তাহা বলা খুব সহজ ছিল। মাতার গর্ভে তাহার জন্ম হইয়াছে, মাতার স্তন্যে সে লালিত-পালিত হইয়াছে। কাহারও মাতার পরিচয় নির্ধারণ কঠিন ছিল না। মাতার পরিচয়ই পুত্র-কন্যাদের আসল পরিচয় ছিল। মাতার পরিচয়েই বংশের পরিচয় ছিল। মাতাকে কেন্দ্র করিয়াই পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাতার কর্তৃত্ব মানিয়া লওয়াই পরিবারের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কাজেই তখন পরিবার মাতৃতান্ত্রিক ছিল।

মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের কিছু কিছু ঐতিহাসিক নজির আছে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না যে, তখন সকল স্থানের সকল পরিবারই মাতৃতান্ত্রিক ছিল। দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে এই ধরনের পরিবার এখনও বিদ্যমান। কিন্তু এইরূপ দুই-একটি দৃষ্টান্ত হইতে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত সম্ভবপর নহে।

ভারতীয় যৌথ পরিবার (Indian Joint Family) :

মাতাপিতা এবং তাহাদের সন্তানগণকে লইয়া এখন পরিবার গঠিত। সন্তানগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাপিতার সাহায্য ছাড়া চলিতে পারে। কিন্তু শিশু-সন্তানগণ মাতাপিতার সাহায্য ছাড়া চলিতে পারে না। কাজেই নাবালক শিশুগণকে মাতাপিতার সঙ্গে থাকিতে হয়। মাতাপিতা এবং শিশু পুত্র-কন্যাগণকে লইয়া যে পরিবার গঠিত, সেই পরিবারই ক্ষুদ্রতম পরিবার। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে পরিবার বলিতে এই ক্ষুদ্রতম আয়তনের পরিবারের কথাই বুঝায়। সেখানে স্বামী-স্ত্রী এবং শিশু পুত্র-কন্যা লইয়াই পরিবার গঠিত.

ভারতীয় পরিবার প্রাচীনকাল হইতেই অনুরূপ। বৃদ্ধ মাতাপিতা বিবাহিত পুত্রের সঙ্গে বাস করে। কোন মাতাপিতার একাধিক পুত্র থাকিলে সাবালক হইয়াও সেই পুত্রগণ সকলে মাতাপিতার সঙ্গে বাস করে। কাজেই মাতাপিতা, ভ্রাতা-ভগিনী এবং পুত্র-কন্যা লইয়া ভারতীয় পরিবার। কোন কোন ক্ষেত্রে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়গণও পরিবারের অংশ। এই ধরনের বড় পরিবারকে যৌথ পরিবার বলা হয়। ইহারা সকলে এক সঙ্গে থাকে এবং আহার করে বলিয়া এই পরিবারকে একান্নবর্তী পরিবারও বলা হয়।

যৌথ পরিবারের কতগুলি সুবিধা আছে। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের উপার্জিত অর্থ পরিবারের সকলেই ভোগ করে। এক বা একাধিক ব্যক্তি উপার্জন করিতে না পারিলেও তাহাকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয় না। পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি আহার, বাসগৃহ, শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে একই রকমের সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। বিপদে একে অন্যের সাহায্য করিতে পারে। আহার প্রভৃতি নানা কাজ এক সঙ্গে করে বলিয়া মোট ব্যয়ও কম হয়। পরিবারের সভ্য-সংখ্যা বেশী থাকায় বিভিন্ন কার্যের ভার বিভিন্ন ব্যক্তির উপর দেওয়া যায়। কাজও সুসম্পন্ন হয়।

যৌথ পরিবার প্রথার কতগুলি অসুবিধাও আছে। এই প্রথা আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। কোনও পরিবারের এক বা একাধিক ব্যক্তি উপার্জন করিলে এবং তাহার বা তাহাদের আয় দ্বারা পরিবারের সাধারণতঃ ব্যয় সঙ্কুলান হইলে পরিবারের অপর ব্যক্তিগণ উপার্জন বিমুখ হইতে পারে, তাহারা আলস্যে কাল কাটাইতে পারে। অন্ন-বস্ত্রের জন্য যখন কোন ভাবনা থাকে না, তখন পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করার প্রয়োজন নাই বলিয়া তাহারা মনে করে। অথচ পৃথকভাবে বাস করিলে অন্তত অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের জন্যও প্রত্যেককেই উপার্জনের চেষ্টা করিতে হয়। একসঙ্গে কয়েক ব্যক্তি এক পরিবারে বাস করিলে যাহারা উপার্জন করে তাহাদের অর্জিত অর্থ নিজেদের জন্য এবং অনুপায়ীদের জন্য ব্যয় হইয়া যায়। তাহারা কিছু সঞ্চয় করিতে পারে না। সঞ্চয় না থাকার ফলে কখনও কখনও অবস্থা বিপর্যয়ের ফলে নিজেরা বিপন্ন হয়। সঞ্চয় না থাকার ফলে জাতীয় মূলধন সৃষ্টির পথে বাধা দেখা দেয়। অনেকে একসঙ্গে বাস করিলে বিভিন্ন মত পোষণের জন্য নিজেদের মতান্তর, মনান্তর এমনকি কলহ বিবাদ ঘটে। তাহাতে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়।

এই সকল নানা কারণে আমাদের দেশের যৌথ পরিবারের প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবেও মানুষ ছোট আকারের পরিবারে বাস করিতে উৎসাহিত হইতেছে। এখন আমাদের দেশের পরিবারের গড়পড়তা লোকসংখ্যা তিন হইতে চার। স্বামী-স্ত্রী পুত্র-কন্যা লইয়াই এখনকার পরিবার। মনে হয় পাশ্চাত্য দেশগুলির মত আমাদের দেশে ক্ষুদ্রতম পরিবারের প্রথা প্রচলনের বিলম্ব আর নাই।

প্রশ্ন

১। সমাজের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা কর। (পৃঃ ৬-৮)

২। প্রাচীনযুগের পরিবারের গঠন কিরূপ ছিল ? (পৃঃ ৯ ১০)

৩। আমাদের দেশের যৌথ পরিবারের প্রথার গুণাগুণ আলোচনা কর। (পৃঃ ১০-১১)

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

ব্যক্তি এবং সমাজ :

পূর্বের আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টরূপে বুঝা গিয়াছে যে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কোন ব্যক্তি সমাজের বাহিরে বাস করিতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে সমাজের বাহিরে অল্প কিছু কাল রাখিলেই তাহার নিকট জীবন দুর্বহ হইয়া উঠে। নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত অ্যালেকজেণ্ডার সেলকার্ক ভাবিলেন যে, সেখানে সকল কিছুর উপরই তাঁহার একাধিপত্য। তিনি সেই দ্বীপ-রাজ্যের রাজা। তথাপি, তাঁহার মন অধীর হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আমার যদি পাখীর মত পাখা থাকিত, আমি যত শীঘ্র সম্ভব গিয়া ভালবাসা, বন্ধুত্ব এবং সমাজের আনন্দ উপভোগ করিতাম।' ইহা কাহিনী। কিন্তু যে চিত্র এই কাহিনীতে পাই তাহা মানুষের মনের চিরদিনের সত্য। অপরের সঙ্গে এবং মানুষের সমাজে বাস করা মানবমাত্রেরই কাম্য।

স্নেহ, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি, পরোপকার প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে মানুষ প্রকৃত মানুষপদবাচ্য হয়, সেই সকল গুণের বিকাশ সমাজেই সম্ভব। মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় সমাজে, সেইজন্যও মানুষের নিকট সমাজ অপরিহার্য।

সমাজ যেমন মানুষের নিকট অপরিহার্য, তেমন সমাজও মানুষ ভিন্ন গঠিত হইতে পারে না। সমাজের যে বন্ধন এবং শৃঙ্খলা তাহা মানুষের পক্ষেই মানিয়া চলা সম্ভব। আমরা কখনও কখনও কথায় বলি 'পশু সমাজ'। সে-কথা বলিতে আমরা কোন সংঘবদ্ধতার ভাব বুঝাই না। সমগ্র পশুজাতিকে বুঝাইবার জন্যই ঐ ধরনের শব্দ ব্যবহার করি। মানুষের যে সমাজ তাহাতে উদ্দেশ্য যেমন বিদ্যমান, সংঘবদ্ধতার ভাবও তেমনি বিদ্যমান।

সমাজে বাস করিতে হইলে মানুষকে কতকগুলি নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হয়। সব সময়ে মানুষ নিজের খুশিমত আচরণ করিতে পারে না। অপরের সুবিধার জন্য নিজের খেয়ালখুশিকে কিছুটা সংযত করিতে হয়। এই কারণে সমাজ-জীবন অবাঞ্ছনীয় বলিয়া কেহ কেহ মনে করে। একটু চিন্তা করিলে ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারে যে, সকলের সুবিধার জন্যই সকলে এই সকল

নিয়মকানুন মানে। এই নিয়মকানুন সমাজ-জীবনকে অবাঞ্ছনীয় ত করেই না, বরং অধিকতর বাঞ্ছনীয় করিয়াছে।

রাষ্ট্র :

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রই বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাসকারী বহিঃশাসনমুক্ত সুসংবদ্ধ সরকারবিশিষ্ট জনসমাজকে রাষ্ট্র বলা হয়। উপরের এই সংজ্ঞাটিকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের চারিটি উপাদান আছে। ইহার প্রথম উপাদান জনসমষ্টি, দ্বিতীয় উপাদান নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, তৃতীয় উপাদান সরকার এবং চতুর্থ উপাদান সার্বভৌম শক্তি।

জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত। রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানই জনসমষ্টিকে বাদ দিয়া গঠিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান। জনসমষ্টি ইহার অন্যতম উপাদান। রাষ্ট্রের জনসমষ্টি ক্ষুদ্রও হইতে পারে, বৃহৎও হইতে পারে। ভারত রাষ্ট্রের জনসংখ্যা খুব বেশী। অন্য দিকে দক্ষিণ আমেরিকার পানামা রাজ্যের লোকসংখ্যা খুব কম। জনসংখ্যা বেশী হইলেই যে রাষ্ট্র শক্তিশালী হয় এবং কম হইলেই যে রাষ্ট্র দুর্বল হয়, তেমন নহে। জনসংখ্যা শক্তির একটি উপাদান বটে, কিন্তু সংখ্যা ছাড়াও শক্তি নির্ভর করে লোকেদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক গঠন এবং রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক ও অর্থ নৈতিক সম্পদের উপর।

রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজন। একটি জনসমষ্টি যদি বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে তাহারা রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। রাষ্ট্র-গঠনের জন্য জনসমাজের একটা নির্দিষ্ট স্থায়ী বাসস্থান থাকা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্যনির্দিষ্ট কোন সীমারেখা দ্বারা একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র হইতে পৃথক করা হয়। কোন রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বৃহৎ হইতে পারে, আবার অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ক্ষুদ্রও হইতে পারে। চীন রাষ্ট্র আয়তনে খুব বড়, অপরদিকে হল্যাণ্ড রাষ্ট্র আয়তনে খুব ছোট।

সরকার রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদান। রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তাহা কতগুলি নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়মকানুন প্রণয়ন এবং কার্যকরী করার জন্য যে প্রতিষ্ঠান থাকে, তাহাকে সরকার বলা হয়। রাষ্ট্রের করণীয় সকল কার্য সরকারই সম্পন্ন করে। সরকারই রাষ্ট্রের বহিঃপ্রকাশ। সরকার ভিন্ন রাষ্ট্র থাকিতে পারে না।

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের শেষ এবং অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রকৃত রাষ্ট্র নামে অভিহিত হইতে হইলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই এমন একটা শক্তি থাকা প্রয়োজন, যে শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে এবং যে শক্তির ফলে বাহিরের কোন শক্তি রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে না। এই শক্তিই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি। এই সার্বভৌম শক্তি না থাকিলে কোন মানব-সমাজ রাষ্ট্র নামে অভিহিত হইতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতবর্ষকে প্রকৃত রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা যাইত না। ইহার বিপুল জনসংখ্যা ছিল, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল, এমনকি সুগঠিত একটি সরকারও ছিল। কিন্তু তখন ব্রিটিশ সরকার ভারত রাষ্ট্রের সকল ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিতে পারিত। কাজেই ভারতবর্ষের সার্বভৌম শক্তি ছিল না। ভারত তখন একটি প্রকৃত রাষ্ট্র ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত এখন প্রকৃত রাষ্ট্ররূপে পরিণত হইয়াছে। এখন বিপুল জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুগঠিত সরকার ছাড়াও ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। কাজেই এখন ভারত একটি প্রকৃত রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র এবং সরকার :

সাধারণ আলোচনায় রাষ্ট্র এবং সরকার একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র এবং সরকার পৃথক জিনিস। সরকার রাষ্ট্রের একটি অংশ। যে চারিটি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়, সরকার তাহাদের অন্যতম। মস্তিষ্ক যেরূপ মনুষ্যদেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গ, সরকারও সেইরূপ রাষ্ট্রদেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সমগ্র রাষ্ট্রবাসীকে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত, সমগ্র রাষ্ট্রবাসীর একটি অংশ লইয়া সরকার গঠিত। এমন কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সরকার বলিতে আমরা সমগ্র জনসাধারণকে না বুঝাইয়া কেবল মন্ত্রিমণ্ডলী এবং সরকারী কর্মচারিগণকে বুঝাইয়া থাকি। রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সরকার পরিবর্তনশীল। রাষ্ট্রের দলবিশেষ সংখ্যাধিক্যবশতঃ আজ সরকার গঠন করিতে পারে। কিছুদিন পর যদি এই দল জনসাধারণের আস্থা হারায় এবং ইহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হয়, তখন অন্য দল সরকার গঠন করে। কিন্তু রাষ্ট্র অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। সরকারের বাস্তব রূপ এবং বহিঃপ্রকাশ আছে। সরকার বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় ; তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কিন্তু রাষ্ট্রের কোন বাস্তব রূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। ইহা কেবল অনুভব করা যায়।

রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংঘ :

সমাজ-জীবনে রাষ্ট্র ব্যতীত আরও অনেক সংঘ রহিয়াছে। কিন্তু নানা কারণে রাষ্ট্র ঐ সকল সংঘ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অন্যান্য সংঘের সভ্য হওয়া ব্যক্তি-বিশেষের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। একজন শ্রমিক শ্রমিকমণ্ডলীর সভ্য হইতে পারে, না-ও হইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া আবশ্যিক। রাষ্ট্রের সমগ্র জনসাধারণ রাষ্ট্রের সভ্য। রাষ্ট্রের এলাকা একটি ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ। ভারত রাষ্ট্র বলিতে আমাদের মনে একটি ভৌগোলিক সীমার কথা জাগিয়া উঠে। কিন্তু অন্যান্য সংঘের এলাকা ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ না-ও হইতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নভাবে ইহার শাখা থাকিতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে রোটারী ক্লাবের শাখা আছে। কোন ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না। কিন্তু এক ব্যক্তি একই সময়ে বিভিন্ন সংঘের সভ্য হইতে পারে। অন্যান্য সংঘ বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাপক। ব্যাপকভাবে নাগরিকগণের কল্যাণ-সাধনের জন্য রাষ্ট্র গঠিত। রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য সংঘের মূল পার্থক্য এই যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। অন্যান্য সংঘের সে ক্ষমতা নাই। সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র ব্যক্তি এবং ব্যক্তিসমষ্টির উপর সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব করিতে পারে। রাষ্ট্রের বিধান ভঙ্গ করিলে রাষ্ট্র নাগরিকদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাও করিতে পারে। অন্যান্য সংঘের সেইরূপ ক্ষমতা নাই। কোন সংঘের বিধান ভঙ্গ করিলে সেই সংঘ বড় জোর ব্যক্তিবিশেষের সভ্যপদ বাতিল করিয়া দিতে পারে। সার্বভৌম ক্ষমতার অভাবই এই দুর্বলতার কারণ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি :

রাষ্ট্র কি তাহা ভাল করিয়া জানিতে হইলে কিভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জানা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। ইহাদের মধ্যে দৈব উৎপত্তির মতবাদ, শক্তি-প্রয়োগের মতবাদ, সামাজিক চুক্তির মতবাদ এবং ঐতিহাসিক মতবাদই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দৈব উৎপত্তির মতবাদ (Theory of Divine Origin) :

যাহারা দৈব উৎপত্তি মতবাদের সমর্থক তাহাদের মতে ঈশ্বর রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বরের নির্দেশেই রাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হয়। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাজা রাষ্ট্র শাসন করে। রাষ্ট্র-শাসনে রাজা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কার্যকরী করে। রাজা ঈশ্বরের নির্দেশে কাজ করে। সেইজন্য রাজার আদেশ অমান্য

করার অর্থ ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা যেমন অন্যায়, রাজার আদেশ অমান্য করাও তেমনি অন্যায়। রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করার তাৎপর্য একই। অপর দিকে রাজা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট দায়ী। অপর কাহারও নিকট রাজার কোন দায়িত্ব নাই। এই মতবাদ অনুসারে রাজা অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

প্রাচীন কালে অনেক দেশেই রাজাকে ঈশ্বরের পরেই স্থান দেওয়ার রীতি ছিল। প্রাচীন ভারতে রাজাকে নররূপী ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মিশর দেশে প্রাচীন কালে রাজাকে সূর্যদেবের বংশোদ্ভব বলিয়া মনে করা হইত।

এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, এই মতবাদ রাজার স্বেচ্ছাচারিতার সমর্থন করে। রাজা নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে স্বেচ্ছাচারী রাজগণের কার্যকলাপের সমর্থনের জন্যই বিশেষভাবে এই মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।

এই মতবাদের কিছুটা মূল্যও আছে। ইহা সহজে রাজদ্রোহ রোধ করে। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে ইহা সাহায্য করে। লোকেরা রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি জানিয়া রাজাদ্বারা প্রচারিত নির্দেশ সহজে মানিয়া লয়। রাজাও নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করিয়া লোকেদের মঙ্গল-সাধনে যত্নবান হয়। গণতন্ত্র এই দৈব উৎপত্তি মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

শক্তি-প্রয়োগ মতবাদ :

এই মতবাদের সমর্থকগণ মনে করে যে, শক্তি-প্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। শক্তির সাহায্যেই রাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হইতেছে। তাহাদের মতে আদিম কাল হইতেই 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতি চলিয়া আসিতেছে। সকল সময়েই সবল ব্যক্তি দুর্বলের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহাকে পরাভূত করিয়াছে এবং তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলেও এই সংগ্রাম, পরাভব এবং আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস আছে। ইহাদের মতে শক্তিমান ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিদিগকে বলপ্রয়োগ করিয়া নিজ অধীনে আনিয়া তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহাদের মতে রাষ্ট্র-শাসনের মূলে আছে শক্তি। রাষ্ট্র শক্তিশালী বলিয়াই জনগণ রাষ্ট্রের শাসন মানিয়া চলে। রাষ্ট্র যদি শক্তির অধিকারী না হইত, তবে কেহ রাষ্ট্রের শাসন মানিয়া চলিত না।

এই মতবাদের মধ্যেও কিছুটা সত্য আছে। রাষ্ট্রের গঠনে এবং কার্য পরিচালনে শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু কেবল শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে জনগণের সমর্থনের উপর, আঘাত করিতে উদ্যত সঙ্গীনের উপর নহে। জনগণের সম্মতির অভাব হইলে পুলিশ বা সৈন্যবাহিনী রাষ্ট্র রক্ষা করিতে পারে না।

শক্তিকেই যদি রাষ্ট্রের ভিত্তি বলিয়া মনে করা হয়, তবে সকল রাষ্ট্রই শক্তি দৃঢ় করিবার কাজে মনোনিবেশ করিবে ; শক্তিবৃদ্ধির ফলে বিরোধ-বিসংবাদ বাড়িবে। বিশ্বের শান্তি নষ্ট হইবে।

নৈতিক দিক দিয়া এই মতবাদ সমর্থন করা যায় না। 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতি মানুষের মধ্যে প্রচলিত থাকা সঙ্গত নহে। ইহা বন্য নীতি। এই নীতি বন্য পশুপক্ষীর মধ্যে প্রচলিত থাকিতে পারে। মানুষ পশু হইতে অনেক উর্ধ্বে।

শক্তি যে রাষ্ট্র গঠনের এবং সংরক্ষণের একটি উপাদান, একথা সত্য। কিন্তু ইহাই একমাত্র উপাদান নহে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ :

হব্‌স, লক, রুশো প্রভৃতি সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থক। যাঁহারা এই চুক্তির সমর্থন করেন তাঁহাদের মতে আদিম কালে মানুষ যে অবস্থায় বাস করিত, সে অবস্থা ছিল প্রাকৃতিক অবস্থা। তখন রাষ্ট্রের বা সমাজের বন্ধন ছিল না। প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কাজ করিত। কাহাকেও কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন উপায় ছিল না। ফলে নানারূপ অসুবিধা এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এই অসুবিধা এবং বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য লোকেরা একটা চুক্তি সম্পাদন করিল। ইহাই সামাজিক চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে মানুষ রাষ্ট্র গঠন করিয়া সংঘবদ্ধভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিল। এই সামাজিক চুক্তিই রাষ্ট্রের মূল।

হব্‌স, লক এবং রুশো এই তিনজন লেখকই সামাজিক চুক্তিকে রাষ্ট্রের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রাকৃতিক অবস্থা, চুক্তির বিভিন্ন পক্ষ এবং চুক্তির ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রের রূপ সম্বন্ধে তিনজনের মধ্যে কিছুটা মতের পার্থক্য ছিল।

হব্‌সের মতে মানুষ যে প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করিত, সে অবস্থায় শৃঙ্খলা বলিয়া কিছু ছিল না। মানুষে মানুষে সংগ্রাম সকল সময় লাগিয়া থাকিত। মানুষের জীবন তখন ছিল নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, কদর্য, পাশবিক এবং স্বল্পায়ু। এই

অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য লোকেরা নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদন করিয়া এক ব্যক্তির হাতে নিজেদের তথাকথিত স্বাভাবিক অধিকারগুলি সমর্পণ করিল। বিনিময়ে তাহারা নিজেদের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার আশ্বাস পাইল। যে ব্যক্তির হাতে স্বাভাবিক অধিকার দেওয়া হইল, সে ব্যক্তি রাজা হিসাবে পরিচিত হইল। লোকেরা লোকেদের মধ্যে সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করিল। রাজা চুক্তিতে পক্ষ ছিল না। রাষ্ট্রে রাজা সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন হইল। হব্সের সামাজিক চুক্তি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সমর্থন করে।

লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় শৃঙ্খলা যে একেবারে ছিল না, তেমন নহে। লোকেরা প্রাকৃতিক নিয়ম এবং চুক্তি মানিয়া চলিত। স্বভাবতঃ তাহারা যদৃচ্ছ আচরণ করিত না। তথাপি সমাজে পূর্ণ শান্তি বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন ব্যক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করিতে পারিত। ফলে বিরোধ দেখা দিত। বিরোধ মীমাংসা করিবার মত কেহ ছিল না। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য লোকেরা একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া একজনকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। প্রথমে লোকেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া একটি সামাজিক জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিল। পরে তাহারা রাজার সঙ্গে চুক্তি করিয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত করিল। রাজা চুক্তির একটি পক্ষ হইল। লোকেরা নিজেদের কিছু অধিকার রাজার হাতে ছাড়িয়া দিল। রাজা লোকেদের অবশিষ্ট অধিকার সংরক্ষণ করিবার অঙ্গীকার করিল। রাজা চুক্তি ভঙ্গ করিলে রাজাকে পদচ্যুত করিবার অধিকার লোকেদের হাতে রহিল। লকের মতে রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজার সৃষ্টি হইল।

রুশোর মতে প্রাকৃতিক অবস্থা অত্যন্ত মনোরম ছিল। ইহা তখন মর্ত্যে স্বর্গের অবস্থার মতই ছিল। ইহাতে শান্তি, আনন্দ এবং সাম্যের ভাব পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তখন মানুষ স্বাভাবিক স্বাধীনতা ভোগ করিত। কিন্তু লোকসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে মানুষে মানুষে সংঘাত, বিশেষ করিয়া আর্থিক সংঘাত দেখা দিল। তাই তাহারা নিজেদের স্বাভাবিক স্বাধীনতার বিনিময়ে সামাজিক স্বাধীনতা লাভের জন্য নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে চুক্তিবদ্ধ হইল। লোকেরা কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে তাহাদের অধিকার অর্পণ করিল না। তাহারা নিজেদের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা রাখিয়া দিল। তাহারা গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিল। নূতন সৃষ্টি-করা রাজ্যের রূপ হইল গণতান্ত্রিক।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরুদ্ধে একথা বলা চলে যে, পৃথিবীতে কোন দেশে চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের সৃষ্টির কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

মানুষ যে আদিম কালে প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করিত, তাহাও বিশ্বাস করিতে হইলে কেবলমাত্র কল্পনার উপরই নির্ভর করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ একথা বলা চলে যে, রাষ্ট্রই নিয়মকানুনের প্রবর্তক। যখন রাষ্ট্র ছিল না, তখন নিয়মকানুনও ছিল না। নিয়মকানুন না থাকিলে এবং সেগুলি লোকের মানিয়া চলার অভ্যাস না থাকিলে, চুক্তি সম্পাদন ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

তৃতীয়তঃ একথা বলা চলে যে, এই মতবাদ মানিয়া লওয়া বিপজ্জনক। মানুষ যদি চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে, তবে তাহারা চুক্তি করিয়া তাহা ভঙ্গও করিতে পারে। এই মতবাদে বিশ্বাসী হইলে লোকেরা সামান্য কারণেও রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারে।

এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইতে না পারিলেও ইহার মূলে যে একটি সত্য আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করে। চুক্তিকে রাষ্ট্রের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করার অর্থ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় এবং রাষ্ট্রের কার্য-পরিচালনে জনগণের সম্মতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের গঠনে এবং পরিচালনে জনগণের সম্মতির কথা সকলেই স্বীকার করে।

ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical Theory) :

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র মানুষ বা ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের জন্মের পর হইতেই স্বভাববশতঃ মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। অবশ্য প্রাচীনতম সমাজের বন্ধন খুব দৃঢ় ছিল না, আর সামাজিক জীবন খুব সুশৃঙ্খলও ছিল না। কালক্রমে বিবর্তনের ফলে এই দুর্বল এবং অপরিণত সমাজ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। রাষ্ট্র একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। ইহা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে।

মোটামুটি রক্তের সম্বন্ধ, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যক্তিগতভাবে ধনসম্পত্তির মালিকানা এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা রাষ্ট্র-গঠনে সহায়তা করিয়াছে। পরিবার মানুষের আদিমতম সমাজ। এক পরিবার হইতে বিভিন্ন পরিবারের উদ্ভব হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন পরিবার একটি গোষ্ঠী গঠন করিয়াছে। একই পরিবার হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন গোষ্ঠী একটি উপজাতি গঠন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ থাকায় একটা ঐক্যবোধ ছিল; এই ঐক্যবোধ ইহাদের সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করিয়াছে। আবার রক্তের বন্ধন একটু শিথিল হইলে ধর্মের বন্ধন সমাজের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে

সহায়তা করিয়াছে। যাহারা একই ধর্ম আচরণ করিত, তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই একটা ঐক্যবোধ জাগিয়া উঠিত। যুদ্ধ কখনও কখনও সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করিয়াছে। যুদ্ধে যাহারা পরাজিত হইয়াছে, তাহারা বিজয়ী-দলভুক্ত হইয়াছে। উভয়েই একই সমাজিক সংগঠন মানিয়া লইয়াছে। আদিম কালে সকল প্রাকৃতিক সম্পদেই সকলের অধিকার ছিল। কিন্তু লোকসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্ন দেখা দিল। ফলে নিয়মকানুন প্রবর্তনের দরকার হইল। নিয়মকানুন মানাইবার মত দৃঢ় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দিল। সমাজের রীতিনীতি আরও দৃঢ় হইল। রাষ্ট্রের গঠনে সর্বাপেক্ষা বেশী দান ছিল রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার। মানুষ ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিল, দৃঢ় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় তাহারা তাহাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। মানুষ তখন অপরিণত সমাজকে দৃঢ় করিয়া ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিল। এইভাবে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদই শ্রেষ্ঠ মতবাদ বলিয়া গণ্য হয়।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি—জৈব মতবাদ (Organismic Theory):

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি বিশেষ মতবাদ আছে। ইহার নাম জৈব মতবাদ। এই মতবাদের সমর্থকগণ উদ্ভিদ বা জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কতগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া যেমন জীবদেহ গঠিত, রাষ্ট্রও তেমনই কতগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া গঠিত। জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সমষ্টিগতভাবে দেহের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তেমনই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সমবেতভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। জীবদেহে যেমন কতগুলি কোষ আছে, রাষ্ট্রের দেহেও তেমনই কতগুলি কোষ আছে। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ রাষ্ট্রদেহের কোষ। কোন কোন সমর্থকের মতে মস্তিষ্ক, স্নায়ু, মাংসপেশী প্রভৃতি মানবদেহের বিভিন্ন অংশ যে ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে, রাষ্ট্রদেহেরও বিভিন্ন অংশ অনুরূপ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এই মতবাদের চরম সমর্থকগণ মনে করিতেন যে রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোন নাগরিকের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় নাগরিকগণ নিজ অস্তিত্বের জন্য অপরাপর নাগরিকগণের উপর এবং সমগ্র রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল।

জৈব মতবাদ অতি পুরাতন মতবাদ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের লেখকগণ এই মতবাদের সমর্থন করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো রাষ্ট্রের সঙ্গে মানবদেহের তুলনা করিয়াছিলেন এবং ব্যক্তির বিভিন্ন কার্যাবলীর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। রোমান লেখক সিসেরো রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে মানবদেহের পরিচালনকারী শক্তির তুলনা করিয়াছেন। মধ্যযুগের এবং আদি আধুনিক যুগের অনেক লেখক এইরূপ ভাবে এই মতবাদের সমর্থন করিয়াছেন। হব্‌স রাষ্ট্রের সঙ্গে এক অতিকায় জন্তুর তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের আত্মা, রাষ্ট্রের কার্যপালিকা (Executive) বিভাগের সঙ্গে দেহের গ্রন্থি এবং পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান-প্রণালীর সঙ্গে দেহের শিরার তুলনা করা চলে। তিনি এমন কি রাষ্ট্রের দুর্বলতার সঙ্গে দেহের বিস্ফোট প্রভৃতি রোগের তুলনা করিয়াছেন। মনুষ্যদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রদেহের তুলনা করিতে গিয়া রুশো রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারী বিভাগকে রাষ্ট্রের হৃদয়, কার্যপালিকা বিভাগকে রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জার্মান লেখক ব্লুন্টস্‌লি ছিলেন এই মতবাদের চরম সমর্থক। তাঁহার মতে রাষ্ট্র একটি কৃত্রিম যন্ত্র নহে। ইহা একটি সজীব পদার্থ। যে কোন তৈলচিত্র যেমন কতগুলি তৈলবিন্দুর সমষ্টিমাত্র নহে, যে কোন প্রস্তরমূর্তি যেমন কতগুলি প্রস্তরখণ্ডের সমষ্টিমাত্র নহে, তেমনই রাষ্ট্রও কতকগুলি নাগরিকের বা নিয়মকানুনের সমষ্টিমাত্র নহে। ইংরেজ লেখক হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে মানবদেহ এবং সমাজ এই উভয়েই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে জীবন আরম্ভ করে, ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ পরস্পর হইতে পৃথকরূপ ধারণ করে এবং জটিল হইতে জটিলতর হয়। সর্বনিম্ন স্তরের জীবদেহ উদর এবং শ্বাসপ্রণালী লইয়া গঠিত; তেমনই আদিম অবস্থায় সমাজ শিকারী, কুটির নির্মাতা, বা ছোট-খাট হাতিয়ার নির্মাণকারী মানুষ লইয়া গঠিত ছিল। সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রম বিভাগ দেখা দিল এবং নূতন নূতন কাজের প্রয়োজনে সমাজে নূতন নূতন অঙ্গের উদ্ভব হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও নূতন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নূতন অঙ্গের উদ্ভব হয়। সমাজ এবং মানবদেহ এই উভয় ক্ষেত্রেই অঙ্গগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক অঙ্গের নিজ নিজ কর্ম সম্পূর্ণরূপে সম্পাদনের উপর অপর অঙ্গগুলির স্বাস্থ্য এবং সজীবতা নির্ভর করে। যে কোন একটি অঙ্গ নিজ কর্ম সম্পাদনে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে অপর অঙ্গগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানবদেহের স্নায়ু এবং রক্ত-কণিকা প্রভৃতির পরিবর্তন এবং পুনর্সংস্থাপনের

ফলে দেহের বিলোপ এবং পুনর্জন্ম হয়। ফলে জীবনের ধারা অব্যাহত থাকে। তেমনই সমাজেরও বিভিন্ন অঙ্গের বিলোপ সংঘটনের বা পরিবর্তনের পরও সমাজের ধারা অব্যাহত থাকে। এই সকল সামঞ্জস্যের উল্লেখ করিয়াও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে জীবদেহের বিভিন্ন অংশ অবিচ্ছেদ্য রূপে দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাহার চেতনা একটি বিশিষ্ট অংশে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু সমাজদেহের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের হইতে দৃশ্যতঃ বিচ্ছিন্ন এবং স্বাধীন। সমাজের চেতনা সমগ্র সমাজের দেহময় ছড়াইয়া আছে। এই পার্থক্য উল্লেখযোগ্য হইলেও তাঁহার মতে ইহা জৈব মতবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে যদি জৈব মতবাদ ব্যক্তির সঙ্গে সমগ্র সমাজ বা রাষ্ট্রের নির্ভরশীলতার উপর জোর দেয় বলিয়া মনে করা হয়, তবে এই মতবাদের বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা করা যায় না। এমন কি ইহা যে জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করে তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং সঙ্গতও বটে। তথাপি একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এই উপমা অনেক ক্ষেত্রেই কাল্পনিক। জীবকোষের সঙ্গে রাষ্ট্রের নাগরিকের তুলনা নিতান্ত বাহ্য। কারণ জীবকোষগুলির পৃথকভাবে কোন জীবন নাই, ইচ্ছাশক্তি বা চিন্তাশক্তি নাই। সম্পূর্ণরূপে সমগ্র দেহের সংরক্ষণের জন্যই ইহাদের অস্তিত্ব। কিন্তু নাগরিকগণের পৃথক জীবন আছে, ইচ্ছাশক্তি বা চিন্তাশক্তি আছে। তাহাদের নিজস্ব চলিবার শক্তি আছে, নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি আছে। আংশিকভাবে নিজ নিজ জীবন নিয়মিত করার শক্তি তাহাদের আছে। তাহাদের সমগ্র কর্মধারা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না। কোষগুলির মধ্যে চেতনা এবং ইচ্ছাশক্তির অভাব এবং নাগরিকের মধ্যে এইগুলির অস্তিত্ব রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে উপমার দুর্বলতা প্রমাণ করে। জীবদেহের অংশগুলির সমগ্র দেহের উপর নির্ভরশীলতা অপরিহার্য। যে কোন অংশকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে ইহা লোপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সমাজদেহ হইতে কোন ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিলেও সে ব্যক্তি ব্যক্তি থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ জীবদেহের জন্ম, বৃদ্ধি, বিলোপের নিয়ম সমাজের জন্ম, বৃদ্ধি বা বিলোপের নিয়মের সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। জীবদেহ ভিতর হইতে জন্মে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাহির হইতে কোন অংশের সংযুক্তি বা পরিবর্তনের ফলে ইহা সংগঠিত হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রদেহ বাহির হইতে সংযুক্তি এবং পরিবর্তনের ফলে বৃদ্ধি বা লোপ প্রাপ্ত হয়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের সক্রিয় চেষ্টার ফলে এই সকল ঘটিয়া থাকে। মানুষের নিজ চেষ্টার ফলে তাহার দেহের বৃদ্ধি বা পরিবর্তন সাধন সম্ভব

নহে। লেখক জেলিনেকের মতে জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু জীবদেহের পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু রাষ্ট্রদেহের পক্ষে এগুলি মোটেই অপরিহার্য নহে। এই সকল কারণে এই মতবাদকে সমর্থন করা সম্ভব নহে। বাস্তবিক পক্ষে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক এই মতবাদের সমর্থন না করিলে ইহা মোটেই আলোচনার যোগ্য হইত না।

জৈব মতবাদ যে একেবারেই মূল্যহীন তাহা নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক তখন মনে করিতেন যে রাষ্ট্র একটি যন্ত্র-বিশেষ, বিভিন্ন অংশ জুড়িয়া দিলে ইহা গঠিত হয়। এই ধরনের ধারণা তখন রাষ্ট্রের দুর্বলতার উৎস ছিল। জৈব মতবাদ এই ধারণার বিরোধিতা করিয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের উপর বিভিন্ন অঙ্গের নির্ভরশীলতা এবং রাষ্ট্রের ঐক্যের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছে।

প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রের একটি সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইহার বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লেষণ কর। (পৃঃ ১৪)
২। অন্য সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্য নির্দেশ কর। (পৃঃ ১৬)
৩। "রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে" এই মতবাদের আলোচনা কর। (পৃঃ ১৬-১৭)
৪। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদ কি? তাহা বিশ্লেষণ কর। (পৃঃ ২০-২১)
৫। জৈব মতবাদের আলোচনা কর। (পৃঃ ২১-২২)

চতুর্থ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন রূপ

(Forms of Government)

যে প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে, সে প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় সরকার। গঠন-প্রণালী এবং শাসন-পরিচালনের রীতি অনুসারে সরকারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। কোনও রাষ্ট্রের সরকারকে বলা হয় একনায়কতন্ত্র, আবার কোনও রাষ্ট্রের সরকারকে বলা হয় গণতন্ত্র। কোনও রাষ্ট্রের সরকারকে বলা হয় এককেন্দ্রিক সরকার, আবার কোনও রাষ্ট্রের সরকারকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। আবার কোনও সরকার মন্ত্রিপরিষৎ-শাসিত, কোনও সরকার রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার। এক প্রকারের সরকার যেভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে, অন্য প্রকারের সরকার তাহা হইতে পৃথক-ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) :

যে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের চরম শাসন-ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে থাকে, সে ব্যবস্থার সরকারকে বলা হয় একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত জার্মানি এবং ইতালিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন রাশিয়ায় একনায়কতন্ত্র বিদ্যমান। প্রাচীন কালেও কোন কোন রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সেই সকল রাষ্ট্রে শাসক ছিলেন রাজা। রাজ-পদ ছিল উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত। তখন একনায়কতন্ত্রে জনগণের সমর্থনের প্রয়োজন বড় একটা ছিল না। তখন একনায়কতন্ত্র-শাসিত দেশের শাসকরা রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বশক্তিমান ব্যক্তি ছিল। তাহারা নিজের ইচ্ছামত শাসনকার্য পরিচালনা করিত। অন্যায় অত্যাচার করিলেও তাহাদিগকে বাধা দিবার কোন উপায় ছিল না। বর্তমান যুগের একনায়কতন্ত্রের শাসনকর্তা সাধারণতঃ কোন শক্তিশালী দলের নেতা। চরম ক্ষমতা তাহার হাতে থাকিলেও সাধারণতঃ সেই শাসনকর্তা প্রয়োজনবোধে নিজ দলের অভিমত অবগত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। হিটলার কিংবা মুসোলিনীর সমর্থনকারী দল ছিল। ইহারা দলের সমর্থনে একনায়কতন্ত্র বজায় রাখিয়াছিল। ইহারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে রাষ্ট্রের স্বার্থের নিকট বলি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। ইহাদের নিকট বিরোধী দলের কোন স্থান ছিল না। ইহারা হিংসায় বিশ্বাসী ছিল। একনায়কতন্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ বিরোধী দলের অধিকার স্বীকার করে না।

গণতন্ত্র (Democracy) :

যে শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করে, সেই শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় গণতন্ত্র। সমগ্র জাতির সামগ্রিক প্রয়োজন ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করা কোন এক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। গণতন্ত্রে ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া সকলের মিলিত বিবেচনার সহায়তায় শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। কোন নীতি নির্ধারণে যদি সকলের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং সকলের স্বার্থ সমভাবে বিবেচিত হয়, তবে সেই নীতি সকলের পক্ষে হিতকর এবং গ্রহণযোগ্য হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের মতে গণতন্ত্র জনসাধারণের জন্য রচিত জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনে জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনতন্ত্র। সকল শাসনতন্ত্রই জনসাধারণের জন্য রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল শাসনতন্ত্রের পরিচালক জনসাধারণ নহে। কেবল গণতন্ত্রেই জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। গণতন্ত্রের মূল নীতি—(১) জনসাধারণ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, (২) শাসন-ক্ষমতার পরিচালকগণ জনসাধারণের নিকট হইতে শাসনকার্য পরিচালনার অধিকার পায়। যে শাসন-ব্যবস্থা সর্বাধিক জনসংখ্যার সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে, সে শাসন-ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট। গণতন্ত্র যতদূর সম্ভব অধিকসংখ্যক লোকের, যতটা সম্ভব অধিক পরিমাণ কল্যাণ সাধন করিতে পারে বলিয়া ইহাকে বর্তমান যুগের সর্বোৎকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের মূল কথা ছিল সমাজের সুখ-সুবিধার অংশ সকল ব্যক্তিই পাইবে। কিন্তু বর্তমান যুগের গণতন্ত্রের মূল কথা—রাষ্ট্রের সুখ-সুবিধার অংশ সকলে পাইবে, পরন্তু সেই সুখ-সুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্য সকলে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করিবে। প্রকৃত গণতন্ত্র একটি সক্রিয় শক্তি। জনগণের চেষ্টায় নিয়ত উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া ইহার লক্ষ্য।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ গণতন্ত্র (Direct and Representative Democracy) :

গণতন্ত্রসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এবং পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ মিলিত হইয়া সমবেতভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। নাগরিকগণ মিলিত হইয়া আইন

প্রণয়ন করে, আয়-ব্যয়ের পন্থা নির্ধারণ করে এবং কর্মচারী নিয়োগ করে। প্রাচীন গ্রীস দেশের এথেন্স প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রে এবং প্রাচীন ভারতের কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বর্তমান কালে সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি আরণ্য-জনপদে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নিউ-ইংল্যাণ্ডের নগরসমূহে এইরূপ প্রত্যক্ষ শাসন প্রচলিত আছে।

বর্তমান পৃথিবীতে রাষ্ট্রের আয়তন সাধারণতঃ বৃহৎ। শাসন-ব্যবস্থাও পূর্বাপেক্ষা অনেকাংশে জটিলতর হইয়াছে। এই সকল বিশাল রাষ্ট্রের জন-সাধারণ মিলিত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিবে, ইহা ধারণা করাই কঠিন। ফলে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় জনগণ মিলিত হইয়া নিজেদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে। সাধারণতঃ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নির্বাচনের সময় জনসাধারণের নিকট হইতে যে সকল নির্দেশ পায়, সেই সকল নির্দেশ অনুসারে এবং পরে সভাসমিতি, সংবাদপত্র প্রভৃতির মারফতে গঠিত এবং প্রচারিত জনমত অনুসারে আইন প্রণয়ন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে সরকার একবার গঠিত হইলে ইহা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনসাধারণের অভিমতকে অগ্রাহ্য করিয়া শাসনকার্য চালাইতে পারে। তাহাতে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এই সম্ভাবনা আংশিকভাবে রোধ করিবার জন্য কোন কোন রাষ্ট্রে গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative) এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির পদত্যাগ দাবি (Recall) প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

কোন আইনের প্রস্তাব জনসাধারণের ভোটে গৃহীত বা পরিত্যক্ত করার বিধানকে বলে গণভোট। আইন-সভার নিকট জনসাধারণের আইনের প্রস্তাব পেশ করিবার রীতিকে বলা হয় গণ-উদ্যোগ। নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচকমণ্ডলীর অভিমতকে অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করিলে কখনও কখনও নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধির পদত্যাগ দাবি করিতে পারে। এই রীতিকে বলা হয় Recall। এই সকল ব্যবস্থার সাহায্যে নির্বাচকমণ্ডলী তাহাদের প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। তাহা ছাড়া নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ পুনরায় নির্বাচিত হইবার আশা পোষণ করে বলিয়া তাহারা নির্বাচকমণ্ডলীর অভিমতকে একেবারে অগ্রাহ্য করে না।

গণতন্ত্রের গুণ :

গণতন্ত্র সকল নাগরিকের সমপরিমাণ অধিকার এবং স্বাধীনতা স্বীকার করে। একদল লোক শাসন করিতে এবং অপর একদল লোক শাসিত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই নীতি অস্বীকার করিয়া গণতন্ত্র প্রত্যেককে নিজের ক্ষমতানুযায়ী আত্মশক্তি-বিকাশের সুযোগ দান করে।

গণতন্ত্রে সকল শ্রেণীর লোকের স্বার্থ সমভাবে সংরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যদি শ্রেণীবিশেষের হাতে ক্ষমতা থাকে, তবে সেই শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু গণতন্ত্রে শাসন-ক্ষমতা সমগ্র জনসাধারণের হাতে বলিয়া শ্রেণীবিশেষ অপর শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবার সুযোগ পায় না।

গণতন্ত্রে সরকারী নীতি এবং আইন জনগণের নিজেদের প্রতিনিধি দ্বারা রচিত এবং প্রবর্তিত হয়। ফলে জনগণ সহজেই ঐ নীতি এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

গণতন্ত্রে বিপ্লবের আশঙ্কা কম থাকে। পরিবর্তনই সহজে বিপ্লব রোধ করিতে পারে। গণতন্ত্রে পরিবর্তন সহজসাধ্য। জনগণ যদি পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে, তবে নিজেরাই তাহাদের প্রতিনিধিদের সাহায্যে পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। তাহাদের কোনও বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হয় না। বিপ্লবেরও প্রয়োজন হয় না।

গণতন্ত্র জনগণের মনে দেশপ্রীতি বর্ধিত করে। দেশের বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়া দেশকে নিজের বলিয়া জনগণ উপলব্ধি করিতে এবং ভালবাসিতে শিখে।

গণতন্ত্র শিক্ষামূলক। জনগণ যখন জানিতে পারে যে, রাষ্ট্রের শাসনকার্যে তাহাদের অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, তখন তাহারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে আগ্রহশীল হয়। এতদ্ব্যতীত শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াও নাগরিকগণ অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পায়।

ত্রুটি :

বিভিন্ন লেখক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। একটু যত্ন সহকারে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই অভিযোগগুলি

সকল ক্ষেত্রে প্রমাণসহ নহে। অভিযোগগুলি মোটামুটি নিম্নরূপ :—

জনগণের অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং সতর্কতার প্রয়োজন, তাহা অনেকেরই নাই। ফলে গণতন্ত্রে শাসনকার্য সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় না। কার্লাইল ইঁহাকে নির্বোধতন্ত্র বলিয়া উপহাস করিয়াছেন।

সকল লোক সমান—এই নীতির উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায়, সকল লোক সমযোগ্যতাসম্পন্ন নহে। ক্ষেত্রবিশেষে গণতন্ত্র যোগ্যতার মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে বলিয়া যোগ্য ব্যক্তির সাহায্যে দক্ষতার সহিত শাসনকার্য চালনা করা সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের পন্থা-নির্ধারণে যে সতর্কতা এবং বিচক্ষণতার প্রয়োজন, তাহা অল্প কয়েকজনেরই থাকা সম্ভব। জনসাধারণের নিকট হইতে সে সতর্কতা এবং বিচক্ষণতা আশা করা যায় না। কাজেই আর্থিক ব্যাপার পরিচালনের ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকিলে রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা বিপন্ন হইতে পারে।

যদিও দলগত শাসন রোধ করাই গণতন্ত্রের লক্ষ্য, নানা কারণে দলগত শাসনই গণতন্ত্রে অপরিহার্য হইয়া উঠে। ফলে সকলের স্বার্থ সমানভাবে সংরক্ষণ সম্ভব হয় না।

স্যার হেন্‌রী মেইন বলেন—গণতন্ত্র শিল্প, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য-চর্চার সহায়ক নহে। গণতন্ত্র অপেক্ষা অপরাপর শাসনতন্ত্রে শিল্প, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের অধিকতর চর্চা হইয়া থাকে। জনসাধারণ এই সকলের মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না বলিয়া তাহারা শিল্প, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের সংরক্ষণের এবং উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে না।

গণতন্ত্রে সঙ্কটের সময় দৃঢ়ভাবে এবং দ্রুত কার্য করিবার ক্ষমতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। দৃঢ়তা ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। গণতন্ত্রে ব্যক্তিত্বের মর্যাদা নাই। দ্রুত কাজ করিতে হইলে অল্পসংখ্যক লোককে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। গণতন্ত্রে অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণও অসম্ভব। সুতরাং জরুরী অবস্থায় গণতন্ত্র অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে।

গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট সময়ের পর সরকারের পরিবর্তন হয়। ফলে নীতি এবং কর্মধারারও পরিবর্তন হয়। ইহাতে কোনও কার্য কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর যদি সরকারের পরিবর্তন হয়, তবে সে কার্য বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। অযথা অর্থব্যয় হয়।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আনীত অন্তত: কয়েকটি অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করা সহজ। অশিক্ষিত জনগণ সকল সময়েই নির্বোধ হইবে একথা সত্য নহে। লেখাপড়া-না-জানা লোকেদের মধ্যেও এমন অনেক লোক থাকিতে পারে যাহারা শাসনকার্যের জটিল সমস্যাগুলি অনুধাবন করিতে পারে। ইহারা সহজে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ইতিহাসও গণতন্ত্রের সাফল্যের সাক্ষ্য দিতেছে। একনায়কতন্ত্রাধীন ইতালির তৎকালীন শাসন গণতন্ত্র-শাসিত ব্রিটেনের শাসন অপেক্ষা অধিকতর কর্মকুশল ছিল না। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এবং প্রয়োজনবোধে পরিবর্তনীয় গণতন্ত্রই বর্তমান পৃথিবীর উপযোগী শাসনতন্ত্র।

গণতন্ত্রের সাফল্য :

বর্তমান যুগে গণতন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হয়। অবশ্য ইহা সম্পূর্ণ ত্রুটিবিহীন নহে। ইহার যে ত্রুটি আছে তাহার প্রতিকার করিতে পারিলে গণতন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হয়। দার্শনিক 'মিল্'-এর মতে গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে জনসাধারণের আগ্রহ, কর্তব্যপরায়ণতা এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিবার ইচ্ছার প্রয়োজন। গণতন্ত্রে নাগরিকদের মনে তাহাদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। অধিকার এবং দায়িত্ব কি তাহা জানিলেই চলিবে না, অধিকার আদায় করিবার এবং দায়িত্ব পালন করিবার চেষ্টাও তাহাদের থাকা প্রয়োজন।

গণতন্ত্রে জনমতই প্রকৃত শাসক। কাজেই গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে রাষ্ট্রে জনমত যাহাতে সহজে গঠিত হইতে পারে এবং প্রকাশিত হইতে পারে, সে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য পরিচালনা করে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামত মানিয়া চলিতে হয়। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠদের মনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামত মানিয়া লইবার মত মনোভাব থাকা প্রয়োজন।

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য জনসাধারণের কয়েকটি ন্যূনতম দাবি পূরণের ব্যবস্থা সকল সময়ে থাকা প্রয়োজন। জনসাধারণের সর্বপ্রকারের অভাব এবং অজ্ঞতার হাত হইতে মুক্তি পাইবার ন্যূনতম অধিকার আছে। প্রত্যেক গণতন্ত্রের কর্তব্য প্রথমেই জনসাধারণকে অভাব এবং অজ্ঞতার হাত হইতে মুক্তি দেওয়া এবং তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government) :

এই শাসন-ব্যবস্থায় সমগ্র রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা এক স্থানে অবস্থিত একটি-মাত্র সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। এই সরকার সমগ্র দেশের শাসনকার্য

পরিচালনা করে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যাইতে পারে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় সরকারও থাকিতে পারে। কিন্তু এই স্থানীয় সরকারের নিজস্ব কোন শাসন-ক্ষমতা থাকে না। স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে। ইংল্যাণ্ডে এখন এককেন্দ্রিক শাসন চলিতেছে। ভারতেও এককেন্দ্রিক শাসন বিদ্যমান ছিল। তখন দিল্লী-স্থিত ভারত সরকার সমগ্র দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিত। বিহার, বঙ্গদেশ, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার ছিল। কিন্তু এই সকল প্রাদেশিক সরকার দিল্লী-স্থিত ভারত সরকারের প্রতিনিধি ছিল। ইহাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিল না। ইহারা ভারত সরকারের নির্দেশে কাজ করিত।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার কতকগুলি সুবিধা আছে। এই ব্যবস্থায় সমগ্র দেশময় একই রকমের আইন এবং নীতি প্রচলিত থাকে। একই বিষয় লইয়া বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আইনের প্রচলন হয় না। একই কাজ দুইবার করিতে হয় না। ফলে কম অর্থব্যয় হয়। দেশের ঐক্য অটুট থাকে। তাহা ছাড়া এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করায় শাসন-পরিচালনে দৃঢ়তা অবলম্বন করা সহজ হয়। তাহা ছাড়া কাজও ত্বরান্বিত হয়।

ইহার কতগুলি ত্রুটিও আছে। একটি বড় দেশ শাসনের পক্ষে ইহা অনুপযোগী। বড় রাষ্ট্রের এক অঞ্চলের অবস্থার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের অবস্থার পার্থক্য থাকে। কাজেই একই নীতি বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যকরী করিলে সকল অঞ্চলের সমানভাবে সুবিধা হয় না। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় রাজধানী হইতে শাসকরা অনেক সময় রাষ্ট্রের দূরতম অঞ্চলের অবস্থার কথা সহজে অবগত হইতে পারে না। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যার সমাধান করা কঠিন হয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি, নিজ ক্ষমতায় তাহারা কিছু করিতে পারে না। সরকারের কাজে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা আগ্রহশীল হয় না। ফলে জনসাধারণের নাগরিক চেতনালাভের সুযোগ থাকে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন (Federal Government) :

এই ব্যবস্থায় দেশের শাসন-সংক্রান্ত নিয়ম অনুসারে সমগ্র শাসন-ক্ষমতাকে একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং কয়েকটি আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ভাগ করিয়া

দেওয়া হয়। নিজ নিজ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার স্বাধীন। কেহ কাহারও ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে না। যে সকল বিষয়ে সমগ্র দেশের জন্য একই নীতি অবলম্বন করা উচিত, সেই সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থাকে। যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা বিভিন্ন রূপ এবং যে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন নীতির প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়ে আঞ্চলিক সরকারের কর্তৃত্ব থাকে। শত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষা করা রাষ্ট্রের সকল অংশেরই সমস্যা এবং এই ব্যাপারে একই নীতি অবলম্বন করা উচিত। কাজেই দেশরক্ষা ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। আবার কৃষি বা শিল্প-বিষয়ক সমস্যা একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কাজেই কৃষি এবং শিল্প বিষয়ের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীর ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের হাতে দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের চারিটি বিশিষ্টতা আছে। প্রথমতঃ দেশের শাসন-সংক্রান্ত নিয়মকানুন সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকে। এই নিয়মকানুন সহজে পরিবর্তন করা চলে না। এই চরম নিয়মকানুনের প্রাধান্য সর্ববিষয়ে বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রে যাহা কিছু এই নিয়মকানুনের বিরোধী তাহাই অবিধেয়।* দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতাগুলি লিখিত-ভাবে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মকানুনগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকে। এই আদালতের ব্যাখ্যা সর্বক্ষেত্রে গ্রাহ্য হয়। চতুর্থতঃ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণকে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং আঞ্চলিক সরকারের এই উভয়ের আইনই মানিয়া চলিতে হয়। অবশ্য উভয় শ্রেণীর আইনের মধ্যে কোন বিরোধ থাকা স্বাভাবিক নহে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের গুণ :

একটি বড় দেশ শাসনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা খুবই উপযোগী। জাতীয় ঐক্য বজায় রাখিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাধীনতা স্বীকার করিবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকে যুক্তরাষ্ট্রে। বড় একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ভার বিভিন্ন অঞ্চলের হাতে ছাড়িয়া দিলে ভাল হয়। আবার জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয় একটি সরকারের হাতে রাখিলে জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে সহজে এই ব্যবস্থা করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনকার্যও ভালভাবে পরিচালিত হইতে পারে। দিল্লী হইতে পশ্চিমবঙ্গের শাসনকার্য চালানো যত কঠিন, কলিকাতা হইতে পশ্চিমবঙ্গের শাসনকার্য চালানো তত কঠিন নয়। বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক সরকার থাকিলে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকার্য ভালভাবে সম্পন্ন হয়।

এই ব্যবস্থায় অনেকগুলি ছোট রাজ্য একত্র হইয়া বেশ বড় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে পারে। বিভিন্ন রাজ্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিতে পারে। সর্বদেশীয় ব্যাপারে শাসনকার্য পরিচালনার ভার একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া সম্ভব হয়।

সমগ্র দেশে একটি সরকার থাকিলে অধিক সংখ্যক লোক শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। পরন্তু দেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকার থাকিলে অধিক সংখ্যক লোককে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। ফলে অধিক সংখ্যক লোক রাজনৈতিক শিক্ষার সুযোগ পায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের ত্রুটি :

• যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে একাধিক সরকার থাকে বলিয়া শাসনকার্য পরিচালনে ব্যয় বেশী হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন হয় বলিয়া আইনের জটিলতাও বৃদ্ধি পায়। কখনও কখনও এক অঞ্চলের আইন অন্য অঞ্চলের আইনের বিরোধী হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে শাসন-ক্ষমতা বন্টন করিয়া দেওয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থায় কোন বিপর্যয় দেখা দিলে এক সরকার অন্য সরকারকে দোষ দেয়। ১৯৪২ সালে পশ্চিমবঙ্গে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে এবং প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দিয়াছিল।

ক্ষমতা ভাগ হইলে যাহারা বিভক্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাহারা দুর্বল হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা ভাগ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার উভয়ই দুর্বল হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কয়েকটি আঞ্চলিক সরকার নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়া কখনও কখনও যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে।

এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এখন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই বিভিন্ন রাষ্ট্র আগ্রহশীল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সম্পূর্ণভাবে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতে এখন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

চৌদ্দটি রাজ্য এবং ছয়টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। অবশ্য সংবিধানে ইহাকে যুক্তরাষ্ট্র না বলিয়া রাজ্যসংঘ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অংশের ঐক্যের উপর জোর দিবার জন্যই যুক্তরাষ্ট্র না বলিয়া ইহাকে রাজ্যসংঘ বলা হইয়াছে। কার্যতঃ ইহার শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক সরকার আছে। আবার ভারত রাজ্যসংঘের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার আছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বা আঞ্চলিক সরকার এই উভয়ের মধ্যে শাসন-ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে না। অধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে কোনও প্রকার মতভেদ দেখা দিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে তাহার মীমাংসা হয়। ইহার সংবিধানও সম্পূর্ণরূপে লিখিত এবং স্পষ্ট।

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার দিক দিয়া কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা রাজ্য সরকার বেশী শক্তিশালী হয়। কিন্তু ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলি রাজ্য সরকারের হাতে আছে। তাহা ছাড়া কতগুলি আছে যুগ্ম বিষয়। সে সকল বিষয়েই উভয় সরকারেরই ক্ষমতা আছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের দাবী সেখানে বেশী। তাহা ছাড়া অবশিষ্ট যে সকল বিষয় আছে সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাধীন। দেশে যদি কখনও জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রপতি মনে করেন, তবে তিনি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে সমগ্র ভারতের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। তখন কেন্দ্রীয় আইন-সভা রাজ্যের আইন-সভার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে। ফলতঃ সেই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

মন্ত্রিপরিষদের শাসন এবং রাষ্ট্রপতি-শাসন (Parliamentary Government and Presidential Government) :

দেশ-শাসনের ভার যখন একটি মন্ত্রিপরিষদের হাতে থাকে, তখন সেই শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় মন্ত্রিপরিষদের শাসন-ব্যবস্থা। সাধারণতঃ আইন-সভায় অধিক সংখ্যক সদস্য যে দলভুক্ত, মন্ত্রিগণ সেই দল হইতে নিযুক্ত হয়। তাহারা আইন-সভার নিকট তাহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকে। আইন-

সভার অধিক সংখ্যক সদস্যের সমর্থন হারাইলে বা আইন-সভার অধিক সংখক সদস্য এই মন্ত্রিপরিষদের উপর আস্থা হারাইলে, ইহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। এই ধরনের সরকারের অপর নাম পার্লামেন্টারী বা দায়িত্বশীল সরকার। ভারতে এখন এই ধরনের সরকার বিদ্যমান। মন্ত্রিগণ আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য। তাহারা শাসনকার্য পরিচালনা করে। তাহাদের কার্যের জন্য তাহারা আইন-সভার নিকট দায়ী। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ যথেচ্ছাচার করিতে পারে না। আইন-সভার সঙ্গে শাসন-বিভাগের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে।

জনসাধারণ-কর্তৃক নির্বাচিত এক ব্যক্তির হাতে যখন শাসন-ক্ষমতা থাকে, তখন সেই শাসন-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি-শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাচিত হন। সেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনি আইন-সভার সমর্থন ভিন্নও নিজ পদে বহাল থাকেন। আইন-পরিষদ্ তাঁহার উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিলেও তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয় না। নিজ কার্যের সুবিধার জন্য তিনি কয়েকজন মন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারেন। এই মন্ত্রিগণ আইন-সভার সদস্য নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন এই ব্যবস্থা আছে।

এই ব্যবস্থায় দ্রুত কার্য সম্পাদন সহজ হয়। অপরদিকে দ্রুত সরকারের পরিবর্তন সাধন করা যায় না বলিয়া কোন নীতির পরিবর্তনও সহজে করা যায় না।

প্রশ্ন

১। গণতন্ত্র কাহাকে বলে? ইহার সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা কর। (পৃঃ ২৮-৩০)

২। এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের পার্থক্য ও গুণাগুণ নির্ণয় কর। (পৃঃ ৩০-৩৪)

৩। মন্ত্রিপরিষদের শাসন এবং রাষ্ট্রপতি-শাসনের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? (পৃঃ ৩৪-৩৫)

পঞ্চম অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং ক্ষমতা-বিভাজন

বিভিন্ন বিভাগ :

রাষ্ট্র-শাসনের কার্যকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। শাসনকার্য পরিচালনের জন্য আইন-প্রণয়ন করিতে হয়। আইনগুলি কার্যকর করাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যা করার এবং আইনভঙ্গকারীর দণ্ডের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়। এই তিন প্রকারের কার্যকে মোটামুটি বলা যাইতে পারে আইন প্রণয়ন, শাসন এবং বিচার।

সরকারের এই তিন প্রকারের কাজ সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ দ্বারা সম্পন্ন হয়। আইন-বিভাগ আইন প্রণয়নের কাজ করে। শাসন-বিভাগ আইন কার্যকর করে। বিচার-বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করে এবং যে বা যাহারা আইন ভঙ্গ করে, তাহার বা তাহাদের দণ্ডের বিধান দেয়।

আইন-বিভাগ (Legislature) :

প্রাচীন কালে রাজারা আইন প্রণয়ন করিত। কোন কোন রাজাকে পরামর্শ দিবার জন্য মন্ত্রিপরিষদ্ থাকিত। কেহ কেহ নিজেই আইন প্রণয়ন করিত। এখন সকল রাষ্ট্রেই আইন-সভা আছে। এই আইন-সভাই আইন প্রণয়ন করে। আইন-সভার সদস্যগণ সকলে না হইলেও বেশীর ভাগই জনগণের প্রতিনিধি। কোন কোন আইন-সভায় দুইটি কক্ষ থাকে। একটি নিম্ন পরিষদ্, অপরটি উচ্চ পরিষদ্। সাধারণতঃ জনগণের প্রতিনিধিরাই নিম্ন পরিষদের সদস্য হয়। কাজেই নিম্ন পরিষদ্ উচ্চ পরিষদ্ অপেক্ষা বেশী ক্ষমতাশালী হয়। আমাদের ভারতেও আইন-সভার দুইটি কক্ষ আছে। নিম্ন পরিষদের নাম লোকসভা এবং উচ্চ পরিষদের নাম রাজ্য-পরিষদ্।

আইনের প্রস্তাব আইন-সভায় উত্থাপিত হয়। সেখানে নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে সেগুলি আলোচিত হয় এবং পরিত্যক্ত বা গৃহীত হয়। গৃহীত হইলে সাধারণতঃ শাসন-বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়।

আইন প্রণয়ন ছাড়া আইন-সভার আরও অন্য কার্য আছে। আইন-সভা রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের উপর কর্তৃত্ব করে। কোন্ খাতে কত টাকা ব্যয় করা হইবে এবং কি উপায়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা হইবে, আইন-সভার নির্দেশে তাহা

ঠিক হয়। যে রাষ্ট্রে দায়িত্বশীল সরকার আছে সে রাষ্ট্রে আইন-সভা মন্ত্রিগণের উপর কর্তৃত্ব করে। আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারাই মন্ত্রিপরিষদ্ গঠন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। এইরূপ আইন-সভা শাসন-কার্যেও অংশ গ্রহণ করে। আবার কখনও কখনও আইন-সভা বিচারের কাজও করে। ইংলণ্ডের আইন-সভার উচ্চ কক্ষের (House of Lords) একটি অংশ ইংলণ্ডের উচ্চতম বিচার-সংস্থা।

শাসন বিভাগ (Executive) :

আজকাল শাসনের কাজ হয়ত পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে অথবা রাষ্ট্রপতি-শাসন-পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। সাধারণতঃ পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে শাসন-বিভাগের একজন উচ্চতম কর্তা থাকেন। তিনি হয়ত বংশানুক্রমিক রাজা অথবা জনগণ-কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। এই উচ্চতম শাসনকর্তার প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা বিশেষ কিছু থাকে না। শাসন-ক্ষমতা থাকে মন্ত্রিগণের হাতে। রাজা বা রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিগণের পরামর্শক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিগণ আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। ইহাদের একজন প্রধান থাকেন। তাঁহাকে বলা হয় প্রধান মন্ত্রী ; অন্য মন্ত্রিগণ তাঁহার সহকর্মী।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত রাষ্ট্রে সরকারের শাসন-সংক্রান্ত চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতি। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণ-কর্তৃক নির্বাচিত হন। তাঁহারও একটি মন্ত্রিসভা থাকিতে পারে। কিন্তু এই মন্ত্রিসভার পরামর্শ তিনি ইচ্ছামত গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারেন।

শাসন-বিভাগের কাজ রাষ্ট্রের আইন কার্যকর করা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা, অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা। শাসন-সংক্রান্ত এইগুলিই শাসন-বিভাগের প্রধান কর্তব্য।

শাসন-বিভাগ আইন-সভা সংক্রান্ত কোন কোন কাজও করিয়া থাকে। শাসন-বিভাগের পরামর্শক্রমে আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়। শাসন-বিভাগই আয়-ব্যয়ের খসড়া প্রস্তুত করে। তাহা ছাড়া জরুরী অবস্থায় শাসন-বিভাগ স্বল্পকাল-স্থায়ী আইন প্রণয়ন এবং প্রবর্তন করে। শাসন-বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি আইন-সভার একটি অংশ। তাঁহার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়াই আইনের প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে আইনে পরিণত হয়।

শাসন-বিভাগ কিছু কিছু বিচার-বিভাগ সংক্রান্ত কাজও করিয়া থাকে। শাসন-বিভাগ সাধারণতঃ বিচারক নিযুক্ত করে। ভারতে ব্রিটিশ আমলে

শাসন-বিভাগীয় কোন কোন কর্মচারী বিচারের কাজও করিত। এখনও এই রীতি প্রচলিত আছে। তবে শীঘ্রই শাসন-বিভাগ হইতে এই ক্ষমতা অপসারিত হইবে।

বিচার বিভাগ (Judiciary) :

বিভিন্ন আদালত রাষ্ট্রে বিচারের কার্য করিয়া থাকে। বিচারকদের লইয়া এই আদালত গঠিত হয়। বিচারকগণ সাধারণতঃ শাসন-বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হয়। আমাদের ভারতেও সেই ব্যবস্থা আছে। আমেরিকায় কখনও কখনও জনসাধারণ-কর্তৃক বিচারক নির্বাচিত হয়। এই পদ্ধতি সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ সাধারণ লোক বিচারকের উপযোগী গুণাগুণ বিচার করিতে পারে না।

বিচারকের কাজ আইনের ব্যাখ্যা করা। কখনও কেহ যদি আইন ভঙ্গ করে, তবে সে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আদালতে হাজির করা হয়। সেই ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করিয়াছে কিনা বিচারক তাহা সাব্যস্ত করে এবং যদি আইন ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবে তাহাকে শাস্তি দেয়।

বিচারক কখনও কখনও আইন প্রণয়ন করে। কোন একটি বিচারাধীন বিষয় যদি কোন প্রচলিত আইনের আমলে না আসে, তবে বিচারপতি নিজ বিচার-বুদ্ধি অনুসারে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করে। সেই সিদ্ধান্ত অনুরূপ ক্ষেত্রে আবার প্রয়োগ করা হয়। ফলে ঐ সিদ্ধান্ত আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

সকল রাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে বিচার-বিভাগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে হয়। নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার পরোক্ষ দায়িত্ব বিচার-বিভাগের। সেইজন্য বিচার-বিভাগকে সকল ক্ষেত্রেই অন্যান্য বিভাগের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়।

ক্ষমতা-বিভাজন বা পৃথকীকরণ (Separation of Powers) :

আইন প্রণয়ন, শাসন এবং বিচার এই তিনটি সরকারের কাজ। ফরাসী লেখক মন্টেস্কু (Montesquieu) এবং ইংরেজ লেখক ব্ল্যাকস্টোনের মতে এই তিনটি কাজ তিনটি পৃথক বিভাগ দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত। এক বিভাগের পক্ষে অন্য বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করা বা অন্য বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া আপত্তিজনক। মন্টেস্কুর মতে শাসন-ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা না হইলে এবং একই বিভাগের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে, সেই বিভাগ

স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে এবং ফলে লোকের উপর অত্যাচার হইতে পারে। প্রাচীন কালে রাজা আইন প্রণয়ন করিত, আইন কার্যকর করিত এবং বিচার করিত। রাজা ইচ্ছা করিলে আইন প্রণয়ন করিয়া যাহাকে খুশি ধরিয়া আনিয়া নিজেই বিচার করিয়া তাহাকে শাস্তি দিতে পারিত। কিন্তু আইন করার ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা বিভাগের হাতে, শাসন-ক্ষমতা অন্য ব্যক্তি বা বিভাগের হাতে এবং বিচার-ক্ষমতা তৃতীয় আর এক ব্যক্তি বা বিভাগের হাতে থাকিলে এইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যাহারা আইন প্রণয়ন করে তাহারা আইন প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে। অপর ব্যক্তিরা সেই আইন কার্যকর করিবে। আবার তৃতীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সে আইন অনুসারে বিচার করিবে। ইহাতে কোন বিভাগের অন্যায়-অত্যাচার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অপর বিভাগ তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে। তাহাতে লোকের উপর অযথা অত্যাচার নিবারণ হয়।

বিভিন্ন বিভাগের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, এক বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের যোগ রহিয়াছে। এক বিভাগের সাহায্য অন্য বিভাগের পক্ষে সময় সময় অপরিহার্য হয়। দেশের শাসনের জন্য কি ধরনের আইনের প্রয়োজন সে-কথা আইন-বিভাগ শাসন-বিভাগের নিকট হইতে জানিতে পারে। আইন-বিভাগ শাসন-বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করে। বিচারকগণ শাসন-বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। মানুষের শরীরের হাত-পা-মুখ যেমন পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করিলেই মানুষের মঙ্গল হয়, তেমন সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করিলে শাসনকার্যও ভাল চলে। মন্টেস্কু সম্পূর্ণরূপ ক্ষমতা বিভাজনের কথা বলিয়াছেন। অথচ তিনি ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডেও এক বিভাগ অপর বিভাগ হইতে একেবারে পৃথক নহে।

তাহা ছাড়া ক্ষমতা-বিভাজন অন্য একটি কারণেও সঙ্গত নহে। শাসন-সংক্রান্ত বিভাগগুলি সমান ক্ষমতাসম্পন্ন নহে। এখন প্রায় সকল রাষ্ট্রেই গণতান্ত্রিক শাসন চলিতেছে। গণতন্ত্রে জনগণের প্রতিনিধিরাই আইন-সভা গঠন করে। কাজেই আইন-সভা সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। অন্য দুইটি বিভাগকে আইন-সভার উপর কিছু-না-কিছু নির্ভরশীল হইতে হয়।

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা-বিভাজন অপরিহার্য নহে। নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হইল তাহাদের সতর্ক দৃষ্টি। সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে ক্ষমতা-বিভাজন না থাকিলেও স্বাধীনতা রক্ষা পায়। আর সতর্ক

দৃষ্টি না থাকিলে ক্ষমতা-বিভাজন সত্ত্বেও স্বাধীনতা রক্ষা পায় না। ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা-বিভাজন নীতি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী নহে। তথাপি সেখানকার নাগরিকগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে। ক্ষমতা-বিভাজন নীতি সকল দেশেই মানিয়া চলা হয়। তবে সম্পূর্ণ বিভাজন সম্ভবও নহে, সঙ্গতও নহে।

প্রশ্ন

১। রাষ্ট্র-শাসনের জন্য কি কি বিভিন্ন বিভাগ থাকে? বিভিন্ন বিভাগের কাজ কি? (পৃঃ ৩৬-৩৮)

২। ক্ষমতা-বিভাজন নীতি বিশ্লেষণ কর। এই নীতির সমালোচনা কর। (পৃঃ ৩৮-৪০)

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারের কর্মধারা

নাগরিকগণের কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করিতে হয়। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সরকার এই সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সরকার যে কাজ করিলে নাগরিকগণের কল্যাণ হয় তাহাই সরকারের বা রাষ্ট্রের করণীয় কাজ। যে কাজ নাগরিকগণের কল্যাণের পরিপন্থী তাহা সরকারের বা রাষ্ট্রের করণীয় কাজ নহে। যে কাজ নাগরিকের কল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় নহে সে কাজও সরকারের করণীয় কাজ নহে। সরকারের কোন কার্য করণীয় এবং কোন কার্য করণীয় নহে তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে সেই কার্য নাগরিকের কল্যাণ সাধন করিবে কিনা তাহা জানিতে হয়।

রাষ্ট্রের বা সরকারের করণীয় কার্য সম্বন্ধে দুইটি সুস্পষ্ট মতবাদ আছে। একটি মতবাদকে বলা হয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, অপরটিকে বলা হয় সমাজতন্ত্রবাদ।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) :

যাঁহারা এই মতের সমর্থন করেন তাঁহারা বলেন যে রাষ্ট্রের কর্তব্য ব্যক্তির স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা। বাধা-নিষেধের সংখ্যা এবং পরিধি যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া সকল ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে কর্ম করিতে দিলেই ব্যক্তির তথা সমাজের কল্যাণ সাধন হয়। রাষ্ট্র বা সরকার দেখিবে যাহাতে কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হয়। যে সরকার সর্বাপেক্ষা কম বাধা-নিষেধ আরোপ করে সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মতে আদর্শ শাসনের অর্থ শাসন না থাকা। কিন্তু যেহেতু মানুষের মধ্যে দুষ্ট প্রকৃতি রহিয়াছে, যেহেতু তাহারা অন্যের অনিষ্ট সাধন করিয়াও নিজ স্বার্থ সাধনে প্রয়াসী হয় সেহেতু তাহাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য বাধা-নিষেধের প্রয়োজন, সরকার এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তবে এই বাধা-নিষেধের গণ্ডী খুব বিস্তৃত হইবে না। একের অত্যাচার হইতে অপরকে রক্ষা করার জন্য যতখানি বাধা-নিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিক বাধা-নিষেধ আরোপ রাষ্ট্রের কর্তব্য নহে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করেন যে সকল ব্যক্তিই নিজ নিজ কল্যাণ কি প্রকারে সাধিত হইবে তাহা জানে এবং সেইভাবে কল্যাণ-সাধনে প্রয়াসী হয়। ইহার জন্য রাষ্ট্র বা সরকারের সহায়তার কোন প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকে স্বাধীন-ভাবে নিজ কর্ম সম্পাদন করিলেই নিজের এবং সমাজের কল্যাণ সাধন সহজ হইবে। রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির কাজ করিয়া দিতে অগ্রসর হয় তবে কেহই পরিণামে

কোন কাজ করিতে চেষ্টা করিবে না। সকলেই আত্মশক্তি হারাইয়া রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির নিয়মে যোগ্যতম ব্যক্তিই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী। সরকার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে কখনও কখনও সেই দুর্বল এবং অযোগ্য ব্যক্তির টিকিয়া থাকার অধিকার নাই, তাহাকে টিকিয়া থাকিবার সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁহারা আরও বলেন, ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিধি বর্ধিত হইলে প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়, নাগরিকদের কল্যাণ হয়। তাহা ছাড়া আজকাল সরকার বলিতে দলগত সরকার বুঝায়। এই সরকার যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে তবে স্বভাবতঃই বিরোধী দল বিপন্ন বোধ করে। এই সকল কারণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করেন যে রাষ্ট্র বা সরকার কেবল আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে, আইন এবং শৃঙ্খলাভঙ্গকারীকে শাস্তি দিবে। রাষ্ট্র বহিরাক্রমণের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবে। রাষ্ট্রের কর্তব্য এইখানেই শেষ। রাষ্ট্র কেবল পুলিশী কর্তব্য সম্পাদন করিবে। তাঁহাদের রাষ্ট্র পুলিশী রাষ্ট্র।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যে সকল যুক্তি দেখান হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে বিচারসহ নহে। এই মতের সমর্থনকারীরা মনে করেন যে সকল ব্যক্তিরই নিজ নিজ কল্যাণ সম্বন্ধে ধারণা আছে। তাহারা পরের সহায়তা ব্যতিরেকেই নিজ কল্যাণ সাধন করিতে পারে। এই যুক্তি পুরোপুরি মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে। কিছু-সংখ্যক লোক নির্বোধ, কিংবা বিকৃত-মস্তিষ্ক আছে। তাহা ছাড়া কিছু-সংখ্যক লোক আপাততঃ স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া সমাজের অকল্যাণ এবং পরোক্ষভাবে নিজের অকল্যাণ সাধন করে। সেই সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তবে ধনিক শ্রমিকের উপর অত্যাচার করে। নিঃস্ব এবং দুর্বলদের রক্ষা না করিলে তাহারা নিপীড়িত হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকিলে অবাঞ্ছিত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, বন্টন-ব্যবস্থা সুষ্ঠু হয় না। কাজেই নিয়ন্ত্রণ এবং হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রের কর্তব্য হইয়া পড়ে।

সমাজতন্ত্রবাদ :

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে রাষ্ট্র মঙ্গলের আকর। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত। যত বেশী কার্য সরকারের দ্বারা সম্পন্ন হইবে, ততই জনসাধারণের মঙ্গল। নাগরিকের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সরকারের কল্যাণ-হস্তের স্পর্শ বাঞ্ছনীয়। চরম সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে ব্যক্তিগত মালিকানা বলিয়া কিছুই থাকিবে না।

ভূমি, পুঁজি প্রভৃতি রাষ্ট্রের সম্পদ। এই সম্পদের সাহায্যে সরকারই উৎপাদন-কার্য পরিচালন করিবে। উৎপাদনের উপর সরকারের কর্তৃত্ব থাকিবে। সরকার উৎপাদন পরিচালন করিবে, উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন-ব্যবস্থা করিবে। ফলে উৎপাদন-ক্ষেত্রে অন্যায়-অবিচার রোধ হইবে। ধনিকে শ্রমিকে যে বিরোধ আজ সমাজ-জীবনের একটা জটিল সমস্যা রূপে দেখা দিয়াছে, সে বিরোধ মিটিয়া যাইবে। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে কেবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিচার-ব্যবস্থা ব্যতীতও সরকারের অনেক কর্তব্য আছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উৎপাদন, বণ্টন, পরিবহন প্রভৃতির পরিচালন কিংবা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও সরকারকে করিতে হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে সমাজতন্ত্রবাদিগণ সরকারকে সর্বকর্মক্ষম বলিয়া যে বিশিষ্ট স্থান প্রদান করে, সরকার সে স্থান পাইবার যোগ্য কিনা তাহা আজও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই। নিজ কর্ম সম্পাদনের জন্য সরকার কর্মচারিগণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। লাভালাভের অংশ কর্মচারিগণকে পাইতে হয় না বলিয়া কর্মচারিগণ তেমন দক্ষতা প্রদর্শনে আগ্রহান্বিত না-ও হইতে পারে। কর্মচারিগণ সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন হয় না। উৎপাদনের কিংবা আবিষ্কারের ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের বিচক্ষণতাই বেশী ফলদায়ক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সরকারের হস্তক্ষেপে উৎপাদন এবং বণ্টনের সমস্যার সমাধান সর্বত্র সফল হইতে পারে না।

বর্তমান কালে দেখা যাইতেছে যে, সকল রাষ্ট্রই অধিক হইতে অধিকতর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেছে এবং সে প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। কেবলমাত্র যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে নহে, কম-বেশী সকল দেশেই উৎপাদন ও বণ্টনের মূল পন্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার নীতি গৃহীত হইয়াছে। নীতির দিক হইতে ভারত সরকারও উহা গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য বহুক্ষেত্রে ইহা কার্যকর করিতে কিছু বিলম্ব হইবে। রেলপথ, বিমানপথ, ডাক ও তার বিভাগ, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন এবং বণ্টনের ব্যবস্থা ইতোমধ্যে রাষ্ট্র-করায়ত্ত করা হইয়াছে।

আধুনিক রাষ্ট্র যে সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে, সে সকল কার্যকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমতঃ অপরিহার্য কার্য অর্থাৎ যেগুলি সম্পাদন না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজনই থাকে না। দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছাধীন কার্য, অর্থাৎ যেগুলি রাষ্ট্র দ্বারা সম্পন্ন না হইলেও চলিতে পারে, তথাপি জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য যেগুলি প্রগতিশীল রাষ্ট্রমাত্রই সম্পাদন করিয়া থাকে।

অপরিহার্য কার্য :

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্র স্থল-বাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং বিমান-বাহিনী নিয়োগ করিয়া থাকে। সরকারের বৈদেশিক বিভাগ এই কার্য সম্পাদন করে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রাখে।

প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। রাষ্ট্রকে নাগরিকের ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে এবং রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়। ইহা না হইলে রাষ্ট্রের অগ্রগতি প্রতিহত হয়, এমন কি রাষ্ট্রের বিলোপ-প্রাপ্তিও অসম্ভব নহে। শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র পুলিশবাহিনী নিয়োগ করিয়া থাকে। ইহাদের সহায়তায় রাষ্ট্র চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, উৎপীড়ন, অত্যাচার রোধ করে।

রাষ্ট্রকে ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করিতে হয়। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য সর্বসাধারণকে অধিকার প্রদান করিয়া এবং কিছু পরিমাণে তাহাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে। এই আইন দ্বারা নাগরিকের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি কেহ এই আইন ভঙ্গ করে বা অমান্য করে, তবে শাস্তি এবং শৃঙ্খলার ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। আইনভঙ্গকারীর বিচার ও দণ্ডের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় কার্য। সকল রাষ্ট্রই এই কাজ করিয়া থাকে।

ইচ্ছাধীন কার্য :

শিক্ষা ব্যতীত নাগরিকগণ আত্মশক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না এবং নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্রের কর্তব্য নাগরিকগণকে শিক্ষালাভের সর্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করা। নাগরিক-গণের হাতে যদি শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার দেওয়া হয়, তবে অনেকেই নিজ নিজ সন্তানের শিক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে না বা করিতে পারে না। সেইজন্য কোন কোন রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এমন কি বাধ্যতা-মূলক করিয়া আইন প্রণয়ন করে।

স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা নাগরিকের হাতে ছাড়িয়া দিলে অক্ষমতা বা অনিচ্ছা-বশতঃ সকল নাগরিক স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না বা করে না। ফলে ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হয়। সেইজন্য রাষ্ট্রের কর্তব্য জনগণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য

প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এতদ্ব্যতীত জনস্বাস্থ্যসংরক্ষণকল্পে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিয়া রাষ্ট্র সেগুলিকে কার্যকর করিবার ব্যবস্থাও করে।

জনসাধারণের স্বার্থে কতকগুলি শিল্প রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়া থাকে। এই সকল শিল্প পরিচালনার ভার নাগরিকগণের হাতে ছাড়িয়া দিলে অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতার ফলে কিংবা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থপরতার ফলে নাগরিকগণের এবং রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন হইতে পারে। সেইজন্য এইগুলি রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হওয়া সঙ্গত। যাহারা উৎপাদন করিবে এবং যাহারা ভোগ করিবে, তাহাদের স্বার্থের সংঘাত এ প্রকারে রোধ করা চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে নাগরিকের এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে বিভিন্ন ব্যবসায়-বাণিজ্যও রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। খাদ্যসামগ্রীর অপ্রাচুর্যবশতঃ আমাদের দেশে চাউল, আটা, গম প্রভৃতির ব্যবসায় অনেকদিন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় ধনিকগণ শ্রমিকগণের উপর অন্যায় জুলুম করিতে পারে। মালিকগণ শ্রমিকগণকে তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতে পারে। শিশু এবং নারী শ্রমিকগণকে সমাজ-জীবনের পরিপন্থী পরিবেশে পরিশ্রম করিতে বাধ্য করিতে পারে। এই সকল রোধ করা রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আইনের দ্বারা রাষ্ট্র এই সকল রোধ করিতেছে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই অসহায় দরিদ্র এবং সম্পূর্ণ অক্ষম নাগরিক রহিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবার কেহ নাই। সেই সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ইহাদের ভার হইতে হয়।

রেল, স্টীমার, বিমান প্রভৃতি যানবাহনের ব্যবস্থার মধ্যে এমন সব জটিল সমস্যা রহিয়াছে যে, একমাত্র রাষ্ট্রই ইহা সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিতে পারে। সেজন্য অনেক রাষ্ট্রে যানবাহন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রণ কিংবা পরিচালনা করে।

এইরূপে জনহিতকর এবং সমাজহিতকর অনেক কার্যই আজকাল রাষ্ট্র সম্পাদন করিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে মানব-জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। রাষ্ট্রের করণীয় কার্যের একটি আদর্শ এবং ব্যাপক তালিকা প্রস্তুত এ-যুগে আর সম্ভব নহে।

প্রশ্ন

১। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা কর। (পৃঃ ৪১-৪৩)

২। আধুনিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী বর্ণনা কর। (পৃঃ ৪৩ ৪৫)

সপ্তম অধ্যায়

জাতি, জাতীয়তা, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিকতা

জাতি, জাতীয়তা (Nation, Nationalism) :

একই মানবগোষ্ঠী হইতে যাহাদের উদ্ভব হইয়াছে, যাহারা একই ভাষায় কথা বলে, যাহাদের ধর্ম এক, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অভিন্ন, যাহারা একই আশা-আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়, যাহারা এক সঙ্গে দুঃখকষ্ট ভোগ করে এবং দুঃখকষ্টের অবসানের জন্য এক সঙ্গে সংগ্রাম করে তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই একটা ঐক্যবোধ জাগিয়া উঠে। এইরূপে যে ঐক্যবোধ জাগে সেই ঐক্যবোধের নাম জাতীয়তা (Nationalism)। যাহাদের মধ্যে এই ঐক্যবোধ বিদ্যমান তাহারা একটি জাতি (Nation) বলিয়া পরিগণিত। এই জাতি নিজেদের অনুরূপ অপর জাতি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। কাজেই এই জাতীয়তাবোধের মূলে একদিকে যেমন আছে ঐক্যবোধ, অপর দিকে তেমনই আছে স্বাতন্ত্র্যের ভাব।

ভাষাগত মিল, ধর্মগত মিল, আচার-আচরণগত মিল প্রভৃতি জাতীয়তার উপাদান। কিন্তু ইহার কোনটিই জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান নহে। সকল উপাদান বিদ্যমান থাকিলে সহজে জাতীয়তার উদ্ভব হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল উপাদানের কোন একটি বা কয়েকটি বিদ্যমান না থাকিলেও একটি মানবগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তা বিদ্যমান থাকিতে পারে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত, বিভিন্ন ভাষাভাষী, কিংবা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানব-সমাজ যদি অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণে একই ধরনের দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিয়া মুক্তিলাভের জন্য অনুরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং নিজেদের অন্য মানব-সমাজ হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে তবে তাহাদের মধ্যে জাতীয়তার ভাব বিদ্যমান বলিয়া সহজেই বলা চলে। যাহারা একই গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত তাহাদের মধ্যে ঐক্যের ভাব বর্তমান থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ইংরেজ কিংবা ফরাসীদের মত উন্নত জাতি ও একগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত নহে। অথচ ইহারা যে সুস্পষ্টভাবে পৃথক জাতি এ-সম্বন্ধে কেহ কোনদিন সন্দেহ পোষণ করে নাই। যাহারা এক ভাষায় কথা বলে, তাহাদের মধ্যে সহজে ভাবের বিনিময় হয়, হৃদ্যতা গড়িয়া উঠে। তাহারা সহজে নিজেদের এক বলিয়া মনে করে। অথচ এক ভাষাভাষী না হইলেও

কোন এক জনগোষ্ঠী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা কেহ বা ফরাসী ভাষায়, কেহ বা জার্মান ভাষায়, কেহ বা ইতালীয় ভাষায় কথা বলে। ইহা সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা এক জাতি। যাহারা এক ধর্ম আচরণ করে, ধর্মীয় নিষ্ঠা তাহাদিগকে স্বভাবতঃ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও এক জাতি গঠন করিতে পারে। জার্মানীতেও দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। এক সম্প্রদায় রোমান ক্যাথলিক, অপর সম্প্রদায় প্রটেস্টাণ্ট। তাহা সত্ত্বেও জার্মানগণ একজাতি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাস করিত। তাহা সত্ত্বেও তখনও ভারতীয়গণ এক-জাতি ছিল। বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাস করে। তথাপি ভারতীয়গণ একজাতি। এইভাবে দেখা যায় পূর্বোক্ত উপাদানগুলির কোনটিই জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান নহে। প্রকৃতপক্ষে যখন কোন মানবগোষ্ঠী নানা কারণে নিজেদের অন্য মানবগোষ্ঠী হইতে পৃথক বলিয়া এবং নিজেদের এক বলিয়া মনে করে তখনই তাহারা জাতি গঠন করে। কখনও কখনও দেখা যায় কেবল একসঙ্গে দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে। একসঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে বলিয়াই তাহারা নিজেদের পৃথক জাতি বলিয়া মনে করিয়াছে।

ইংরেজীতে জাতি শব্দের দুইটি প্রতিশব্দ আছে। একটি প্রতিশব্দ Nation অপর প্রতিশব্দ Nationality, ইংরেজী প্রতিশব্দ দুইটির মধ্যে কিছুটা তারতম্য বিদ্যমান আছে। লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) ভাষায় এই তারতম্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার মতে যে জনসমষ্টি, ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, ভাব, ঐতিহ্য, রীতি নীতি, আচার-আচরণের মিলবশতঃ নিজেদের এক বলিয়া এবং অন্য জনগোষ্ঠী হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে তাহারা একটি Nationality বলিয়া পরিগণিত হয়। যখন এইরূপ একটি Nationality একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা করে বা করিতে চেষ্টা করে তখন ইহা Nation বলিয়া পরিগণিত হয়। অবশ্য বাংলা ভাষায় জাতি বলিতে ইহাদের উভয়কে বা যে-কোন একটিকে বুঝায়।

রাষ্ট্র এবং জাতি (State and Nation) :

কখনও কখনও রাষ্ট্র এবং জাতিকে সমার্থ-বোধক বলিয়া মনে করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্র এবং জাতির ভৌগোলিক সীমানা এক। যেমন, ফরাসী জাতি এবং ফরাসী রাষ্ট্রের সীমানা এক। ভারতীয় জাতি এবং ভারত রাষ্ট্রের সীমানা এক। সর্বক্ষেত্রে কিন্তু তাহা এক নহে। রাষ্ট্র এবং জাতির সংজ্ঞা বা

প্রকৃতক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ আলোচনা করিলেই এই পার্থক্য সহজে ধরা পড়িবে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী বহিঃশাসনমুক্ত সুসংবদ্ধ সরকার-বিশিষ্ট জনসমষ্টিকে বলা হয় রাষ্ট্র। যেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মগত, ভাষাগত, আচার-আচরণগত, সাহিত্য-সংস্কৃতিগত মিলবশতঃ একটি ঐক্যের ভাব বিদ্যমান সেই জনসমষ্টিকে জাতি বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহারা নিজেদের অন্য জনসমষ্টি হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে। দেখা যায় জাতি-গঠনে যে ঐক্যবোধ অপরিহার্য, রাষ্ট্র গঠনে তেমন ঐক্যবোধের প্রয়োজন নাই। অবশ্য একই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে থাকে বলিয়া রাষ্ট্রের জনসমষ্টির মধ্যে ধীরে ধীরে ঐক্যবোধ জাগিয়া উঠে। কিন্তু ইহা অপরিহার্য নহে। একই রাষ্ট্রে ঐক্যবোধসম্পন্ন একাধিক জাতি বাস করিতে পারে। আবার একই জাতির জনসমষ্টি পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নভাবেও বাস করিতে পারে। বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেন রাষ্ট্রে ইংরেজ, স্কচ্, ওয়েলস্ প্রভৃতি জাতি বাস করে। আবার ফরাসী জাতির কিছু অংশ ফরাসী রাষ্ট্র ব্যতীত বেলজিয়াম, ইতালি সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রেও বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু জাতি-গঠনে তাহা অপরিহার্য নহে। একই জাতির জনসমষ্টির বিভিন্ন অংশ সাময়িকভাবে হইলেও বিচ্ছিন্নভাবে নানা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বাস করিতে পারে। এক দুর্বল জাতি সবল এক জাতির সঙ্গে একই রাষ্ট্রে বাস করিয়া কখনও কখনও নিপীড়িত হইয়াছে, ইতিহাসে ইহার অনেক সাক্ষ্য রহিয়াছে। পোল্যাণ্ডে জার্মানগণকে ভূমি হইতে এবং নাগরিকতা হইতে এক সময় বঞ্চিত করা হইয়াছিল। হাঙ্গেরীতে ইহুদিগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হইত না। পরাভূত অস্ট্রিয়ায় আদি অধিবাসিগণকে জার্মানগণ বলপূর্বক জার্মান ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে সবল জাতির সঙ্গে একত্র বসবাসকারী দুর্বল জাতি নিজ বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলিতে পারে। এমন কি পৃথিবীর ইতিহাস হইতে জাতি হিসাবে লুপ্ত হইতে পারে। এইরূপ সম্ভাবনা রোধ করিবার জন্য বর্তমানে রাষ্ট্র এবং জাতির ভৌগোলিক সীমানার একীকরণের চেষ্টা হইয়া থাকে।

জাতীয়তা এবং ভারত (Nationalism and India) :

ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের লোক রহিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। ভারতবাসীদের মধ্যে আচার-আচরণগত পার্থক্যও রহিয়াছে। কাজেই ভারতবাসীরা এক জাতি

কিনা সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। পূর্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি জাতীয়তার উপাদান হইলেও এইগুলি জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান নহে। যে জনসমষ্টির মধ্যে এইগুলির এক বা একাধিক বিদ্যমান সেই জনসমষ্টিও যদি নিজেদের এক বলিয়া এবং অন্যদের হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, তবে তাহারা একটি জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই ঐক্য এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে জাগিয়া উঠিতে পারে। যাহারা একসঙ্গে দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে, একসঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে, পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা স্বভাবতঃই নিজেদের এক বলিয়া এবং অপর জনসমষ্টি হইতে পৃথক বলিয়া মনে করিয়াছে। কাজেই সহজেই তাহারা একটি জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিবার ফলে ভারতীয়গণও এক সঙ্গে দুঃখকষ্ট নির্যাতন ভোগ করিয়াছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য তাহারা একসঙ্গে চেষ্টা করিয়াছে, একসঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে। বহু ক্ষেত্রেই তাহাদের সংস্কৃতিগত মিল আছে। কাজেই ভারতবাসীরা এক জাতি। স্বাধীনতালাভের পূর্বে ভারতবর্ষের লোকেরা এক জাতি ছিল। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইয়া এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। পাকিস্তানবাসীরা এক পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশ যাহা আজ ভারত নামে অভিহিত হইয়াছে তাহার অধিবাসীরা পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের ধর্মগত বা ভাষাগত পার্থক্য তাহাদের জাতীয়তার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই। ইহাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্যান-ধারণা এক। ইহারা নিজেদের অনুরূপ অন্য মানবগোষ্ঠী হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে। কাজেই ভারতীয়গণ একটি জাতি।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—এক জাতি এক রাষ্ট্র (Right of Self-determination : One Nation one State) :

নানা কারণে বিশেষতঃ নিজ বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রত্যেক জাতি স্বাধীনভাবে স্বনির্বাচিত এবং স্বপরিকল্পিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বাস করিতে চায়। যদি নিতান্ত অপরিহার্য কারণে কোন জাতিকে অপর জাতির সঙ্গে একই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে বাস করিতে হয়, তবে অন্ততঃ কয়েকটি বিষয়ে তাহারা নিজ ব্যবস্থাধীন থাকিতে চায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতেই নানা জাতির মনে

এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। তখন হইতেই স্বনির্বাচিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে বাস করার অধিকার জাতির স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। এই দাবীর তাৎপর্য এই যে, যেই সকল জাতি অপর জাতির সঙ্গে এক রাষ্ট্রে বাস করিতেছে তাহাদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠন প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন্ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দাবীর প্রতি নানাভাবে সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ বলিয়াছেন যে অপর কাহার সঙ্গে তাহারা বাস করিবে ইহা নির্ধারণ করিবার অধিকার যদি কোন নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর না থাকে তবে কোন কিছুই করিবার স্বাধীনতা তাহাদের নাই বলিয়া বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার তাৎপর্য এই যে যদি কোন জাতি অপর কোন জাতির সঙ্গে একই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অধীনে বাস করিয়া থাকে তবে তাহারা নিজের ইচ্ছায় সেই সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পৃথক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে অথবা অপর জাতির সঙ্গে নূতন সম্পর্ক গড়িয়া এক রাষ্ট্রে একত্র বাস করিতে পারে। স্বনির্বাচিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বাস করার অধিকারের অপর নাম আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of Self-determination)।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি হইতে অপর একটি নীতির উদ্ভব হইয়াছে। এই নীতির নাম এক জাতি এক রাষ্ট্র (One Nation one State) নীতি। জন স্টুয়ার্ট মিল্-এর মতে জাতির ভৌগোলিক সীমানা রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার সঙ্গে অভিন্ন হওয়া উচিত। কোন রাষ্ট্রের সীমানায় যদি বিভিন্ন জাতি বাস করে তবে ঐ রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক জাতির জন্য পৃথক একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি উইলসনের মতে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকিলে এবং জাতির ভৌগোলিক সীমানা রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার সঙ্গে অভিন্ন হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রে যেসকল সংখ্যালঘু সমস্যা আছে তাহার সহজ সমাধান হইবে। পৃথিবী শান্তির পথে অগ্রসর হইবে। আত্মনিয়ন্ত্রণশীল জাতি নিজ নিজ ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন করিতে পারিবে।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বা এক জাতি এক রাষ্ট্রের আদর্শকে কার্যকর করার পথে অনেক অসুবিধা আছে। সুইজারল্যাণ্ডে ফরাসী, জার্মান এবং ইতালীয় এই তিনটি জাতির বাস। 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতি প্রবর্তন করিতে হইলে এই সঙ্গে তিনটি রাষ্ট্র স্থাপন করিতে হয়। অনুরূপ কারণে বেলজিয়ামকে অন্ততঃ দুইটি রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হয়। এমন কি

ইংল্যাণ্ডকেও একাধিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হয়। এই নীতি অনুসৃত হইলে ইয়োরোপের বর্তমান আটাশটি রাষ্ট্রকে অন্ততঃ আটষট্টিটি রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হয়। এই নীতি একবার স্বীকৃত হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ছোটখাট মানবগোষ্ঠীও স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিবে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইবে, রাষ্ট্র দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইবে।

এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র হইতে কখনও কখনও দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়, পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন। কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় একই জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এই ধরনের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিতেছে। ঐসকল রাষ্ট্রে ক্ষুদ্র জাত্যংশের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের কল্পনা করা কঠিন। লোক-বিনিময়ের দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। ১৯২৩-২৫ খৃষ্টাব্দে গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। এশিয়া মাইনর হইতে গ্রীকগণকে গ্রীসে পাঠান হইল এবং গ্রীসের অটোম্যান মুসলমানগণকে তুরস্কে পাঠান হইল। প্রথম দিকে কিছুটা জোর দবরদস্তির ফলে এই বিনিময় সংঘটিত হইয়াছিল, পরে একটি চুক্তি অনুসারে এই বিনিময় ঘটে। দেশত্যাগীদিগকে নিজ নিজ অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল এবং স্থাবর সম্পত্তির মূল্য দেওয়া হইয়াছিল। ১৯১৯ সালে গ্রীস এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে এই ধরনের লোক-বিনিময় হইয়াছিল। বর্তমানে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যেও এই ধরনের লোক-বিনিময়ের কথা উঠিয়াছে। পাকিস্তানে অনেক হিন্দু আছে যাহারা নিজেদের ভারতীয় বলিয়া মনে করে। আবার ভারতে এমন অনেক মুসলমান আছে যাহারা নিজেদের পাকিস্তানী বলিয়া মনে করে। এই অবস্থা উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই অকল্যাণকর। মাঝে মাঝে উভয় রাষ্ট্রে যে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ দেখা দেয় এই অবস্থা তাহার অন্যতম কারণ। কেহ কেহ মনে করে লোক-বিনিময় হইলে এই অবস্থার অবসান হইবে। বাস্তবিক পক্ষে লোক-বিনিময়ের পথে অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ সংখ্যার দিক হইতে দেখা যায় পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা এক কোটি আর ভারতে মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ কোটি। পাকিস্তানে সকল মুসলমান চলিয়া গেলে পাকিস্তানে স্থান সঙ্কুলান কঠিন হইবে। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের পক্ষে এই ধরনের ধর্ম-ভিত্তিক লোক-বিনিময় সম্ভব হইলেও ভারতের মত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে এই ধরনের লোক-বিনিময়ের ব্যবস্থা সম্ভব নহে। বিগত মহাযুদ্ধের পর এই নীতি অনুসারে যে সকল রাষ্ট্র নূতন ভাবে গঠিত হইল তাহাতেও

একটি জাতির জন্য একটি রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হইল না। অন্যান্য কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল যে বিভিন্ন জাতির লোকেরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রে বাস করিতেছিল। জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে অপর জাতির বিচ্ছিন্ন অংশ রহিয়া গেল। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্ন জাতির অংশ নূতন রাষ্ট্র গঠনের সময় অন্ততঃ কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্যের দাবী উত্থাপন করিল। সমস্যার সমাধান হইল না।

আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ দান করা হইলেই শান্তির পথ সুগম হইবে একথা সর্বক্ষেত্রে সমান ভাবে স্বীকৃত হইতে পারে না। এই আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। নূতন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে এই দুই রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয় নাই, শান্তির পথও সুগম হয় নাই। বিভিন্ন চিন্তানায়ক এই নীতির বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। লর্ড কার্জন বলিয়াছেন ইহা, একটি দুইদিকে ধার-বিশিষ্ট অস্ত্র। ইহা একদিকে যেমন জনগোষ্ঠীর ঐক্য সুদৃঢ় করে তেমনই অপর জাতির সঙ্গে অপ্রীতির ভাবও প্রবল করিয়া তোলে। লর্ড অ্যাকটনের মতে মানুষে মানুষে মিলিত হইলে সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হয়, জাতিতে জাতিতে মিলিত হইলে এই অগ্রগতি আরও সহজ হয়। তাঁহার মতে একাধিক জাতির দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সর্বক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকে। একজাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্র অসম্পূর্ণ। সম্ভবতঃ গ্রেটবিটেন, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি একাধিক জাতি অধ্যুষিত দেশের অবস্থা ঐতিহাসিক অ্যাকটনের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অপরদিকে বলপূর্বক ত্রিধাবিভক্ত পোল্যাণ্ডের অবস্থা তাঁহার মনকে হয়ত আলোড়িত করে নাই।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কিংবা প্রত্যেক জাতির জন্য পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের দাবীকে এখন আর কেবল একটি মতবাদ বলিয়া খণ্ডন করিলে চলিবে না। বাস্তব রাষ্ট্র নীতিতে ইহা একটি সক্রিয় শক্তি। কোন রাষ্ট্রের মোট জনসমষ্টির একটি বিশিষ্ট অংশ পৃথক জাতি হিসাবে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী উত্থাপন করে, নিজ বিশিষ্টতা বজায় রাখিবার জন্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যদি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, তবে এই নৈতিক দাবীকে রোধ করা কঠিন। ইহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে আভ্যন্তরীণ শান্তির বিঘ্ন ঘটাইবার ঝুঁকি লইতে হয়। অবশ্য সব ক্ষেত্রে

এইরূপ পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বিপজ্জনক। অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যা-লঘু জাতির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকিতে পারে দেশের সংবিধানে এইরূপ উদার ব্যবস্থা থাকিলেও চলিতে পারে। অবশ্য সকল সময় সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রতিও সমান মর্যাদা প্রদর্শন করা হয় না। তথাপি স্পষ্টভাবে যদি সংবিধানে সংখ্যালঘু জাতির ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির সংরক্ষণ এবং পরিবর্ধনের ব্যবস্থা উদার ভাবে করা হয়, তবে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা অবাঞ্ছনীয় আলোড়নের সৃষ্টি করিতে পারে না।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা (Nationalism and Internationalism) :

বর্তমান পৃথিবীতে যেমন একজন মানুষ অপর একজন মানুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে না, তেমনই এক জাতি অপর জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন-ভাবে বাস করিতে পারে না। সমগ্র পৃথিবী বিভিন্ন কারণে একসূত্রে গাঁথা আছে। পৃথিবীর এক অংশের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তন অন্য অংশেরও পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। নিজের স্বার্থে প্রত্যেক জাতিকেই অন্য জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। একথা রাষ্ট্রের জন্মের পর হইতেই সকল রাষ্ট্রই উপলব্ধি করিয়া আসিতেছে। ফলে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব বিধানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আজও জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক প্রীতি-বিধানেরই চেষ্টা করিতেছে।

জাতীয়তাবোধ বিভিন্ন জাতির বিশিষ্টতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে এবং সমৃদ্ধ করিতে উৎসাহ দেয়। এই উৎসাহ যখন উগ্র হয়, তখন এক জাতি অন্য জাতির বিশিষ্টতাকে অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করে। জাতিতে জাতিতে বিরোধ দেখা দেয়। কাজেই কেহ কেহ মনে করে যে, জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী ; যেখানে জাতীয়তাবোধ আছে সেখানে আন্তর্জাতিকতার কোন স্থান নাই। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত জাতীয়তা নিজ বিশিষ্টতার উপর যেমন শ্রদ্ধাবান হয়, অন্য জাতির বিশিষ্টতার উপরও তেমনই শ্রদ্ধাবান হয়। নাগরিকরা নিজে যেমন স্বাধীনতা ভোগ করে, অপরকেও সেইরূপ স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করে না। প্রত্যেক জাতি নিজের বিশিষ্টতা যেমন বজায় রাখিতে চাহে, তেমনই অপর জাতিকেও বিশিষ্টতা বজায় রাখিতে সুযোগ দেয়। যে উগ্র জাতীয়তাবোধ অপরের জাতীয়তাবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবান নহে, সে জাতীয়তাবোধ নিজেই নিজের সমাধি রচনা করে। বিকৃত জাতীয়তাবোধই অপরের বিশিষ্টতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ এক জাতিকে অপর জাতির সঙ্গে সখ্যসূত্রে আরদ্ধ

থাকিতে শিক্ষা দেয়। জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতা পরস্পরবিরোধী নহে, বরং পরস্পরের সহায়ক। আন্তর্জাতিক প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করা বর্তমান জাতীয়তার অন্যতম কর্তব্য। উগ্র জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী হইতে পারে, প্রকৃত জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিকতার সহায়ক।

আন্তর্জাতিক শান্তি :

বিভিন্ন জাতি পাশাপাশি বাস করিলে এক জাতির স্বার্থের সঙ্গে অপর জাতির স্বার্থের সংঘর্ষ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এইরূপ সংঘর্ষের ফলে বিশ্বের শান্তি নষ্ট হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র যখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের বিরোধ মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন দেশবাসীর ধনপ্রাণ বিপন্ন হয়। মানবজাতির সমগ্র সভ্যতা তখন লোপ পাইবার উপক্রম হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি যখন নির্ধারিত হইয়াছিল তখন দেখা গিয়াছিল যে, যুদ্ধে আশি লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন জাতির শুভ বুদ্ধির উদ্রেক করিল। বিনা যুদ্ধে নিজেদের বিরোধ মিটাইবার জন্য, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বর্ধনের জন্য এবং বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিভিন্ন জাতি মিলিত হইয়া তখন জাতিসংঘ (League of Nations) গড়িয়া তুলিল। ১৯২০ সালে এই জাতিসংঘের জন্ম হইল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্ উইলসন্ জাতিসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হইলেও আমেরিকার জনমত ইহাতে যোগদানের বিরোধী ছিল। ফলে আমেরিকা জাতিসংঘে যোগদান করে নাই। প্রথম রাশিয়াও ইহাতে যোগদান করে নাই এবং জার্মানিকে ইহাতে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। পরে জার্মানি এবং রাশিয়া জাতিসংঘে যোগদান করে। ভারতবর্ষ প্রথম হইতেই এই জাতিসংঘের সদস্য ছিল। ছোটখাট দুই-একটি ক্ষেত্রে জাতিসংঘ শান্তিপূর্ণ ভাবে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করিতে সক্ষম হইলেও পরে ইহার ব্যর্থতা স্পষ্ট রূপে ধরা পড়িল। ১৯৩১ সালে যখন জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে, ১৯৩৫ সালে যখন মুসোলিনী হাবসীদেশ আবিসিনিয়া আক্রমণ করে এবং ১৯৩৮ সালে যখন হিটলারের ভীতি-প্রদর্শনে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বার্থ বিসর্জন করে, তখনই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইল। অবশেষে বিফলতার চরম পরিণতি দেখা গেল ১৯৩৯ সালের বিশ্বগ্রাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায়। বাস্তবিক পক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জাতিসংঘের সমাধি রচনা করিল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) :

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের কিছুকাল পূর্ব হইতেই পুনরায় অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার উদ্যোগ চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) প্রতিষ্ঠিত হইল। চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এই পাঁচটি প্রধান এবং সনদে স্বাক্ষরকারী আরও অন্যান্য রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য হইল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে ইহার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করিবে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করিবে। ইহা পৃথিবীর আর্থিক এবং সামাজিক উন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা করিবে। কৃষ্টি সংরক্ষণ করা, মানব-দুঃখ লাঘব করা এবং মানবের মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করার ব্যবস্থা করাও ইহার কর্তব্য হইবে। ইহা নারীপুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সকল জাতিকে সমান মর্যাদা দান করিবে। ইহা বিভিন্ন সন্ধির শর্ত এবং আন্তর্জাতিক আইন মান্য করিবে। ইহা সামাজিক জীবনের উন্নতির জন্য এবং জীবন-যাত্রার উচ্চতর মান প্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট হইবে। এই সনদের মুখবন্ধে যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য এবং পৃথিবীর স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে অস্ত্র-ব্যবহার রোধ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে।

গঠন :

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ছয়টি শাখা আছে। যথা—(১) নিরাপত্তা পরিষদ্ ; (২) সাধারণ পরিষদ্ ; (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্ ; (৪) অছি পরিষদ্ ; (৫) আন্তর্জাতিক আদালত ও (৬) সেক্রেটারিয়েট বা দপ্তরখানা।

নিরাপত্তা পরিষদ্ (Security Council) :

ইহাতে মোট ১১ জন সদস্য আছেন। আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং চীন এই পাঁচটি রাষ্ট্রের ৫ জন স্থায়ী সদস্য এবং সাধারণ পরিষদ্ কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত ৬ জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ্ গঠিত। এই পরিষদ্‌কে বিশ্বের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহার প্রতিনিধিগণ স্থায়িভাবে নিউইয়র্কে বাস করেন এবং সর্বদা আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এই পরিষদ্ বিবদমান রাষ্ট্রগুলির সহিত আলাপ-আলোচনা এবং সালিসীর দ্বারা বিরোধ মীমাংসা করে।

এই পরিষদের সুপারিশক্রমে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তি কিংবা সামরিক বল-প্রয়োগের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহার মতানুসারে নূতন সদস্য গৃহীত হয়। কোন জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে স্থায়ী সদস্য পাঁচজনের এবং অবশিষ্ট ছয়জনের অন্ততঃ দুইজনের সমর্থনের প্রয়োজন হয়। পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের যে-কোন একজন বিরোধিতা করিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না।

সাধারণ পরিষদ্ (General Assembly) :

প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র এই পরিষদে ৮ জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রের একাধিক ভোটের অধিকার নাই। এই পরিষদ্ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে। এই পরিষদ্ নিরাপত্তা পরিষদের ছয়জন অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন করে। ইহা নিরাপত্তা পরিষদ্-প্রদত্ত বিবরণী বিচার করে, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পাস করে এবং অছি পরিষদের কার্য পরীক্ষা করে। ইহাকে পৃথিবীর পার্লামেন্ট বা প্রতিনিধি সভা বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্ (Economic and Social Council) :

পৃথিবীর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা এই সংস্থার কাজ। সাধারণ পরিষদ্ কর্তৃক নির্বাচিত ১৮ জন সদস্য লইয়া ইহা গঠিত। এই পরিষদ্ বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (World Health Organisation —WHO), আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান (International Labour Organisation—ILO), বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান (World Food & Agricultural Organisation—FAO) এবং জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান (United Nations' Educational, Scientific & Cultural Organisation—UNESCO) প্রভৃতি সংস্থার কার্যে সহায়তা করিতেছে। এই পরিষদের চেষ্টায় বিশ্বজনীন মানবিক অধিকারের ঘোষণা কার্যকরী হইয়াছে। এই ঘোষণা কার্যকরী হইলে কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দাবীতে মানুষ যে সকল অধিকার লাভ করিতে পারে, মানুষের সে সকল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অছি পরিষদ্ (Trusteeship Council) :

কতগুলি অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নতি বিধান করিবার এবং ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসিগণকে স্বাধীনতা অর্জনের উপযোগী করিবার দায়িত্ব

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ছয়টি রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করিয়াছে। এই ছয়টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এবং অন্য ছয়টি দেশের প্রতিনিধি লইয়া অছি পরিষদ্ গঠিত। এই অছি পরিষদ্ অনগ্রসর অঞ্চলগুলি যে সকল রাষ্ট্রের অধীনে আছে, সে সকল রাষ্ট্রকে অনগ্রসর অঞ্চলগুলির উন্নতি-বিধানকল্পে পরামর্শ দিয়া থাকে এবং ঐ অঞ্চলের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থার তদারক করে।

আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice) :

আন্তর্জাতিক আদালত হেগ শহরে অবস্থিত। সাধারণ পরিষদ্ এবং নিরাপত্তা পরিষদ্ কর্তৃক যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত ১৫ জন বিচারক লইয়া এই আদালত গঠিত। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিচার করা ইহার কাজ। এই আদালত বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত এবং নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত বিষয়ের বিচার করে এবং আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদ্ ও সাধারণ পরিষদের অনুরোধক্রমে মত দিয়া থাকে।

দপ্তরখানা (Secretariat) :

জাতিপুঞ্জের অফিসের দৈনন্দিন কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য এই দপ্তরখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কর্মকর্তা সেক্রেটারী-জেনারেল। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ৮ জন সহকারী সেক্রেটারী-জেনারেল এবং অন্যান্য কর্মচারী আছে। সেক্রেটারী-জেনারেল নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ্ কর্তৃক নিযুক্ত হন।

শান্তিরক্ষায় জাতিপুঞ্জ :

কোরিয়ার যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার ফলে কেহ কেহ জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহার কার্যকারিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছে। ইরান-সোভিয়েট মতদ্বৈধ নিরসন (১৯৪৬), ইহুদি-আরব দ্বন্দ্ব সমাধান (১৯৪৯), ইন্দোনেশিয়ায় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ করা, বার্লিন অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিন ও সোভিয়েট দ্বন্দ্বের সমাধান (১৯৪৮-৪৯), কোরিয়া ৩৮ অক্ষরেখা অতিক্রম করার পর জাতি-পুঞ্জের অস্ত্রধারণ প্রভৃতি কতগুলি রাজনৈতিক ঘটনা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্যের সাক্ষ্য দিতেছে।

মানবজাতির সর্ববিধ কল্যাণ-সাধনের আগ্রহ লইয়া জাতিপুঞ্জ যে কয়টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কার্যে সহায়তা করিতেছে, সেগুলি জাতিপুঞ্জের বিশ্ব-কল্যাণের সমবেত ও সার্থক প্রয়াসের সাক্ষ্য দিতেছে।

সম্প্রতি কাশ্মীরকে উপলক্ষ করিয়া ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরোধের ভাব দেখা দিয়াছে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সে বিরোধ মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই কাজে সফল হইতে পারিলে ইহার মর্যাদা আরও বাড়িবে সন্দেহ নাই।

আন্তর্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠান (ILO) :

এই সংস্থা শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সম্মেলনে আলোচনা করে এবং খসড়া আইন ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে পাঠাইয়া থাকে।

খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান (FAO) :

এই সংস্থা খাদ্য ও কৃষির অবস্থা আলোচনা করে। পুষ্টি, কৃষি, বন এবং মৎস্য সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সদস্য-রাষ্ট্রসমূহকে পরিবেশন করা এই সংস্থার প্রধান কাজ। এই সকল বিষয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্ম-প্রচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করাও ইহার কাজ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিল্প-কৃষ্টি-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (UNESCO) :

ইহার উদ্দেশ্য বিজ্ঞান এবং কৃষ্টির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার বিস্তার।

বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (WHO) :

এই সংস্থা বিশ্বের রোগ-প্রতিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ইত্যোমধ্যে বিশেষ কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু সংস্থা প্রভৃতির কর্ম-প্রচেষ্টাও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যকারিতা সম্বন্ধে জনগণের মনে আশার সঞ্চার করিতেছে।

প্রশ্ন

১। জাতীয়তা কাহাকে বলে? ইহা কি আন্তর্জাতিকার বিরোধী? জাতীয়তার উপাদান কি?
(পৃঃ ৪৬-৪৭, ৫৩-৫৪, ৪৮-৪৯)

২। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সঙ্গত কি? (পৃঃ ৪৯-৫৩)

৩। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন শাখার গঠন এবং কার্যাবলী বর্ণনা কর। (পৃঃ ৫৫-৫৭)

৪। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ণয় কর। (পৃঃ ৫৫-৫৮)

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিক

(Citizen)

রাষ্ট্রে যাহারা বাস করে তাহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—নাগরিক (Citizen) এবং বৈদেশিক (Alien)। যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের ভিতরে কিংবা বাহিরে রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের দাবী করিতে পারে, তাহারাই রাষ্ট্রের নাগরিক। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য। তাহারা রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। যোগ্যতা অনুসারে রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার তাহাদের আছে। নাগরিকগণ যেখানেই থাকুক না কেন, তাহারা নিজ রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ দাবী করিতে পারে।

এক রাষ্ট্রের কোন নাগরিক যখন অপর রাষ্ট্রে বাস করে, তখন সেই নাগরিক দ্বিতীয় রাষ্ট্রে বৈদেশিক। ভারতীয় নাগরিক যদি কার্যোপলক্ষে পাকিস্তানে সাময়িকভাবে বাস করে, তবে সে পাকিস্তানে বৈদেশিক হিসাবে পরিগণিত হইবে। নাগরিক এবং বৈদেশিক উভয়কেই রাষ্ট্রের আইন মানিয়া চলিতে হয় এবং নির্ধারিত কর দিতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। গ্রেট ব্রিটেনের কোন নাগরিক যদি সাময়িকভাবে ভারতে বাস করে, তবে তাহাকে ভারতের আইন মানিয়া চলিতে হইবে এবং যথারীতি কর প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু সে ভারত রাষ্ট্রের আনুগত্য না করিয়া গ্রেট ব্রিটেনের আনুগত্য স্বীকার করিবে। ভারত যদি কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে ভারত সরকার ভারতীয় নাগরিকগণকে সংগ্রামে যোগদান করিতে বাধ্য করিতে পারে। কিন্তু ভারতপ্রবাসী গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিককে সেরূপ বাধ্য করা চলে না। নাগরিক শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। বৈদেশিকগণের গতিবিধির উপর নানারূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় নাগরিকগণের উপর এই প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয় না। রাষ্ট্র স্বাভাবিক অবস্থাতেও বৈদেশিকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় নাগরিকের গতিবিধি রাষ্ট্র অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না।

নাগরিকত্ব অর্জন এবং নাগরিকত্ব বাতিল (Acquisition and Loss of Citizenship) :

দ্বিবিধ উপায়ে মানুষ নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে—জন্মের দ্বারা এবং স্বেচ্ছায়। আবার জন্মের দ্বারা দ্বিবিধ নিয়মে নাগরিকত্ব লাভ করা যায়। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের এলাকায় জন্মগ্রহণ করে, সে ব্যক্তি সেই রাষ্ট্রের নাগরিক। মাতাপিতার নাগরিকত্বের সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। এইক্ষেত্রে জন্মস্থানের দ্বারা নাগরিকত্ব নির্দিষ্ট হইল। এই নিয়মানুসারে (*Jus soli*) ইংল্যাণ্ডে প্রবাসকালে ভারতীয় নাগরিক দম্পতির যদি ইংল্যাণ্ডে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে সে সন্তান গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিক হইবে। দ্বিতীয় নিয়মানুসারে জন্মস্থান-নির্বিশেষে সন্তান মাতাপিতার নাগরিকত্ব অর্জন করে। এই নিয়মে (*Jus sanguinis*) ভারতে প্রবাসকালে যদি কোন ইংরেজ নাগরিক দম্পতির কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে সে সন্তান গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিক হইবে।

কোন রাষ্ট্র এই দুই নীতির একটি নীতি গ্রহণ করে। আবার কোন রাষ্ট্র উভয় নীতিই গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার ফলে একই ব্যক্তির যুগপৎ দুই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবার বা তাহার দ্বিনাগরিকত্ব লাভের (Dual Citizenship) সম্ভাবনা থাকে। যদি গ্রেট ব্রিটেনের কোন নাগরিক দম্পতির ভারতে প্রবাসকালে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে সে সন্তান গ্রেট ব্রিটেনের নিয়ম অনুসারে গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিক, আবার ভারতীয় নিয়ম অনুসারে সে ভারতীয় নাগরিক। সাধারণতঃ এই প্রকারের সন্তান সাবালক হইয়া ঘোষণা দ্বারা যে-কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে পারে। ভারতীয় নিয়মানুসারে এইরূপ বালক বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছায় ভারতীয় নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিতে পারে।

স্বেচ্ছায় নাগরিকত্ব গ্রহণ নাগরিকত্ব অর্জনের দ্বিতীয় উপায় (Naturalisation)। কোন বৈদেশিক কোন রাষ্ট্রে নির্দিষ্টকাল বাস করিয়া অথবা ঐ রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিয়া অথবা ঐ রাষ্ট্রের এলাকায় ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে। নারী বিবাহ দ্বারা স্বামীর নাগরিকত্ব অর্জন করে। এইরূপ কতগুলি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করিয়া সেই রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বাস করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের নিকট নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করিলে, সেই রাষ্ট্র তাহাকে নাগরিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। এই সকল নাগরিককে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক (Naturalised Citizen) বলা হয়। ইহার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজস্ব আইন বা নিয়ম প্রবর্তন করে।

ভারত, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি কোন কোন রাষ্ট্রে স্বাভাবিক (Natural Citizen) এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকগণের (Naturalised Citizen) মধ্যে তারতম্য করা হয় না। আবার কোন রাষ্ট্রে ইহাদের মধ্যে তারতম্য করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কেবল স্বাভাবিক নাগরিকগণই রাষ্ট্রপতি কিংবা উপরাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী হইতে পারে। অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকগণের সে অধিকার নাই।

কতগুলি কারণে নাগরিকত্ব লোপ পাইতে পারে। অন্য রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিলে পূর্ব-নাগরিকত্ব লোপ পায়। ভারতীয় নাগরিক যদি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে, তবে তাহার ভারতীয় নাগরিকত্ব লোপ পায়। যদি এক রাষ্ট্রের মহিলা নাগরিকের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের পুরুষের বিবাহ হয়, তবে ঐ মহিলার পূর্ব-নাগরিকত্ব লোপ পায়। সেই মহিলা স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল রাষ্ট্রের এলাকার বাহিরে বাস করিলে নাগরিকত্ব লোপ পায়। রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রে পলায়ন করিলে কখনও কখনও পূর্ব-নাগরিকত্ব বাতিল হয়। কোন ব্যক্তি যদি আবেদনক্রমে ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তবে তাহার পূর্ব-নাগরিকত্ব লোপ হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজস্ব নাগরিকত্ব লোপ এবং অর্জন বিধি প্রণয়ন করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এই সকল বিধির মিল নাও থাকিতে পারে।

সুনাগরিকের গুণাবলী (Qualities of a Good Citizen) :

বর্তমান যুগে প্রায় সকল রাষ্ট্রই গণতন্ত্রের নীতিতে শাসিত হইয়া থাকে। গণতন্ত্রের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনে নাগরিকগণের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। তাহাদের অধিকারও অনেক। এই সকল দায়িত্ব পালন করিতে এবং অধিকার ভোগ করিতে হইলে নাগরিককে কতগুলি গুণের অধিকারী হইতে হয়। রাষ্ট্রের কল্যাণ এবং সমাজের উৎকর্ষ নাগরিকদের এই সকল গুণের উপর নির্ভর করে। যে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যত বেশী গুণসম্পন্ন হইবে, সে রাষ্ট্রের তত বেশী কল্যাণ সাধন হইবে এবং সেই রাষ্ট্রের সমাজ তত বেশী উৎকর্ষ লাভ করিবে।

খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ্ লর্ড ব্রাইস সুনাগরিকের তিনটি গুণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুনাগরিক বুদ্ধিমান হইবে, আত্মসংযমী হইবে এবং বিবেকসম্পন্ন হইবে।

গণতন্ত্রে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের কার্য-সম্পাদনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। নাগরিকগণ সরকারের নীতি নির্দেশ করে। নাগরিকদের বুদ্ধি এবং শিক্ষা না থাকিলে, কোন্ নীতি ভাল, কোন্ নীতি মন্দ, তাহা তাহারা বিচার করিতে পারিবে না। কিসে তাহাদের বা জনসাধারণের মঙ্গল-সাধন হইবে, তাহা তাহারা বুঝিবে না। নিজেদের কর্তব্য সম্পাদনের কিংবা দায়িত্ব পালনের জন্য তাহাদিগকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হয়। নিজেরা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন না হইলে চতুর রাজনীতিকগণ তাহাদিগকে নিজ স্বার্থ-সাধনে নিয়োজিত করিতে পারে এবং বিচারবুদ্ধিবিহীন নাগরিকদের দ্বারা দেশের অমঙ্গল-সাধন করাইতে পারে।

নাগরিকগণকে সংযমী হইতে হইবে। গণতন্ত্রে নাগরিকগণ নানাবিধ অধিকার ভোগ করে। তাহাদের হাতে প্রভূত ক্ষমতাও থাকে। নাগরিকগণ ইচ্ছা করিলে এই সুযোগকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইতে পারে। ব্যক্তি-স্বার্থ কখনও কখনও দেশের স্বার্থের বিরোধী হইতে পারে। নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টার ফলে দেশের অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। এই অকল্যাণের সম্ভাবনা রোধ করিবার জন্য নাগরিকগণকে সংযমী হইতে হয়। সুনাগরিক সংযমের সহিত প্রয়োজনবোধে নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়া জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। যখন জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে নিজ স্বার্থের বিরোধ দেখা দেয়, তখন সুনাগরিক ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। গণতন্ত্রে অধিকাংশের মতে কার্য সম্পন্ন হয়। কোন নাগরিকের মত অধিকাংশ নাগরিকের মতের সঙ্গে না মিলিলেও সুসংযত সুনাগরিক অকুণ্ঠচিত্তে অধিকাংশের মত মানিয়া লয়। এমন কি সে মত যদি তাহার নিকট অসংগত বলিয়াও মনে হয়, তথাপি সে মত সে গ্রহণ করে। তাহাতে গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়।

সর্বশেষে সুনাগরিককে বিবেকসম্পন্ন এবং কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে হয়। গণতন্ত্রে নাগরিকগণকে অনেক কর্তব্য সম্পন্ন করিতে হয়। তাহাদের কর্তব্য সম্পাদনের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। সেইজন্য সুনাগরিককে কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে হয়। আবার নিজ কর্তব্য সম্পাদনে সকল সময় তাহাকে কি ন্যায় কি অন্যায়, তাহা বিচার করিতে হয়। অন্যায়কে বর্জন করিয়া সুনাগরিককে ন্যায়ের আশ্রয় লইয়া নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করিতে হয়। অর্থাৎ তাহাকে বিবেকসম্পন্ন হইতে হয়। ন্যায় মনে করিয়া সুনাগরিক নির্দিষ্ট হারে কর দেয়, সরকারী কর্মচারীদের কার্যে সাহায্য

করে, দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বপ্রকার স্বার্থ বিসর্জন করে। সে যোগ্য ব্যক্তিকে সরকারী কার্যের জন্য নিয়োগ বা নির্বাচন করে। কর্তব্যনিষ্ঠা এবং বিবেক-সম্পন্নতা সুনাগরিকের অতি প্রয়োজনীয় গুণ। এই ধরনের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই রাষ্ট্রকে বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে পারে।

সুনাগরিকতার পথে অন্তরায় (Hindrances to Good Citizenship):

সুনাগরিক হইবার পথে কতগুলি অন্তরায় আছে। লর্ড ব্রাইসের মতে উত্তমহীনতা, স্বার্থপরায়ণতা এবং দলাদলির মনোভাবই সুনাগরিকতার পথের অন্তরায়। যাহারা উত্তমহীন, অলস, স্বার্থপর এবং দলাদলিপ্রিয়, তাহারা সুনাগরিক হইতে পারে না।

(ক) উত্তমহীনতা (Indolence):

নাগরিকদের কর্তব্য সম্পাদনের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। নাগরিকগণ যদি অলস বা উত্তমহীন হইয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হয়, তবে দেশের কাজ সুন্দর ভাবে মোটেই সম্পন্ন হইবে না। গণতন্ত্রে দেশের কাজ সকলের কাজ। সকলের কাজ কাহারও কাজ নহে অথবা আমি না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না, মনে করিয়া সকলেই যদি নিশ্চেষ্ট থাকে বা উত্তমহীন হয়, তবে কোন কাজই সম্পন্ন হয় না। গণতন্ত্রের অধোগতি হয়। সকলের স্বাথ ক্ষুণ্ণ হয়। সকলের স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থও জড়িত থাকে। ফলে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হয়। আইন প্রণয়নের জন্য বা শাসনের নীতি নিধারণের জন্য ভোট দিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিতে হয়। এই নির্বাচন-কার্যে নাগরিকগণ যদি উত্তমহীনতা দেখায়, তবে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হইবে না। দেশের আইন প্রণয়ন বা শাসনের নীতি নির্ধারণের কাজ ভালভাবে চলিবে না। উত্তমহীন হইলে মানুষ দেশের কাজে নিযুক্ত হইতে চাহে না, প্রয়োজনবোধে দেশের জন্য অস্ত্রধারণ করে না। দেশের কোন কাজ করে না বলিয়া ধীরে ধীরে সে দেশের জন্য চিন্তাও করে না। কর্মশক্তিতে অলসতার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তিতেও অলসতা আসে। অথচ গণতন্ত্র নির্ভর করে নাগরিকদের সক্রিয় চিন্তাশক্তির উপর, কর্ম-সম্পাদনের উপর। নাগরিকগণ কর্মবিমুখ বা চিন্তাবিমুখ হইলে গণতন্ত্র ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

বর্তমান যুগে নাগরিকদের এই ধরনের ঔদাসীন্যের কতগুলি কারণ আছে। এখন রাষ্ট্রের আয়তন খুব বড়। প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রের মত ছোট রাষ্ট্র এখন আর নাই। রাষ্ট্রে লোকসংখ্যাও অনেক। ব্যক্তিবিশেষ স্বভাবতঃই নিজেকে নগণ্য বলিয়া মনে করিতে পারে। সে ভাবিতে পারে, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের মতামত বিবেচিত হইবে বা যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করিবে, সেখানে তাহার সক্রিয়তার এবং নির্লিপ্ততার অর্থ প্রায় সমান। সে কোন কাজে অংশ গ্রহণ না করিলেও রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হইবে না এই ভাবিয়া সে নির্লিপ্ত থাকে। অথচ এই নির্লিপ্ততা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং নিজের পক্ষেও ক্ষতিকারক।

দ্বিতীয়তঃ নাগরিক দিক ছাড়া বর্তমানে মানুষের আকর্ষণীয় অনেক দিক আছে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা প্রভৃতি কোন কোন মানুষের মনকে এমনভাবে আকর্ষণ করিতে পারে, যাহার ফলে তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নির্লিপ্ততা আসা অস্বাভাবিক নহে।

তৃতীয়তঃ মানুষের জীবন-সংগ্রাম এখন এতই প্রবল হইয়াছে যে, কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই মানুষকে খব পরিশ্রম করিতে হয় বা চিন্তা করিতে হয়। আমাদের নিজেদের জীবন-সংগ্রামের কথাই ধরা যাক। আমরা দেখি খাদ্য, বস্ত্র, তৈল, লবণ সংগ্রহ করিতেই দিনের একটা বিশিষ্ট অংশ আমাদের ব্যয় হয়। তাহার উপর অর্থ উপার্জনের জন্য পরিশ্রমের কথা আছে। ইহার পর মানুষের মনে নাগরিক ব্যাপারে কিছুটা নির্লিপ্ততা আসা অস্বাভাবিক নহে। সময় এবং আগ্রহ এই উভয়ের অভাবেও এই নির্লিপ্ততা আসে।

(খ) ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি (Self-interest):

ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেষণ সুনাগরিকতার পথে দ্বিতীয় অন্তরায়। মানুষ যখন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তখন জনসাধারণের স্বার্থ তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় কিনা, সে কথা সে চিন্তা করে না। ফলে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে। কাজেই স্বার্থবুদ্ধি মানুষের সুনাগরিকতার পথে অন্তরায় হয়। নির্বাচনের সময় ভোটদাতা কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে সামান্য উৎকোচ গ্রহণ করিয়া অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করিলে নিজের আর্থিক স্বার্থ সামান্য পরিমাণে সিদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোকেরা

কালোবাজার হইতে অধিক মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করে। এইভাবে কালোবাজারীকে উৎসাহিত করিয়া কালোবাজার বাঁচাইয়া রাখে এবং জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে। এইরূপে দেখা যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে সুনাগরিক হইতে দেয় না।

(গ) দলীয় মনোভাব (Party Spirit) :

দলীয় মনোভাব সুনাগরিকতার আর একটি অন্তরায়। গণতন্ত্রে দল অপরিহার্য। কিন্তু যাহা একদিক দিয়া অপরিহার্য, তাহা অপরদিকে মহাক্ষতির কারণও হইতে পারে। বিভিন্ন দলের মধ্যে যখন সঙ্গত এবং শোভন প্রতিযোগিতা থাকে, তখন বিভিন্ন কাজ ভালরূপ সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। পরন্তু এই প্রতিযোগিতা যখন অস্বাস্থ্যকর এবং অশোভন রূপ ধারণ করে, তখন দেশের প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়। প্রত্যেক দল তখন নিজ দলের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। জনসাধারণের কল্যাণের কথা বা সমগ্র দেশের কল্যাণের কথা কোন দলই চিন্তা করে না। প্রত্যেক দলই এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করে, যাহার ফলে কেবল সেই দলেরই স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। দলের নির্দেশে মানুষ অন্যায়ের সমর্থন করে। এইরূপ দলীয় প্রতিযোগিতার ফলে কখনও কখনও কলহ, মারামারি, হানাহানিও হয়। দেশে অশান্তি বৃদ্ধি পায়। কাজেই এই ধরনের দলীয় মনোভাব গণস্বার্থের বিরোধী।

(ঘ) অজ্ঞতা (Ignorance) :

সুনাগরিকতার পথে সর্বশেষ অন্তরায় হইল অজ্ঞতা। গণতন্ত্রে নাগরিকদের কর্তব্য এবং অধিকার অনেক। যাঁহারা অজ্ঞ, তাহারা তাহাদের কর্তব্য কি, অধিকার কি, তাহা জানে না। জানিলেও তাহারা কিভাবে কর্তব্য সম্পন্ন করিবে, কিভাবে অধিকার ভোগ করিবে, তাহা জানে না। যাহাদের কর্তব্য সম্পাদনের উপর গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে, তাহারা যদি কর্তব্য সম্পাদন না করে, যাহাদের অধিকার দানের জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তাহারা যদি অধিকার ভোগ না করে, তবে গণতন্ত্রই ব্যর্থ হইয়া যায়। নাগরিক অজ্ঞ থাকিলে এই ধরনের ব্যর্থতা অপরিহার্য। আমাদের ভারতে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। নাগরিকদের দায়িত্ব বহুগুণে বাড়িয়াছে। অথচ এই দায়িত্ব পালনের পথে অজ্ঞতা একটি বিশাল অন্তরায় হইয়া দেখা দিয়াছে। নাগরিকগণ শিক্ষার অভাবে নানা বিষয়ে অজ্ঞ। দেশের শিক্ষা-বিভাগ সমাজ শিক্ষার মাধ্যমে এবং প্রচার বিভাগ প্রচার কার্যের মাধ্যমে

এই অজ্ঞতা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে। অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে গণতন্ত্র অর্থবিহীন হইবে।

প্রশ্ন

১। নাগরিক এবং বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য কি? (পৃঃ ৫৯)
২। নাগরিকতা কিভাবে লাভ করা যায়? (পৃঃ ৬০-৬১)
৩। কি গুণ থাকিলে মানুষ সুনাগরিক হয়? (পৃঃ ৬১-৬৩)
৪। সুনাগরিতার পথে অন্তরায় কি? (পৃঃ ৬৩-৬৬)

নবম অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য
(Rights and Duties of a Citizens)

নাগরিকের অধিকার (Rights of a Citizen) :

রাষ্ট্র তাহার নাগরিকগণকে নিজ নিজ শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিবার জন্য এবং নিজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনের সুযোগ দিবার জন্য কতগুলি সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে। রাষ্ট্র এই সুযোগ বা ক্ষমতা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। নাগরিক যাহাতে এই ক্ষমতা বা সুযোগ ভোগ করিতে পারে, রাষ্ট্র সেই ব্যবস্থাও করিয়া থাকে। কেহ নাগরিককে সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিলে, রাষ্ট্র তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্র-কর্তৃক প্রদত্ত এবং সংরক্ষিত এই সুযোগ বা ক্ষমতাগুলিই নাগরিকের অধিকার। রাষ্ট্র নাগরিককে অবাধে নিজ সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার দেয়। এই অধিকার কেহ যেন ক্ষুণ্ণ না করে রাষ্ট্র সেদিকে লক্ষ্য রাখে।

রাষ্ট্র নাগরিকগণের দ্বিবিধ অধিকার মানিয়া লয় এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এইগুলি পৌর অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার।

পৌর অধিকার (Civic Rights) :

সমাজে সভ্য জীবন-যাপনের জন্য যে সকল অধিকারের প্রয়োজন, সে সকল অধিকারই পৌর অধিকার। ধনপ্রাণ রক্ষার অধিকার, স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার, চুক্তি সম্পাদনের অধিকার প্রভৃতিকে পৌর অধিকার বলা হয়। মানসিক এবং নৈতিক শক্তির উন্নতি-বিধানকল্পে নাগরিকগণের এই সকল অধিকারের প্রয়োজন। নাগরিকের পৌর অধিকারগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) জীবন-রক্ষার অধিকার (Right to Life) :

প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজ জীবন রক্ষার অধিকার আছে। নিজ জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনবোধ করিলে নাগরিক আক্রমণকারীর প্রাণনাশও করিতে পারে। রাষ্ট্রও অপরের আক্রমণ হইতে প্রত্যেক নাগরিকের জীবন রক্ষা করে।

(খ) অবাধ গতিবিধির অধিকার (Right to Freedom of Movement) :

রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে নাগরিক অবাধে চলাফেরা করিতে পারে। প্রচলিত কোন আইন ভঙ্গ না করিলে কোন সরকারী কর্মচারী তাহাকে বাধা

প্রদান করিতে কিংবা গ্রেপ্তার করিতে পারে না। রাষ্ট্রের কিংবা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে নাগরিকের এই অধিকার আংশিকভাবে ক্ষুণ্ণ করা অসঙ্গত নহে। অবাধ চলাফেরার অধিকার আছে বলিয়াই বিনা অনুমতিতে একজন নাগরিককে অপরের বাসগৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া চলে না। তাহাতে সমাজ-জীবন বিপন্ন হয়।

(গ) সম্পত্তি ভোগের অধিকার (Right to Property) :

বিনা বাধায় নিজ নিজ সম্পত্তি ভোগের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। অপর কোন ব্যক্তি কিংবা কোন সরকারী কর্মচারী এই অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি অপর নাগরিকের গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে পারে না। এমন কি সরকারী কর্মচারীরও বিনা পরোয়ানায় কোন নাগরিকের গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। সমাজের বা রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এই অধিকার রাষ্ট্র ক্ষুণ্ণ করিতে বা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারে।

(ঘ) চুক্তির অধিকার (Right to Contract) :

নাগরিকগণ ইচ্ছামত অন্যের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে। অবশ্য এই চুক্তি প্রচলিত কোন আইনের পরিপন্থী হইলে অগ্রাহ্য হইবে। দুইজন নাগরিক যদি অপরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়, তবে সে চুক্তি রাষ্ট্র-কর্তৃক অগ্রাহ্য হইবে। কারণ তাহা প্রচলিত আইনের পরিপন্থী।

(ঙ) ধর্মাচরণের অধিকার (Right to Religions) :

প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজ নিজ বিশ্বাসমত ধর্মাচরণ করিবার অধিকার আছে। কোন সভ্য রাষ্ট্রই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নাগরিকগণের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করে না।

(চ) স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবার অধিকার (Right to Freedom of Expression) :

নাগরিকগণের নিজ নিজ মত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। নিজ মত প্রকাশ করিতে গিয়া যদি নাগরিকগণ সরকারী নীতি কিংবা কার্যেরও প্রতিকূল সমালোচনা করে, তথাপি মত-প্রকাশে বাধা দিবার অধিকার রাষ্ট্রের

নাই। ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় অধিকার। এই অধিকার না থাকিলে নাগরিকের স্বাধীনতাই অর্থবিহীন হইয়া উঠে। বাস্তবিক পক্ষে নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারাই সরকার ন্যায় পথে চালিত হয়। ন্যায় সমালোচনা দ্বারা যদি ভুল-ভ্রান্তি নির্দেশিত না হয়, তবে সরকার আপন ভুল বুঝিতে সক্ষম হয় না। ফলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে। অবশ্য এই অধিকারের বলে কোন নাগরিককে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক, দুর্নীতিপূর্ণ কিংবা অশ্লীল বক্তৃতা প্রদান করিতে দেওয়া চলে না।

(ছ) সভায় যোগদান করিবার এবং সংঘ গঠন করিবার অধিকার (Right to free Association) :

প্রত্যেক নাগরিকের সভা আহ্বান করিয়া সভায় যোগদান এবং অপরের সঙ্গে মিলিত হইয়া শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ মত প্রচার করিবার অধিকার আছে। নিজের মতকে অন্যের নিকট প্রকাশ এবং প্রচার করিতে না পারিলে, অত্যন্ত সুচিন্তিত হইলেও সেই মতের দ্বারা সমাজের কিংবা রাষ্ট্রের কোন মঙ্গল-সাধন হইতে পারে না।

(জ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of Press) :

প্রত্যেক নাগরিকের সংবাদপত্র কিংবা মুদ্রিত পুস্তকের মাধ্যমে নিজ মত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। সংবাদপত্রেরও প্রত্যেকের মতামত মুদ্রিত আকারে প্রকাশ ও প্রচার করিবার অধিকার আছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারী নীতি এবং কার্যের সমালোচনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু অশ্লীল, দুর্নীতিপূর্ণ অথবা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার সংবাদপত্রকে দেওয়া চলে না। কারণ তাহা সমাজ এবং রাষ্ট্রের মঙ্গলের পরিপন্থী।

(ঝ) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য (Equality before Law) :

প্রত্যেক নাগরিকের আইনের দৃষ্টিতে সমানভাবে বিবেচিত হইবার অধিকার আছে। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান। রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা যেমন সকলে সমানভাবে ভোগ করে, একই আইন ভঙ্গ করিলে সকল নাগরিক তেমনই সমান শাস্তি ভোগ করে।

(ঞ) সংস্কৃতি এবং ভাষা সংরক্ষণের অধিকার (Right to protect Language and Culture):

প্রত্যেক নাগরিক বা নাগরিক-শ্রেণীর নিজ নিজ ভাষা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার এবং তাহার উন্নতি-বিধান করিবার অধিকার আছে।

(ট) যথাযোগ্য কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার (Right to Employment):

বর্তমানে সকল রাষ্ট্রই নাগরিকগণের যোগ্যতা অনুসারে কর্মে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা অর্জন করিবার অধিকার স্বীকার করিতেছে। প্রত্যেক নাগরিকের আপন শ্রমের যথাযোগ্য মূল্য পাইবার অধিকার আছে। এই প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে নাগরিক তাহার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে।

(ঠ) শিক্ষালাভের অধিকার (Right to Education):

প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি-বিধানকল্পে শিক্ষালাভ করিবার অধিকার আছে। রাষ্ট্রের কর্তব্য নিজ ব্যয়ে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা। বর্তমান যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ ব্যয়ে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights):

রাষ্ট্রের কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সকল প্রকারের অধিকারকে নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। এই অধিকার নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার হইতে পারে:—

(ক) ভোটাধিকার (Right to Vote):

বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন-সভার সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকে। নাগরিকগণের এই সদস্যগণকে নির্বাচিত করিবার অধিকার আছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অধিকারকে নাগরিকের ন্যূনতম অধিকার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। গণতন্ত্রে ভোটদানের অধিকার হইতে যাহারা বঞ্চিত, তাহাদের দাবী-দাওয়া অবহেলিত হয়। ভোটাধিকারই বর্তমান যুগে শাসন-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষে নাগরিকগণের হাতের একমাত্র হাতিয়ার। যাহারা শাসনকার্য

চালনা করে, তাহারা যদি জানে যে, পুনরায় নির্বাচনের জন্য নাগরিকদের নিকট আবার উপস্থিত হইতে হইবে, তখন তাহারা নাগরিকদের স্বার্থ বজায় রাখিতে যত্নবান হয়।

(খ) সর্বজনীন ভোটাধিকার (Universal Suffrage) :

সকলের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভোটাধিকার সর্বজনীন হইতে হইবে। কেহ কেহ মনে করে যে, যে ব্যক্তির কিছু পরিমাণ শিক্ষা আছে বা যাহার নির্দিষ্ট-পরিমাণ সম্পত্তি আছে, কেবল সেই ব্যক্তিরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। যুক্তি হিসাবে বলা হয়, যাহার শিক্ষা নাই সে শাসনকার্যের ভাল-মন্দ বুঝিতে পারে না। যাহার অর্থ নাই সে অপরের অর্থের মর্যাদা বুঝে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত, শিক্ষিত না হইলেও লোক বুদ্ধিমান হইতে পারে। কাজেই শিক্ষার অভাবকে ভোটদানের অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিবার হেতু মনে করা যায় না। বিশেষতঃ রাষ্ট্রের কর্তব্য নাগরিকগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা। বিত্তবিহীনতার জন্য কাহাকেও ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে শাসন-ক্ষমতা কেবল ধনীরাই নিয়ন্ত্রণ করিবে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলেরই নির্বাচনের অধিকার থাকা উচিত। নাবালক, দেউলিয়া, উন্মাদ কিংবা কোন গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি ব্যতীত সকল নাগরিকেরই এই অধিকার ভোগ করিবার ব্যবস্থা সকল গণতন্ত্রেই আছে।

(গ) সরকারী কার্যে নিয়োগের অধিকার (Right to Employment) :

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকিলে প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার আছে। অযোগ্যতা ব্যতীত এই প্রকার নিয়োগে কোন নাগরিকের পক্ষেই কোন আইনগত বাধা থাকিতে পারে না।

(ঘ) সরকারের নিকট আবেদন-পত্র দাখিলের অধিকার (Right to Petition) :

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নিজ নিজ অভাব-অভিযোগ জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিবার অধিকার নাগরিকমাত্রেরই আছে।

এই সকল অধিকারের অধিকাংশকেই বর্তমান সভ্য জগতে নাগরিকের মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করা হয়। রাষ্ট্রবিশেষ এই অধিকারগুলিকে নিজ শাসন-সংবিধানে সুনির্দিষ্টরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের

এবং ভারতীয় ইউনিয়নের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি সুনির্দিষ্টরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলির উল্লেখ নাই। সেখানকার প্রচলিত আইন হইতেই মৌলিক অধিকারগুলি উদ্ভূত। *সেইজন্য পৃথকভাবে উল্লেখ না থাকিলেও, গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিকগণও* মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া থাকে। অবশ্য এই অধিকারগুলি সকল রাষ্ট্রে সমানভাবে স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হয় না। তবে একথা বলা বাহুল্য যে, যে রাষ্ট্র যে পরিমাণে এই অধিকারগুলি স্বীকার করে এবং সংরক্ষণ করে, সে রাষ্ট্র সেই পরিমাণে উন্নত।

(ঙ) অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights) :

বর্তমান যুগে আর একপ্রকারের অধিকার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহাকে বলা হয় অর্থনৈতিক অধিকার। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কর্মে নিয়োগের অধিকার, শ্রমের জন্য যথাযোগ্য মজুরি পাইবার অধিকার, কর্মবিহীনতার হাত হইতে মুক্তি পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে অর্থনৈতিক অধিকার বলা হয়। সকল কল্যাণ রাষ্ট্রই আজকাল নাগরিকদের এই সকল অধিকার মানিয়া লইতেছে।

অধিকার এবং কর্তব্য (Rights and Duties) :

অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানে অধিকার আছে সেখানে কর্তব্যও আছে। কর্তব্যসাধন ব্যতীত অধিকার ভোগ করা যায় না। যখন কোন নাগরিকের অধিকার নির্দিষ্ট হয়, তখন অপরাপর নাগরিকের, রাষ্ট্রের এবং ঐ নাগরিকেরও কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া যায়। একজন নাগরিকের যদি কোন অধিকার থাকে, তবে অন্য নাগরিকের কর্তব্য হইবে তাহার কার্য দ্বারা ঐ অধিকার ভোগে বাধা সৃষ্টি না করা। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে সর্বপ্রযত্নে ঐ নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করা। এই স্থলে দেখা গেল, একজন নাগরিকের অধিকার অপর নাগরিক এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্দেশ করিতেছে। আবার প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার তাহার নিজের দুইটি কর্তব্য সূচিত করে। প্রথম কর্তব্য অপর নাগরিকের প্রতি, দ্বিতীয় কর্তব্য রাষ্ট্রের প্রতি বা সমাজের প্রতি। প্রত্যেক নাগরিককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধার সমান অংশীদার হিসাবে অন্য নাগরিকেরও অনুরূপ অধিকার আছে। তখন প্রথম নাগরিকের কর্তব্য হইবে তাহার কার্য দ্বারা অপর নাগরিকের

অনুরূপ অধিকার ভোগে বাধা সৃষ্টি না করা। আবার আত্মশক্তির বিকাশ-সাধন করিয়া নিজের ও সমাজের কল্যাণ-সাধন করিবার জন্যই রাষ্ট্র নাগরিকগণকে বিভিন্ন অধিকার প্রদান করে। কাজেই সমাজের প্রতি বা রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য হইবে নিজ শক্তির বিকাশ-সাধন করিয়া সমাজের এবং রাষ্ট্রের কল্যাণবিধানে যত্নবান হওয়া। সুতরাং দেখা যায়, কর্তব্য এবং অধিকার পরস্পর জড়িত আছে। একজন নাগরিকের নিজ সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার আছে। সেই নাগরিকের এই অধিকার ভোগ করা নির্ভর করে অপর নাগরিক এবং রাষ্ট্রের কর্তব্যপালনের উপর। এই ক্ষেত্রে অপর নাগরিকের কর্তব্য ঐ নাগরিকের সম্পত্তি ভোগে বাধা না দেওয়া এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য কেহ ঐ নাগরিকের সম্পত্তি ভোগে বাধা দিলে তাহার শাস্তি বিধান করা। সমাজ বা রাষ্ট্র নাগরিককে অবাধ সম্পত্তি ভোগের অধিকার দিয়া তাহাকে আত্মশক্তি-বিকাশের সুযোগ দেয়। তখন ঐ নাগরিকের কর্তব্য আত্মশক্তি বিকাশ করিয়া নিজের সমাজের এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করা।

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of a Citizen) :

প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজ পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন কর্তব্য আছে। সুনাগরিক হিসাবে তাহাকে এই সকল প্রকারের কর্তব্যই পালন করিতে হয়।

পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র জীবনের প্রাথমিক সংস্থা। পরিবারের পরিবেশে মানুষের জন্ম হয়। পরিবারে মানুষ লালিতপালিত হয়। পরিবারে মানুষ বাস করে। পরিবারের কল্যাণের সঙ্গে নিজের কল্যাণ জড়িত। সুষ্ঠু কল্যাণকর পারিবারিক জীবন যাপন করিতে হইলে, কর্তব্য পালন করিয়া ও অধিকার ভোগ করিয়া স্নেহ, ভালবাসা, সহানুভূতি, সহযোগিতার মাধ্যমে পরিবারের বন্ধন দৃঢ় করিতে হয়। পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তির বাস। সেখানে মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, ভাই-ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন একসঙ্গে বাস করে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অধিকার আছে। যেমন, পুত্রের অধিকার শিক্ষালাভের, পিতার অধিকার পুত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের, স্ত্রীর অধিকার ভরণপোষণের, তেমনই পুত্রের কর্তব্য পিতার নির্দেশ মান্য করা। পিতার কর্তব্য পুত্রকে শিক্ষাদান করা, স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর কার্যে সহায়তা করা। এইরূপ অধিকার-ভোগ এবং কর্তব্যপালনের উপর পরিবারের বন্ধন নির্ভর করে।

কেবল পরিবারের মধ্যে মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যেক মানুষকেই নিজ পরিবারের বাহিরে অপর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে হয়। তাহাদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিয়া সমাজ-জীবন গড়িয়া তুলিতে হয়। অপরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করিতে হয়, কর্মের আদান-প্রদান করিতে হয়, অর্থের আদান-প্রদান করিতে হয়। ব্যক্তির জীবন সমাজের জীবনের সঙ্গে জড়িত ; কাজেই ব্যক্তির বা পরিবারের মঙ্গল এখন নির্ভর করে সমাজের মঙ্গলের উপর। সেইজন্য মানুষ যদি নিজ জীবন সুন্দর করিতে চাহে, মানুষকে সমাজের জীবন সুষ্ঠু করিবার চেষ্টা করিতে হয়। অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া, অপরের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিলেই সমাজ-জীবন সুন্দর হইবে। সমাজের যাহাতে কল্যাণ হয়, সকলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেই চেষ্টা নাগরিককে করিতে হয়। এইগুলি নাগরিকের সমাজের প্রতি কর্তব্য।

নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতিও কতগুলি কর্তব্য আছে। নাগরিককে সেই কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া রাষ্ট্র-জীবন সুষ্ঠু করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য মোটামুটি এইরূপ নির্দিষ্ট করা যায় :—

আনুগত্য (Allegiance) :

রাষ্ট্রের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য স্বীকার—রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব মানিয়া লওয়া নাগরিকমাত্রেরই কর্তব্য। কোন বহিঃশত্রু যদি রাষ্ট্র আক্রমণ করে কিংবা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যদি কোন বিপ্লব দেখা দেয়, তবে প্রাণপণে রাষ্ট্র রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করা এবং অপরাধীর দণ্ড-বিধানে সাহায্য করাও প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। এই প্রকারের কার্যে তাহার আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আইন মান্য করা :

সকল নাগরিকের হিতার্থে রাষ্ট্রের আইন প্রণীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য বিনা দ্বিধায় ঐ আইন মান্য করিয়া চলা। নাগরিকগণ আইন মান্য না করিলে, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। যদি কোন আইন বা নির্দেশ সত্যই জনহিতের পরিপন্থী বলিয়া কোন নাগরিক মনে করে, তবে সেই নাগরিক ঐ আইন রদ করাইবার জন্য কিংবা উহার পরিবর্তন সাধন করাইবার জন্য ন্যায় এবং আইনসঙ্গত পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। ইহাতে তাহার কর্তব্যচ্যুতি হয় না।

নিয়মিত কর প্রদান :

রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ নাগরিক প্রদত্ত কর হইতে সংগৃহীত হয়। রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ নাগরিকগণের উপর বিভিন্ন কর ধার্য করে। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য নিয়মিতভাবে যথানির্দিষ্ট কর প্রদান করা। নচেৎ রাষ্ট্রের কার্য পরিচালন অসম্ভব হইয়া উঠে।

ভোটাধিকারের ব্যবহার :

নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা বা ভোট দেওয়া একদিকে যেমন একটি অধিকার, অপরদিকে তেমনই ইহা একটি কর্তব্য। রাজনৈতিক সমস্যাগুলির যথাসম্ভব বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া, ব্যক্তিগত লাভালাভের কথা ভুলিয়া, রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা মনে রাখিয়া প্রত্যেক নাগরিকেরই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা কর্তব্য। ঔদাসীন্য সর্বপ্রকারে বর্জন করিয়া, লোভের বশীভূত না হইয়া বা অন্যায় ভয়ে ভীত না হইয়া সততার সহিত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা নাগরিকমাত্রেরই কর্তব্য। যথাযথভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করিলে গণতন্ত্র নিরর্থক হইয়া যায়।

সরকারী কার্য সম্পাদন :

যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার আছে। সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইয়া সৎভাবে নিজ কার্য সম্পাদন করা নাগরিকের কর্তব্য। শহরের বা গ্রামের অসুবিধা মোচনে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করাও নাগরিকের কর্তব্য।

ইহা ছাড়া নাগরিকের আরও অনেক কর্তব্য আছে। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য তাহার সন্তানগণকে শিক্ষা দান করা। রাষ্ট্রের হিতজনক সকল কাজে অংশ গ্রহণ করাও নাগরিকের কর্তব্য। নাগরিককে নিজ অধিকার সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট [illegible] হইতে হইবে। রাষ্ট্র যেমন নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণে সর্বদা যত্নবান হইবে, নাগরিকও তেমনই সকল সময় নিজ কর্তব্য-পালনের চেষ্টা করিবে। উভয়ের উপরই রাষ্ট্রের মঙ্গল নির্ভর করে।

প্রশ্ন

১। নাগরিকেদের কি কি অধিকার আছে? (পৃঃ ৬৭-৭২)
২। নাগরিকগণের বিভিন্ন প্রকার কর্তব্য নির্দেশ কর। (পৃঃ ৭৩-৭৫)
৩। অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর। (পৃঃ ৭২-৭৩)

দশম অধ্যায়

আইন এবং স্বাধীনতা

(Law and Liberty)

আইন (Law) :

অনেক লোক যখন একসঙ্গে বাস করে তখন তাহারা যদি সকলে নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কাজ করে, তবে তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি হয়। সবল ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তির উপর অত্যাচার করে। এই রূপ যাহাতে না ঘটিতে পারে, সেইজন্য একত্র বাসকারী লোকেরা কতগুলি নিয়মকানুন মানিয়া চলে। সেই সকল নিয়ম মানিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ করিয়া যায়। তাহাতে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

রাষ্ট্রে বহুলোক একসঙ্গে বাস করে। সেইজন্য রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিয়মকানুনের প্রয়োজন। পরস্পরের আচরণ-সংক্রান্ত যে সকল নিয়মকানুন রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ প্রবর্তন করে বা সমর্থন করে এবং যে সকল নিয়মকানুন রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ নাগরিকদিগকে পালন করিতে বাধ্য করে, সেই সকল নিয়ম কানুনকে আইন বলা হয়। আইন রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত এবং সমর্থিত কতগুলি নিয়মের সমষ্টি। এই সকল নিয়ম নাগরিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিবে তাহার নির্দেশ দেয়। এইগুলি কেহ যদি অমান্য করে, তবে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ তাহাকে শাস্তি দেয়। অধ্যাপক হল্যাণ্ড সেইজন্য বলেন—আইন মানুষের বাহিরের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বা প্রচলিত নিয়ম। এই নিয়মগুলি প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি।

প্রত্যেক সংঘেরই আইন আছে। তবে রাষ্ট্রের আইনের সঙ্গে সেই সকল আইনের পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রের আইনের পশ্চাতে সার্বভৌম শক্তি আছে। অন্য সংঘের আইনের পশ্চাতে সে ধরনের কোন শক্তি নাই। ফলে রাষ্ট্রের আইনভঙ্গকারীকে রাষ্ট্র কঠোরতম শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু অন্য কোন সংঘের সদস্য যদি সেই সংঘের নিয়ম ভঙ্গ করে, তবে সংঘ কর্তৃপক্ষ বড় জোর সেই সদস্যের সদস্য-পদ বাতিল করিতে পারে।

আইন এবং নীতিশাস্ত্র (Law and Morality) :

আইন এবং নীতিশাস্ত্র এই উভয়ই মানুষের আচরণ সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়। মানুষের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত, কিরূপ হওয়া উচিত নয় উভয়ের মধ্যেই

সে সম্বন্ধে বিধান থাকে। কাজেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাস্তবিকপক্ষে প্রাচীন কালে এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্যই ছিল না। নীতিশাস্ত্র অনুসারে যেই আচরণ সঙ্গত বলিয়া মনে করা হইত, আইনও তাহাকে সঙ্গত বলিয়া মনে করিত। আবার নীতিশাস্ত্রে যে আচরণ অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত আইনের বিচারে তাহা অসঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বলিয়া আইন তাহার অনুমোদন করিত। আবার প্রতারণা করা নীতিশাস্ত্র-বিরোধী বলিয়া আইনও তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করিত। মোটামুটি নীতিশাস্ত্রই বহুবিধ আইনের সূত্র বলিয়াই পরিগণিত হইত।

ধীরে ধীরে সমাজ-জীবনে নানা জটিলতা দেখা দিল। মানুষের আচরণ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিল। কোন কোন আচরণ নীতিসম্মত হইলেও সমাজ-জীবনের পক্ষে অসুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। আবার কোন কোন আচরণ নীতি বিগর্হিত বলিয়া পরিগণিত হইলেও আইন তাহাকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব মনে করিতে লাগিল। ফলে আইন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন হিন্দুদের মধ্যে একাধিক বিবাহ নীতিশাস্ত্রানুমোদিত হইলেও সমাজে জটিলতা সৃষ্টি করে বলিয়া ইহা আইন-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মদ্যপান নীতিশাস্ত্র-বিরোধী হইলেও আইন তাহার উপর পুরোপুরি হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। এখন আইনের বিধান এবং নীতিশাস্ত্রের নিয়মের যে তারতম্য রহিয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইল, আইনের পশ্চাতে রাষ্ট্রের দৃঢ় সমর্থন রহিয়াছে। কিন্তু নীতি-শাস্ত্রের বিধানের পশ্চাতে তেমন শক্তিশালী সমর্থন নাই। কেহ আইনের বিধান অমান্য করিলে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সরকার তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করে। কিন্তু কেহ যদি নীতিশাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন করে তবে সে সমাজের নিন্দা-বা তিরস্কার-ভাজন হয়। তাহার শাস্তির কোন ব্যবস্থা সমাজ করিতে পারে না। চুরি করিলে শাস্তি হয়, কিন্তু মিথ্যা কথা বলিলে অনেক ক্ষেত্রেই কেবল নিন্দিত বা তিরস্কৃত হওয়া ছাড়া আর দণ্ডের ব্যবস্থা নাই।

দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই, নীতিশাস্ত্রের বিধান মানুষের মনের এবং বাহিরের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই উভয় ক্ষেত্রেই এই বিধান সম্প্রসারিত। মানুষের কিরূপ চিন্তা করা সঙ্গত নীতিশাস্ত্রের বিধানে তাহারও নির্দেশ আছে। কিন্তু আইনের ক্ষেত্র এতদূর সম্প্রসারিত নয়। আইন কেবল মানুষের বহিরাচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চিন্তা যতক্ষণ বহিরাচরণে প্রকাশ না পায়,

ততক্ষণ তাহা আইনের আওতায় আসে না। একজন নীতি-বিরুদ্ধভাবে মনে মনে অপরকে হত্যা করার কথা চিন্তা করিয়া যতক্ষণ হত্যার চেষ্টা না করে, ততক্ষণ তাহার আচরণ আইনের আমলে আসিবে না। হত্যার চেষ্টা করিলেই বা হত্যা করিলেই আইন তাহার উপর নির্দিষ্ট বিধান প্রয়োগ করিবে।

তৃতীয়তঃ দেখা যায় উদ্দেশ্যের দিক হইতেও এই উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। আইনের উদ্দেশ্য হইল মানুষের আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করা। সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন বিবেচিত হইলে যে বিধান নীতিশাস্ত্রসম্মত নয়, সে বিধানকেও আইনে পরিণত করা হয়। আবার নীতিশাস্ত্রসম্মত বিধানও বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল মানুষকে ন্যায়পথে বা সৎপথে চালিত করা। ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনার দ্বারাই ইহার বিধান রচিত হয়। কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখা অন্যায় নহে। কাজেই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া তাহা নীতিশাস্ত্রের বিধানসম্মত। অথচ কয়েকজন শক্তিশালী ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে দুর্মূল্যতা দেখা দিবে, দুষ্প্রাপ্যতাও দেখা দিতে পারে। ইহা সমাজের কল্যাণের প্রতিকূল। কাজেই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ইহা বিচার করিয়া আইন ইহাকে অননুমোদিত কার্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে।

সর্বশেষ আমরা দেখিতে পাই যে আইনের বিধানগুলি সুনির্দিষ্ট। কোন আচরণ আইন-অনুমোদিত, কোন আচরণ আইন-সঙ্গত নহে তাহা জানা বা নির্ণয় করা খুব কঠিন ব্যাপার নহে। কিন্তু মানুষের কোন আচরণ নীতিশাস্ত্রসম্মত এবং কোন আচরণ নীতিশাস্ত্রসম্মত নয় সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া দুরূহ কাজ। ইহা ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। ফলে একজন যাহাকে নীতিসম্মত আচরণ বলিয়া মনে করে অপর ব্যক্তি তাহা নীতি-বিগর্হিত আচরণ বলিয়া মনে করিতে পারে।

পার্থক্য যতই হউক না কেন, আইন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সর্বদা বিদ্যমান থাকিবে। উভয়ে উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং করিবে। একের সমর্থনে অপরটি শক্তিশালী হয়। একের সমর্থন না থাকিলে অপরটির ভাগ্য অনির্দিষ্ট অবস্থায় থাকে।

আইনের সূত্র (Sources of Law) :

আজকাল সকল রাষ্ট্রেই আইন-প্রণয়নকারী একটি সংস্থা আছে। এই সংস্থার নাম আইন-সভা বা পার্লামেন্ট। প্রয়োজনমত এই আইন-সভা নূতন

আইন প্রণয়ন করে বা পুরাতন আইনের পরিবর্তন সাধন করে। যে-কোন রাষ্ট্রে আমরা যত আইন দেখি, তাহার সবগুলিই কিন্তু আইন-সভার দ্বারা প্রণীত আইন নহে। আইনের জন্ম আইন-সভাতে হয়, অন্য উপায়েও হয়।

প্রথা (Custom) :

কখনও দেখা যায়, অনেকদিন ধরিয়া মানুষ কতকগুলি রীতি-নীতি মানিয়া চলিয়া আসিতেছে। রাষ্ট্র সেইগুলি সমর্থন করিয়া আসিতেছে। ফলে সেই রীতি-নীতিও আইনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। হিন্দুদের সম্পত্তি বণ্টন প্রভৃতি আইনের জন্মও অনেকক্ষেত্রে এইভাবেই হইয়াছে।

ধর্ম (Religion) :

মানুষ নিজেদের আচরণে অনেক সময় ধর্মের অনুশাসন মানিয়া চলে। সেই সকল অনুশাসন যখন রাষ্ট্র-কর্তৃক সমর্থিত হয়, তখন সেইগুলি আইন বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই যাহা ধর্মসঙ্গত তাহা আইন, যাহা ধর্মসঙ্গত নহে তাহা বে-আইনী। আমাদের বিবাহ প্রথায় ধর্মীয় আইনের প্রভাব বিদ্যমান।

বিচারকের সিদ্ধান্ত (Judicial Decisions) :

অনেক সময় কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিচার করিতে গিয়া বিশিষ্ট বিচারকগণ সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই সকল সিদ্ধান্ত শেষে আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

আইন-জ্ঞদের আলোচনা (Scientific Commentaries) :

কখনও কখনও বিশিষ্ট আইন-জ্ঞ ব্যক্তিরা আইন সম্বন্ধে গবেষণা এবং আলোচনা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেইগুলি শেষে আইনের সম্মান পায়।

ন্যায়নীতি (Equity) :

কখনও কখনও ন্যায়নীতি হইতেই আইনের উদ্ভব হয়। কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন আইন নাই। সে বিষয়ে বিচার করিতে গেলে বিচারকগণ ন্যায়নীতি অনুসারে বিচার করেন। এইভাবে ন্যায়নীতি আইনের জন্মদাতা হয়।

পূর্বের এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই, সকল আইন আইন-সভা প্রণয়ন করে না। কতক আইন রাষ্ট্রের আইন-সভা কর্তৃক প্রণীত হয়।

অবশিষ্ট আইন অন্যভাবে প্রণীত হইলেও রাষ্ট্র সেগুলি সমর্থন করে এবং প্রয়োগ করে। সেগুলি আইনের সমর্থন দ্বারা সম্পন্ন।

আইন এবং স্বাধীনতা (Law & Liberty) :

সহজ কথায় স্বাধীনতার অর্থ হইল নিজের অধীনতা। সাধারণ অর্থে মানুষ তখনই নিজের অধীন যখন মানুষ নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে, যখন অপর কোন ব্যক্তি তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে না। এই অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বাহিরের বাধাবন্ধনহীনতাকেই বুঝায়।

শব্দমাত্রই পরিবেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন শব্দ এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে শেষে উৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানব সমাজে স্বাধীনতা শব্দেব অর্থও প্রায় সেইরূপ। মাংষের সমাজে এখন আর স্বাধীনতাকে উৎপত্তিগত অর্থে প্রায়ই ব্যবহার করা হয় না। পরিবেশ অনুসারে অর্থের পরিবর্তন হইয়াছে।

মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজে বাস কবিয়া মানুষ যদি নিজ নিজ খেয়ালখুশিমত কাজ কবে, তবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাহা হইলে সবল ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তির যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইতে পাবে, তাহাকে হত্যা করিতে পারে। সবল ব্যক্তিকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। ফলে সবলের স্বাধীনতা দুর্বলের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে। স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয়। সেই স্বাধীনতা নিরর্থক স্বাধীনতা।

স্বাধীনতাকে অথপূর্ণ করিতে হইলে স্বাধীনতা এমন জিনিস হইবে, যাহা সকল ব্যক্তি সমানভাবে ভোগ করিবে। সবল এবং দুর্বলের মধ্যে স্বাধীনতার ব্যাপারে কোন পার্থক্য থাকিবে না। এইরূপ করিতে হইলে প্রত্যেকেব কাজের উপর কতগুলি বাধা-নিষেধ অরোপ করিতে হইবে। কেহ কাহারও সম্পত্তি হরণ করিতে পারিবে না, কেহ কাহারও প্রাণনাশ করিতে পারিবে না। এইরূপ বাধা না থাকিলে একজনের স্বাধীনতা অপরের বিপদের কারণ হইবে।

এইরূপ বাধা এমন শক্তি দ্বারা আরোপিত হইবে, যে শক্তিকে সকলে মান্য করে। সেই শক্তি রাষ্ট্র। রাষ্ট্র মানুষের কার্যের উপর কিছু কিছু বাধা আরোপ করে। কেহ যদি সেই বাধা মান্য না করে, তবে রাষ্ট্র তাহার দণ্ডের বিধান করে। মানুষের আচরণ সংক্রান্ত এই সকল বাধা-নিষেধ বা নির্দেশই আইন। আইন দ্বারা রাষ্ট্র নির্দেশ দেয় কেহ কাহারও সম্পত্তি হরণ

করিতে পারিবে না, কেহ কাহারও প্রাণনাশ করিতে পারিবে না। ফলে সকলেই নিরাপদে থাকিবে।

আইন মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করে। স্বভাবতঃই মানুষ মনে করিতে পারে আইনের সঙ্গে স্বাধীনতার বিরোধ আছে। যেখানে আইন আছে, সেখানে স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। একজনের স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব না করিলে সে অন্যের স্বাধীনতা হরণ করিবে। কাজেই সকলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলেরই স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব করিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার আছে। অপর ব্যক্তি যেন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, সেরূপ বাধা বা বিধান না থাকিলে কেহই নিজ সম্পত্তি নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে পারে না। রামের সম্পত্তি রক্ষার জন্য শ্যামের অপরের সম্পত্তি জোর করিয়া লইবার অধিকার খর্ব করা হয়। আবার শ্যামের সম্পত্তি রক্ষার জন্য রাম যেন অপরের সম্পত্তি জোর করিয়া দখল করিতে না পারে তাহা দেখিতে হয়। তাহাতে রামের এবং শ্যামের যদৃচ্ছ আচরণ করিবার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়। সকলের সম্পত্তি ভোগের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সকলেরই যথা ইচ্ছা অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অধিকার কিছুটা ক্ষুণ্ন করা হয়। এইরূপে প্রত্যেকের স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব করিয়া সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করা হয়। আইন কিছু স্বাধীনতা খর্ব করিয়া অবশিষ্ট স্বাধীনতা রক্ষা করে। কাজেই স্বাধীনতা এবং আইন পরস্পর-বিরোধী নহে। বাধা-নিষেধ বা আইন না থাকিলেই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। সেইজন্য বাধা-নিষেধ বা আইন স্বাধীনতার সহায়ক। স্বাধীনতা মানুষকে নিজের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ দেয়। দেশের আইন মানুষকে অপরের হাত হইতে রক্ষা করিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সাহায্য করে বলিয়াই মানুষের স্বাধীনতা বজায় থাকে। সেই হিসাবে আইন স্বাধীনতার রক্ষক।

বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতা (Forms of Liberty) :

যে স্বাধীনতা ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং ব্যক্তিই ভোগ করে, তাহাকে বলা হয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা (Personal Liberty) যেমন—মত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। ব্যক্তিই মত প্রকাশ করে। মত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা ব্যক্তির জন্যই প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিই ইহা ভোগ করে। ইহাকে বলা হয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতা জাতির জন্য প্রয়োজনীয় এবং জাতি যে স্বাধীনতা ভোগ করে, তাহাকে জাতীয় স্বাধীনতা বলা হয়। ভারত কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তিতে আবদ্ধ

হইবে, সে-কথা বাহিরের কোন দেশের বলিয়া দিবার অধিকার নাই। এ ব্যাপারে ভারতের স্বাধীনতা আছে। এই প্রকারের স্বাধীনতা জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty)।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার কয়েকটি শ্রেণী আছে। যথা—(ক) সামাজিক স্বাধীনতা, (খ) রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ও (গ) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

(ক) সামাজিক স্বাধীনতা (Social Liberty) :

সমাজে বাস করিতে গেলে যে স্বাধীনতা ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয়, সেই স্বাধীনতা ব্যক্তির সামাজিক স্বাধীনতা। মানুষ অপরের সঙ্গে সমাজে বাস করে। ব্যক্তির পক্ষে অপর ব্যক্তির দৈহিক আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকার অধিকার প্রয়োজনীয়। অপরের নিকট নিজ মত প্রকাশ করিবার অধিকার থাকা চাই। কোন ব্যক্তি কাহার সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে, তাহা নির্ধারণ করিবার অধিকার তাহার থাকা চাই। এই সকল অধিকার না থাকিলে অপরের সঙ্গে সে বাস করিতে পারে না। এইগুলি তাহার সামাজিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

(খ) রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) :

দেশের শাসনকার্য পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপারে যে স্বাধীনতা নাগরিক ভোগ করে, তাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলা হয়। গণতন্ত্রেই এই স্বাধীনতা মানুষ বেশী পরিমাণে ভোগ করে। সরাসরি ভাবে শাসনকার্য পরিচালন সকল নাগরিকের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই নাগরিকগণ শাসকগণকে নির্বাচিত করে বা নিজেরা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হয়। এইরূপ নির্বাচন করিবার বা নির্বাচিত হইবার স্বাধীনতা, সরকারের কাজের সমালোচনা করিবার স্বাধীনতা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার পর্যায়ভুক্ত।

(গ) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) :

মানুষের জীবনে অভাব-অনটনের কবল হইতে মুক্তি এবং কর্মবিহীনতার হাত হইতে মুক্তির খুব প্রয়োজন। তাহা ছাড়া সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য মানুষের অবসরেরও প্রয়োজন। যখন ব্যক্তি এই অভাব-অনটনের কবল হইতে মুক্ত থাকে, যখন তাহার বেকার বসিয়া থাকিবার ভয় থাকে না অথচ যখন সে প্রয়োজনীয় অবসর ভোগ করে, তখন ব্যক্তি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে বলিয়া বলা হয়। যে রাষ্ট্র নাগরিকগণকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দিতে সচেষ্ট থাকে, সেই রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবিকা

অর্জনের ব্যবস্থা করে। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যেন অবসরও ভোগ করিতে পারে, সে ব্যবস্থাও করে। সেই রাষ্ট্র দেখে নাগরিকগণ যেন অভাব-অনটনের হাত হইতে মুক্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই ব্যক্তির পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে অপর প্রকারের স্বাধীনতা এমন কি জীবনও তাহার পক্ষে নিরর্থক।

জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty) :

বিদেশীর শাসন-পাশ হইতে মুক্তিই জাতীয় স্বাধীনতা। ভারত ১৯৪৭ সালের পূর্বে জাতীয় স্বাধীনতা ভোগ করিত না। কারণ তখন ব্রিটিশ ভারত শাসন করিত। ১৯৪৭ সালে ভারত ব্রিটিশ-শাসন মুক্ত হইয়াছে। তখন ভারতে জাতীয় স্বাধীনতা আসিয়াছে। বিদেশীর অধীনতা হইতে মুক্তিকেই বলা হয় জাতীয় স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা (Provisions for the Protection of Liberty) :

সাধারণতঃ আইন স্বাধীনতা-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। কেহ যদি কোন ব্যক্তির আইন-অনুমোদিত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে, তবে আইন সেই স্বাধীনতা-ক্ষুণ্ণকারীর শাস্তির ব্যবস্থা করে। কিন্তু যাহারা আইন প্রণয়ন করে, তাহারাও স্বাধীনতা সংকোচিত করিতে পারে। এইরূপ সংকোচন যাহাতে সহজে সম্ভব না হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রূপে করা হয়। কোন কোন রাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রে লিখিতভাবে স্বীকৃত হয়। এইগুলির বিশেষ একটা মর্যাদা থাকে। এইভাবে লিপিবদ্ধ অধিকারের পরিবর্তন বা সংকোচন সহজসাধ্য নহে। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে লিখিত আকারে স্বীকৃত হইয়াছে।

আবার শাসন-ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের দ্বারাও নাগরিকদের স্বাধীনতা-রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আইন-প্রণয়ন-বিভাগ, শাসন-বিভাগ এবং বিচার-বিভাগ মোটামুটি একে অন্যের নিরপেক্ষভাবে কাজ করিলে নাগরিকদের স্বাধীনতা সহজে ক্ষুণ্ণ হয় না। বিশেষতঃ বিচার-বিভাগের যদি স্বাতন্ত্র্য থাকে, তবে স্বাধীনতা-সংরক্ষণের কিছুটা সুবিধা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অন্যায়ভাবে শাসন-বিভাগ যদি কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া তাহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করে, তখন বিচার-বিভাগ আইনসঙ্গত উপায়ে বিচার করিয়া তাহার মুক্তি

দিতে পারে। এই ভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে।

কখনও কখনও শাসন-ক্ষমতায় আসীন হইয়া শাসন-কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করে। ইহা রোধ করিবার জন্য গণ-ভোট (Plebiscite Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative) প্রভৃতির ব্যবস্থা কোথাও কোথাও আছে। গণ-ভোটে কোন বিশেষ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সকল নাগরিকের ভোটের ব্যবস্থা করা হয়। তাহাতে সকলের মতেরই মর্যাদা দেওয়া হয়। গণ-উদ্যোগে জনগণ বিশেষ প্রথায় নিজেরাই কোন নীতি প্রবর্তনের সূত্রপাত করিতে পারে। জনসাধারণের মত কার্যকর করিতে যখন আইন-সভার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কুণ্ঠা প্রকাশ করে, তখন এই গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা করা হয়।

কাহারও কাহারও মতে আইনের শাসন (Rule of Law) স্বাধীনতার সংরক্ষক। আইনের পক্ষে ধনী নির্ধন, একজন মন্ত্রী বা একজন সাধারণ লোক সকলেই সমান। এই নীতির অনুসারে দেশের সকল লোক সমানভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ নাগরিকগণের স্বাধীনতা-রক্ষার স্পৃহা। দার্শনিক পেরিক্লিসের মতে চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য (Eternal vigilance is the price of liberty)। ইংল্যাণ্ডে স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য নানা কৃত্রিম ব্যবস্থা নাই। দেশের প্রচলিত সাধারণ আইনই স্বাধীনতার সংরক্ষক। দেশের ঐ সকল সাধারণ আইন পালন করা হইলেই ব্যক্তির স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা নাই। সেখানকার লোকেদের স্বাধীনতার স্পৃহা প্রবল বলিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা সেখানে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ। ব্যক্তি-স্বাধীনতা-সংরক্ষণে সর্বদা সচেতন মনোভাবই স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায়।

প্রশ্ন

১। আইন এবং স্বাধীনতার সম্পর্ক কি? (পৃঃ ৮০-৮১)

২। কিরূপে স্বাধীনতার প্রকার ভেদ করা হয়? (পৃঃ ৮১-৮২)

৩। স্বাধীনতা সংরক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা বর্ণনা কর। (পৃঃ ৮৩ ৮৪)

একাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রকৃত্যক
(Public Services)

সাধারণ কথায় বলা হয়, রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি বা মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা নীতি নির্ধারণ করে। একদল স্থায়ী সরকারী কর্মচারীই এই নীতিগুলি কার্যকরী করে। সরকারী কার্য আকারে বিশাল, সংখ্যায় অনেক এবং প্রকৃতিতে জটিল। এই অবস্থায় একজন রাষ্ট্রপতি বা কয়েকজন মন্ত্রীর পক্ষে এই কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নহে। সংখ্যায় অনেক বেশী সহকারীর সাহায্য ব্যতীত কাজ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রিগণ সাধারণতঃ একদিকে যেমন দীর্ঘকালস্থায়ী নহে, অপরদিকে তাহারা শাসনকার্যের জটিলতার সঙ্গেও পরিচিত নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে স্থায়ী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একদল কর্মচারীর সাহায্য তাহাদের নিকট অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে এই কর্মচারীরাই শাসনের খুঁটিনাটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই সকল কর্মচারীকে সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রকৃত্যক বলা হয়। ইহারা প্রত্যেকে রাষ্ট্রভৃত্য নামে পরিচিত।

কর্মে স্থায়িত্ব রাষ্ট্রভৃত্যগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রী প্রভৃতি রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ স্বল্পকালের জন্য নির্বাচিত হন। কেহ কেহ পুনরায় নির্বাচিত হইয়া পুনরায় পদে আসীন হন। তথাপি তাঁহাদের কার্যকাল দীর্ঘ নহে। কিন্তু রাষ্ট্রভৃত্যগণের কার্যকাল দীর্ঘ ; নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত বা কার্যকাল পর্যন্ত ইহারা কর্মে বহাল থাকে। অবশ্য গুরুতর অন্যায় কার্যের জন্য ইহারা নিজ পদ হইতে অপসৃত হইতে পারে।

দল-নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রভৃত্যগণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দল ক্ষমতায় আসীন হইতে পারে। রাষ্ট্রভৃত্যগণ কোন দলের সঙ্গেই নিজেদের যুক্ত করিতে পারে না। তাহারা দল-নিরপেক্ষভাবে সরকার-নির্দিষ্ট নীতি কার্যকরী করিয়া যায়।

রাষ্ট্রভৃত্যগণের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সরকারী কার্যে খ্যাতি-অখ্যাতি কোনটাই তাহাদের প্রাপ্য নহে। কোন নীতি যখন কার্যকর হইল, তখন দেখা গেল তাহা সুফলপ্রদ হইল; যে কর্মচারীই এই নীতি কার্যকরী করুক না কেন, ইহার কৃতিত্ব রাষ্ট্রের প্রধান বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরই প্রাপ্য হইল। অনুরূপভাবে যখন

কোন নীতির ফলে সঙ্কট উপস্থিত হইল, তাহার জন্য অখ্যাতিও রাষ্ট্রের প্রধান বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরই প্রাপ্য হইল। যে-সকল কর্মচারী নীতি কার্যকরী করিল, অখ্যাতি তাহাদের স্পর্শ করিল না।

রাষ্ট্রকৃত্যকের কার্যাবলী :

রাষ্ট্রকৃত্যকের কার্যাবলী প্রধানতঃ তিন প্রকারের। ইহারা দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করে, শাসনকার্যের নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাইয়া শাসনকর্তাকে পরামর্শ দেয়।

শাসন-কর্তৃপক্ষ নীতি নির্ধারণ করে। সরকারী কর্মচারীরা নীতি কার্যকরী করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, খাদ্য কর্তৃপক্ষ নীতি প্রবর্তন করিল যে, এক জেলা হইতে অন্য জেলায় চাউল চালান দেওয়া চলিবে না। এইবার একদল সরকারী কর্মচারীর কাজ হইল, যেন এক জেলা হইতে অপর জেলায় চাউল চালান দেওয়া না হয়, তাহা দেখা। যদি কেহ চাউল চালান দেয় বা দিবার চেষ্টা করে, তবে ঐ সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য হইল যাহারা চালান দিয়াছে বা দিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা। আবার বলা যায় সরকার নীতি নির্ধারণ করিল যে, বন্যার ফলে যাহারা গৃহহারা হইয়াছে সরকারী ব্যয়ে তাহাদের গৃহ-নির্মাণ হইবে। এইবার সরকারী কর্মচারিগণ এই নীতি কার্যকরী করিতে কাহারা গৃহহীন হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করিবে। তাহার পর এই সরকারী কর্মচারীরা গৃহ নির্মাণ করাইবার ব্যবস্থা করিবে। এইরূপে দেখা যায়, শাসন-কর্তৃপক্ষ নীতি নির্ধারণ করে। সরকারী কর্মচারীরা সেই নীতি কার্যকরী করে।

দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট কালের পরে বা তাহার মধ্যেও শাসন-কর্তৃপক্ষের পরিবর্তন হয়। কয়েক ব্যক্তি চার কি পাঁচ বৎসর কাল ক্ষমতায় আসীন থাকে। তাহার পর অন্য কয়েক ব্যক্তি ক্ষমতায় আসীন হয়। নির্দিষ্ট কালের পূর্বেও এইরূপ পরিবর্তন ঘটে। পাকিস্তানে শাসন-কর্তৃপক্ষের পরিবর্তন অতি দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘটিয়াছে। ফরাসী দেশেও এই পরিবর্তন অতি দ্রুত সংঘটিত হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি সর্বক্ষেত্রে শাসন-কার্যেরও পরিবর্তন হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। শাসনের কার্য যেন একটানা গতিতে চলিতে পারে, তাহা দেখিবার জন্য থাকে সরকারী কর্মচারিগণ। তাহারা দেখিবে যেন শাসন-কর্তৃপক্ষের পরিবর্তন সত্ত্বেও শাসনকার্যের ধারা অব্যাহত থাকে। আরব্ধ নীতি মধ্যপথে বর্জন করা হইলে

রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা নানা প্রকারের ক্ষতির কারণ হয়। কর্মকর্তাদের পরিবর্তন খুব দ্রুত হইলেও শাসনধারায় পরিবর্তন ধীরে ধীরে হইবে।

তৃতীয়তঃ, সরকারী কর্মচারিগণ শাসন-কর্তৃপক্ষকে শাসনকার্যে পরামর্শ দিবে। সাধারণতঃ শাসনের শীর্ষে অধিষ্ঠিত মন্ত্রিগণ নিজ নিজ বিভাগীয় কার্যের খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচিত নহেন। নীতি নির্ধারণ করিতে হইলে যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের অনেক সময়ই থাকে না। সেইজন্য তাঁহাদিগকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। সরকারী কর্মচারীরা দীর্ঘ দিন কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। ইহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান শাসন-কর্তৃপক্ষের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় হয়। এইজন্য সরকারী কর্মচারীরা শাসন-কর্তৃপক্ষকে শাসনের নীতি নির্ধারণে পরামর্শ প্রদান করিতে পারে। ফলে শাসকগণ নীতির গুণাগুণ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে।

রাষ্ট্রভৃত্য-নিয়োগের পদ্ধতি :

পূর্বের আলোচনা হইতে দেখা যায়, শাসনকার্যের সাফল্য নির্ভর করে রাষ্ট্রভৃত্যগণের দক্ষতার উপর। তাহারা যদি নিপুণ হয়, তবে শাসনকার্য সফলতার সহিত পরিচালিত হয়। আবার তাহারা যদি অনিপুণ হয়, তবে সরকারের কার্যে সাফল্য লাভ দুরূহ হয়। সেইজন্য সরকারী কর্মচারী নিয়োগে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন হয়। সরকারী কর্মচারীদের কুশলতা, সততা প্রভৃতি গুণ একান্ত আবশ্যক। কাজেই নিয়োগের সময় দেখিতে হইবে, নিয়োগ-প্রার্থীর এই সকল প্রয়োজনীয় গুণ আছে কিনা। গণতন্ত্রে দলীয় শাসন প্রবর্তিত হয়। কখনও কখনও দলকে তুষ্ট রাখিবার জন্য শাসন-কর্তৃপক্ষ দলের লোককে সরকারী কার্যে নিযুক্ত করিতে প্রলুব্ধ হয়। এই প্রলোভন দমন করিতে না পারিলে শাসনকার্যে সঙ্কট দেখা দেয়। সেইজন্য কেবল গুণকে ভিত্তি করিয়াই সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করা উচিত।

আজকাল প্রায় সকল দেশেই সরকারী কর্মে লোক নিয়োগের জন্য নিরপেক্ষ কমিশনের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়োগ কমিশন এবং রাজ্য সরকারের কর্মচারী নিয়োগের জন্য রাজ্য নিয়োগ কমিশন আছে। এই কমিশনের কার্যে শাসন-কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করে না। ইহারা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে যোগ্যতা নির্ধারণ করিয়া কর্মপ্রার্থিগণের মধ্য হইতে কর্মচারী বাছাই করে। ইহাদের নিয়োগ করিবার ক্ষমতা নাই। নিয়োগের ক্ষমতা থাকে শাসন-কর্তৃপক্ষের উপর।

কমিশন শাসন-কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়োগের সুপারিশ করে। শাসন-কর্তৃপক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কর্মচারী নিয়োগ করে। ইচ্ছা করিলে কমিশনের সুপারিশ শাসন-কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে জনমত বিক্ষুব্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে। কাজেই সাধারণতঃ নিয়োগ কমিশনের সুপারিশ অনুসারেই কর্মচারী নিয়োগ করা হয়।

প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রকৃত্যক কাহাকে বলে? রাষ্ট্রকৃত্যকের কাজ কি? (পৃঃ ৮৫-৮৬)

২। সরকারী কর্মচারী নিয়োগ আজকাল কিভাবে হয়? (পৃঃ ৮৭-৮৮)

দ্বাদশ অধ্যায়

জনমত এবং রাজনৈতিক দল
(Public Opinion & Parties)

জনমত (Public Opinion) :

কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক ব্যাপারে জনসাধারণের অধিকাংশ যে মত পোষণ করে, যে মত জনসাধারণের মধ্যে খুব প্রভাবশালী, সেই মতকে বলা হয় জনমত। জনগণের অধিকাংশ বলিতে সকল সময়ই যে সংখ্যাগরিষ্ঠকে বুঝাইবে তেমন নহে। জনমত-নির্ধারণে সংখ্যা অপেক্ষা গভীরতার গুরুত্ব বেশী। কখনও কখনও সংখ্যালঘিষ্ঠের মতও জনমত হইতে পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যদি দলনির্বিশেষে সকলের কল্যাণের জন্য দৃঢ় আস্থার সহিত কোন মত পোষণ করে, তবে তাহাও জনমত। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের মত তখনই জনমত যখন তাহারা কেবল নিজ স্বার্থে তাহা পোষণ করে না এবং যখন সংখ্যালঘিষ্ঠরাও সেই মত ভয়ে না মানিয়া স্বেচ্ছায় মানিয়া লয়। যাহারা এই মত পোষণ করে, তাহাদের সকলের মধ্যে এই মতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঐক্য নাও থাকিতে পারে। সকলের মতের মধ্যে মূলতঃ মিল থাকিলেই সেই মত জনমত।

কখনও কখনও দেখা যায় কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ বা প্রকাশ করিতেছে। ধীরে ধীরে পরিশেষে নানা আলাপ-আলোচনা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে অনেক ব্যক্তিই এক মত পোষণ করিতে আরম্ভ করে। অন্যেরাও ইহা মানিয়া লয়। প্রারম্ভিক বৈষম্য সত্ত্বেও পরবর্তী ঐক্যবশতঃ এই মতই জনমত বলিয়া পরিগণিত হয়।

কোন মত জনমত কিনা তাহা কেবল সেই মতাবলম্বীদের সংখ্যা দিয়া নির্ণয় করা চলে না। জনমতের জন্য সকলের মতের প্রয়োজন হয় না। আবার কোনও সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতও জনমত না হইতে পারে। যে মত জনগণের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী, যে মত জনকল্যাণের আদর্শে সৃষ্ট এবং যে মত গভীর-আস্থার সহিত পোষণ করা হয়, সেই মত জনমত। যত অধিকতর লোক এই মত পোষণ করে, ইহা তত শক্তিশালী।

গণতন্ত্রে জনমত (Democracy and Public Opinion) :

প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনে জনগণের এখন আর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের পক্ষে দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করে,নূতন নীতি গ্রহণ করে, নূতন আইন রচনা করে। একবার নির্বাচিত হইয়া গেলে দ্বিতীয় বারের নির্বাচন পর্যন্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিয়াই শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রত্যেক ব্যাপারে তাহাদের পক্ষে নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে তাহাদের ইচ্ছা বা দাবী জানা সম্ভব হয় না। অথচ জনগণের ইচ্ছা বা দাবী কার্যকর করা তাহাদের কর্তব্য। জনমত প্রতিনিধিগণকে এই কার্যে সাহায্য করে। জনমত প্রতিনিধি এবং নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে যোগসূত্র। সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের মত প্রচারিত হয়। প্রতিনিধিগণ সেই সকল সূত্র হইতে জনমত অবগত হইয়া সেই অনুসারে নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করে। জনমতকে কার্যকর করিয়া প্রতিনিধিগণ প্রকৃত গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করে। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান গণতন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে জনগণ-পরিচালিত শাসনতন্ত্র নহে, বরং জনমত-পরিচালিত শাসনতন্ত্র। জনমত শাসকগণকে পরিচালিত করে, নিয়ন্ত্রণ করে। জনমতের চাপে শাসকগণ নূতন আইন প্রবর্তন করে, পুরাতন আইন বাতিল করে, নীতির পরিবর্তন করে।

জনমত গঠন এবং প্রকাশের উপায় (Organs of Public Opinion) :

বিভিন্ন উপায়ে জনমত গঠিত এবং প্রকাশিত হয়। এই উপায়গুলির মধ্যে সংবাদপত্র, বক্তৃতামঞ্চ, বেতার, চলচ্চিত্র, রাজনৈতিক দল, আইন-সভা এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য।

মুদ্রাযন্ত্র (Press) :

সংবাদপত্রে বিভিন্ন সংবাদ প্রচারিত হয় এবং সেই সকল সংবাদ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি সংবাদপত্র এবং নানা পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে তাহাদের মতামত প্রচার করে। এইভাবে সংবাদপত্র এবং পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে মত প্রচারিত হয়। আবার সংবাদপত্র এবং পুস্তক-পুস্তিকার আলোচনা এবং মন্তব্য পাঠ করিয়া পাঠকগণও তাহাদের মতামত গঠন করে। এইরূপে একদিকে যেমন জনমত প্রচারিত হয়, অপরদিকে জনমত গঠিতও হয়।

জনমত প্রচার এবং গঠনে গুরু দায়িত্ব পালন করিতে হইলে সংবাদ-পত্রগুলিকে সত্য এবং ন্যায় পথে চলিতে হইবে। বিশেষ কোন দলের প্রভাবে বা মতবাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলে সংবাদপত্র তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতে পারে না। এই দায়িত্ব পালনের জন্য সংবাদপত্রের যথেষ্ট

পরিমাণ স্বাধীনতা থাকাও প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা করার অধিকারও সংবাদপত্রের থাকা প্রয়োজন।

বক্তৃতামঞ্চ (Platform) :

বক্তৃতামঞ্চে বক্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করে। অনেক শ্রোতা সমবেত হয়। তাহাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা এবং লেখাপড়া-না-জানা অনেক লোক থাকে। সকলের নিকটই বক্তা নিজের মত প্রকাশ করে। মতের সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করে। ফলে মত প্রচারিত হয়। জনগণ আলোচনা শুনিয়া নিজেদের মত গঠন করে। এইরূপে মত প্রচারিত এবং গঠিত হয়।

বক্তৃতামঞ্চ হইতে একই সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের কাছে কেহ নিজ মত জ্ঞাপন করিতে পারে না। বেতারের সাহায্যে তাহা সম্ভব। যে-কোন বেতার-কেন্দ্র হইতে বক্তৃতা প্রদত্ত হইলে, তাহা পৃথিবীর সকল স্থানের লোকেরাই ইচ্ছা করিলে শুনিতে পারে। সেইজন্য বেতার মত প্রচারের বেশ একটা বিশিষ্ট উপায়। এইভাবে প্রচারিত মতের প্রভাবে শ্রোতারা নিজেদের মত গঠন করে।

ছায়াচিত্র (Cinema) :

ছায়াচিত্রের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ মত প্রচার করা সহজ হয়। অস্পৃশ্যতা মানুষের মধ্যে কি ব্যবধান সৃষ্টি করে তাহা যদি ছায়াচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়, তবে একসঙ্গে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্যও সম্পন্ন হয় এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জনমতও গঠিত হয়। এইরূপ যে-কোন ব্যাপারেই জনমত প্রচার এবং গঠনের পক্ষে ছায়াচিত্র অত্যন্ত উপযোগী।

রাজনৈতিক দল (Political Parties) :

রাজনৈতিক দলের সাহায্যেও জনমত প্রচারিত এবং গঠিত হয়। দেশে যদি দুই বা ততোধিক দল থাকে, প্রত্যেক দলই তাহাদের সভ্য-সংখ্যা বাড়াইয়া দলকে শক্তিশালী করিবার জন্য নিজেদের মতবাদ নানা যুক্তিতর্ক-সহকারে প্রচার করে। জনগণ এই সকল যুক্তিতর্ক শুনিয়া ও কিছু পরিমাণে নিজ বিবেচনা প্রয়োগ করিয়া নিজের মত গঠন করে। অবশ্য অজ্ঞ জনগণের বিচার-বিবেচনা শক্তি কম থাকে। ফলে তাহারা যে-কোন দলের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইতে পারে। কিন্তু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ বিভিন্ন দলের

যুক্তিতর্ক শুনিয়া সহজে নিজ মত গঠন করে। কাজেই এ-কথা বলা যায় যে, রাজনৈতিক দল জনমত প্রচার এবং গঠন করে।

আইন-সভা (Legislature) :

আইন-সভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা এবং বিতর্ক চলে। বিভিন্ন দলের লোকেরা তাহাদের দলের মতামত সেখানে প্রকাশ করে। শ্রোতারা বা সংবাদপত্রের পাঠকরা সহজে এই সকল মতের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং এই সকল মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপে আইন-সভা জনমত প্রচার এবং গঠন করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions) :

বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও নানা রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হয়, বিতর্ক হয়। এই সকলের মাধ্যমে চিন্তাশীল শিক্ষক এবং ছাত্রগণ নিজেদের মত প্রচার করে এবং অন্যদের মত গঠন করে।

ধর্ম প্রতিষ্ঠান (Religious Institutions) :

বিভিন্ন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেও জনমত প্রচারিত এবং গঠিত হয়। মদ্যপান ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। ধর্মপ্রচারকগণ নিজেদের প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করিয়া মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতে পারে। ইহার ফলে জনগণের মনে মদ্যপানের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব জাগিতে পারে। জনগণ সমবেতভাবে মদ্যপানের উৎসাদন করিয়া আইন প্রণয়ন দাবী করিতে পারে।

রাষ্ট্রনৈতিক দল (Political Parties) :

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিভিন্ন সমস্যা আছে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে এই সকল সমস্যা সমাধান করিবার প্রস্তাব করে। ইহাতে মতভেদ দেখা দেয়। যাহারা মোটামুটি একমত তাহারা একটি দল গঠন করে। যেহেতু বিভিন্ন মত আছে, সেহেতু বিভিন্ন দলও গঠিত হয়।

কতগুলি বিষয় এবং নীতি সম্বন্ধে কয়েকজন লোক যদি মূলতঃ একই মত পোষণ করে এবং ঐ মতকে কার্যকর করিবার জন্য ঐ কয় ব্যক্তি যদি মিলিত হয়, তবে তাহাদিগকে সম্মিলিতভাবে দল বলা হয়। যখন ঐরূপ কোন দল তাহাদের মত বা নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে ব্রতী হয়, তখন তাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক দল বলা হয়। গণতন্ত্রে এই ধরনের যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, সেই দল সরকার গঠন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে।

রাষ্ট্রনৈতিক দল এবং কুচক্রী দলের (Faction) মধ্যে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রনৈতিক দল নিজেদের সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা সমগ্র জাতির কল্যাণসাধনের চেষ্টা করে। কুচক্রী দল বিচ্ছিন্নভাবে গঠিত দল। ইহার সভ্যরা নিজ দলীয় কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। জাতীয় স্বার্থের দিকে তাহাদের কোন লক্ষ্য থাকে না।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রথম কাজ জাতির কল্যাণসাধনকল্পে কতগুলি নীতি নির্ধারণ করা ; সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে এই নীতিগুলি কার্যকরী করা হইবে তাহাও স্থির করা। নীতি এবং কার্যপ্রণালী স্থির করা হইলে দলের দ্বিতীয় কাজ ঐ নির্ধারিত নীতি এবং উপায়ের অনুকূলে জনমত গঠন করা। এইজন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রচারকার্য চালাইতে হয়। জনসাধারণকে তাহাদের নীতির এবং উপায়ের উপযোগিতা বুঝাইতে হয়। প্রচারকার্য শেষ হইলে তাহাদের তৃতীয় কাজ রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা করায়ত্ত করা। সেই উদ্দেশ্যে তাহারা আইন-সভায় প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য দল হইতে সভ্য মনোনয়ন করে এবং জনসাধারণকে সেই মনোনীত সভ্যদের অনুকূলে ভোট দিতে অনুরোধ জানায়। দলের মনোনীত সভ্যগণ নির্বাচিত হইলে তাহারা নিজেদের নীতি এবং কর্মপন্থা কার্যকর করিবার সুযোগ পায় এবং কার্য করিতে চেষ্টা করে।

রাষ্ট্রে দুই বা ততোধিক দল থাকে। যে দল আইন-সভার অধিকসংখ্যক আসন অধিকার করিতে পারে, সেই দল সরকার গঠন করে। তাহারা সহজে তাহাদের নীতি এবং কর্মপন্থা কার্যকর করিতে পারে। যে দল বা সম্মিলিত-ভাবে যে সকল দল আইন-সভার মোট আসনের অন্ততঃ অর্ধেক আসন অধিকার করিতে না পারে, তাহারা বিচ্ছিন্নভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে বিরোধী দল গঠন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কার্যের সমালোচনা করা, তাহাদের দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করা এবং বাহিরে প্রচার করা এই বিরোধী দলের কাজ। এই বিরোধী দল শক্তিশালী এবং সতর্ক হইলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল স্বৈরাচারী হইতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সর্বদা সচেতন থাকিতে হয় এবং কর্তব্যসাধনে মনোনিবেশ করিতে হয়।

দলপ্রথার গুণাগুণ :

প্রতি রাষ্ট্রেই এখন বিপুল জনসংখ্যা আছে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে চিন্তা করে এবং বিভিন্ন মত পোষণ করে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি

বিভিন্ন মত পোষণ করিলে কোন মতই কার্যকর করা সম্ভব নহে। এক-মতাবলম্বী বিভিন্ন ব্যক্তি যদি মিলিত হয়, তবে তাহারা সুশৃঙ্খলভাবে তাহাদের মতকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটা নির্দিষ্ট রূপ দিতে পারে এবং সেই মতকে কার্যকর করিতে চেষ্টা করিতে পারে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়া প্রচারকার্য চালায়। ফলে জনগণ নানা বিষয় জানিতে পারে এবং শিক্ষা লাভ করে। এইভাবে দলগুলি জনমত-গঠনে সহায়তা করে।

আজকাল প্রায় সকল রাষ্ট্রেই গণতান্ত্রিক শাসন চলিতেছে। দল থাকার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন সহজ হইয়াছে। সরকারের পশ্চাতে সমর্থনকারী একটি দল থাকিলে সরকার দৃঢ়ভাবে শাসনকার্য পরিচালন করিতে পারে। তাহা না থাকিলে সরকারকে প্রায়ই নীতি পরিবর্তন করিতে হয়। এমন কি সরকারও প্রায়ই পরিবর্তিত হয়।

রাষ্ট্রে বিভিন্ন দল থাকিলে কোন দলই স্বৈরাচারী বা যথেচ্ছাচারী হইতে পারে না। প্রত্যেক দলকেই সকল সময় সতর্ক থাকিতে হয়। সর্বদা একদল অন্য দলের ত্রুটি বাহির করিতে চেষ্টা করে। কাজেই সকল দলই ঠিক পথে চলিতে চেষ্টা করে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিলে নাগরিকগণকে তাহারা দেশের শাসন-ব্যাপারে সচেতন করিয়া তোলে। কেহই উদাসীন থাকিতে পারে না। বিভিন্ন সমস্যার কথা সকলেই চিন্তা করিতে শিখে।

দলপ্রথার কতগুলি ত্রুটিও আছে। বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা স্থায়ী বিরোধের ভাব থাকে। এই বিরোধ কখনও কখনও বিরাট আকার ধারণ করে। তাহাতে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলাও ব্যাহত হয়।

বিভিন্ন দল নিজেদের সদস্য-সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টা করে। কখনও কখনও অন্য মতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারকার্য চালায়। ফলে শিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষা প্রচার হয়। তাহারা জনগণের অপকার সাধন করে।

বিভিন্ন দল প্রত্যেক সমস্যার বিচার করে নিজ দলীয় নীতির মাপকাঠিতে। সর্বদেশীয় স্বার্থের কথা এইভাবে অনেক সময় অবহেলিত হয়। জাতীয় স্বার্থ শেষে ক্ষুণ্ণ হয়।

দলপ্রথা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন করে। দলের বিভিন্ন ব্যক্তিকে দলের নির্দেশে চলিতে হয়। কোন বিষয়ে যদি দলের কোন সদস্য ভিন্ন মত পোষণ করে, তবে সেই মতের পোষকতা করিয়া সে ব্যক্তি কোন কাজ

করিতে পারে না। তাহাকে দলের মতই গ্রহণ করিতে হয়। এই সকল কারণে অনেক স্বাধীনচেতা চিন্তাশীল ব্যক্তি দলের বাহিরে থাকে।

দল কখনও কখনও উপদলে পরিণত হয়। তখন দলের সদস্যরা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যত্নবান হয়। অনেক সময় সত্যকে চাপা দিয়া স্বার্থান্বেষী দল মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালায় এবং গ্রহণ করে। তাহাতে সকলেরই পরিণামে অকল্যাণ হয়।

দলপ্রথার দোষ এবং গুণ উভয়ই আছে। শিক্ষা যত প্রসার লাভ করিবে, জনসাধারণ যত বেশী চিন্তা করিতে শিখিবে, দলপ্রথার ত্রুটি তত বিদূরিত হইবে। তখন দলপ্রথা পূর্ণ কল্যাণকর হইবে।

প্রশ্ন

১। জনমত কাহাকে বলে? ইহা কিভাবে গঠিত এবং প্রচারিত হয়? (পৃঃ ৮৯-৯০)

২। রাষ্ট্রনৈতিক দল এবং কুচক্রী দল কাহাকে বলে? দলপ্রথার গুণাগুণ নির্ণয় কর। (পৃঃ ৯২ ৯৫

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

ভারত সংবিধান

গোড়ার কথা (Introduction) ঃ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীনে ছিল। তখন পর্যন্ত দেশের শাসনকার্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত সংবিধান অনুসারে পরিচালিত হইত। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত-স্বাধীনতা আইন পাস করিয়া ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইল। ভারতবর্ষের জন্য সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করা হইল। একটি পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করা হইল। এক ভাগের নাম হইল ভারত, অপর ভাগের নাম হইল পাকিস্তান।

ভারতের জন্য শাসনতন্ত্র বা সংবিধান প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে গঠিত গণ-পরিষদের একটি উপসমিতি ভারতের জন্য সংবিধানের একটি খসড়া প্রণয়ন করিল। ১৯৩৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই উপসমিতি গণ-পরিষদের নিকট খসড়াটি উপস্থাপিত করিল। অনেকদিন আলোচনা চলিল। তারপর ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণ-পরিষদে সংবিধান গৃহীত হইল এবং গণ-পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ-কর্তৃক উহা স্বাক্ষরিত হইল। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে এই সংবিধান কার্যকর হইল।

সংবিধানের ভূমিকা (Preamble) ঃ

সাধারণতঃ লিখিত সংবিধানের একটি ভূমিকা বা প্রস্তাবনা থাকে। এই ভূমিকা মূল সংবিধানের অঙ্গ নহে। কিন্তু মূল সংবিধানের আসল কথার কিছুটা আভাস ইহাতে দেওয়া থাকে। আমাদের ভারতের সংবিধানেরও একটি ভূমিকা আছে। এই ভূমিকায় সংবিধানের মূল কথার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

সংবিধানের ভূমিকায় বা প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইল এবং ন্যায়-বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা এই রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইল।

'সার্বভৌম', 'গণতান্ত্রিক' এবং 'সাধারণতন্ত্র' এই তিনটি কথার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যখন কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বা বাহ্য সকল ব্যাপারেই নিজ কর্তৃত্ব বিদ্যমান, যখন বাহিরের কোন রাষ্ট্রশক্তি তাহার এই কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করিতে

পারে না, তখন সেই রাষ্ট্রকে সার্বভৌমকর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্র বলিয়া বলা হয়। নূতন সংবিধান অনুসারে ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইল। তাহাতে এই কথাই বুঝিতে হইবে যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ বা বাহিরের সকল ব্যাপারেই কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভারত রাষ্ট্রের হাতে। বাহির হইতে কোন শক্তি ইহার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

ভারত 'কমন্‌ওয়েল্‌থ'-এর সদস্য। ব্রিটিশরাজকে কমন্‌ওয়েল্‌থের প্রধান বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্য হিসাবে ব্রিটিশরাজকে কমন্‌ওয়েল্‌থের প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না কি? কমন্‌ওয়েল্‌থে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকাও সদস্য আছে। এই সকল রাষ্ট্রের কমন্‌ওয়েল্‌থে যে মর্যাদা, ভারতের মর্যাদা সেই মর্যাদা হইতে পৃথক। অন্যান্য সদস্যকে ব্রিটিশরাজের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। ভারতকে তাহা করিতে হয় না। ব্রিটিশরাজের ভারত-সংক্রান্ত ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক কোন ক্ষমতা নাই। ভারতের রাষ্ট্রপতি ব্রিটিশরাজের প্রতিনিধি নহেন। ব্রিটিশরাজ কমন্‌ওয়েল্‌থের প্রধান হিসাবে সভ্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের বা আলাপ-আলোচনার সূত্র হিসাবে কাজ করেন। ভারত কোন সদস্যের, এমন কি, প্রধানের আদেশ মান্য করিতে বাধ্য নহে। সদস্যগণের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ইচ্ছাধীন। যতদিন ইচ্ছা ভারত কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্য থাকিতে পারে। যখন ইচ্ছা তখন ভারত বাহিরেও চলিয়া আসিতে পারে। কাজেই কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্য-পদ ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করে নাই।

ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ভারত শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা ভারতের নাগরিকগণের হাতে। ভারতের সংবিধানে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করে। কাজেই জনসাধারণ ক্ষমতার উৎস।

নূতন সংবিধান অনুসারে ভারতে সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় কোন বংশানুক্রমিক রাজা বা শাসনকর্তা নাই। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রের প্রধান। কাজেই ভারত একটি সাধারণতন্ত্র।

ভারত সংবিধান সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে রচিত। জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাত্র এবং ন্যায়-বিচার যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিভিন্ন উপায়ে সেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিজ জীবন-রক্ষার অধিকার, নিজ সম্পত্তি ভোগের অধিকার প্রভৃতি যে সকল মৌলিক অধিকার ব্যক্তিমাত্রেরই থাকা প্রয়োজন,

সেইগুলি সংবিধানে লিখিত আকারে স্বীকার করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া শাসন-কার্য পরিচালনের জন্য কতগুলি নির্দেশও সংবিধানে সংযোজিত করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা সুবিচার, সাম্য, সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে।

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights):

মানুষ যাহা অন্তরে অনুভব করে, তাহা যদি প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার না থাকে, যে সম্পত্তি মানুষ অর্জন করে, সে সম্পত্তি যদি ভোগ করিবার অধিকার তাহার না থাকে, যে-কোন সময়ে যদি যে-কোন ব্যক্তি তাহার জীবন নাশ করিতে পারে, তবে মানুষের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়। নিজের নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবার অধিকার, সম্পত্তি-ভোগের অধিকার বা জীবন-রক্ষার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার বলা হয়। সকল রাষ্ট্রেরই কর্তব্য নাগরিকের এই সকল অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। ভারতের সংবিধানে ইহার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই অধিকারগুলির একটা বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে উচ্চতম বিচারালয়ের সাহায্যে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা আছে। কোন্ কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে জনগণের এই মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাইবে, তাহারও নীতি নির্দেশ করা হইয়াছে। আইন-সভা-প্রণীত কোন আইন যদি কোনও মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করে, তবে সেই আইন কার্যকর হইতে পারে না।

মৌলিক অধিকারগুলিকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে; যথা—সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্ম আচরণের অধিকার, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি-গত অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

সাম্যের অধিকার বলিতে বুঝিতে হইবে যে, আইনের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই। ধর্ম, জন্মস্থান, জাতি অথবা স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে রাষ্ট্র সকলের প্রতিই সমান আচরণ করে। সরকারী চাকুরি-লাভে সকলেরই সমান অধিকার। কোন শ্রেণী বা জাতিবিশেষ অস্পৃশ্য নহে। কেবলমাত্র সামরিক বা শিক্ষাগত কোন উপাধি ব্যতীত আর সকল প্রকারের উপাধির বিলোপ সাধন করা হইয়াছে।

স্বাধীনতার অধিকার বলিতে বুঝিতে হইবে যে, নাগরিকগণ তাহাদের নিজ মত প্রকাশ করিতে পারে, শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হইতে পারে, সমিতি গঠন করিতে পারে, ভারতের সর্বত্র বিচরণ করিতে পারে, ভারতের যে-কোন স্থানে বসবাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় নাগরিক ও তাহাদের নির্বাচনের অধিকার

সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ প্রথমতঃ নিজ নিজ রাজ্যের নাগরিক। তাহারা পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দ্বৈত নাগরিকতা প্রথা বিদ্যমান। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভারতের নাগরিকগণ মাত্র ভারতেরই নাগরিক, এখানে দ্বৈত নাগরিকত্ব নাই।

মূল সংবিধানে কিভাবে নাগরিকতা অর্জিত হইবে এবং কিরূপে নাগরিকতা লোপ পাইবে, তাহা বলা হয় নাই। এই সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন-সভার হাতে দেওয়া হইয়াছে। নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হইবার সময়ে কাহারা নাগরিক বলিয়া গণ্য হইল, সংবিধানে মোটামুটি তাহার উল্লেখ করা হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালের কেন্দ্রীয় আইন-সভা একটি আইন প্রণয়ন করিয়া নাগরিকত্ব সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী রচনা করে।

সংবিধান কার্যকর হইবার সময় নিম্ন-বর্ণিত ব্যক্তিগণকে ভারতের নাগরিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল :—

(ক) যাহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতেই বসবাস করিতেছিল, অথবা

(খ) যাহাদের মাতাপিতা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং যাহারা ভারতে বসবাস করিতেছিল, অথবা

(গ) সংবিধান কার্যকর হইবার অব্যবহিত কাল পূর্বে যাহারা অন্ততঃ পাঁচ বৎসর ভারতে বসবাস করিয়া ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছিল।

পূর্বে অবিভক্ত ভারতের অংশ ছিল এবং বর্তমান পাকিস্তানের অংশভুক্ত হইয়াছে, এইরূপ অঞ্চল হইতে ভারতে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে আগত ব্যক্তিগণকে নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসারে ভারতের নাগরিক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল :—

(ক) যাহারা নিজে, অথবা যাহাদের মাতাপিতা, অথবা পিতামহ-পিতামহী, অথবা মাতামহ-মাতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের পূর্বে ভারতে আসিয়া তদবধি ভারতে বসবাস করিতেছিল, অথবা

(খ) যাহারা নিজে, অথবা যাহাদের মাতাপিতা, অথবা পিতামহ-পিতামহী, অথবা মাতামহ-মাতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের

মধ্যে যাহারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই অথবা তাহার পরে ভারতে আসিয়া অন্যূন ছয় মাসকাল ভারতে বসবাস করিয়া আবেদনক্রমে ভারত সরকার-নিযুক্ত যোগ্য কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক যথাবিধি ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পঞ্জীভুক্ত হইয়াছে।

পূর্ব-বর্ণিত নিয়ম অনুসারে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যাহারা ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চের পর ভারত হইতে পাকিস্তানে বসবাস করিবার জন্য চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইল না। তবে ঐরূপ ব্যক্তি যদি ভারতে পুনরায় বসবাসের জন্য যোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। এই প্রকার ব্যক্তির নাগরিকত্বের ব্যাপারে ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই অথবা তৎপরে পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তিদের মতো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

ভারতের বাহিরে যে সকল ভারতীয় বাস করে, তাহারা নিজে, অথবা তাহাদের মাতাপিতা, অথবা পিতামহ-পিতামহী, অথবা মাতামহ-মাতামহী যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহারা যে-দেশে বাস করিতেছিল যদি সে-দেশে অবস্থিত ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক যথাবিধি আবেদনক্রমে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পঞ্জীভুক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহারা ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৫৫ সালে ভারত পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া নাগরিকতা অর্জন এবং বাতিল সংক্রান্ত নিয়মাবলী রচনা করিয়াছে। নিয়মগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

এই আইনের বিধান অনুসারে ১৯৫০ সালের ২৫শে জানুয়ারী বা উহার পরে যাহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা করিবে, তাহারা ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী বা তাহার পরে প্রবাসী ভারতীয় নাগরিকগণের ভারতের বাহিরে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা করিবে, তাহারাও ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। যাহারা নিজে, অথবা যাহাদের মাতাপিতা, অথবা পিতামহ-পিতামহী, কিংবা মাতামহ-মাতামহী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইরূপ ব্যক্তি অন্য দেশের নাগরিক থাকিতে পারে। এইরূপ ব্যক্তি অন্যূন ছয় মাস কাল ভারতে বাস করিয়া যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনক্রমে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। ভিন্ন দেশের কোন নাগরিক যদি ভারতীয় নাগরিকতা গ্রহণের আবেদন করে, তবে কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্গত মনে করিলে তাহাকেও নাগরিক বলিয়া গণ্য করিতে পারে।

কোন অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্তির দরুন কাহারা ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে, ভারত সরকার ঘোষণা দ্বারা তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে।

নির্বাচনের অধিকার (Franchise) ঃ

গণতন্ত্রে নাগরিকগণ আইন-সভার সদস্য নির্বাচন করে। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশে এই নির্বাচনের অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। শেষ পর্যন্ত শতকরা চৌদ্দজন লোক নির্বাচনের অধিকার লাভ করিয়াছিল। তখন শিক্ষা, সম্পত্তি প্রভৃতির উপর নির্বাচনের অধিকার নির্ভর করিত। নির্দিষ্ট পরিমাণে বা ততোধিক কর প্রদান করিলে, নির্দিষ্ট মানের বা তদুচ্চ মানের শিক্ষা থাকিলে, নির্দিষ্ট পরিমাণ বা ততোধিক সম্পত্তির অধিকারী হইলে কোন ব্যক্তি নির্বাচনের অধিকার লাভ করিত। কাজেই খুব কম-সংখ্যক লোকেরই নির্বাচনের অধিকার ছিল।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আইন-সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল এবং পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল ব্যবস্থা গণতন্ত্র-বিরোধী ছিল।

জাতি-ধর্ম, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কের নির্বাচনাধিকার বর্তমান সংবিধানের একটি বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সংবিধান অনুসারে অন্যূন একুশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই আইন-সভার সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ ব্যক্তি যদি নির্বাচন-এলাকায় সাধারণতঃ বসবাস না করে, কিংবা বিকৃতমস্তিষ্ক হয়, কিংবা কোন নির্বাচনের সময় অসাধু বা বেআইনী উপায় অবলম্বন করে, তবে সেই ব্যক্তি নির্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। অন্যথায় একুশ বৎসরের অধিক বয়সের ব্যক্তিমাত্রেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারী। বর্তমান ব্যবস্থার ফলে ভারতের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী নির্বাচনের অধিকার লাভ করিয়াছে। গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে।

সংবিধান কার্যকর হইবার দশ বৎসর কাল যাবৎ সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য আইন-সভার আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহার পর এই ব্যবস্থাও বাতিল হইবে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। তাহা দশ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কার্যকর করা হয় নাই। পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা বাতিল করা হইয়াছে।

প্রশ্ন

১। কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোককে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া স্বীকার করা হয়? (পৃঃ ১০৪-১০৬)

২। ভারতের নাগরিকগণের নির্বাচনের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা কর। (পৃঃ ১০৬)

তৃতীয় অধ্যায়

ভারত রাজ্যসংঘ

(Indian Union)

সংবিধানে ভারতকে একটি রাজ্যসংঘ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভারতের ঐক্যের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। যে রাজ্যগুলি লইয়া এই সংঘ গঠিত, সেই রাজ্যগুলি সংঘ হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। শাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কতগুলি রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। বাস্তবিক সমগ্র দেশ এক। ইহার অধিবাসিগণ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ।

ভারতকে রাজ্যসংঘ বলিয়া অভিহিত করা হইলেও, কার্যতঃ ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্যই ইহাতে বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার—এই দুই প্রকারের সরকার বিদ্যমান থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসন-ক্ষমতা সংবিধানে লিখিত-ভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার নিজ নিজ ক্ষেত্রে আত্মকর্তৃত্বশীল হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। সাধারণ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কার্যে হস্তক্ষেপ করে না। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনও বিষয়ে মতানৈক্য হইলে, তাহা মীমাংসা করিবার জন্য উচ্চতম আদালত থাকে। এই আদালত লিখিত সংবিধানের যে ব্যাখ্যা করে, সেই ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ভারত সংবিধান অনুসারে ভারতেও কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যের জন্য রাজ্য সরকার আছে। সংবিধানে এই উভয় সরকারের মধ্যে শাসন-ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনও বিষয় লইয়া মতানৈক্য দেখা দিলে, তাহার মীমাংসার জন্য উচ্চতম আদালত (Supreme Court) রহিয়াছে। এই উচ্চতম আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র।

ক্ষমতা-বিভাজন (Distribution of Powers) ঃ

সংবিধানে শাসন-সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। কতগুলি বিষয়ের সঙ্গে সমগ্র রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত। এই সকল বিষয়ে রাজ্য সরকার অপেক্ষা কেন্দ্রীয় সরকার অধিকতর নিপুণতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। এই সকল বিষয়কে কেন্দ্রীয় বিষয় বলিয়া নির্দিষ্ট করা

হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেশ-রক্ষা বিষয়টির কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে। ভারতের যে-কোন অঞ্চল বিদেশী শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে, তাহা সমগ্র ভারতের পক্ষেই বিপজ্জনক। শত্রুকে বিতাড়িত করিবার জন্য যে ব্যাপক ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই সম্ভব। কাজেই দেশ-রক্ষা একটি কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, যুদ্ধ এবং শান্তি, স্থল-সৈন্য, নৌ-বাহিনী, বিমানবাহিনী, ডাক, তার, রেল, বৈদেশিক বাণিজ্য, বেতার, টেলিফোন, মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ, ব্যাঙ্ক, বীমা, নাগরিকতা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় বিষয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

কতগুলি বিষয়ের সঙ্গে কোন রাজ্যবিশেষের স্বার্থ জড়িত। এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমস্যা বিভিন্ন-রূপ। সেই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যই নিপুণ। এই সকল বিষয় রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকার আইন প্রণয়ন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৎস্য-উৎপাদনের কথা ধরা যাইতে পারে। মৎস্য-উৎপাদন পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা। উত্তর প্রদেশে এই সমস্যা নাই। সেই রাজ্যে মৎস্য-উৎপাদনের সমস্যা থাকিলেও তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। পশ্চিম বঙ্গে মৎস্য-চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পশ্চিম বঙ্গের সরকারই নিপুণতমভাবে অবলম্বন করিতে পারে। কাজেই ইহা একটি রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়। এইরূপ কৃষি, সেচ, বন, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, সমবায় প্রভৃতি রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রধান দুই শ্রেণীর শাসন-বিষয় ছাড়াও কতগুলি বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে উভয় সরকারই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। পুনর্বাসন, দেওয়ানী কার্যবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে উভয় সরকারই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। এই বিষয়গুলি যুগ্ম বিষয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যদি কখনও এইরূপ কোন যুগ্ম বিষয়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তবে সেরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার-কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাই কার্যকরী হইবে।

কেন্দ্রীয় বিষয়, রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয় এবং যুগ্ম বিষয় ব্যতীত যে সকল বিষয় আছে, সেইগুলিকে অতিরিক্ত বিষয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই অতিরিক্ত বিষয়গুলির উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

বিশেষ প্রয়োজন বোধে কেন্দ্রীয় সরকার কোন রাজ্য সরকারের ক্ষমতা আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিতে পারে। কেন্দ্রীয় আইন-সভার উচ্চতর কক্ষের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় আইন-সভা কোন রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয় আইন প্রণয়ন করুক, তবে সেই রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন-সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যদি রাষ্ট্রপতি কখনও দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তবে ঐ ঘোষণা বলবৎ থাকার কালে কেন্দ্রীয় আইন-সভা যে-কোন রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে বা শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে। আবার কোন রাজ্যপালের বিবরণী পাঠ করিয়া যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে, সংবিধান অনুসারে ঐ রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নহে, তবে তিনি জরুরী ঘোষণা দ্বারা ঐ রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

উপরের এই ব্যবস্থাগুলি হইতে বুঝা যায় যে, সংবিধানের অন্যতম উদ্দেশ্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে এইরূপ শক্তিশালী করিবার ব্যবস্থা নাই। আরও দুইটি বিষয়েও ভারত যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। ভারতে "অতিরিক্ত বিষয়"গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইগুলি রাজ্য সরকারের হাতে আছে। ভারতের নাগরিকগণ যে-কোন রাজ্যের অধিবাসীই হউক না কেন, তাহারা ভারতীয় নাগরিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ একদিকে নিজ নিজ রাজ্যের নাগরিক, অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ ঃ

বর্তমানে নিম্নলিখিত ষোলটি রাজ্য এবং ছয়টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল লইয়া ভারত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত ঃ—

রাজ্য		কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল
১। অন্ধ্র	৯। পাঞ্জাব	১। দিল্লী
২। আসাম	১০। বিহার	২। মণিপুর
৩। উত্তর প্রদেশ	১১। মধ্যপ্রদেশ	৩। ত্রিপুরা
৪। উড়িষ্যা	১২। মহারাষ্ট্র	৪। হিমাচল প্রদেশ
৫। কেরালা	১৩। মহীশূর	৫। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
৬। গুজরাট	১৪। মাদ্রাজ	৬। লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভ দ্বীপপুঞ্জ
৭। জম্মু ও কাশ্মীর	১৫। রাজস্থান	
৮। পশ্চিম বঙ্গ	১৬। নাগাভূমি	

সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় আইন-সভা আইন প্রণয়ন করিয়া প্রয়োজন মনে করিলে নূতন রাজ্য গঠন করিতে, রাজ্যগুলির সীমানা বাড়াইতে বা কমাইতে বা অন্যভাবে পরিবর্তন করিতে পারে। এই প্রকারের আইনের খসড়া রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কেন্দ্রীয় আইন-সভায় উত্থাপিত হইতে পারে না। সুপারিশ করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইন-সভার অভিমত গ্রহণ করেন। অবশ্য অভিমত অনুসারে কার্য করার বাধ্য-বাধকতা নাই। সংবিধানের এই বিধান অনুসারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য বোম্বাইকে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট নামক দুইটি পৃথক রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে।

ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেই হিসাবে ভারত নূতন রাজ্যখণ্ড অর্জন করিতে পারে। এই অর্জিত রাজ্যখণ্ড সুবিধামত পৃথক রাজ্যে পরিণত করিতে পারে বা কোন রাজ্য বা অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতে পারে।

প্রশ্ন

১। ভারতকে কেন রাজ্যসংঘ বলা হইয়াছে? ইহা কি পুরাপুরি একটা রাজ্যসঙ্ঘ? (পৃঃ ১০৭-১০৮)

২। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে কিভাবে বিষয় বণ্টন করা হইয়াছে? (পৃঃ ১০৮)

৩। কিভাবে রাজ্য পুনর্গঠন করা যায়। সাম্প্রতিক একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও। (পৃঃ ১০৯-১১০)

———

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রপতি

(President)

রাষ্ট্রপতি (President):

কেন্দ্রীয় শাসনকার্য পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় সরকার। রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রি-পরিষদ্ লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। তিনি রাষ্ট্রের নায়ক।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Election of the President):

কেন্দ্রীয় আইন-সভার উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধান-সভার নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। জনগণ আইন-সভার সদস্যগণকে নির্বাচিত করে। আইন-সভার নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। কাজেই দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। জনগণ সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে না। আইন-সভার নির্বাচিত সদস্যগণ-কর্তৃক গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা তিনি নির্বাচিত হন। সমগ্র ভারতের উনিশ কোটি লোকের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সহজসাধ্য নহে বলিয়াই এইরূপ পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত রাষ্ট্র। এই প্রকার রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রয়োজনও বিশেষ নাই।

রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীর নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন :—

(১) তাঁহাকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে,

(২) তাঁহার বয়স অন্যূন ৩৫ বৎসর হইতে হইবে,

(৩) আইনতঃ লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা তাঁহার থাকিতেই হইবে,

(৪) কোন লাভজনক সরকারী পদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না,

(৫) যদি তিনি নির্বাচনের পূর্বে কোন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইন-সভার সদস্য থাকেন, তবে নির্বাচনের পর তাঁহাকে সদস্য-পদ ত্যাগ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। তবে ঐ সময়ের পূর্বে তিনি পদত্যাগ করিতে পারেন। তিনি সংবিধান অমান্য করিলে বিশেষ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় আইন-সভা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। তাঁহার কার্যকাল শেষ হইলে, তিনি পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন।

তাঁহাকে একটি সরকারী বাসগৃহ ও মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতির পদ যেমন গৌরবময়, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁহার কতগুলি সুযোগ-সুবিধা আছে। তাঁহার কার্যের জন্য কোনও আদালতে তাঁহার বিচার চলিবে না। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা বা আটক করিয়া রাখা চলিবে না। তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করিলে কেবল কেন্দ্রীয় আইন-সভার যে-কোন কক্ষ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে ইহার বিচার দাবী করিতে পারে। বিচারের ১৪ দিন পূর্বে এইরূপ দাবীর কথা তাঁহাকে জানাইতে হইবে এবং এই দাবী করিয়া যে প্রস্তাব রচিত হইবে, তাহাতে দাবী-ঘোষণাকারী পরিষদের অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ সদস্যের স্বাক্ষর থাকিবে। আইন-সভার অপর কক্ষ ঐ সকল অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া দেখিবে। এই কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে অভিযোগ সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে, রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করিতে হয়।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (Powers of the President) ঃ

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে ভারতীয় ইউনিয়নের সকল শাসন-ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার নামেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়; তাঁহার নামেই সকল সরকারী আদেশ প্রচারিত হয়। তিনি ভারতের স্থল, জল ও বিমান বাহিনীর প্রধানতম অধিনায়ক। রাষ্ট্রপতি আইনে দণ্ডিত ব্যক্তিকে দয়া করিয়া মার্জনা করিতে পারেন, তাহার দণ্ড হ্রাস করিতে বা দণ্ডদান স্থগিত রাখিতে পারেন। তিনি রাজ্যপালদিগকে, সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচারপতিদিগকে এবং ভারতের অ্যাটর্নি-জেনেলার, অডিটর-জেনেলার ও চীফ ইলেক্‌শন্ কমিশনার প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারীদিগকে নিয়োগ করেন।

রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবার ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকে। রাষ্ট্রপতি এই মন্ত্রিসভার প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তিনিই মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন কাজ ভাগ করিয়া দেন। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ও কার্য-বিবরণ প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানান। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে একটি মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারেন।

রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থার উপরও রাষ্ট্রপতি কর্তৃত্ব করিতে পারেন; রাজ্যগুলির রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাজ্যপালের কার্যকাল রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় শাসন-ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ের ভার

রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে রাজ্য সরকারের হাতে দিতে পারেন। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে, তিনি তাহার তদন্তের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কোন রাজ্যপালের বিবরণী পাঠ করিয়া প্রয়োজন বুঝিলে ঐ রাজ্যের শাসনভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

কেবল শাসন-বিষয়েই নহে, আইন প্রণয়নের বিষয়েও রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় আইন-সভা বলিতে রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্য-পরিষদ্—এই তিনটি অঙ্গকে বুঝায়। রাজ্য-পরিষদের বার জন সদস্য রাষ্ট্রপতিই মনোনীত করেন। লোকসভার জন্যও তিনি অনধিক দুই জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সভ্য মনোনীত করিতে পারেন। তিনিই কেন্দ্রীয় আইন-সভার উভয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন বা স্থগিত রাখেন। প্রয়োজনবোধে তিনি লোকসভা ভাঙিয়া দিতে পারেন। তিনি কেন্দ্রীয় আইন-সভার যে-কোনও পরিষদে বক্তৃতা দিতে বা বাণী পাঠাইতে পারেন। কেন্দ্রীয় আইন-সভার দুই পরিষদ্ কোন বিল সম্বন্ধে একমত হইতে না পারিলে, রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের একটি মিলিত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় আইন-সভায় কোন বিল গৃহীত হইলে তাহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোনও বিল আইনে পরিণত হইতে পারে না। অর্থ-সংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্য যে-কোনও বিল তিনি পুনরায় বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় আইন-সভায় ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। তবে কেন্দ্রীয় আইন-সভায় পুনরায় ঐ বিল গৃহীত হইলে, রাষ্ট্রপতিকে অনুমতি দিতে হয়। সরকারী ব্যয় বাবদ কোনও প্রস্তাব আইন-সভার অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ভিন্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতির নামে মন্ত্রীরা ভিন্ন অন্য কেহ কেন্দ্রীয় আইন-সভায় অর্থ বিল বা অর্থব্যয়ের প্রস্তাব তুলিতে পারেন না।

আইন-সভার অধিবেশন স্থগিত থাকার কালে প্রয়োজনবোধে দেশের স্বার্থে রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন বা অর্ডিনান্স জারি করিতে পারেন। আইন-সভার পরবর্তী অধিবেশনে এই জরুরী আইন বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়। আইন-সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি আইন-সভা এই জরুরী আইন অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ না করে, তবে অধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ পরে এই জরুরী আইন বাতিল হইয়া যায়।

জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কতগুলি বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন। দেশে বৈদেশিক আক্রমণ হইলে বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিলে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় আইন-সভা ও সরকার বিশেষ কতগুলি ক্ষমতার

অধিকারী হন। কোন রাজ্যপালের বিবরণী পাঠ করিয়া রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, সেই রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালন সম্ভব হইবে না, তবে তিনি ঘোষণার দ্বারা ঐ রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে লইতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় আইন-সভাকে উক্ত রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে অধিকার দিতে পারেন। ভারতের বা ভারতের কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব ও সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন, তবে তিনি ঘোষণার দ্বারা সে বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব নিজহস্তে লইতে বা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে দিতে পারেন।

আইনতঃ রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের নায়ক ও সর্বময় কর্তা হইলেও, কার্যতঃ তিনি প্রকৃত শাসক নহেন। তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে চলেন। সকল কার্যের জন্য মন্ত্রীরা লোকসভার নিকট দায়ী থাকেন। অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে, লোকসভা বা জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি নামেমাত্র শাসনের সর্বময় কর্তা। **তিনি শাসনের কর্তা নহেন, তিনি রাষ্ট্রের কর্তা। তিনি জাতিকে শাসন করেন না, তিনি জাতির প্রতিনিধি।** তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মত প্রকৃত শাসক নহেন। তাঁহার পদ ও অধিকার অনেকখানি ইংল্যাণ্ডের রাজার মত।

উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President):

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের একজন উপরাষ্ট্রপতি আছেন। তিনি কেন্দ্রীয় আইন-সভার উভয় কক্ষের সদস্যগণ-কর্তৃক যুক্ত বৈঠকে নির্বাচিত হন। উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন-প্রার্থীকে ভারতের নাগরিক হইতে হয় এবং তাঁহার বয়স অন্যূন ৩৫ বৎসর হওয়া চাই। রাজ্য-পরিষদের সভ্য হইবার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা তাঁহারও থাকা চাই। তিনি কোন লাভজনক সরকারী পদে নিযুক্ত থাকিলে চলিবে না। উপরাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইন-সভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না।

পদাধিকারবলে উপরাষ্ট্রপতি রাজ্য-পরিষদের সভাপতিত্ব করেন। রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে অনুপস্থিত থাকিলে উপরাষ্ট্রপতিই তাঁহার কাজ করিবেন। রাষ্ট্রপতির পদ কোন কারণে হঠাৎ শূন্য হইলে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। উপরাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাঁচ বৎসর। তিনি তাঁহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেও পদত্যাগ করিতে পারেন। রাজ্য-পরিষদ্ অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিলে এবং তাহা লোকসভার সমর্থন পাইলে, উপরাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হইবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ঃ

রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যে সাহায্য করিবার ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকে। মন্ত্রীদের সাহায্য ও পরামর্শ রাষ্ট্রপতিকে যে লইতেই হইবে এরূপ কোনও লিখিত নির্দেশ সংবিধানে নাই। তবে কার্যতঃ তাঁহাকে মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, **মন্ত্রিসভাই রাষ্ট্রপতির নামে দেশ শাসন করে।**

সাধারণতঃ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যিনি নেতা, তাঁহাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্যান্য মন্ত্রীরাও নিযুক্ত হন। মন্ত্রীদিগকে আইন-সভার সভ্য হইতে হয়। কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হইবার সময়ে আইন-সভার সভ্য না থাকিলে কার্যভার গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে ঐ মন্ত্রীকে আইন-সভার সদস্য হইতে হয়; সদস্য না হইতে পারিলে অতঃপর মন্ত্রিত্ব থাকে না।

মন্ত্রিগণের কার্যকাল রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি প্রয়োজন বোধ করিলে মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া দিতে এবং অন্য মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারেন। মন্ত্রিসভাকে সকল সময়ে যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিতে হয়। লোকসভার অধিকাংশ সভ্য যদি কোন মন্ত্রী বা সমগ্র মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করেন, তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, লোকসভাই মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই লোকসভার আস্থাভাজন ব্যক্তিগণকে লইয়াই রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বাধ্য হন।

মন্ত্রীরা উভয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন। তবে কোন মন্ত্রী যে পরিষদের সভ্য নহেন, সে পরিষদে তিনি ভোট দিতে পারেন না। আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধান মন্ত্রী হন এবং অন্যান্য মন্ত্রীরাও সেই দলের সভ্য হন। অধিকাংশ বিল তাঁহারাই উত্থাপন করেন। তাঁহাদের অনুমোদন ও সমর্থন ভিন্ন অন্য কোন বিল গৃহীত হইবার সম্ভাবনাও কম। অর্থ-সংক্রান্ত বিলগুলি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাইলে কেবল মন্ত্রীরাই উত্থাপন করিতে পারেন।

প্রধান মন্ত্রীই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকর্তা। মন্ত্রিসভার অধিবেশনগুলিতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এইসকল অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। শাসন ও আইন প্রণয়ন সম্পর্কে কোন বিষয় রাষ্ট্রপতি জানিতে চাহিলে, প্রধান মন্ত্রীই তাঁহাকে সে সকল বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করেন। অনেক সময় কোন একজন মন্ত্রী কোন বিষয়ে নিজের বিবেচনা অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রয়োজনবোধ করিলে রাষ্ট্রপতি ঐ বিষয় সম্পর্কে সমগ্র মন্ত্রিসভাকে আলোচনা করিয়া দেখিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর উপমন্ত্রীও নিযুক্ত হইয়াছেন। উপমন্ত্রীরা মন্ত্রিসভার সদস্য নহেন। আবার মন্ত্রিসভার অন্তর্গত কয়েক জন মন্ত্রীকে লইয়া একটি মন্ত্রি-পরিষদ্‌ বা 'কেবিনেট' গঠিত হয়। মন্ত্রি-পরিষদের সদস্য মন্ত্রী-দিগকে 'পরিষদ্‌ভুক্ত' বা 'কেবিনেটপদস্থ' মন্ত্রী বলা হয়। যে সকল মন্ত্রী মন্ত্রিসভার সভ্য, অথচ মন্ত্রি-পরিষদের সভ্য নহেন, তাঁহারা 'রাষ্ট্র-মন্ত্রী' নামে পরিচিত। ফলে মন্ত্রিমণ্ডলীতে তিন শ্রেণীর মন্ত্রী থাকেন—(১) পরিষদ্‌ভুক্ত মন্ত্রী (Cabinet Minister); (২) রাষ্ট্র-মন্ত্রী (Minister of State); (৩) উপমন্ত্রী (Deputy Minister)।

ভারত সরকারের শাসনকার্য কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি বিভাগ এক-একজন মন্ত্রীর অধীনে থাকে। তবে অনেক সময় একাধিক বিভাগের ভারও এক-একজন মন্ত্রী গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন? (পৃঃ ১১১-১১২)

২। রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন ক্ষমতা বর্ণনা কর। (পৃঃ ১১২-১১৪)

৩। মন্ত্রীদের নিয়োগ-পদ্ধতি বর্ণনা কর। (পৃঃ ১১৫-১১৬)

পঞ্চম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় আইন-সভা

রাজ্য-পরিষদ্, লোকসভা ও রাষ্ট্রপতি—এই তিনটি অঙ্গ লইয়া কেন্দ্রীয় আইন-সভা বা পার্লামেণ্ট গঠিত। রাষ্ট্রপতির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখানে রাজ্য-পরিষদ্ ও লোকসভার কথা বলা হইতেছে।

রাজ্য-পরিষদ্ (Council of State) :

অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া রাজ্য-পরিষদ্ গঠিত। উক্ত সদস্যের মধ্যে ২৩৮ জনকে বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা নির্বাচন করেন এবং বাকি ১২ জনকে মনোনীত করেন রাষ্ট্রপতি। মনোনীত সদস্যদের চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজসেবা বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা চাই। সদস্যগণের বয়স অন্ততঃ ৩০ বৎসর হওয়া দরকার। তাঁহাদিগকে ভারতের নাগরিক হইতে হয়। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি রাজ্য-পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি রাজ্য-পরিষদে ভোটদানে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। কোন বিষয়ে ভোটসংখ্যা সমবিভক্ত হইলে তিনি একটি অতিরিক্ত ভোট দিতে পারেন। রাজ্য-পরিষদের সদস্যগণ একজন উপসভাপতি নির্বাচন করেন। রাজ্য-পরিষদের সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনিই রাজ্য-পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই পরিষদ্ কখনো ভাঙিয়া দেওয়া যাইবে না। ইহা একটি স্থায়ী পরিষদ্। দুই বৎসর অন্তর পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের স্থলে নূতন সদস্য নির্বাচিত হন।

বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল বিভিন্ন সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করে। পশ্চিম বঙ্গ প্রেরণ করে ১৪ জন।

লোকসভা (House of the People) :

বর্তমানে অনধিক ৫২০ জন সদস্য লইয়া লোকসভা গঠিত হয়। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটে এই সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পরে প্রথম দশ বৎসরের (অর্থাৎ ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য কয়েকটি আসন সংরক্ষিত আছে। রাষ্ট্রপতি অনধিক দুইজন ইঙ্গ-ভারতীয় সভ্যকে মনোনীত করিতে পারেন।

অন্যূন পাঁচ লক্ষ ও অনধিক সাড়ে সাত লক্ষ অধিবাসীর জন্য একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচন-প্রার্থীর বয়স কমপক্ষে পঁচিশ বৎসর হওয়া চাই। তাঁহাকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে। লোকসভার কার্যকাল সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর। তবে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পুর্বেই রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন লোকসভার নির্বাচন করিতে পারেন। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে রাষ্ট্রপতি লোকসভার কার্যকাল বৃদ্ধি করিতেও পারেন।

লোকসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপাল (Speaker) ও একজন উপসভাপাল (Deputy Speaker) নির্বাচিত করেন। লোকসভার অধিবেশনে সভাপাল এবং সভাপালের অনুপস্থিতিতে উপসভাপাল সভাপতিত্ব করেন। রাজ্য-পরিষদের সভাপতির মত লোকসভার সভাপালের অতিরিক্ত ভোট দিবার অধিকার আছে।

কেন্দ্রীয় আইন-সভার অধিকার ও কার্যাবলী (Powers and Functions) ঃ

বৎসরে অন্ততঃপক্ষে দুইবার কেন্দ্রীয় আইন-সভার উভয় পরিষদের অধিবেশন বসিবে। একটানা ছয় মাস অধিবেশন বন্ধ থাকিতে পারিবে না। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইন-সভার অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি অধিবেশন স্থগিত রাখিতে এবং লোকসভাকে ভাঙিয়া দিতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয়, যুগ্ম তালিকাভুক্ত এবং অবশিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কেই কেন্দ্রীয় আইন-সভা আইন পাস করে। তবে যদি দুই বা ততোধিক রাজ্য সম্মতি দেয়, রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়েও কেন্দ্রীয় আইন-সভা আইন পাস করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে, কেন্দ্রীয় আইন-সভা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন পাস করিতে পারে। রাজ্য-পরিষদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি মনে করেন যে, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য কোনও রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন-সভার আইন করা উচিত, তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় আইন-সভা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন করিতে পারে।

রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত আয়-ব্যয় মঞ্জুর ও কর সম্বন্ধে কোনও বিল কেন্দ্রীয় আইন-সভায় উত্থাপিত হইতে পারে না।

কতগুলি বিষয়ে ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা আইন-সভায় চলিতে পারে না। যেমন—রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, রাজ্য-পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতির বেতন ও ভাতা, লোকসভার সভাপাল ও উপসভাপালের বেতন ও ভাতা, সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের বিচারপতিদের বেতন ইত্যাদি।

দুই পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the two Houses) :

সাধারণতঃ রাজ্য-পরিষদ্‌কে উর্ধ্বতন পরিষদ্‌ ও লোকসভাকে নিম্নতন পরিষদ্‌ বলা হয়। তবে রাজ্য-পরিষদের অপেক্ষা লোকসভার ক্ষমতা খুব বেশী। অর্থ-সংক্রান্ত বিলগুলি কেবল লোকসভাতেই প্রথমে উত্থাপিত হইতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত বিলগুলির উপর রাজ্য-পরিষদের কোন হাত নাই বলিলেও চলে। লোকসভা অর্থ-সংক্রান্ত বিল পাস করিয়া রাজ্যপরিষদে আলোচনার জন্য পাঠায়। পাঠাইবার ১৪ দিন পরে রাজ্য-পরিষদের বিনা অনুমোদনেই তাহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো চলে। অন্যান্য বিলগুলি উভয় পরিষদেই প্রথমে উত্থাপিত হইতে পারে। তখন এক পরিষদ্‌ বিলটি পাস করিয়া অন্য পরিষদে পাঠাইয়া দেয়। উভয় পরিষদে বিলটি গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কোন বিল লইয়া উভয় পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ হইলে রাষ্ট্রপতি ঐ বিলটির আলোচনার জন্য উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। তখন যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক ভোটে বিলটি বাতিল বা গৃহীত হয়। মন্ত্রি-পরিষদ্‌ লোকসভার নিকট দায়ী। রাজ্য-পরিষদের প্রতিকূল ভোটে মন্ত্রিগণকে পদত্যাগ করিতে হয় না।

আইন প্রণয়নের পদ্ধতি (Legislative Procedure) :

আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কোনও বিল প্রথমে একটি পরিষদে উত্থাপিত হয়। তবে অর্থ-সংক্রান্ত বিলগুলি প্রথমে রাজ্য-পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে না; রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে কোনও মন্ত্রী লোকসভায় তাহা প্রথমে উত্থাপন করেন। অর্থবিল ভিন্ন অন্য যে-কোন বিল যে-কোন সদস্য উত্থাপিত করিতে পারেন। তবে সাধারণ সদস্য কোন বিল উত্থাপন করিতে চাহিলে তাঁহাকে একমাস পূর্বে বিলের অনুলিপিসহ নোটিশ দিতে এবং বিলটি উত্থাপনের জন্য পরিষদের অনুমতি চাহিতে হয়। ভোটে পরিষদের অনুমতি পাইলে বিলের উত্থাপক বিলটিকে পরিষদে উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু কোন মন্ত্রী কোন বিল উত্থাপন করিতে চাহিলে তাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিলেই চলে।

এবার বিলটির প্রথম পাঠ শুরু হয়। তখন সাধারণতঃ বিলটিকে কয়েক জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিটিতে পাঠানো হয়। কমিটি বিলটির আলোচনা করে এবং সংশোধনসহ বা বিনা সংশোধনে তৎসম্পর্কে একটি বিবরণী পেশ করে। কখনো কখনো বিলটিকে জনমত নির্ধারণের জন্য প্রচার করা হয়। প্রথম পাঠকালে বিলটির সাধারণ নীতি সম্পর্কে আলোচনা হইয়া থাকে।

অতঃপর বিলটির দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয়। তখন প্রত্যেকটি ধারা লইয়া বিশদ আলোচনা চলে এবং প্রত্যেক ধারা সম্পর্কে পৃথকভাবে ভোট লওয়া হয়। সভ্যগণ প্রত্যেক ধারা সম্পর্কে তখন যে-কোনও সংশোধন প্রস্তাব আনিতে পারেন।

তারপর বিলটি তৃতীয়বার পাঠ করা হয়। এই সময়ে বিলটি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা চলে।

তৃতীয় বার পাঠের পর বিলটি গৃহীত হইলে সেটিকে অন্য পরিষদে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়। সেখানেও বিলটির অনুরূপভাবে আলোচনা চলে। তিনবার পাঠের পর দুই পরিষদ্ যদি বিলটিকে বিনা সংশোধনে পাস করে, তবে উহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয় এবং রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে বিলটি আইন বলিয়া গণ্য হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় পরিষদ্ যদি বিলটির কোনও সংশোধন করে, তবে বিলটিকে পুনরায় আলোচনার জন্য প্রথম পরিষদে—অর্থাৎ যে পরিষদে বিলটি প্রথমে উত্থাপিত ও পাস হইয়াছিল—সেই পরিষদে পাঠাইতে হয়। বিল লইয়া যদি দুই পরিষদে মতভেদ ঘটে, তবে রাষ্ট্রপতি একটি যুক্ত অধিবেশন ডাকিতে পারেন। যুক্ত অধিবেশনে বিলটি গৃহীত বা বর্জিত হইলে তাহাকেই উভয় পরিষদের সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

অর্থ-সংক্রান্ত বিলগুলি প্রথমে লোকসভায় উত্থাপিত হয় এবং সেখানে গৃহীত হইলে রাজ্য-পরিষদে পাঠানো হয়। রাজ্য-পরিষদ্ ১৪ দিনের মধ্যে বিলটিকে সুপারিশসহ ফেরত পাঠায়। লোকসভা রাজ্য-পরিষদের সুপারিশ গ্রহণ করিতে বা না করিতে পারে। না করিলেও তাহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়।

রাষ্ট্রপতির সম্মতি ভিন্ন কোনও বিল আইনে পরিণত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। কিন্তু বিলটি যদি পুনরায় আইন-সভায় গৃহীত হয়, তখন রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। রাষ্ট্রপতি অর্থবিল পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির অনুমতি ভিন্ন অর্থবিল উত্থাপিতও হইতে পারে না।

আইন-সভা কর্তৃক শাসন-বিভাগের নিয়ন্ত্রণ (Control of the Executive by the Legislature) ঃ

রাষ্ট্রপতির নামে মন্ত্রিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে। আইন-সভার সদস্যগণ জনগণের প্রতিনিধিরূপে মন্ত্রিগণের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। শাসন-কর্তৃপক্ষ যত বেশী আইন-সভার সদস্যগণের নিকট দায়িত্বশীল হয়, গণতন্ত্র ততই বেশী অর্থপূর্ণ হয়।

প্রথমতঃ সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর কর্তৃত্ব করিয়া আইন-সভা মন্ত্রিসভার উপর কর্তৃত্ব করে। আইন-সভা অনুমোদন না করিলে সরকার কোন কর ধার্য করিতে পারে না বা অর্থ ব্যয় করিতে পারে না। সকল কাজই অর্থের উপর নির্ভর করে। অর্থ-ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করিয়া আইন-সভা মন্ত্রিগণের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে।

সরকারের আয়-ব্যয়-ব্যবস্থা সঠিকভাবে চলিতেছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য আইন-সভার দুইটি কমিটি আছে। মন্ত্রিগণ এই কমিটিগুলির সদস্য হইতে পারে না। এই কমিটিগুলি সরকারী আয়-ব্যয় আইন-সভার নির্দেশমত পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখে। এইভাবেও আইন-সভা মন্ত্রীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

আইন-সভার সদস্যগণ সংবাদ জানিবার জন্য মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রশ্নের উত্তর দিলে ঐ উত্তরের উপর আলোচনা হয়। কখনো কখনো আইন-সভার সদস্যগণ মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব পাস হইলে উহা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হয়। এইরূপ প্রশ্ন বা মুলতুবী প্রস্তাবের মাধ্যমে নানাবিষয়ে আইন-সভা মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

মন্ত্রিগণ কখনও কখনও আইন-সভায় কোন কাজ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইতেছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য লোকসভা একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছে।

উপরে-বর্ণিত উপায়গুলির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হইলে, আইন-সভার নিম্নকক্ষ অর্থাৎ লোকসভা যে-কোন মন্ত্রী বা সমগ্র মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাস করিতে পারে। যে-কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবেরই সামিল। কারণ সকল কার্যের জন্য মন্ত্রিগণ যৌথভাবে দায়ী। কাজেই যে-কোন একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে হউক বা সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধেই হউক, অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাস হইলে সমগ্র মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয়। কেবল লোকসভার অনাস্থা প্রস্তাবেই মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয়। রাজ্য-পরিষদের অনুরূপ প্রস্তাবে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য নহে।

মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা আনীত কোন আইনের খসড়া যদি আইনসভা কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়, তবে ইহাকেও অনাস্থা প্রস্তাব বলিয়াই মনে করা হয়। এই অবস্থায়ও মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করে। আইন-সভা এইভাবে নানারূপ উপায়ে শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় আইন-সভার গঠন বর্ণনা কর। (পৃঃ ১১৭-১১৮)

২। আইন-সভা শাসন-কর্তৃপক্ষের উপর কিরূপে কর্তৃত্ব করে? (পৃঃ ১২০-১২১)

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা

রাজ্য সরকার (State Government) ঃ

রাজ্যপাল—প্রত্যেকটি রাজ্যের জন্য একজন করিয়া রাজ্যপাল (Governor) আছেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। ইচ্ছা করিলে কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে তিনি পদত্যাগ করিতে পারেন। অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিককে এই পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। নিয়োগের সময় তিনি যদি কোন আইন-সভার সদস্য থাকেন, তবে যথারীতি নিযুক্ত হইবার পূর্বে তাঁহাকে আইন-সভার সদস্য-পদ ত্যাগ করিতে হয়। তিনি বিনা ভাড়ায় সরকারী বাসগৃহে বাস করিতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় আইন-সভা অন্যরূপ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আনুষঙ্গিক ভাতাসহ মাসিক ৫,৫০০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। যে-কোন রাজ্যপালের কার্যকালের মধ্যে তাঁহার বেতন কিংবা ভাতা হ্রাস করা চলে না।

যে সকল বিষয়ে রাজ্যের আইন-সভা আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে, সে সকল বিষয়ে রাজ্যপালের শাসন-ক্ষমতা আছে। শাসনকার্যে তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয়। রাজ্যপাল প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে অপরাপর মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতে তিনি বাধ্য কিনা সে সম্বন্ধে শাসনতন্ত্রে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁহাকে তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতে হয়। না হয় তাঁহাকে সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয়। এই ব্যাপারে তাঁহার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অপেক্ষা কম। এ-কথা স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত নেতা—জনগণের প্রতিনিধি; পরন্তু রাজ্যপাল মনোনীত বা নিযুক্ত ব্যক্তি।

রাজ্যপাল রাজ্যের মহাব্যবহারিককে (Advocate-General), রাজ্যের লোকসেবায়োগের (State Public Service Commission) সদস্যগণকে এবং রাজ্যের প্রধান হিসাব-পরীক্ষককে (Chief Auditor) নিযুক্ত করেন। এই সব নিয়োগ ব্যাপারে তিনি মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে কার্য করেন। তিনি রাজ্য-শাসন-বিষয়ক নিয়ম প্রণয়ন করেন। তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারেন কিংবা তাহার দণ্ড হ্রাস করিয়া দিতে পারেন।

তিনি আইন-সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে কিংবা স্থগিত রাখিতে পারেন। তিনি রাজ্যের বিধানসভা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন। রাজ্যের আইন-সভায় কোন আইনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে, তাঁহার সম্মতির জন্য উহা তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। তিনি সম্মতি দিলে ঐ আইনের প্রস্তাব কার্যকর হয়। প্রয়োজন মনে করিলে তিনি কোন আইনের প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য আইন-সভায় প্রেরণ করিতে পারেন। আইন-সভা কর্তৃক ঐ প্রস্তাব পুনরায় গৃহীত হইলে রাজ্যপালকে উহাতে সম্মতি প্রদান করিতে হয়। ইচ্ছা করিলে রাজ্যপাল আইন-সভায় গৃহীত কোন আইনের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য রাখিয়া দিতে পারেন। আইন-সভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালে প্রয়োজনবোধে রাজ্যপাল জরুরী আইন জারি করিতে পারেন। আইন-সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে আইন-সভা কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে এই জরুরী আইন বাতিল হইয়া যায়। অর্থ-সংক্রান্ত কোন বিল রাজ্যপালের সুপারিশ ভিন্ন আইন-সভায় উত্থাপিত হইতে পারে না। রাজ্যপাল যে রাজ্যে বিধান পরিষদ্ আছে, সেই রাজ্যের বিধান পরিষদের নির্দিষ্ট-সংখ্যক সদস্য মনোনীত করেন।

মন্ত্রি-পরিষদ্ (Council of Ministers) :

রাজ্যপালকে শাসনকার্যে পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ্ আছে। রাজ্যপাল প্রধান মন্ত্রীকে এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অপরাপর মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। রাজ্যপাল মন্ত্রিগণের মধ্যে কর্ম-বিভাগ করিয়া দেন। নিযুক্ত হইবার পর মন্ত্রিগণকে আনুগত্যের এবং গোপনতা রক্ষার শপথ গ্রহণ করিতে হয়। যদি নিয়োগের সময় কোন মন্ত্রী আইন-সভার সদস্য না থাকেন, তবে নিয়োগের ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে যথারীতি আইন-সভার সদস্য হইতে হয়। অন্যথায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিগণের কার্যকাল রাজ্য-পালের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলেও কার্যতঃ তাঁহাদের কার্যকাল বিধানসভার অধিকসংখ্যক সদস্যের আস্থার উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ তাঁহারা আইন-সভার অধিকসংখ্যক সদস্যের আস্থাভাজন থাকেন, ততক্ষণ তাঁহারা সহজে পদে বহাল থাকিতে পারেন। আইন-সভার অধিকসংখ্যক সদস্যের আস্থাভাজন মন্ত্রি-মণ্ডলীকে পদচ্যুত করিয়া রাজ্যপাল বিকল্প মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে পারেন না ; করিলে তিনি সঙ্কটের সম্মুখীন হন। মন্ত্রিমণ্ডলী যদি আইন-সভার অধিক-সংখ্যক সদস্যের আস্থা হারায়, তাহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে আইন-সভার নিকট দায়ী। যে-কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সম্পূর্ণ মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে আনস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব বলিয়া মনে করা হয়।

প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর নেতা। তিনি মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত রাজ্যপালের গোচরীভূত করেন। যদিও রাজ্যপাল শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানে আসীন, তথাপি কার্যতঃ মন্ত্রিগণই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং শাসন-বিভাগীয় বিভিন্ন কর্মচারীর উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা (Administration of Union Territories) :

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির শাসনকার্য রাষ্ট্রপতি দ্বারা পরিচালিত হয়। অবশ্য যত দিন পার্লামেণ্ট অন্য প্রকার ব্যবস্থা না করে, তত দিন এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য একজন করিয়া শাসক (Administrator) নিযুক্ত করেন। এই শাসকের নাম কোনও অঞ্চলে চীফ কমিশনার, আবার কোনও অঞ্চলে উপরাজ্যপাল। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্যের রাজ্যপালের হাতেও কোন কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত করিতে পারেন। এইরূপ ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের শাসনকার্য-পরিচালনে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজ্যপাল তাঁহার মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করেন না।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষা দ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভ দ্বীপপুঞ্জের শান্তি-শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি এবং সুশাসনের জন্য রাষ্ট্রপতি নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারেন। এই সকল নিয়ম ভারতীয় আইন-সভা কর্তৃক প্রণীত আইনের বিরোধী হইলেও কার্যকর হইবে।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলিতে এখনও জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই। দিল্লী, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং হিমাচল প্রদেশের শাসনকার্যে সরকারকে সাহায্য করার জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইয়াছে। সরকার এই অঞ্চলগুলির শাসনকার্য-পরিচালনে এই উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করে। হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, এবং ত্রিপুরায় আঞ্চলিক পরিষদ্ গঠন করা হইয়াছে এবং দিল্লীতে একটি কর্পোরেশন গঠন করা হইয়াছে। এইগুলি সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং হইবে এবং স্থানীয় ব্যাপারে শাসনকার্য পরিচালন করিবে।

ভারতীয় আইন-সভা আইন পাস করিয়া কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে উচ্চ আদালত স্থাপন করিতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোন আদালতকে উচ্চ আদালতের মর্যাদা দান করিতে পারে।

রাজ্যের আইন-সভা :

বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য-প্রদেশ, মহীশূর, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের আইন-সভা রাজ্যপাল, বিধান পরিষদ্ (Legislative Council) এবং বিধানসভা (Legislative Assembly) লইয়া গঠিত। অপর রাজ্যগুলির আইন-সভা রাজ্যপাল এবং বিধানসভা লইয়া গঠিত। কেন্দ্রীয় আইন-সভা আইন প্রণয়ন করিয়া যে রাজ্যে বিধান পরিষদ্ আছে সেই রাজ্যের বিধান পরিষদ বাতিল করিতে পারে কিংবা যে রাজ্যে বিধান পরিষদ্ নাই সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ্ সৃষ্টি করিতে পারে।

বিধান পরিষদ্ (Legislative Council) গঠন :

রাজ্যের বিধান পরিষদ একটি স্থায়ী সভা। ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি দুই বৎসর পর পদত্যাগ করে এবং নব-নির্বাচিত সদস্য তাহাদের স্থান গ্রহণ করে। কোন রাজ্যের বিধান পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যা ঐ রাজ্যের বিধানসভার সদস্য-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের অধিক হইবে না। বিভিন্ন রাজ্যের বিধান পরিষদের সদস্য-সংখ্যা গণ-প্রতিনিধিত্ব আইনে নির্ধারিত হইয়াছে। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ৭৫। বিধান পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যার নিকটতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্য রাজ্যের পৌরসভা, জেলাবোর্ড প্রভৃতির সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। নিকটতম এক-দ্বাদশাংশ অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্বে যাহারা স্নাতক (graduate) হইয়াছে তাহাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। নিকটতম এক-দ্বাদশাংশ মাধ্যমিক এবং তদূর্ধ্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যাহারা অন্যূন তিন বৎসর শিক্ষাদান করিয়াছে তাহাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণ বিধানসভার বাহির হইতে নিকটতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচন করে। অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ সদস্য সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমবায়-আন্দোলন-বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি হইতে রাজ্যপাল মনোনীত করেন। সদস্য-পদপ্রার্থীর বয়স অন্যূন ত্রিশ বৎসর হইতে হইবে। তাহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে।

সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি এবং একজন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করে। সভাপতির অতিরিক্ত ভোটের ব্যবস্থা আছে। অন্যূন দশজন কিংবা মোট সদস্য-সংখ্যার এক-দশমাংশ সদস্য (যে সংখ্যা অধিক) উপস্থিত থাকিলেই সভার কাজ চলিতে পারে।

বিধানসভা (Legislative Assembly) গঠন :

বিধানসভার সদস্য-সংখ্যা কোন ক্ষেত্রেই পাঁচ শতের অধিক এবং ষাটের কম

হইবে না। পশ্চিম বঙ্গের বিধানসভার সদস্য-সংখ্যা ২৫২। বিধানসভা পাঁচ বৎসরের জন্য গঠিত হয়। প্রয়োজনবোধ করিলে রাজ্যপাল পাঁচ বৎসর গত হইবার পূর্বেও ইহা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন কিংবা জরুরী অবস্থায় ইহার কার্যকাল আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দিতে পারেন। বিভিন্ন রাজ্যের আইন-সভার আসন-সংখ্যা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে মোট জনসংখ্যার অন্যূন প্রতি ৭৫০০০ জনের জন্য অনধিক একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকে। তপশীলভুক্ত উপজাতি (Scheduled tribes) এবং তপশীলভুক্ত জাতি (Scheduled castes) ভিন্ন অন্য আসন সংরক্ষিত নাই। কেবল রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ বিধানসভায় যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব লাভ করে নাই এবং তাহাদের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন, তখন তিনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। সদস্য-পদপ্রার্থীর বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর হইতে হইবে এবং তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। কোন সরকারী কর্মচারী পদত্যাগ না করিয়া নির্বাচন-প্রার্থী হইতে পারে না। যদি কোন সদস্য নিজে পদত্যাগ করে কিংবা বিধানসভার বিনা অনুমতিতে দুই মাসকাল (৬০ দিন যাবৎ অধিবেশনে যোগদান না করে, তবে বিধানসভা সে সদস্যের আসন শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন অধ্যক্ষ (Speaker) এবং একজন উপাধ্যক্ষ (Deputy Speaker) নির্বাচিত করে। অধিবেশনে অধ্যক্ষ ভোট দিতে পারেন না। কোন বিষয়ে ভোটসংখ্যা সমবিভক্ত হইলে অধ্যক্ষ একটি অতিরিক্ত (Casting) ভোট দিতে পারেন। অন্যূন দশজন কিংবা মোট সদস্য-সংখ্যার এক-দশমাংশ সদস্য (যে সংখ্যা অধিক) উপস্থিত থাকিলে সভার কাজ চলিতে পারে।

আইন-সভার কর্ম-পদ্ধতি ঃ

বৎসরে অন্ততঃ দুইবার আইন-সভার উভয় কক্ষের অধিবেশন আহ্বান করিতে হয়। কোন বারের শেষ অধিবেশন-তারিখ এবং পরবর্তী বারের প্রথম অধিবেশন-তারিখের মধ্যে ছয় মাসের ব্যবধান থাকিতে পারে না। অর্থ-সংক্রান্ত আইনের প্রস্তাব বিধানসভায় প্রথম উত্থাপিত হয়। বিধানসভার সিদ্ধান্ত এই ব্যাপারে চূড়ান্ত। অর্থ-সংক্রান্ত আইনের প্রস্তাবে বিধান পরিষদের বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই।

বিধানসভা মন্ত্রি-পরিষদের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। বিধানসভার অধিক-সংখ্যক সদস্যের ভোটে মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাস হইলে

মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু বিধান পরিষদের অনুরূপ ক্ষমতা নাই। এতদ্ব্যতীত আইন-সভার উভয় কক্ষের ক্ষমতাই সমান। আইনের প্রস্তাব উভয় কক্ষে গৃহীত হইয়া রাজ্যপাল কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে আইনে পরিণত হয়। কোন আইনের প্রস্তাব সম্বন্ধে মতানৈক্য হইলে বিধানসভায় দ্বিতীয়বারের গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়। সদস্য কর্তৃক আইন-সভায় প্রদত্ত কোন বক্তৃতা কিংবা কোন ভোট কোন আদালতের বিচার্য বিষয় হয় না। আইন-সভার কার্যে রাজ্যের নিজস্ব ভাষা, হিন্দী কিংবা ইংরেজী ব্যবহার করা চলে। যদি কোন সদস্য উপরি-বর্ণিত কোন ভাষায় নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে না পরে, তবে সে সদস্য অধ্যক্ষ কিংবা সভাপতির অনুমতিক্রমে নিজ মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে।

রাজ্যের আইন-সভা রাজ্য-সংক্রান্ত এবং যুগ্ম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে। রাজ্যের আইন-সভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অবস্থাবিশেষে ক্ষুণ্ণ হয়। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে কেন্দ্রীয় আইন-সভা রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যদি রাজ্যের কোন যুগ্ম বিষয়-সংক্রান্ত আইন কেন্দ্রীয় আইনের বিধানের বিরোধী হয়, তবে- কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ হয়। অবশ্য যুগ্ম বিষয়ে রাজ্যের আইন যদি পূর্বেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়া থাকে, তবে রাজ্যের আইন বলবৎ হয়।

প্রশ্ন

১। রাজ্যপালের বিভিন্ন ক্ষমতা বর্ণনা কর। (পৃঃ ১২২-১২৩)

২। রাজ্যপালের সঙ্গে মন্ত্রিগণের সম্পর্ক কি? (পৃঃ ১২৩-১২৪)

৩। মন্ত্রিগণের কার্য বর্ণনা কর। (পৃঃ ১২৩-১২৪)

৪। রাজ্যের বিধানসভার গঠন এবং ক্ষমতা বর্ণনা কর। (১২৫-১২৬)

৫। রাজ্যের বিধান পরিষদের গঠন এবং ক্ষমতা নির্ধারণ কর। (পৃঃ ১২৫)

সপ্তম অধ্যায়

কেন্দ্র এবং রাজ্যসমূহের সম্বন্ধ

(Relation between the Centre and the States)

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির আইন প্রণয়ন ব্যাপারে, শাসন-পরিচালন ব্যাপারে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ব্যাপারে, আর্থিক ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এইগুলি পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

আইন প্রণয়ন :

ক্ষমতা-বিভাজনের ফলে কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন-সভা আইন প্রণয়ন করে। রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে রাজ্য আইন-সভা আইন প্রণয়ন করে। যুগ্ম বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় আইন-সভা এবং রাজ্য আইন-সভা উভয়েই আইন প্রণয়ন করে। এই ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য আইন-সভা যদি পরস্পর বিরোধী আইন প্রণয়ন করে, তবে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ হয়। কেন্দ্রীয় রাজ্য এবং যুগ্ম বিষয় ভিন্ন যে-সকল অতিরিক্ত বিষয় আছে, সেগুলি সম্বন্ধে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারই আইন প্রণয়ন করে।

কতগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন-সভা রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়েও আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় আইন-সভার উচ্চতর পরিষদ্ অর্থাৎ রাজ্য-পরিষদ্ অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, কোন একটি রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় আইন-সভার আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তবে কেন্দ্রীয় আইন-সভা ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যদি দুই বা ততোধিক রাজ্য তাহাদের কোন রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানায় বা সম্মতি দেয় তবে কেন্দ্রীয় আইন-সভা ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। আবার কোন সন্ধির সর্ত বা আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে যদি আইন প্রণয়ন প্রয়োজনীয় মনে করে, তবে কেন্দ্রীয় আইন-সভা ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

শাসন-পরিচালন :

যে-সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন-সভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে, সেই সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-পরিচালনেরও ক্ষমতা আছে।

অনুরূপভাবে, যে-সকল বিষয়ে রাজ্য আইন-সভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে, সেই সকল বিষয়ে শাসনকার্য-পরিচালনেও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা আছে। কিন্তু ঐক্য এবং সংযোগের প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের শাসন-ক্ষমতা-পরিচালনে ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হয়, যেন কেন্দ্রীয় আইন রাজ্য মধ্যে কোন প্রকারে অমান্য না হয়। জাতীয় প্রয়োজনে বা সামরিক প্রয়োজনে কোন রাস্তা-ঘাট নির্মাণ বা সংরক্ষণ প্রভৃতি রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মনে করিলে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে। আবার রাষ্ট্রপতি কোন রাজ্য সরকারের সম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তাধীন কোন বিষয়-সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা বা দায়িত্ব ঐ রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত করিতে পারেন। এই ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব পালনে রাজ্য সরকারের যদি অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তবে তাহা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে।

বিভিন্ন রাজ্যের সংযোগ-সাধন :

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ভাব বজায় রাখা এবং সংযোগ-সাধনের জন্য রাষ্ট্রপতি একটি আন্তর-রাজ্য-পরিষদ্ (Inter-State Council) গঠন করিতে পারেন। এই পরিষদ্ বিভিন্ন রাজের মধ্যে বিবাদের কারণ অনুসন্ধান করিবে। রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব কিংবা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতার ভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়, সেই সম্বন্ধে এই পরিষদ্ সুপারিশ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সুপারিশ কার্যকর করিতে পারে। রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংযোগ, সহযোগিতা এবং সংহতি বিধানের ব্যাপারে পরামর্শ দিবার জন্য পাঁচটি আঞ্চলিক পরিষদ্ গঠন করা হইয়াছে।

আর্থিক ব্যবস্থা :

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের নিজ নিজ কার্য সম্পাদনের জন্য পৃথক আর্থিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। সংবিধান কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব-বন্টনের একটা মোটামুটি নির্দেশ দিয়াছে। রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক নিযুক্ত অর্থ কমিশন (Finance Commission) ভারতের কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব-বন্টনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করে। বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে আয়-কর প্রভৃতি কোন কোন রাজস্বের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য এবং কিছু অংশ রাজ্য সরকারের প্রাপ্য। আবার ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য এবং বিক্রয়-কর প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত অর্থ সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের প্রাপ্য।

জরুরী অবস্থা :

সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে কতগুলি গুরু দায়িত্ব পালন করিতে হয়। শাসন-পরিচালন ব্যাপারে সংবিধানে যে-সকল নীতির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন এবং শাসন-পরিচালন হইতেছে কিনা তাহা দেখা কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ। বিভিন্ন রাজ্যের সমাজ-সেবামূলক ও জাতি-গঠনমূলক কার্যগুলির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং সেইগুলির মধ্যে সংহতি সাধন করাও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমানভাবে গণতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে কিনা, ইহাও কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখিতে হয়। সর্বোপরি কোন রাজ্য যেন বৈদেশিক আক্রমণে বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগে বিপর্যস্ত না হয়, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখিতে হয়। সকল রাজ্যই সংবিধান অনুসারে শাসিত হইতেছে কিনা, ইহা দেখাও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য।

উপরে-বর্ণিত এই সকল দায়িত্ব পালনের জন্য জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে, কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে। প্রয়োজনবোধ করিলে রাজ্য সরকারের আইন প্রণয়ন এবং শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারে। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে রাজস্ব-বণ্টন ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে ব্যয়-সঙ্কোচন প্রভৃতি ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে। যখন কোন রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়, তখন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

এ-কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই সকল ব্যবস্থা কেবল জরুরী অবস্থাতেই অবলম্বন করা যাইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসন-সংক্রান্ত সম্পর্ক বর্ণনা কর। (পৃঃ ১২৮-১৩০)

অষ্টম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয়

(Heads of Revenues and Expenditure for Union and State Governments)

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। ভারতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে কাজ করে। নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনের জন্য বা দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। কাজেই প্রত্যেক সরকারেরই অর্থের প্রয়োজন। অর্থাগমের বিভিন্ন পন্থা বা উপায় আছে। এই পন্থাগুলি পৃথক না হইলে সকল সরকারের পক্ষেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা কঠিন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থের জন্য যদি রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, অথবা রাজ্য সরকারকে যদি অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, তবে নির্ভরশীল সরকার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে না। সেইজন্য ভারতের সংবিধান অর্থাগমের পন্থাগুলি পৃথক করিয়া দিয়াছে। কয়েকটি পন্থাকে সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের আয়ের পন্থা বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। আবার কয়েকটি পন্থাকে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের পন্থা বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কয়েকটি পন্থা কেন্দ্রীয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও, উহা হইতে প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে বণ্টন করা হয়। আবার কোন উপায় হইতে কেন্দ্রীয় সরকার কর সংগ্রহ করে; কিন্তু তাহা হইতে প্রাপ্ত অর্থ রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। বণ্টনের হার নির্দিষ্ট করিবার ভার রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক নিযুক্ত অর্থ কমিশন (Finance Commission) নামে কমিশনের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

পন্থাগুলি নির্ধারণে কয়েকটি নীতির কথা বিবেচনা করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের স্বাতন্ত্র্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, প্রত্যেক সরকারের আয় যেন পর্যাপ্ত হয় এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর আয়ের হার যেন বিভিন্ন রাজ্যে সমান থাকে এবং সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে যেন অসুবিধা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের পন্থা

১। কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক (Excise Duties) :

দেশের অভ্যন্তরে কেরোসিন, চিনি, দিয়াশলাই, সুপারি, তামাক, তৈল, গাড়ির টায়ার ও টিউব, চা, কফি প্রভৃতি যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কেন্দ্রীয়

সরকার সেই সকল দ্রব্যের উপর কর ধার্য করে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের ইহাই রাজস্বের সর্বপ্রধান পন্থা। কফি, চা, দিয়াশালাই প্রভৃতি কতগুলি দ্রব্যের উৎপাদন-শুল্কের শতকরা পঁচিশ ভাগ রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হয়। বন্টনের পরও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় আড়াই শত কোটি টাকা থাকিয়া যায়।

২। আয়-কর (Income-Tax) :

আয়-কর তিন প্রকারের—ব্যক্তিগত আয়-কর, উপরিস্থ আয়-কর এবং কর্পোরেশন আয়-কর। ব্যক্তিবিশেষের আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাহা ব্যক্তিগত আয়-কর। আয়-করের উপরেও যে কর বসানো হয়, তাহা উপরিস্থ আয়-কর। যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উপর যে আয়-কর ধার্য করা হয়, তাহা কর্পোরেশন আয়-কর। উপরিস্থ আয়-কর এবং কর্পোরেশন আয়-কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য। ব্যক্তিগত আয়-কর হইতে প্রাপ্ত নীট অর্থের শতকরা ষাট ভাগ রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হয়। সকল প্রকার আয়-কর হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট প্রায় দেড় শত কোটি টাকা আয় হয়।

৩। আমদানি-রপ্তানি শুল্ক (Customs) :

ভারত হইতে যে-সকল দ্রব্য রপ্তানি করা হয় এবং ভারতে যে-সকল দ্রব্য আমদানি করা হয়, সেগুলির উপর ধার্যকৃত কর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য। ইদানীং আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে এবং রপ্তানিও কমিয়াছে। সেইজন্য এই সূত্র হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। এখন রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। ফলে রপ্তানি কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সূত্র হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় এক শত ত্রিশ কোটি টাকা আয় হইয়া থাকে।

৪। মূলধন-কর, সম্পদ-কর, ব্যয়-কর (Capital Tax, Tax on Wealth, Expenditure Tax) :

বিগত তিন চারি বৎসরের মধ্যে মূলধন লাভ-কর, সম্পদ-কর এবং ব্যয়-কর নামে তিনটি কর ধার্য করা হইয়াছে। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় হইতে যে লাভ হয়, তাহার উপর ধার্যকৃত করকে মূলধন লাভ-কর বলা হয়। সম্পত্তির উপর ধার্যকৃত করকে বলা হয় সম্পদ-কর এবং ব্যক্তিগত ভোগের

জন্য যে ব্যয় করা হয়, তাহার উপর ধার্য-করা করকে বলা হয় ব্যয়-কর। এই তিন প্রকারের কর হইতে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট প্রায় পনের কোটি টাকা আয় হয়।

৫। রেলপথ হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব (Railways) :

রেলপথ পরিচালনার ফলে যে লাভ হয় তাহার একটি অংশ রাজস্ব হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য। এই রাজস্ব হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সাত কোটি টাকা আয় হয়।

৬। ডাক ও তার হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব (Post and Telegraphs) :

ডাক এবং তার বিভাগের পরিচালনার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু লাভ হইয়া থাকে। ইহা হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাঁচ কোটি টাকার মত আয় হইয়া থাকে।

৭। মুদ্রা ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্ত আয় (Currency) :

মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনার ফলে এবং মুদ্রাঙ্কনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকার মত আয় হইয়া থাকে।

৮। বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয় (Other Sources of Revenue) :

শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি পরিচালনার ফলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু আয় হইয়া থাকে। এই সকল সূত্র হইতে বর্তমানে বিশেষ আয় না হইলেও, ভবিষ্যতে ভালরূপ আয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই প্রকারের বিভিন্ন সূত্র হইতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় মিটাইবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। অবশ্য এইরূপে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়

বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ইহার বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব অপেক্ষা প্রায়ই অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ঋণ গ্রহণ করিয়া বা অনুরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। বিভিন্ন প্রকারের ব্যয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :—

১। দেশরক্ষা ব্যয় (Defence Expenditure) :

দেশরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হয়। মোট ব্যয়িত অর্থের প্রায় শতকরা ত্রিশ ভাগ অর্থ এই দেশরক্ষার কাজেই ব্যয়িত হইয়া

থাকে। সম্প্রতি এই খাতে ব্যয় যাহাতে কমানো যায়, তাহার চেষ্টা হইয়াছিল। তথাপি স্বাভাবিক অবস্থায় এই খাতে আড়াই শত কোটি টাকার অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। বর্তমান জরুরী অবস্থায় এই ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২। শাসন-পরিচালনায় ব্যয় (Civil Administration) :

দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কর্মচারীদের বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য খাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এইজন্য সরকারকে পঞ্চাশ কোটি টাকার মত ব্যয় করিতে হয়।

৩। ঋণ পরিশোধ-সংক্রান্ত ব্যয় (Debt Repayment) :

নানা কার্য সম্পাদনের জন্য সরকারকে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ে এই ঋণের সুদ দিতে হয় এবং ঋণ শোধের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রত্যেক বৎসর এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্যূন পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়।

৪। উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ব্যয় (Development Expenditure) :

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতির উন্নতি-বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক হইতে অধিকতর অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। ভারতের মত অনগ্রসর দেশে এই ব্যয়ের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে। এখনও এই সকল খাতে আশানুরূপ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই।

৫। বিভিন্ন খাতে ব্যয় (Other Expenditures) :

উপরে বর্ণিত খাত ভিন্নও নানা খাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। নূতন কল-কারখানা স্থাপন, রেল লাইন নির্মাণ প্রভৃতি কার্যের জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রতি বৎসরই এই ব্যয় মিটাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজস্ব ভিন্ন অন্য সূত্রের উপর নিভর করিতে হয়।

রাজ্য সরকারের আয়

১। ভূমি-রাজস্ব (Land Revenue) :

জমির মালিককে জমির মালিকানার জন্য খাজনা দিতে হয়। পূর্বে এই খাজনা জমিদার সংগ্রহ করিত। তাহার একটা অংশ রাজ্য সরকারের প্রাপ্য ছিল। জমিদারী প্রথা লোপ-সাধনের ফলে এই খাজনা সম্পূর্ণই রাজ্য

সরকারের প্রাপ্য হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার এখন ভূমি-রাজস্ব হইতে ছয় কোটি টাকার অধিক আয় করিয়া থাকে।

২। বিক্রয়-কর (Sales-Tax) :

দ্রব্যাদি-বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে মূল্যের উপর শতকরা নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করে। ইহাকে বিক্রয়-কর বলা হয়। পশ্চিম বঙ্গে এই হার শতকরা পাঁচ টাকা। কাপড়, চিনি এবং তামাকের উপর এই কর ধার্য হয় না। পশ্চিম বঙ্গে পুস্তকের উপর হইতেও এই কর উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে এই কর হইতে নয় কোটি টাকার মত আয় হয়।

৩। উৎপাদন শুল্ক (State Excise Duties) :

মদ, অহিফেন প্রভৃতি কতগুলি মাদক-জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য শুল্ক দিতে হয়। এই শুল্ক রাজ্য সরকারের প্রাপ্য। ইহা হইতে পশ্চিম বঙ্গে পাঁচ কোটি টাকার মত আয় হয়।

৪। স্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশন (Stamp Duties and Registration) :

দলিল প্রভৃতি সম্পাদনের জন্য স্ট্যাম্পের ব্যবহার অপরিহার্য। এইগুলির রেজিষ্ট্রেশনও প্রয়োজনীয়। স্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশন বাবদ যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহা রাজ্য সরকারের প্রাপ্য। পশ্চিম বঙ্গে এই রাজস্ব হইতে প্রায় তিন কোটি টাকা আয় হয়।

৫। বিভিন্ন কর :

কৃষি, আয়-কর, প্রমোদ-কর, বিদ্যুৎ-কর, রেল-মাশুলের উপর কর, বৃত্তি-কর প্রভৃতি হইতে রাজ্য সরকারের আয় হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া জলসেচ ব্যবস্থা, অরণ্য সম্পদ, রাজ্য-পরিচালিত শিল্প হইতেও রাজ্য সরকারের আয় হইয়া থাকে।

রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পুনর্বাসন, তপশীলী জাতি-সমূহের উন্নয়ন, শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি কাজের জন্য অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আয়-করের একটি অংশ এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন করের একটি অংশও রাজ্য সরকারে প্রাপ্য।

রাজ্য সরকারের ব্যয়

রাজ্য সরকার যে-সকল খাতে অর্থ ব্যয় করে, সে সকল খাতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) উন্নয়নমূলক খাত এবং (২) অনুন্নয়নমূলক খাত। শিক্ষা,

জনস্বাস্থ্য, কৃষি, রাস্তাঘাট, সেচ, বিদ্যুৎ-উৎপাদন শিল্প, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি উন্নয়ন-মূলক খাত এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, ঋণ পরিশোধ, দুর্ভিক্ষে সাহায্য প্রভৃতি অনুন্নয়নমূলক খাত।

উন্নয়নমূলক খাতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহার একটি বিশিষ্ট অংশ ব্যয় হয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য। ভারতের মতো দেশে ইহার প্রয়োজনীয়তাকে কেহই অস্বীকার করিবে না। পশ্চিম বঙ্গে সতের কোটি টাকা ব্যয় হয় শিক্ষাপ্রসারের জন্য। কৃষির উন্নয়ন সাধনের জন্য এবং সেই সঙ্গে সেচ ও সমবায় আন্দোলনের প্রসারের জন্যও এখন রাজ্য সরকারগুলি যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করিতেছে। তাহার পরই জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য ব্যয়। রাজ্য সরকারগুলির উপর বাস্তবিক পক্ষে উন্নয়নমূলক প্রায় সকল কাজেরই দায়িত্ব। এই বাবদে ব্যয় ক্রমে বাড়িয়াই চলিতেছে। কিন্তু সে পরিমাণে আয় বাড়িতেছে না।

অনুন্নয়নমূলক কাজের জন্য রাজ্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে, তাহার অধিকাংশ ব্যয়িত হয় পুলিশ, জেল এবং বিচার-ব্যবস্থার জন্য। পশ্চিম বঙ্গে মোট রাজস্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই কার্য বাবদে ব্যয় হয়। সরকারী কর্মচারীদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি বাবদে ব্যয়ের স্থান তাহার পরে। দুর্ভিক্ষের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা পূর্বে নির্ণীত হওয়া কঠিন। তবে প্রতি বৎসর ইহার জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়া থাকে। প্রত্যেক রাজ্য সরকার নিজ কার্য সম্পাদনের জন্য কিছু কিছু ঋণ করিয়া থাকে। এই ঋণ পরিশোধের জন্যও প্রত্যেক বৎসর একটা ব্যয় বরাদ্দ করিয়া রাখা হয়। ইহাও রাজ্য সরকারের ব্যয়ের একটি অংশ। রাজ্যগুলির মোট ঋণের পরিমাণ বার শত কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের যে ঋণ আছে, তাহার পরিমাণ পাঁচ হাজার দুই কোটি টাকা।

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের উপায় কি? কোন্ কোন্ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ ব্যয় করিতে হয়? (পৃঃ ১৩২-১৩৩, ১৩৪)

২। রাজ্য সরকারের আয়ের উপায়গুলি বর্ণনা কর। রাজ্য সরকারকে কি বাবদ অর্থ ব্যয় করিতে হয়? (পৃঃ ১৩৫-১৩৬, ১৩৬)

নবম অধ্যায়

বিচার-ব্যবস্থা

(The Judicial Administration)

ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—দেওয়ানী ও ফৌজদারী। ধন-সম্পত্তি প্রভৃতির দাবী সম্পর্কে যে বিচার হয়, তাহাকে দেওয়ানী (Civil) বিচার বলে এবং অপরাধ সম্পর্কে যে-সকল বিচার হয়, সেগুলিকে ফৌজদারী (Criminal) বিচার বলে।

গ্রামাঞ্চলে দেওয়ানী মামলার বিচার করিবার জন্য সর্বনিম্ন আদালত হইল ইউনিয়ন কোর্ট। সেখানে ইউনিয়ন বোর্ডের কয়েক জন সদস্য বসিয়া ছোটখাটো মামলার বিচার করেন। বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ড উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থলে গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং অঞ্চল পঞ্চায়েৎ স্থাপন করা হইয়াছে। ইউনিয়নের বিচার-কার্য এই পঞ্চায়েৎ সম্পন্ন করিবে। শহরে সর্বনিম্ন দেওয়ানী আদালত হইল মুন্সেফের আদালত। কলিকাতার মত বড় বড় শহরে ছোটখাটো দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য ছোট আদালত বা স্মল কজেস্ কোর্ট আছে। মুন্সেফের আদালতগুলি মহকুমা শহরে ও চৌকীতে থাকে। মুন্সেফী আদালতের উপরে আছে অধস্তন বিচারপতি বা সব-জজের আদালত। বেশী টাকার দাবী লইয়া মামলা হইলে তাহার বিচাব সব-জজের আদালতেই হইয়া থাকে। মুন্সেফের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য জেলার সদরে জেলা বিচারপতি বা ডিষ্ট্রিক্ট জজের আদালত আছে। জেলা বিচারপতি সমগ্র জেলার বিচার-ব্যবস্থার তদারক করেন।

অধস্তন বিচারপতিদের ও জেলা বিচারপতিদের রায়ের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে আপীল করিতে হয়। হাই কোর্টগুলি রাজ্যের সর্বপ্রধান শহরে অবস্থিত থাকে। হাই কোর্ট রাজ্যের মধ্যে উচ্চতম আদালত। প্রত্যেক হাই কোর্টে এক জন প্রধান বিচারপতি ও কয়েক জন বিচারপতি থাকেন। তাঁহাদিগকে রাজ্যপালের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতিই নিয়োগ করেন। প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগকালে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিরও পরামর্শ গ্রহণ করেন। ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত হাই কোর্টের বিচারপতিরা তাঁহাদের পদে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। তবে তৎপূর্বে তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাক্রমে পদচ্যুত হইতে পারেন।

কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের হাই কোর্টে আপীল ব্যতীত বেশী টাকার মামলার আরম্ভিক শুনানীও হয়। হাই কোর্ট'ই রাজ্যের সমগ্র বিচার-ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করে। অন্যূন বিশ হাজার টাকার দাবী বা বর্তমান সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত মামলা হইলে হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। সুপ্রীম কোর্ট-ই ভারতীয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত।

গ্রামাঞ্চলে ছোটখাটো ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার থাকে ইউনিয়ন বেঞ্চের উপর। ফৌজদারী মামলার উহাই সর্বনিম্ন আদালত। পঞ্চায়েৎ এখন এই ইউনিয়ন বেঞ্চের স্থান অধিকার করিয়াছে। শহরে ছোটখাটো ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার ম্যাজিস্ট্রেটরাই করেন। ম্যাজিস্ট্রেটরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরগুলিতে ঐরূপ মামলার বিচারের ভার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে থাকে। ম্যাজিস্ট্রেটদের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা বিচারপতি ও দায়রা বিচারপতিদের (সেসন জজদের) আদালতে আপীল করিতে হয়। খুন বা গুরুতর অপরাধের মামলাগুলির শুনানী প্রথমে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হয়। অতঃপর ম্যাজিস্ট্রেট উপযুক্ত মনে করিলে অভিযুক্তকে দায়রায় সোপর্দ করেন। দায়রা মামলার শুনানী জেলা ও দায়রা জজগণের নিকট হয়। তাঁহারা জুরীর সাহায্যে বিচার করেন। জেলা বিচারপতিদের বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটদের রায়ের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে আপীল করিতে হয়। কোন গুরুতর অপরাধের অভিযোগ থাকিলে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে হাই কোর্টে দায়রায় সোপর্দ করিতে পারেন। হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে।

সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court) :

বর্তমান সংবিধান অনুসারে ভারতে একটি সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রীম কোর্ট আছে। তাহা একজন প্রধান বিচাপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতিকে লইয়া গঠিত। বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক নিযুক্ত হন। যিনি অন্যূন পাঁচ বৎসর কাল কোন হাই কোর্টের বিচারপতি ছিলেন, কিংবা যিনি অন্যূন দশ বৎসর কাল কোন হাই কোর্টের আইনজীবী (Advocate) ছিলেন, কিংবা যিনি রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক বিশেষ আইনজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত

হন, তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে হইলে, একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। প্রথমে তাঁহার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় আইন-সভার উভয় কক্ষে অক্ষমতা কিংবা অন্যায় আচরণের অভিযোগ আনিতে হয়। সেই অভিযোগ আইন-সভার প্রত্যেক কক্ষের মোট সদস্যের অন্ততঃ অর্ধেক সদস্য দ্বারা এবং আলোচনাকালে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা সমর্থিত হইতে হয়। তখন উভয় কক্ষের অনুরোধক্রমে রাষ্ট্রপতি সেই বিচাপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টে এক জন প্রধান বিচারপতি ও সাত জন বিচারপতি আছেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি-গণ পদত্যাগ না করিলে বা পদচ্যুত না হইলে, ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন। প্রধান বিচারপতি মাসিক ৫০০০৲ এবং অপর বিচারপতিগণ মাসিক ৪০০০৲ বেতন পান।

দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে বা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মতভেদ হইলে, সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান অনুসারে তাহার বিচার করিবে। সুতরাং সুপ্রীম কোর্টকে ভাবতীয় সংবিধানের রক্ষক বলা চলে। সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত কোন মামলা বা অন্যূন বিশ হাজার টাকার দাবীর মামলা সম্পর্কে হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। নিম্ন আদালতের বিচাবে খালাস-পাওয়া কোন আসামীর যদি হাই কোর্টে আপীলের বিচারে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়, তবে এই আসামী সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কোন বিষয়ে পরামর্শ চাহিলে সুপ্রীম কোর্ট তাঁহাকে পরামর্শ দেয়। সংবিধানে প্রদত্ত কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে, কোনও নাগরিক তাহার প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করিতে পারে।

প্রশ্ন

১। সুপ্রীম কোর্টের গঠন এবং ক্ষমতা বর্ণনা কর। (পৃঃ ১৩৮-১৩৯)

২। ভারতের বিচার-ব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (পৃঃ ১৩৭-১৩৯)

দশম অধ্যায়

ভারতে রাজনৈতিক দল

(The Indian Political Parties)

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব প্রায় অপরিহার্য। এক-একটি নীতির সমর্থনকারীরা এক-একটি দল গঠন করে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে প্রধানতঃ তিনটি দল ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ও জাতীয়তার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল জাতীয় কংগ্রেস এবং ধর্মের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা। স্বাধীনতা-লাভের পরও এই সকল রাজনৈতিক দল বিদ্যমান আছে এবং নূতন রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছে।

বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে চারিটি রাজনৈতিক দল সর্বভারতীয় দল বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইহাদের নাম হইল—(ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, (খ) কমিউনিস্ট দল, (গ) প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল এবং (ঘ) ভারতীয় জনসংঘ।

(ক) জাতীয় কংগ্রেস (The Congress Party) :

বর্তমানে জাতীয় কংগ্রেসই ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল। আইন-সভায় এই দলেরই প্রাধান্য। কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে এই দলই মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে। বিগত নির্বাচনে এই দল মোট প্রদত্ত ভোটের প্রায় শতকরা আটচল্লিটি ভোট পাইযাছিল।

অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দলের নীতিরও কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ইহার প্রধান নীতি ছিল। এখন আর সেই সংগ্রামের প্রয়োজন নাই বলিয়া অন্য নীতি ইহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধান, আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রচেষ্টা প্রভৃতি ইহার কর্ম-তালিকায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। জাতীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে।

(খ) কমিউনিস্ট দল (Communist Party) :

শক্তি এবং সংগঠনের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, জাতীয় কংগ্রেস দলের পরেই কমিউনিস্ট দলের স্থান। বিগত সাধারণ নির্বাচনে এই

দল মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা প্রায় নয় ভাগ ভোট পাইয়াছিল। এই দল লোকসভায় ২৭টি আসন লাভ করিয়াছিল।

ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের উদ্দেশ্য হইল ভারতে শ্রেণীহীন, বর্ণহীন, সাম্যবাদী একটি সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। মার্কিন এবং বৃটিশ রাষ্ট্রশক্তি ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই দল এই শক্তিগুলির বিরোধী মনোভাব পোষণ করে। ভারত কমনওয়েলথের সভ্য থাকুক, এই দল ইহা চাহে না। এই দল মনে করে যে, যদি শ্রমের জন্য ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা, ভূমির পুনর্বন্টন-ব্যবস্থা এবং শিল্প-পরিচালনে শ্রমিকদের অধিকার প্রদান করা যায়, তবেই ভারতে সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে। এই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া ইহারা কার্যে অগ্রসর হইতেছে।

(গ) প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল (Praja-Socialist Party) :

পূর্বেকার কৃষক-মজদুর-প্রজা দল এবং সমাজতন্ত্রী দল মিলিত হইয়া এই প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হইয়াছে। স্বাধীনতা-লাভের পূর্বে এই দলের নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সভ্য ছিল। স্বাধীনতা-লাভের পর নীতিগত মতানৈক্যের ফলে ইহারা নূতন দুইটি দল গঠন করিয়াছিল। পরে এই দুই দল মিলিত হইয়া প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল গঠন করিয়াছে। বিগত নির্বাচনে এই দল মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা আট ভাগ ভোট লাভ করিয়াছিল। কৃষকগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন, ব্যাঙ্ক, খনি প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্তে আনয়ন, শিল্প প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, ধনীদের উপর সম্পদ-কর স্থাপন প্রভৃতি এই দলের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) ভারতীয় জনসংঘ (Jana Sangha) :

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় এই দল সর্বপ্রথম গঠিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার মৃত্যুর পর এই দলের শক্তি কিছু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনে এই দল মোট প্রদত্ত ভোট-সংখ্যার শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ ভোট পাইয়াছিল।

(ঙ) অন্যান্য দল (Other Parties) :

এই দলগুলি ভিন্ন ভারতে এখনও হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ইহাদের প্রতিপত্তি কমিয়া আসিতেছে। মনে হয়, ধীরে ধীরে ভারতে দ্বি-দলীয় প্রথাই বজায় থাকিবে।

প্রশ্ন

১। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (পৃঃ ১৪০-১৪১)

একাদশ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান

(Local Self-Government)

প্রত্যেক দেশেই এমন কতগুলি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান থাকে, যেগুলির কার্যকলাপ স্থানীয় লোকেদের জন্যই স্থানীয় লোকেদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এইগুলিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান বলা হয়। অতি প্রাচীনকালে, মৌর্য যুগেও, আমাদের দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল। কালক্রমে এইগুলি লোপ পাইয়াছিল। বৃটিশ আমলে ভারতীয়গণ সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ক্রমেই অধিকতরভাবে হস্তগত করে। বর্তমানে দেশে যে-সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) নাগরিক ও (২) গ্রাম্য। নাগরিক স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান-গুলির উদাহরণ হইল কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি শহর এলাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত। গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলির উদাহরণ ছিল জেলা বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড। বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েৎ, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ এবং জেলা পরিষদ্ ইহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। শহর বহির্ভূত অঞ্চলের জন্যই এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত।

মিউনিসিপ্যালিটি (Municipality) :

প্রায় প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা আছে। পৌরসভার সভ্যদিগকে 'কমিশনার' বলা হয়। বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে কমিশনারের সংখ্যা বিভিন্ন রকম। সভ্য-সংখ্যা সরকার-কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়। তাহা ৯-এর কম এবং ৩০-এর বেশী হইতে পারে না। প্রত্যেক পৌরসভার কার্যকাল ৪ বৎসর। ৪ বৎসর বাদে নূতন করিয়া পৌরসভা গঠিত হয়। তবে সরকার ইচ্ছা করিলে কার্যকাল এক বৎসর বাড়াইয়া দিতে পারে।

পৌরসভার সদস্যগণ একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) নির্বাচিত করেন। সভ্যগণের সিদ্ধান্ত-অনুসারে সভাপতিই পৌরসভার সকল কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। পৌরসভার বার্ষিক আয় এক লক্ষের বেশী হইলে একজন কর্মকর্তা

(Executive Officer) নিযুক্ত করা হয়। পৌরসভার কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য পৌরসভা স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিতে পারে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মারফৎ রাজ্য সরকার পৌরসভাগুলির উপর কর্তৃত্ব করে।

পৌরসভাগুলি শহরের মধ্যে পথঘাট নির্মাণ ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে। পথে আলোকদানের ব্যবস্থা, আবর্জনা, মল প্রভৃতি পরিষ্কারের ব্যবস্থা, জল-নিকাশের ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, বস্তির উন্নয়ন ব্যবস্থা, শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্যও তাহাদের করণীয়। তাহারা জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখে, প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টা করে। শ্মশান, গোরস্থান প্রভৃতিও পৌরসভারই কর্তৃত্বাধীনে থাকে।

মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার অন্তর্গত বাড়ী ও জমির উপর ধার্যকৃত কর, ব্যবসায় ও বৃত্তির উপর ধার্যকৃত কর, জীবজন্তুর উপর ধার্যকৃত কর, যানবাহনের উপর ধার্যকৃত কর, খেয়াঘাট ও পুল প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত কর হইতেই পৌরসভাগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ পাইয়া থাকে। রাজ্য সরকারও মাঝে মাঝে পৌরসভাগুলিকে সাহায্য দেয়। রাজ্য সরকারের অনুমতি লইয়া পৌরসভাগুলি টাকা ধারও করিতে পারে।

কর্পোরেশন (Corporation) :

কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরের পৌরসভাগুলিকে কর্পোরেশন বলা হয়। নিম্নে কলিকাতা কর্পোরেশন সম্পর্কে একটি বিবরণী দেওয়া হইল। তাহা হইতে কর্পোরেশন সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশন (Calcutta Corporation) : ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে নূতন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন অনুসারে প্রথম ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন হইয়াছে। পূর্বে কর্পোরেশনে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচনের ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। উক্ত আইন অনুসারে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীর বা বস্তির যাঁহারা মালিক, কর্পোরেশনকে যাঁহারা রেট, ট্যাক্স বা লাইসেন্স ফী দেন, যে-সকল বস্তির বাসিন্দা অন্ততঃপক্ষে মাসিক চারি টাকা ভাড়া দেন, অন্য বাড়ীর যে সকল বাসিন্দা অন্ততঃপক্ষে মাসিক আট টাকা ভাড়া দেন, যাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করিয়াছেন। তাঁহাদের বয়স অন্ততঃপক্ষে ২১ বৎসর হইলে তাঁহারা সকলেই কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনে ৭৭ জন কাউন্সিলর আছেন। তন্মধ্যে ৭৫ জন নির্বাচিত হন এবং কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সভাপতি ও পোর্ট ট্রাস্টের সভাপতি স্ব স্ব পদাধিকারবলে বাকি দুইটি আসন পান। অতঃপর কাউন্সিলরগণ ৫ জন অলডারম্যান নির্বাচিত করেন। কাউন্সিলর ও অলডারম্যানদের কার্যকাল ৩ বৎসর।

বৎসরের প্রথম অধিবেশনে কর্পোরেশনের সদস্যদের মধ্য হইতে একজন **মেয়র** (Mayor) ও **ডেপুটি মেয়র** (Deputy Mayor) নির্বাচিত হন। তাঁহাদের কার্যকাল এক বৎসর। মেয়র এবং মেয়রের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়র কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। কর্পোরেশনে একজন ক্ষমতাশালী কর্মচারী আছেন। তাঁহাকে কর্পোরেশনের **কমিশনার বা প্রধান কর্মকর্তা** (Commissioner) বলে। তিনি রাজ্য সরকার-কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। কার্যকাল ফুরাইলে তিনি আর একবার পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতে পারেন। তিনি কর্পোরেশনের সদস্য নহেন, কিন্তু কর্পোরেশনের সমগ্র পরিচালন-ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে। তিনি কর্পোরেশনের সভায় যোগ দেন, কিন্তু তিনি ভোট দিতে পারেন না। কর্পোরেশনের সকল দলিলপত্র গচ্ছিত রাখিবার দায়িত্ব তাঁহার। কর্পোরেশনের কোনও প্রস্তাব রাজ্য সরকার-কর্তৃক অগ্রাহ্য না হইলে তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে বাধ্য থাকেন। জরুরী অবস্থায় তিনি কর্পোরেশনের বা স্থায়ী কমিটির অনুমতি না লইয়া কোন কাজের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন—তবে সে কাজের জন্য দশ হাজার টাকার বেশী ব্যয় হইলে চলিবে না। আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার আইন-সঙ্গত ক্ষমতায় কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হিসাব, কর ও অর্থ, শহরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, পূর্তকার্য এবং গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে একটি করিয়া **স্থায়ী কমিটি** আছে। কোন সদস্য একাধিক স্থায়ী কমিটির সদস্য হইতে পারেন না। কর্পোরেশনের চারি-পাঁচটি পল্লী লইয়া এক-একটি করিয়া **আঞ্চলিক কমিটি** গঠনের ব্যবস্থা আছে।

কর্পোরেশনের কাজ নানাবিধ। উহা রাস্তাঘাট, পার্ক, মাঠ প্রভৃতি রক্ষা করে; রাজপথগুলিতে আলোর ব্যবস্থা করে, জল দেয় এবং সেগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। অশোধিত ও শোধিত জল সরবরাহ করা উহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। শহরের নালা-নর্দমার সুব্যবস্থা করাও কর্পোরেশনের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। উহা শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করিবার ভার ও

দায়িত্ব নয়। শহরের বাজার, কসাইখানা, শ্মশান, দমকল প্রভৃতির পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ভার কর্পোরেশনের হাতেই থাকে। শহরের প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের ভারও বহুল পরিমাণে কর্পোরেশন গ্রহণ করে। কর্পোরেশনের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগার ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত যাদুঘর (কমার্শিয়াল মিউ-জিয়াম) আছে। কর্পোরেশনের উপর শহরের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখার ভারও আছে।

উপরি-উক্ত দায়িত্বগুলি পালন করিতে কর্পোরেশনের প্রচুর টাকা ব্যয় হয়। এই টাকা নানারূপ কর, লাইসেন্স ফী প্রভৃতি হইতেই প্রধানতঃ আসে। জমি ও বাস্তুর বার্ষিক আয় বা মূল্যের শতকরা ২০৲ হিসাবে কর ধার্য করা হয়। মালিক এবং অধিবাসী উভয়কেই কর দিতে হয়। বাজার, খাস সম্পত্তি প্রভৃতি হইতেও কর্পোরেশনের কিছু আয় হয়।

ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট (Improvement Trust): প্রধানতঃ বস্তি সমস্যা দূরীকরণ এবং সুপরিকল্পিতভাবে শহর গঠন ও সম্প্রসারণের জন্য এক প্রকার স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাকে বলা হয় ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট। কলিকাতা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি শহরে এইরূপ প্রতিষ্ঠান আছে। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের হাওড়া শহরেও একটি ট্রাস্ট গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট সরকার-কর্তৃক নিযুক্ত এক জন সভাপতি ও অপর দশ জন সদস্য লইয়া গঠিত। উক্ত দশ জন সদস্যের মধ্যে চারি জন সরকার-কর্তৃক নিযুক্ত হন; চারি জনকে কর্পোরেশন নির্বাচন করে; বাকি দুই জন বিভিন্ন বণিক-সভার প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হন। কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে প্রদত্ত সাহায্য, জনসাধারণের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ এবং নূতন উন্নত জমির বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতেই প্রধানতঃ এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-নির্বাহ হয়। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট বস্তি অঞ্চল পরিষ্কার করে, নূতন রাস্তা, পার্ক, খেলাধূলার মাঠ প্রভৃতি গড়িয়া তোলে।

পোর্ট ট্রাস্ট (Port Trust): কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ভিজাগাপট্টম্ প্রভৃতি ভারতের প্রধান বন্দরগুলির উন্নতি, রক্ষা ও পরিচালনার জন্য পোর্ট ট্রাস্টগুলি রহিয়াছে। কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্ট ১৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত। বিভিন্ন বণিক্-প্রতিষ্ঠান হইতে ১১ জন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে ১ জন সদস্য নির্বাচিত হন। সরকার ৫ জন সদস্যকে মনোনীত করে। কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্ট কলিকাতা বন্দরের কার্যাদি পরিচালনা করে। পোতাশ্রয়, ডক, জেটি, গুদাম, মালপত্র রাখিবার ঘর প্রভৃতির নির্মাণ ও মেরামত তাহারাই করিয়া থাকে। তাহারা স্টীমার-যোগে খেয়া পারাপারের এবং বন্দরে আগত

জাহাজগুলির পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। নদীপথ পরিষ্কার রাখাও তাহাদের কর্তব্য। হাওড়া পুলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহাদের উপরেই থাকে। জাহাজ চলাচলের দরুন প্রাপ্য অর্থ ও গুদাম ভাড়া প্রভৃতি হইতেই ট্রাস্টের প্রধান আয় হয়। কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টের বার্ষিক আয় প্রায় তিন কোটি টাকা।

ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড (Cantonment Board): যে-সকল শাহরিক অঞ্চলে সেনানিবাস থাকে, সেই সকল অঞ্চলে ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড নামে এক প্রকার প্রতিষ্ঠান আছে। ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ডগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে থাকে।

জেলা বোর্ড (District Board): গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জেলা বোর্ড প্রধান। সেগুলির ক্ষমতা সমগ্র জেলায় বিস্তৃত। শহর অঞ্চল ইহার এলাকার বাহিরে। বোর্ডের সভ্যগণ সকলেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সদস্য-সংখ্যা কম পক্ষে ৯ জন হওয়া চাই। তবে কার্যতঃ উহা ১৮ হইতে ৩৩-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সদস্যগণ সাধারণতঃ লোক্যাল বোর্ড-কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। যেখানে লোক্যাল বোর্ড নাই, সেখানে তাঁহারা ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির ভোট-দাতাগণের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। সদস্যগণ সাধারণতঃ চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে এক জন সভাপতি ও এক জন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। সভাপতিই বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা।

জেলার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও যানবাহনের সুব্যবস্থা করাই জেলা বোর্ডের প্রধান কর্তব্য। জেলা বোর্ড পথকর (রোড-সেস) হইতেই তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থের একটি মোটা অংশ পায়। জমির খাজনার উপর টাকাপ্রতি এক পয়সা হিসাবে এই কর ধার্য হয়। খোঁয়াড়, খেয়াঘাট, রাস্তা ও পুল হইতেও জেলা বোর্ডের আয় হয়। রাজ্য সরকারগুলি জেলা বোর্ডগুলিকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য দেয়। সরকারের অনুমতিক্রমে বোর্ড ঋণগ্রহণ করিতে পারে।

জেলা বোর্ডের আয়ের শতকরা ৫ ভাগ অফিস-সংক্রান্ত ব্যাপারে, ২৫ ভাগ জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যাপারে, ১৭ ভাগ পথ নির্মাণ ও মেরামত ব্যাপারে, ১৫ ভাগ শিক্ষার ব্যাপারে এবং ৫ ভাগ জল-সরবরাহ ব্যাপারে ব্যয়িত হয়। বাকি অংশ অন্যান্য খাতে খরচ হইয়া থাকে।

পঞ্চায়েত প্রথা চালু হওয়ার পর পশ্চিম বঙ্গে জেলা বোর্ডের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।

লোক্যাল বোর্ড (Local Board): জেলা বোর্ডের নীচে মহকুমায় থাকে লোক্যাল বোর্ড বা তালুক বোর্ড। কমপক্ষে ৬ জন সভ্য লইয়া এই বোর্ড

গঠিত হয়। এই বোর্ডের সদস্য কত জন হইবে সরকার তাহা ধার্য করিয়া দেয়। মোট সভ্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত হয়। সভাপতি ও সহ-সভাপতি সভ্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

লোক্যাল বোর্ডগুলিকে জেলা বোর্ডের শাখা বলা চলে। সেগুলির নিজস্ব কোনও আয়ের উপায় নাই। জেলা বোর্ড-কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে জেলা বোর্ড-কর্তৃক হস্তান্তরিত কতিপয় বিষয় তাহারা পরিচালনা করে। বর্তমানে অনেক রাজ্যে লোক্যাল বোর্ড তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে অনেক কাল হইতেই লোক্যাল বোর্ড নাই।

ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board) : কতগুলি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন হয়। ইউনিয়ন বোর্ড ইউনিয়নের কার্য পরিচালনা করে। ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য-সংখ্যা ৯-এর মধ্যে থাকে। সকল সভ্যই নির্বাচিত হন। যাঁহারা সাইত্রিশ পয়সা ইউনিয়ন কর বা পঞ্চাশ পয়সা সেস দেন, যাঁহাদের উপযুক্ত শিক্ষা আছে, তাঁহাদের বয়স কম-পক্ষে ২১ হইলে তাঁহারা ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। সরকারী কর্মচারী সার্কেল অফিসার বোর্ডের তত্ত্বাবধান করেন। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর নির্বাচন হয়। বোর্ডের সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে এক জন সভাপতি (President) নির্বাচন করেন। সভাপতিই বোর্ডের কর্মকর্তা।

গ্রামগুলির শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং গ্রামের পথঘাট তৈয়ার ও মেরামত করাই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান কর্তব্য। জন্ম-মৃত্যুর হিসাবও তাহারা রাখে। ছোটখাট বিচারের ভারও তাহাদের উপর থাকে।

ইউনিয়ন কর এবং সরকার ও জেলা বোর্ড-কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য হইতেই ইউনিয়ন বোর্ড প্রধানতঃ তাহাদের ব্যয় নির্বাহ করে। লাইসেন্স ফী ও জরিমানা বাবদও তাহারা কিছু টাকা পায়। খেয়া হইতেও কিছু আয় হয়। শান্তিরক্ষার জন্য চৌকিদার ও দফাদার রাখিতে হয়। ইউনিয়নের আয়ের প্রায় অর্ধেক সেজন্যই ব্যয় হয়। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, নর্দমা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পুল ও পথ প্রভৃতির খাতে শতকরা ২৬৲ টাকা ব্যয় হয়। বাকি টাকা ইউনিয়ন বেঞ্চ, ইউনিয়ন কোর্ট ও খেয়া ব্যবস্থার জন্য খরচ হইয়া থাকে।

পশ্চিম বঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং অঞ্চল পঞ্চায়েৎ স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামের লোকেদের মধ্য হইতে সভ্য লইয়া গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠিত হইতেছে। আবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি লইয়া অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে। পঞ্চায়েতে নির্বাচিত এবং মনোনীত এই দুই প্রকারের সভ্য থাকিবে। এই সকল পঞ্চায়েতের

কার্য দেখাশুনা করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। গ্রাম এবং অঞ্চল পঞ্চায়েৎ যাহাতে ইউনিয়ন বোর্ড অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হইয়া অধিকতর যোগ্যতা এবং তৎপরতার সহিত পল্লী-অঞ্চলের শাসনকার্য সম্পন্ন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

পঞ্চায়েৎ প্রথা : ১৯৫৬ সালে গ্রাম পঞ্চায়েৎ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সকল অঞ্চলে ইতিমধ্যে পঞ্চায়েতের গঠন কার্য শেষ হইয়াছে। ১৯৬৪ সালের ২রা অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে পশ্চিম বঙ্গে পঞ্চায়েতের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রাম পঞ্চায়েৎ : পঞ্চায়েতের বিধান-অনুসারে এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া একটি গ্রামসভা গঠিত হইয়াছে। বিধান সভার নির্বাচনে যাহারা ভোট দিতে পারে তাহারা সকলে এই গ্রামসভার সদস্য। এই গ্রামসভাকে ছয় মাস পর একটি ষাণ্মাসিক এবং এক বৎসর পর একটি বার্ষিক সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েৎ গ্রামসভার কার্যকরী সমিতি। এই পঞ্চায়েৎ নয় হইতে পনের জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ইহা ছাড়াও ইহাতে মনোনীত সদস্যও থাকিতে পারে। তবে মনোনীত সদস্যগণের ভোটের অধিকার নাই। তাহারা পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতে পারে না। পঞ্চায়েতের কার্যকাল চারি বৎসর। অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিদিনের কার্য পরিচালনার জন্য দায়ী।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ, জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জনগণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, পুকুর, গোচারণ ভূমি, শ্মশান প্রভৃতি সংরক্ষণ উল্লেখযোগ্য।

রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা প্রসার, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসূতি সদন প্রভৃতি স্থাপন, সমবায় কৃষি প্রবর্তন প্রভৃতির ভারও গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর অর্পণ করিতে পারে।

অঞ্চল পঞ্চায়েৎ : গ্রামের পরবর্তী স্তরের জন্য যে পঞ্চায়েৎ গঠিত হয় তাহাকে বলা হয় অঞ্চল পঞ্চায়েৎ। একই এলাকা-ভুক্ত কয়েকটি গ্রামসভা লইয়া একটি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গঠিত। ইহার সদস্য-সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই। প্রত্যেক ২৫০ জন গ্রামসভার সদস্যের জন্য এক জন করিয়া অঞ্চল সভার সদস্য নির্দিষ্ট আছে। কাজেই অঞ্চল পঞ্চায়েতের সদস্য-সংখ্যা ঐ অঞ্চলের গ্রামসভায় সদস্যের মোট সংখ্যার উপর নির্ভর করে। সদস্যগণের কার্যকাল চারি বৎসর।

অঞ্চল পঞ্চায়েতের সদস্যগণ এক জন প্রধান ও এক জন উপপ্রধান নির্বাচন করেন। প্রধান দৈনন্দিন কার্য পরিচালনের জন্য দায়ী। উপপ্রধান প্রধানের অনুপস্থিতে কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে।

অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ অঞ্চলের শান্তি রক্ষা করা। এইজন্য পঞ্চায়েৎ দফাদার ও চৌকিদার নিযুক্ত করে। ইহা ছাড়া স্বায়ত্ত শাসনের আরও অন্যান্য কাজও ইহার থাকিতে পারে।

অঞ্চল পঞ্চায়েৎ কর ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। এই অর্থ দিয়া ইহা নিজ কার্য সম্পন্ন করে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিজ কার্য করিবার জন্য অর্থ সাহায্য দেয়।

অঞ্চলের ছোটখাট অপরাধের বিচারের জন্য অঞ্চল পঞ্চায়েৎ একটি ন্যায় পঞ্চায়েৎ গঠন করবে। ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণ গ্রামসভার সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হয়।

পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড প্রথা লোপ পাইয়াছে।

জেলা পরিষদ্ : পশ্চিম বঙ্গে এখন জেলা বোর্ড লোপ পাইয়াছে। ইহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে জেলা পরিষদ্। নিম্নপ্রকারের সদস্য লইয়া এই জেলা পরিষদ্ গঠিত :—

১। বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি,

২। প্রত্যেক মহকুমার অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে অধ্যক্ষগণ দ্বারা নির্বাচিত দুই জন অধ্যক্ষ,

৩। জেলা হইতে লোকসভা এবং বিধান সভার নির্বাচিত সদস্যগণ (মন্ত্রীরা সদস্য হইতে পারেন না),

৪। জেলাবাসী রাজ্য সভার এবং বিধান পরিষদের সদস্যগণ,

৫। রাজ্য সরকার-কর্তৃক নিযুক্ত জেলায় বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠানের এক জন পৌর-প্রধান,

৬। অন্যভাবে দুই জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত না হইয়া থাকিলে রাজ্য সরকার-কর্তৃক মনোনীত দুই জন মহিলা সদস্য,

৭। জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি।

ইহা ছাড়া জেলার সব-ডিভিসনের অফিসারগণ এবং জেলা পঞ্চায়েৎ প্রাধিকারিকও ইহার সদস্য। ইহাদের কার্যকাল চারি বৎসর। এই পরিষদের উপরি-উক্ত প্রথম, দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর সদস্যগণ এক জন সভাপতি

(Chariman) এবং এক জন সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) নিযুক্ত করে। ইহারা দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য দায়ী। পরিষদে সরকার-নিযুক্ত এক জন কর্মকর্তা (Executive Officer) এবং পরিষদ-কর্তৃক নিযুক্ত এক জন কর্মসচিব (Secretary) আছে। পরিষদ্-নিযুক্ত অন্যান্য কর্মচারীর সাহায্যে পরিষদ্ তাহার কর্ম সম্পাদন করে।

জেলা পরিষদ্ নিম্নলিখিত কর্ম সম্পাদনের জন্য দায়ী :—

১। কৃষি, সমবায়, সেচ, জনস্বাস্থ্য, কুটির শিল্প প্রভৃতির উন্নয়ন,

২। সরকার-কর্তৃক অর্পিত উন্নয়ন কার্য সম্পাদন,

৩। বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতিকে সাহায্য দান,

৪। হাট-বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ,

৫। আঞ্চলিক পরিষদ্‌কে অর্থ সাহায্য করা এবং তাহাদের হিসাব পরীক্ষা,

৬। জেলার উন্নয়নের জন্য জেলা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দান।

নিজ কার্য সম্পাদনের জন্য জেলা পরিষদের যে অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহের উপায় নিম্নরূপ :—

১। যানবাহন, পশু প্রভৃতির উপর ধার্য কর,

২। খেয়ার শুল্ক,

৩। যানবাহন, নৌকা প্রভৃতি পঞ্জীভুক্ত করার জন্য কর,

৪। জল-সরবাহের জন্য রেট বা ফী,

৫। আলো সরবরাহের জন্য রেট বা ফী,

৬। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার-কর্তৃক বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য অর্থ সাহায্য।

ইহা ছাড়া নিজ কার্য সম্পাদনের জন্য রাজ্য সরকারের অনুমতি-ক্রমে জেলা পরিষদ্ ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

আঞ্চলিক পরিষদ : জেলার বিভিন্ন ব্লকের জন্য একটি একটি আঞ্চলিক পরিষদের ব্যবস্থা হইয়াছে। আঞ্চলিক ব্লক নিম্নরূপ সদস্য লইয়া গঠিত :—

(১) অঞ্চল প্রধানগণ, (২) অধ্যক্ষগণ-কর্তৃক নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত এক জন অধ্যক্ষ, (৩) ঐ অঞ্চলের লোকসভার এবং বিধান সভার নির্বাচিত সদস্যগণ (মন্ত্রিগণ ব্যতীত), (৪) ঐ অঞ্চলের রাজ্য সভা এবং বিধান পরিষদের সদস্যগণ, (৫) দুই জন স্ত্রীলোক, (৬) অনুন্নত শ্রেণীর দুই জন প্রতিনিধি, (৭) দুই জন সমাজসেবী।

ইহা ছাড়া ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তাও ইহার সদস্য। ইনি এই পরিষদের প্রধান কার্যনির্বাহক (Chief Executive Officer)। পরিষদের কার্যকাল চারি বৎসর।

আঞ্চলিক পরিষদের কার্যগুলি নিম্নরূপ :—

১। কৃষি, কুটির শিল্প, সমবায়, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, জল-সরবরাহ প্রভৃতির উন্নয়ন ব্যবস্থা,

২। বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতিকে অর্থ সাহায্য দান,

৩। সরকার-নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন,

৪। অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমন্বয় সাধন।

ইহার আয়ের উৎস :—

১। যানবাহন, জন্তু-জানোয়ারের উপর ধার্য-কর,

২। যানবাহন প্রভৃতিকে পঞ্জীভুক্ত করার ফী,

৩। ফেরীর উপর ধার্য শুল্ক,

৪। জল-সরবরাহের জন্য ফী ইত্যাদি।

যদি রাজ্য সরকার মনে করে যে জেলা পরিষদ্ ও অঞ্চল পরিষদ্ যোগ্যতার সহিত নিজ কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না কিংবা নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছে, তবে রাজ্য সরকার অনধিক দুই বৎসর কালের জন্য পরিষদ্ বাতিল করিয়া কার্য পরিচালনের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (Administrator) নিযুক্ত করিতে পারে।

প্রশ্ন

১। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (পৃঃ ১৪২-১৪৮)

২। জেলা বোর্ডগুলির গঠন ও কাজ কিরূপ লিখ। (পৃঃ ১৪৬)

৩। পশ্চিম বঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সম্পর্কে কি জান ? (পৃঃ ১৪২-১৪৩)

৪। পশ্চিম বঙ্গের ইউনিয়ন বোর্ডগুলির গঠন কার্য বর্ণনা কর। (পৃঃ ১৪৭-১৪৮)

৫। কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। (পৃঃ ১৪৩-১৪৫)

৬। অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন এবং কার্যাবলী বর্ণনা কর। (পৃঃ ১৪৮-১৪৯)

৭। জেলা পরিষদ ও অঞ্চল পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। (পৃঃ ১৪৯-১৫১)

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতে নাগরিক জীবন

ইয়োরোপ বা আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যখন ভারতের তুলনা করা হয়, তখন ভারতকে স্বল্পোন্নত দেশ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহার সঙ্গত কারণ আছে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলেই দেখা যায় ভারত একটি স্বল্পোন্নত দেশ। তাহা ছাড়া ভারতের শহরাঞ্চলের এবং পল্লী-অঞ্চলের জীবনযাত্রার পদ্ধতি আদিম যুগের পদ্ধতি অপেক্ষা অতি অল্পই উন্নত। বাসস্থান, আহার, বৃত্তি প্রভৃতিতে এখনও আদিম রীতি বিদ্যমান। শিল্প, কৃষিকার্য প্রভৃতিতে এখনও আধুনিক রীতির প্রবর্তন হয় নাই। রাস্তাঘাট, যানবাহন প্রভৃতির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে যে সময়ে নিরক্ষতা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে, সে সময়ে ভারতের জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ষোল-সতের জন সাক্ষরতা অর্জন করিয়াছে। এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে না পারিলে ভারতের উন্নতি-বিধান কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। স্বাধীনতাও ভারতের জনগণের নিকট নিরর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

ভারতের নাগরিক জীবনের সমস্যাগুলিকে গ্রামাঞ্চলের সমস্যা এবং শহরাঞ্চলের সমস্যা এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এদেশের মোট লোক-সংখ্যার শতকরা সতের জন বাস করে শহরে। অবশিষ্ট জনগণের বাস পল্লীতে। জীবনযাত্রার পদ্ধতি, সুযোগ-সুবিধা এই দুই অঞ্চলে পৃথক। সেইজন্য এই দুই অঞ্চলের সমস্যাও পৃথক। কাজেই এই সমস্যাগুলির পৃথকভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

গ্রামাঞ্চলের সমস্যা (Rural Problems) :

ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৩ জন পল্লী-অঞ্চলে বাস করে। ভারতবাসীর অবস্থায় বিচার করিতে হইলে প্রধানতঃ পল্লী-অঞ্চলের লোকের অবস্থার কথাই আলোচনা করিতে হয়। পল্লী-অঞ্চলের লোকেদের প্রধান জীবিকা কৃষি। কৃষিকার্য এখনও আদিম পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। কৃষক জলের জন্য আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি উভয়ই সমানভাবে কৃষির ক্ষতি সাধন করে। কৃষকের সংখ্যার তুলনায় কৃষি কার্যোপযোগী ভূমির পরিমাণ কম। কৃষকগণ সে কারণে পূর্ণ নিয়োগের সুযোগ পায় না। তাহা ছাড়া বৎসরে কয়েক মাস মাত্র কৃষিকার্য চলে। অবশিষ্ট সময় কৃষক বেকার থাকে। পরিচালন করে। ইহাদেরও শিল্প-পরিচালন পদ্ধতি আদিম কতক লোক কুটির

শিল্প যুগের পদ্ধতি অপেক্ষা সামান্য উন্নত। পল্লী-অঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্য নানা কারণে বিপন্ন। লোকেদের উদাসীনতা এবং অজ্ঞতা এইজন্য যেমন দায়ী, সরকারী ব্যবস্থাও সেইরূপ আংশিকভাবে দায়ী। রোগ প্রায়ই মহামারীর আকার ধারণ করে। নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতা গ্রামাঞ্চলের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। শহরাঞ্চল অপেক্ষা পল্লী-অঞ্চলে বাসোপযোগী জমির পরিমাণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও পল্লী-অঞ্চলে বাসোপযোগী গৃহের সংখ্যা কম। দারিদ্র্য ইহার প্রধান কারণ। এইভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় পল্লী-জীবন নানা দিক দিয়া সমস্যা-কণ্টকিত।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Programme) :

পল্লী-অঞ্চলের সর্বপ্রকারের সমস্যার সমাধান-কল্পে ভারতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-বিধান করা এবং এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-বিধান-কার্য পল্লীবাসীদেব নিজস্ব চেষ্টায় সম্পন্ন করা। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে কার্য আরম্ভ হয় ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর। কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে সমাজোন্নয়ন দপ্তব খোলা হয় তাহার কিছুকাল পরে। এখন পল্লী-অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজগুলি এই সমাজোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

গ্রামাঞ্চলের উন্নতি-বিধান করিতে হইলে কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন করিতে হইবে, সেচ, পথঘাট, যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। পল্লীবাসীর বাসগৃহের উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে, কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার দেখা যায়, বিচ্ছিন্নভাবে বা পৃথকভাবে একদিকের উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। যেমন—সেচ-ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষিকার্যব্যবস্থার যোগ রাখিতে হইবে। শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ব্যবস্থার যোগ রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে বাসগৃহের ব্যবস্থার যোগ রাখিতে হইবে। সকল ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করিয়া অগ্রসর হইতে না পারিলে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইবে না। বাস্তবিক সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় সেকথা মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম ন্যূনাধিক তিন শত গ্রাম এবং দুই লক্ষ গ্রামবাসী লইয়া একটি পরিকল্পনা অঞ্চল (Project Area) গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক পরিকল্পনা অঞ্চলকে তিনটি উন্নয়ন অঞ্চলে

(Development Block) ভাগ করা হইয়াছিল। বর্তমানে এই উন্নয়ন অঞ্চলকেই কার্যের ইউনিট হিসাবে ধরা হইয়াছে। উন্নয়ন কার্য সম্পাদনের জন্য যে সংস্থা গঠন করা হইয়াছে, তাহাতে কৃষি, শিল্প, সমবায়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী রহিয়াছে। ইহাদের কার্যের সমন্বয় সাধনের জন্য এবং তত্ত্বাবধানের জন্য একজন উন্নয়ন প্রাধিকারিক (Block Development Officer) রহিয়াছে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের জন্য কয়েকটি গ্রামের জন্য এক জন করিয়া গ্রামসেবক রহিয়াছে। গ্রামসেবক বিভিন্ন বিষয়ের খবরাখবর সংগ্রহ এবং বিতরণ করিয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে উন্নয়ন সংস্থার যোগাযোগ সাধন করে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা আছে। এই অর্থসাহায্য সকল সময়েই শর্তাধীন। যে কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করা হয়, সে কাজের জন্য ঐ অঞ্চলের লোকেদেরও আর্থিক সাহায্য দান এবং শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়। সরকারী অর্থ অপেক্ষা সরকারী কর্মচারিগণের নিপুণ পরামর্শই পল্লীবাসীদের বিশেষ সহায়ক হইবে, একথাই বেশী করিয়া মনে রাখিতে হয়। পরিশেষে উন্নয়ন কার্য সম্পাদনের ভার পল্লীবাসীদের নিজেদের গ্রহণ করিতে হইবে।

পল্লী-অঞ্চলের উন্নতি-বিধানের জন্য পূর্বেও বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে পল্লীর স্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শিক্ষা বিভাগ হইতে শিক্ষার উন্নতি-বিধানের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি বিচ্ছিন্ন বা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক-বিহীন ছিল বলিয়া ফলপ্রসূ হয় নাই। বর্তমান ব্যবস্থায় সেই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া পূর্বের ব্যবস্থায় সরকারী সাহায্য এবং পরিচালনা ছিল বৈশিষ্ট্য। বর্তমান ব্যবস্থায় তাহার পরিবর্তন সাধন করার চেষ্টা হইয়াছে। সরকারী সাহায্যের সঙ্গে জনসাধারণের সাহায্য যুক্ত হইয়াছে। জনসাধারণের সহযোগিতাকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কার্যতঃ যে পরিমাণে জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছে, সে পরিমাণে সহযোগিতা পাওয়া যাইতেছে না। জনসাধারণকে আত্মনির্ভর করিয়া তুলিবার চেষ্টা তেমন ফলবতী হইতেছে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কার্যকাল মধ্যে সমগ্র দেশ সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে আনয়ন করা ছিল ভারতের লক্ষ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা সম্ভব হইল না। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ দিকে ইহা সম্ভব হইয়াছে।

শহরাঞ্চলের সমস্যা (Urban Problems) :

ভারতের শহরগুলির সংখ্যা যেমন একদিকে বাড়িয়া চলিয়াছে, অপর দিকে প্রত্যেকটি শহরের লোকসংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে শহরের সমস্যার সংখ্যা এবং পরিধিও বাড়িয়া চলিয়াছে। বাসগৃহের অভাব, আলো-বাতাসের অভাব, জল-নিকাশের অব্যবস্থা, বালক ও যুবকদের খেলাধূলার মাঠ বা চত্বরের অভাব, ভাল খাদ্যের অভাব প্রভৃতি শহরগুলিতে দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আলো সরবরাহ, উত্তম পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট, খোলা মাঠ নির্মাণ এবং জল-নিকাশের ব্যবস্থা সকল সময়েই করা হয়। শহর কর্তৃপক্ষ বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এদিকে সকল সময়েই যত্নবান হইতে হয়।

বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে তিনটি সমস্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি হইল—খাদ্য সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং বাসস্থান সমস্যা। অন্য সমস্যার স্থায়িভাবে সমাধান সম্ভব। কিন্তু এই সমস্যাগুলি শহরে সকল সময়েই রহিয়াছে এবং এইগুলি মিটাইবার চেষ্টা সকল সময়েই করিতে হয়।

• **খাদ্য সমস্যা (Food Problems) :** খাদ্য সমস্যার দুইটি দিক আছে—পরিমাণগত দিক এবং গুণগত দিক। পরিমাণগত দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, আমাদের দেশে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহাতে মোট চাহিদা মিটে না। দেশের খাদ্যাভাব প্রথম দেখা দেয় ১৯৩৬ সালে, যখন ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে পৃথক হয়। এই সমস্যা আরও জটিল হয় দেশ-বিভাগের পর। ভারতের অংশে খাদ্যশস্য-উৎপাদনকারী জমির ভাগ কমিয়া যায় অথচ লোকসংখ্যা বাড়িয়া যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর জোর দেওয়ার ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু খাদ্যশস্য বাহির হইতে আমদানি করা বন্ধ হয় নাই। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারত বিদেশ হইতে সাড়ে সাতাশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালেও খাদ্যশস্যের অভাব মিটানো সম্ভব হয় নাই। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে খাদ্যশস্যের অভাব অনেকটা দূরীভূত হয় নাই।

খাদ্যের গুণগত দিক আলোচনা করিলে দেখা যায়, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যে-সকল দ্রব্য থাকিলে খাদ্য পুষ্টিকর হয়, ভারতবাসীর খাদ্যের মধ্যে সে সকল জিনিসেরও অভাব রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় দুগ্ধ, মৎস্য প্রভৃতি। ভারতে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা কম নহে। কিন্তু প্রত্যেকটি গাভী গড়পড়তা

যে দুগ্ধ দেয় তাহার পরিমাণ কম। লোকসংখ্যার তুলনায় মৎস্য-উৎপাদনের উপযোগী নদী, খাল, বিল বা জলাশয়ের সংখ্যা খুব কম। তাহা ছাড়া সর্বত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টাও হয় না। কাজেই এ সকল দ্রব্যের অভাব হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে ৩০০০ ক্যালোরি খাদ্য-মূল্য থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে সাধারণ ভারতবাসী যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে, তাহার খাদ্য-মূল্য ২,২০০ ক্যালোরি। কাজেই এদিক হইতে অভাব অনুভূত হয়।

সমগ্র দেশের খাদ্যাভাবের কথা আলোচনা করা হইল। পৃথকভাবে শহরের খাদ্যাভাবের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় গ্রামাঞ্চলে। শহরে মোটেই উৎপন্ন হয় না। যদি কখনও হয় তাহাও অতি সামান্য। কাজেই শহরের খাদ্যশস্যের অভাব পল্লী-অঞ্চল মিটায়। চাউল, গম প্রভৃতি পল্লী-অঞ্চলে পাওয়া গেলে শহরেও পাওয়া যায়। বরং সরকারী ব্যবস্থার ফলে অনেক সময়ে গ্রামাঞ্চলে অভাব থাকিলেও শহরাঞ্চলে চাউল-গমের অভাব থাকে না। কিন্তু টাট্‌কা তরিতরকারি, মাছ কিংবা খাঁটি দুগ্ধ শহরে প্রায় দুর্লভ। অথচ গুণগত দিক হইতে দেখিতে গেলে, খাদ্যের মধ্যে এই সকল দ্রব্যের প্রয়োজনই খুব বেশী। তরিতরকারি বাহির হইতে শহরে আসে। অনেক সময় দূরত্বের জন্য আমদানি করিতে সময় বেশী লাগে। ফলে তরিতরকারি টাট্‌কা থাকে না। মাছের অবস্থাও সেইরূপ। দুগ্ধ সরবরাহের অবস্থা আরও শোচনীয়। বাহির হইতে দুগ্ধ আসে। সেগুলি বিভিন্ন হাতে অধিক হইতে অধিকতর রূপে ভেজাল-যুক্ত হইয়া শহরবাসীর বাড়ীতে প্রবেশ করে। এই দুগ্ধ উপকার না করিয়া অপকারই করে। বিভিন্ন শহরের কর্তৃপক্ষ এখন শহরাঞ্চলে দুগ্ধ-সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছে। কলিকাতার অনতিদূরে হরিণঘাটায় অতি বড় আকারে দুগ্ধ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতায় দুগ্ধের অভাব কিছুটা এই ভাবে মিটিতেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা তেমন কিছুই নহে।

উপরের এই আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, খাদ্যের পরিমাণগত এবং গুণগত এই উভয় দিক হইতে ভারত অভাবগ্রস্ত। ১৯৫৭ সালে নিযুক্ত খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি (Food Grains Enquiry Committee) খাদ্যশস্যের অভাবের কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই অভাব পূরণের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছে। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রত্যেক সমাজোন্নয়নকে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টাকে কার্যসূচীতে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। যতদিন অভাব পূরণ না হয়,

ততদিন বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইবে। লোকেদের খাদ্য-স্বভাবের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। যে অঞ্চলের লোকেরা কেবল ভাতই খায়, তাহারা যাহাতে কিছু কিছু গম-জাত দ্রব্য আহারের অভ্যাসও আয়ত্ত করে, সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। খাদ্যশস্যের বণ্টন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে খাদ্যশস্যের অভাব অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। ১৯৫৯ সালে ফোর্ড ফাউণ্ডেশানের একটি অনুসন্ধানকারী দল অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, ভারতের খাদ্যশস্যের অভাব মোচন করিতে হইলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও এগার কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা এখনও সম্ভব হয় নাই।

স্বাস্থ্য সমস্যা (Health Problems) : ভারতের পল্লী-অঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা উভয়ই মন্দ। অবশ্য শহর এবং পল্লীর সমস্যার প্রকৃতিতে কিছুটা পার্থক্য আছে। এই ধরনের পার্থক্যের বিভিন্ন কারণ আছে। গ্রামের লোকেরা অজ্ঞ। গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে। অনেক ক্ষেত্রেই জল সরবরাহের ব্যবস্থাও ভাল নহে। তেমন শহরে ঘন বসতি, টাট্‌কা খাদ্যের অভাব, ভাল বাসস্থানের অভাব প্রভৃতির জন্য অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই সকল কারণে কোন কোন রোগের আক্রমণ গ্রামে বেশী, আবার কোন কোন রোগের আক্রমণ শহরে বেশী। ম্যালেরিয়ায় গ্রামবাসীরা কিছু আক্রান্ত হয়, আবার যক্ষ্মারোগে বেশী আক্রান্ত হয় শহরবাসীরা।

আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা পৃথিবীর উন্নত যে-কোন দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা অপেক্ষা খারাপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাজারে মৃত্যুর হার ৯·৬, ইংল্যাণ্ডে হাজারে মৃত্যুর হার ১১·৬, আর ভারতে মৃত্যুর হার হাজারে ১৬·৫। শিশু-মৃত্যুর হার আরও বেশী। কেবল মৃত্যুর হার দিয়া নহে, মোটামুটি স্বাস্থ্যের অবস্থা দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায়, সাধারণ ভারতবাসী অন্য দেশবাসী অপেক্ষা কম সুস্থ।

শহরের লোকেদের মন্দ স্বাস্থ্যের প্রধান কারণ হইল শহরে বাসোপযোগী বাসগৃহের অভাব, উন্মুক্ত ময়দান প্রভৃতির অভাব, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব এবং টাট্‌কা ও নির্ভেজাল খাদ্যের অভাব। শহরের স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধান করিতে হইলে এই সকল অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করিতে হইবে। শহরে আজকাল মজুরদের জন্য শিল্পপতিদের সহায়তায় সরকার বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ করাইয়া দিতেছে। অল্প এবং মাঝারি আয়ের লোকেদের গৃহ-নির্মাণের

জন্য ঋণ দিতেছে। বড় বড় শহরে উন্নয়ন সংস্থা (Improvement Trust) বাড়ী, পার্ক প্রভৃতি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে নির্মাণ করিতেছে। শহরের জলাভাব মোচনের জন্য শহর কর্তৃপক্ষকে রাজ্য সরকারগুলি সাহায্য করিতেছে। যথেষ্ট-পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য যাহাতে শহরে সরবরাহ হইতে পারে, সে ব্যবস্থা হইতেছে। সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ছাড়া চিকিৎসার উন্নতি-বিধানের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার প্রভৃতি গড়িয়া তোলা হইতেছে।

বাসস্থান সমস্যা (Housing Problems) : প্রসঙ্গতঃ বাসস্থান সমস্যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বাস্তবিক নাগরিক জীবনে বাসস্থানের সমস্যা এক বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে। শহরের লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু গৃহের সংখ্যা সামান্যই বাড়িতেছে। ঘন বসতির ফলে রোগের, বিশেষ করিয়া সংক্রামক রোগের, আক্রমণ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুন্দর মনোরম পরিবেশে বাস করিতে পারিতেছে না বলিয়া বালক-বালিকাদেরও মানসিক বিকাশ সুষ্ঠু হইতেছে না।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই অবস্থার উন্নতি-বিধানের জন্য ৩৮·৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল। সরকারী সাহায্য শিল্পাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ, স্বল্প-আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গৃহ-নির্মাণের জন্য ঋণদান এবং খনি অঞ্চলে গৃহ-নির্মাণের সাহায্য দানের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ ছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রায় তের লক্ষ গৃহ নির্মিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে ১২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং প্রায় ১৯ লক্ষ গৃহ যাহাতে নির্মিত হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনায় শহরের বস্তি অপসারণের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বস্তি-জীবনের শোচনীয় অবস্থা এবং পরিণতির কথা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন রাজ্য সরকার বস্তির অপসারণ-কল্পে আইন প্রণয়ন করিয়াছে। শহরাঞ্চলের বাসগৃহের সমস্যার যত শীঘ্র সম্ভব সমাধান না হইলে শহর-জীবন কোন ক্রমেই বিপদমুক্ত হইবে না।

প্রশ্ন

১। ভারতের পল্লী-জীবনের সমস্যাগুলি কি? কি উপায়ে এইগুলি সমাধানের চেষ্টা হইতেছে? (পৃঃ ১৫২ ৫৪)

২। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপ বর্ণনা কর। এই পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে নিজ অভিমত প্রকাশ কর। (পৃঃ ১৫৩-৫৪)

৩। শহরাঞ্চলের সমস্যাগুলি কি? এইগুলি সমাধানের উপায় কি? (পৃঃ ১৫৫-১৫৮)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

স্বাধীনতা-লাভের পর ভারত সরকারকে যে-সকল বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বই প্রধান। অত্যন্ত তৎপরতার সহিত ভারত সরকার এই দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যাপক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে দেশরক্ষার জন্য যে বিভিন্ন শ্রেণীর বাহিনী আছে রাষ্ট্রপতি তাহার সর্বাধিনায়ক। কার্যতঃ বিভিন্ন বাহিনীর সংগঠন এবং পরিচালনগত কার্যাদি সম্পন্ন করেন আইন-সভার নিকট দায়িত্বশীল একজন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি স্থল বাহিনী, নৌ বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নিজ কর্তব্য স্থির করেন।

তিন শ্রেণীর বাহিনী, যথা—স্থল বাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং বিমানবাহিনী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ। এই তিন প্রকারের বাহিনীর তিন জন প্রধানকে সৈন্য-বাহিনীর প্রধান এবং প্রধান সেনাপতি (Chief of the Army Staff and Commander-in-chief of the Army), নৌ-বাহিনীর প্রধান এবং নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ (Chief of the Naval Staff and Commander-in-chief of the Navy) এবং বিমান-বাহিনীর প্রধান এবং বিমান-বাহিনীর অধ্যক্ষ (Chief of the Air Staff and Commander-in-chief of the Air Force) বলা হইত। এখন ইহারা যথাক্রমে সৈন্যবাহিনীর প্রধান, নৌ-বাহিনীর প্রধান এবং বিমান-বাহিনীর প্রধান বলিয়া অভিহিত হয়।

সৈন্য-বাহিনী (Army) :

ভারতের সমগ্র সৈন্য-বাহিনী পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ অংশে বিভক্ত। ইহাদের ইস্টার্ণ কম্যাণ্ড, ওয়েস্টার্ণ কম্যাণ্ড এবং সাউদার্ণ কম্যাণ্ড বলা হয়। প্রত্যেক কম্যাণ্ড কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অঞ্চল কয়েকটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত। সৈন্য-বাহিনীর প্রধান কার্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত। সৈন্য-বাহিনীর প্রধানের তত্ত্বাবধানে এই কার্যালয়ের ছয়টি শাখা আছে। একটি শাখা সৈন্য-বাহিনীতে নিয়োগ এবং সৈন্য-বাহিনীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয় শাখা সৈন্য-বাহিনীর শিক্ষার এবং পরিচালনের ব্যবস্থা করে। তৃতীয় শাখা চলাচল, যানবাহন এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। চতুর্থ শাখার কাজ অস্ত্রশস্ত্রের

ব্যবস্থা করা। পঞ্চম শাখা বদলি, পদোন্নয়ন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে। ষষ্ঠ শাখা বিভিন্ন নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন করে।

নৌ-বাহিনী (Navy) :

ভারতের নৌ-বাহিনীকে শক্তিশালী করিবার জন্য আধুনিক ধরনের রণতরী সংগ্রহ করা হইতেছে এবং নৌ-বাহিনীকে উত্তমরূপে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নৌ-বাহিনীরও প্রধান কার্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত। নৌ-বাহিনীর প্রধানকে তাহার কার্যে সহায়তা করিবার জন্য চারি জন সহকারী এবং চারি জন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আছেন। ভারতীয় নৌ-বাহিনীদের সরাসরি সাহায্য কবিবার জন্য একটি বিমান শাখা আছে।

বিমান-বাহিনী (Air Force) :

বিমান-বাহিনীর সংরক্ষণ, পরিচালন এবং শিক্ষার জন্য তিনটি পৃথক শাখা আছে। এই তিনটি শাখাকে যথাক্রমে সংরক্ষণ সংগঠন (Maintenance Command), পরিচালন সংগঠন (Operational Command) এবং শিক্ষা সংগঠন (Training Command) বলা হয়। বিভিন্ন শাখা বিমান-বাহিনীব প্রধানেব অধীনে নিজ কার্য সম্পন্ন কবে। এই বাহিনীবও প্রধান কার্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত।

শিক্ষা-ব্যবস্থা (Training) :

প্রতিবক্ষা-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী কবিয়া তুলিতে হইলে সুষ্ঠু শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। ভাবতে স্থল সৈন্য-বাহিনীব জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে, তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সন্তোষজনক। কিন্তু নৌ-বাহিনীর এবং বিমান-বাহিনীব জন্য সমপর্যায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা এখনও গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। উচ্চতব শিক্ষার জন্য নৌ-বাহিনীর এবং বিমান-বাহিনীর লোকদের কখনও কখনও বিদেশে পাঠাইতে হয়। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানে প্রতিরক্ষা বাহিনীর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে :—

জাতীয় প্রতিরক্ষা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (National Defence Academy) : এই প্রতিষ্ঠান পুণার নিকটে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি বৎসর পনের শত সামরিক শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাকাল তিন বৎসর। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করার পর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সামরিক কলেজে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রতিরক্ষাবাহিনী মহাবিদ্যালয় (Defence Services Staff College) : দক্ষিণ ভারতের ওয়েলিংটন শহরে অবস্থিত এই সামরিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রতি বৎসর ১০০ জন সামরিক অফিসার দশ মাস কাল শিক্ষালাভ করেন। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা শেষ করিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর সামরিক অফিসারগণ উচ্চতর পদে উন্নীত হইবার যোগ্যতা অর্জন করেন।

সৈনিক বিদ্যালয় (Army School) : আগ্রা, ফৈজাবাদ, আমেদনগর, বেরিলি, মৌ প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নপদস্থ সামরিক অফিসারগণকে এবং সাধারণ সৈন্যগণকে এইসকল বিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

নৌ-বাহিনী শিক্ষাকেন্দ্র (Naval Training Centre) : বিশাখাপত্তনম, বোম্বাই এবং কোচিনে এই নৌ-বাহিনী শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অবস্থিত। নৌ-বাহিনীর শিক্ষার্থিগণকে এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই সকল কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত নৌ-বাহিনীর শিক্ষার্থিগণের মধ্যে কয়েক জনকে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে পাঠানো হইয়া থাকে।

বিমান-বাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র (Training of the Air Force) : বিমান-বাহিনীর শিক্ষার্থিগণের শিক্ষার জন্য যোধপুরে এবং বেগমপেটে কলেজ আছে। বিমান-বাহিনীর অফিসারগণের উচ্চতর শিক্ষার জন্য কোয়েমবাটরে কলেজ আছে। তাহা ছাড়া বিমান-বাহিনীর সাধারণ শিক্ষার্থিগণের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় আছে।

স্বেচ্ছাধীন প্রতিরক্ষা সংগঠন (Voluntary Defence Organisation) : ভারত একটি গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের নাগরিকদের বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে দেশরক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করা অন্যতম। সকল নাগরিকেরই সেই কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। সামরিক শিক্ষা না থাকিলে এই কর্তব্য পালন করা কঠিন। সেইজন্য গণতন্ত্রের সরকার নাগরিকগণের ইচ্ছাধীন সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই ধরনের শিক্ষা প্রদানের জন্য ভারতে চারিটি সামরিক শিক্ষা-সংগঠন আছে। এই চারিটি সংগঠনের নাম—(ক) আঞ্চলিক সৈন্য-বাহিনী (Territorial Army), (খ) লোক-সহায়ক সেনা (National Volunteer Force) (গ) জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনী (National Cadet Corps) এবং (ঘ) সহায়ক শিক্ষার্থিবাহিনী (Auxiliary Cadet Corps)।

(ক) আঞ্চলিক সৈন্য-বাহিনী (Territorial Army) : ১৯৪৯ সালে

প্রথম এই আঞ্চলিক সৈন্য-বাহিনী গঠন করা হয়। উনিশ বৎসর বয়স হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের যুবকগণকে এই আঞ্চলিক বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে এই বাহিনী সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করিবে এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে। এই আঞ্চলিক বাহিনীব কিছু-সংখ্যক লোককে প্রতি বৎসর নিয়মিত সৈন্য-বাহিনীতে ভর্তি করা হয়।

(খ) লোক-সহায়ক সেনা (National Volunteer Force or Lok Sahayak Sena) : ১৯৫৪ সালে প্রথম এই বাহিনী গঠন করা হয়। আঞ্চলিক সৈন্য-বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সেনাদল গঠন করা হইয়াছিল। পরে এই সেনাদলের নাম দেওয়া হয় লোক-সহায়ক সেনা। এই সেনায় যাহারা ভর্তি হয়, তাহাবা প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা লাভ করে। সীমান্ত-রক্ষার কাজে ইহারা সাহায্য করিতে পারিবে বলিয়া সীমান্ত অঞ্চলেই বিশেষ করিয়া এই বাহিনী গঠিত হইতেছে। আঠার বৎসর বয়স হইতে চল্লিশ বৎসর বয়সের সকল ব্যক্তিই এই বাহিনীতে যোগদান করিতে পারে।

(গ) জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনী (National Cadet Corps) : বিদ্যালয় এবং কলেজেব ছাত্র-ছাত্রীদের জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনীতে ভর্তি কবা হয়। ইহাদিগকে নিয়মানুবর্তিতা, নেতৃত্ব এবং সাধারণ সামবিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বাহিনীর তিনটি বিভাগ আছে। এই বিভাগগুলিব একটিকে বলা হয় সিনিয়র ক্যাডেট বাহিনী, দ্বিতীয়টিকে বলা হয় জুনিয়ব ক্যাডেট বাহিনী এবং তৃতীয়টি বালিকা ক্যাডেট বাহিনী। সিনিয়র এবং জুনিয়র ক্যাডেট বাহিনী প্রভৃতিব আবার স্থল, নৌ এবং বিমান এই তিনটি করিয়া শাখা আছে। ভারতে এই বাহিনীর শিক্ষার্থিসংখ্যা ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে ৬·৫ লক্ষ দাঁড়ায়। ডিসেম্বরে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ঘ) সহায়ক শিক্ষার্থিবাহিনী (Auxiliary Cadet Corps) : বিদ্যালযের অনেক ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনীতে ভর্তি হইবার সুযোগ পায় না। ইহাদের মধ্যে যাহাবা সামবিক শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাদেব লইয়া সহায়ক শিক্ষার্থিবাহিনী গঠিত হইয়াছে। এই বাহিনীর শিক্ষার্থিগণকে একতা, নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যায়। এই বাহিনীতে বার লক্ষের উপর ছাত্র-ছাত্রী আছে।

প্রশ্ন

১। ভারতের নিয়মিত প্রতিরক্ষা সংগঠন বর্ণনা কর। (পৃঃ ১৫৯-১৬১)
২। নিয়মিত সৈন্যদলকে সাহায্য করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ? (পৃঃ ১৬১-১৬২)

অর্থনীতি

দ্বিতীয় খণ্ড—অর্থনীতি

প্রথম অধ্যায়

মানুষের কাজ এবং অভাব-পূরণ

মানুষ কাজ করে কেন ঃ

আমাদের চারিদিকে আমরা নিয়তই মানুষকে কর্মব্যস্ত থাকিতে দেখি। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষ কাজ করে। কেহ কেহ আবার রাত্রিতেও কাজ করে। কাজই যেন জীবন। কাজের পর মানুষ বিশ্রাম করে। কাজ করিতে করিতে দেহে ক্লান্তি আসে। বিশ্রাম করিয়া মানুষ সেই ক্লান্তি দূর করে এবং পুনরায় কাজ আরম্ভ করিবার জন্য শক্তি সংগ্রহ করে। এই বিশ্রামও কাজেরই প্রয়োজনে।

মানুষ কেন কাজ করে? অতি অল্পসংখ্যক মানুষ আছে যাহারা কাজ করিতে ভালবাসে বলিয়াই কাজ করে। কোন শিল্পী ছবি আঁকিতে ভালবাসে বলিয়াই সারাদিন পরিশ্রম করিয়া ছবি আঁকে। কোন লেখক লিখিতে ভালবাসে বলিয়াই সারাদিন বসিয়া লিখে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কাজ করিতে বাধ্য হয় বলিয়াই মানুষ কাজ করে। জীবনধারণের জন্য মানুষের অনেক দ্রব্যের প্রয়োজন। প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াই যদি মানুষ দেখিত যে, তাহাদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই তাহাদের হাতের কাছে প্রস্তুত আছে, তবে তাহাদের কাজ করিতে হইত না। অনেকেই কাজ করিত না। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল আপনা হইতে মানুষেব হাতের কাছে আসিয়া পড়ে না বলিয়াই চেষ্টা এবং পরিশ্রম করিয়া সেইগুলি মানুষকে সংগ্রহ করিতে হয়। সেইজন্যই মানুষকে কাজ করিতে হয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব-পূরণের জন্যই মানুষ কাজ করে।

জীবনধারণের জন্য মানুষের খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, বাসোপযোগী গৃহ চাই। এইগুলি মানুষের না হইলেই নয়। সহজ, ভদ্র এবং সুস্থ জীবন যাপন করিতে হইলে মানুষের আরও অনেক দ্রব্যেরই প্রয়োজন হয়। মানুষকে এই সকল দ্রব্যের অভাব পূরণ করিতে হয়। আর এই অভাব-পূরণের জন্যই মানুষকে পরিশ্রম করিতে হয়, কাজ করিতে হয়।

সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষের অভাবের সংখ্যা ছিল অতি অল্প। তখন নিজেরা পরিশ্রম করিয়া মানুষ নিজেদের অভাব পূরণের জন্য অল্পসংখ্যক প্রয়োজনীয়

দ্রব্য উৎপাদন করিত বা সংগ্রহ করিত। পাথর ঘষিয়া মানুষ অস্ত্র তৈয়ারি করিত। সেই অস্ত্রের সাহায্যে পশু শিকার করিয়া সেই পশুর মাংস খাদ্যরূপে তাহারা ব্যবহার করিত। প্রয়োজন মনে করিলে গাছের বাকল সংগ্রহ করিয়া তাহারা পরিধান করিত। নিজেরা কাজ করিয়া নিজেদের অভাব পূরণ করিত। তাহাদিগকেও কাজ করিতে হইত।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় অতি অল্প মানুষই নিজে পরিশ্রম করিয়া নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন বা সংগ্রহ করিতে পারে। এখন কৃষক ফসল উৎপাদন করে। সে কাপড় বোনে না বা মাটির বাসন গড়ে না। তাঁতী কাপড় বোনে। সে ফসল উৎপাদন করে না বা মাটির বাসন গড়ে না। কুমার মাটির বাসন গড়ে। সে ফসল উৎপাদন করে না বা কাপড় বোনে না। ইহাদের নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু অংশ নিজেদের খাদ্য, বস্ত্র কিংবা বাসনের অভাব পূরণ করে। কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্য তাহার খাদ্যের অভাব পূরণ করিতে পারে, বস্ত্র বা বাসনের অভাব পূরণ করে না। তাঁতীর উৎপন্ন দ্রব্য তাহার বস্ত্রের অভাব পূরণ করিতে পারে, তাহার খাদ্য কিংবা বাসনের অভাব পূরণ করে না। সেই ভাবে কুমারের নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা তাহার বাসনের অভাব পূরণ হইতে পারে, খাদ্য বা বস্ত্রের অভাব পূরণ হয় না। কেহই নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজে উৎপাদন করে না বা করিতে পারে না। কৃষক তাহার ধান্যের একটা বিশিষ্ট অংশ যে ব্যক্তির খাদ্যের অভাব আছে তাহার নিকট বিক্রয় করে। যে ব্যক্তির বস্ত্রের অভাব আছে তাহার নিকট তাঁতী তাহার কাপড়ের একটি বিশিষ্ট অংশ বিক্রয় করে। আবার কুমারও এইভাবে তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের একটি বিশিষ্ট অংশ যাহার বাসনের অভাব আছে তাহাব নিকট বিক্রয় করে। ইহারা নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পায়, তাহার বিনিময়ে নিজের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করে। প্রত্যেকে নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু অংশ দ্বারা নিজের একটি অভাব পূরণ করে, এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বারা অন্যের অভাব পূরণ করে। যে অংশের দ্বারা তাহারা অন্যের অভাব পূবণ করে, সে অংশের বিনিময়ে প্রত্যেকেই অর্থ পায়। সেই অর্থ দিয়া প্রত্যেকে নিজের অবশিষ্ট অভাব পূরণ করার মত দ্রব্য ক্রয় করে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা নিজেদের অভাব-পূরণের জন্যই কাজ করে।

একজন শ্রমিক মোটরের কারখানায় কাজ করে। সে পরিশ্রম করিয়া মোটরের যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করে। এই শ্রমিকের জীবনে কখনও মোটরের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইবে না। কাজেই ইহার উৎপন্ন দ্রব্যের একটি নগণ্য অংশও তাহার অভাব-মোচনের কাজে লাগিবে না। তথাপি সে কাজ করে এবং কাজ করিয়া ঐ যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করে। তাহার কাজের জন্য কারখানার মালিক তাহাকে যে টাকা দেয়, তাহার বিনিময়ে

সে নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করে। এই শ্রমিকও অভাব পূরণ করিতে পারিবে বলিয়াই কাজ করে।

মানুষের প্রায় সকল কাজের পশ্চাতে তাহাদের অভাব-পূরণের চেষ্টা রহিয়াছে। অতি অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে মানুষ নিজেরা কাজ করিয়া নিজেদের অভাব-পূরণের মত দ্রব্যাদি উৎপাদন করে বা করিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুস কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন করে। এই উপার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহারা নিজেদের অভাব-মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে।

অভাব-পূরণের জন্য মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং ব্যয় করে। মানুষের প্রায় সকল কার্যের সঙ্গেই অর্থ-উপার্জন কিংবা অর্থ-ব্যয়ের সম্পর্ক রহিয়াছে। জননী সন্তান লালন-পালন করিতে যে কাজ করে, তাহার সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক নাই। সন্ন্যাসী মানুষের সেবা করিতে গিয়া যে কাজ করে, তাহার সঙ্গেও অর্থ-উপার্জন কিংবা অর্থ-ব্যয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অর্থের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এই ধরনের কার্যের পরিমাণ বা সংখ্যা নিতান্ত কম।

মানুষের চরিত্র জটিল। এই জটিলতার জন্যই একজন মানুষের স্বভাব ও রুচির সঙ্গে অন্য একজন মানুষের স্বভাব ও রুচির প্রায়ই মিল থাকে না। অথচ বিভিন্ন মানুষের অর্থ-উপার্জন এবং অর্থ-ব্যয় সংক্রান্ত কার্যকলাপের মধ্যে একটা বিস্ময়কর মিল আছে। অর্থ উপার্জন বা অর্থ ব্যয় করিতে গিয়া একজন মানুষ যে ভাবে আচরণ করে, অন্য আর একজন মানুষও প্রায় সেই ভাবেই আচরণ করে। কমলালেবুর মূল্য বাড়িয়া গেলে স্বাভাবিক অবস্থায় রাম যেমন কমসংখ্যক কমলালেবু ক্রয় করিতে চাহিবে, শ্যামও তেমনি কমসংখ্যক কমলালেবু ক্রয় করিতে চাহিবে। আমের মূল্য কমিয়া গেলে হরি যেরূপ বেশী আম ক্রয় করিবে, যদুও সেইরূপ বেশী আম ক্রয় করিবে। এইভাবে আমরা দেখি, সকল মানুষের অর্থ-উপার্জন এবং অর্থ-ব্যয় সম্পর্কিত কার্যকলাপের মধ্যেও মোটামুটি একটা মিল আছে।

এই ধরনের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই কার্যকলাপ বা আচরণগুলি কতকগুলি নিয়মের অধীন। একজন দোকানী কাল টাকায় দশটি করিয়া আম বিক্রয় করিতে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। আজ সেই দোকানী টাকায় সাতটি করিয়া আম বিক্রয় করিতে রাজী হইতেছে না। আজ ঘরে ঘরে উৎসব আছে বলিয়া সকলেই আম কিনিতে চাহিতেছে এবং দরকার বলিয়া কেহই আমের জন্য বেশী মূল্য দিতে আপত্তি করিতেছে না। ফলে দোকানী বেশী মূল্যে আম বিক্রয় করিতেছে। সে নিজের খুশিমত আমের মূল্য বাড়াইয়া দিতে পারে নাই। বেশী লোক আম কিনিতে চাহিতেছে বলিয়াই আমের মূল্য বাড়িয়াছে। চাহিদা বাড়িলে মূল্য বাড়ে। ইহা

একটি নিয়ম। মানুষের অর্থ-উপার্জন এবং অর্থ-ব্যয় সংক্রান্ত সকল আচরণই এইরূপ কোন-না-কোন নিয়মের অধীন।

অর্থবিদ্যা কাহাকে বলে ঃ

যে গ্রন্থ মানুষের অর্থ-উপার্জন এবং অর্থ-ব্যয় সংক্রান্ত আচরণের আলোচনা করে, বিশ্লেষণ করে এবং এই সকল আচরণের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি আবিষ্কার করে, এবং আলোচনা করে সেই গ্রন্থের নাম **অর্থবিদ্যা**। মানুষের সকল প্রকারের আচরণ অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নহে। যে সকল আচরণের সঙ্গে অর্থ-উপার্জন এবং অর্থ-ব্যয়ের সম্পর্ক রহিয়াছে, সেই সকল আচরণই অর্থবিদ্যার বিষয়-বস্তু। এই ধরনের আচরণ যদি কোন নিয়মের অধীন না হইয়া কেবল আকস্মিক ঘটনামাত্র হইত, তাহা হইলে এই আলোচনা কঠিন হইত। কিন্তু এই সকল আচরণ মোটেই আকস্মিক ঘটনা নহে। প্রত্যেকটি কার্যকলাপের এক বা একাধিক কারণ থাকে। যে-কোন আচরণ এই এক বা একাধিক কারণের অতি স্বাভাবিক পরিণতি। আমের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কারণ তাহার চাহিদা বাড়িয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চাহিদা বাড়িলে মূল্য বাড়ে। একই রকম কারণ বিদ্যমান থাকিলে একই রকম ফল ফলিবে। অর্থবিদ্যার আলোচ্য নিয়মগুলি কার্যকারণের সূত্র নির্দেশ করে।

অর্থবিদ্যা কি বিজ্ঞান ঃ

অর্থবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান কিনা এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রত্যেক বিজ্ঞানই একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করে। বিজ্ঞান সেই বিষয় সম্বন্ধে একটা সম্যক্ জ্ঞান দান করে এবং সেই বিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের সন্ধান দেয়। জ্যোতির্বিদ্যা একটি বিজ্ঞান। জ্যোতির্বিদ্যা পাঠ করিলে আমরা বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, গতিবিধি এবং প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারি। এই সকল গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি যে সকল নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, জ্যোতির্বিদ্যা পাঠ করিলে আমরা সেই সকল নিয়মও জানিতে পারি। কাজেই জ্যোতির্বিদ্যা একটি বিজ্ঞান। এভাবে রসায়ন-বিদ্যাও একটি বিজ্ঞান। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অর্থবিদ্যাও একটি বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান মানুষের অর্থ-উপার্জন এবং অর্থ-ব্যয় সংক্রান্ত কার্যকলাপের সম্যক্ আলোচনা করে এবং সেই সকল কার্যকলাপ সংক্রান্ত নিয়মগুলির সন্ধান দেয়।

অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে অর্থবিদ্যার সামান্য পার্থক্য আছে। পদার্থ-বিজ্ঞান কিংবা রসায়ন-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি একেবারে গণিতের নিয়মে নির্ভুল। নির্দিষ্টপরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে নির্দিষ্টপরিমাণ অকসিজেন গ্যাস মিশ্রিত করিলে নির্দিষ্ট-

পরিমাণ জল পাওয়া যাইবে। পরিমাণের দিক দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, উৎপন্ন জলের পরিমাণ একটু কম বা একটু বেশী হয় না। নিয়মে যতখানি নির্দিষ্ট আছে উৎপন্ন জলের পরিমাণ ঠিক ততখানিই হইবে। কিন্তু অর্থবিদ্যার নিয়মগুলি গণিতের হিসাবে এইরূপ সঠিক নির্দেশ দিতে পারে না। কোন একটি দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে সেই দ্রব্যের মূল্য বাড়িবে। কিন্তু চাহিদা কি পরিমাণ বাড়িলে মূল্য কি পরিমাণ বাড়িবে, তাহা সঠিক ভাবে বলা কঠিন। কোন একটি দ্রব্যের উপর সরকার কর ধার্য করিলে ঐ দ্রব্যের মূল্য বাড়িবে। কিন্তু কি পরিমাণ কর ধার্য করিলে কি পরিমাণ মূল্য বাড়িবে, তাহাও সঠিকরূপে বলা কঠিন। অর্থ-উপার্জন এবং অর্থ-ব্যয় সংক্রান্ত কোন নূতন অবস্থার উদ্ভব হইলে তাহার কিরূপ পরিণতি হইবে, অর্থবিদ্যার নিয়ম আমাদিগকে সে-কথা বলিয়া দেয়। ঘটনার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া অর্থবিদ্ তাহার পরিণতি সম্বন্ধে অর্থবিদ্যার নিয়ম অনুসারে যে নির্দেশ দেন, গতির দিক হইতে সে নির্দেশ সঠিক। অর্থবিদ্যাব নিয়মগুলি পরিমাণেব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঠিক নির্দেশ না দিলেও ঘটনাব গতি সম্বন্ধে সঠিক নির্দেশ দিতে পারে।

প্রশ্ন

১। কি কি উপায়ে মানুষ নিজের অভাব পূরণ করে? (পৃঃ ২-৩)

২। অর্থবিদ্যা কাহাকে বলে? (পৃঃ ৪)

৩। অর্থবিদ্যার নিয়মেব সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের নিয়মেব পার্থক্য কি? (পৃঃ ৪ ৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্রব্য, উপযোগ এবং সম্পদ

দ্রব্য এবং উপযোগ (Goods and Utility) :

যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, স্পর্শ করিতে পারি, সাধারণ কথায় আমরা তাহাকেই 'দ্রব্য' বলি। অর্থবিদ্যার ভাষায় 'দ্রব্য' কথাটির কিছুটা পৃথক অর্থ আছে। যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, তাহাই অর্থবিদ্যার ভাষায় 'দ্রব্য'। ক্ষুধিত ব্যক্তির আহারের প্রয়োজন। একখণ্ড রুটি তাহার আহারের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। কাজেই রুটিখণ্ড একটি 'দ্রব্য'। একজন রোগীর আরোগ্যলাভের প্রয়োজন। ডাক্তারের পরামর্শ এই প্রয়োজন মিটাইতে পারে। কাজেই ডাক্তারের পরামর্শ অর্থবিদ্যার ভাষায় একটি 'দ্রব্য'। রুটি-খণ্ড আমরা দেখিতে পাই, স্পর্শ করিতে পারি। কিন্তু ডাক্তারেব পরামর্শ আমরা দেখিতে পাই না, স্পর্শ করিতে পারি না। তথাপি অর্থবিদ্যার ভাষায় রুটি যেমন 'দ্রব্য', ডাক্তারের পরামর্শও তেমনি 'দ্রব্য'। যাহা আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, অভাব মোচন করিতে পারে, তাহাই 'দ্রব্য'। দ্রব্যের অভাব মোচন করিবার ক্ষমতাকে অর্থবিদ্যার ভাষায় বলা হয় উপযোগ। ইংরেজীতে ইহাকে বলা হয় Utility।

মূল্যবিহীন এবং মূল্যবান দ্রব্য (Free goods and Economic goods) :

এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা মানুষ যত ইচ্ছা তত পাইতে পারে। তাহার জন্য মানুষকে কোন মূল্য দিতে হয় না। যে ব্যক্তি নদীতীরে বাস করে, সে যত ইচ্ছা তত নদীর জল পাইতে পারে। এই জলের জন্য তাহাকে কোন মূল্য দিতে হয় না। অর্থ-বিদ্যায় এই সকল দ্রব্যকে 'মূল্যবিহীন দ্রব্য' বলা হয়। ইংরেজীতে এই সকল দ্রব্যকে বলা হয় Free goods. বর্তমান পৃথিবীতে মূল্যবিহীন দ্রব্যের সংখ্যা খুব কম। প্রায় সকল দ্রব্যই মানুষ যত পাইতে চায় তত পাইতে পারে না। মোট চাহিদার তুলনায় এইগুলির মোট পরিমাণ কম। সকল লোক যত খাদ্যদ্রব্য পাইতে চায়, তত খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারে না। কারণ তত খাদ্যদ্রব্য সহজে উৎপন্ন হয় না। যে দ্রব্য চাহিদার তুলনায় কম, সে দ্রব্যকে বলা হয় 'মূল্যবান দ্রব্য' বা 'অর্থনৈতিক দ্রব্য'। ইংরাজীতে এইগুলিকে বলা হয় Economic goods।

সম্পদ (Wealth) :

সাধারণ কথায় সম্পদ বলিতে আমরা টাকা পয়সা বুঝি। কোন ব্যক্তির প্রচুর সম্পদ আছে বলিলে, আমরা মনে করি তাহার প্রচুর টাকা পয়সা আছে। অর্থবিদ্যায় সম্পদ বলিতে কিন্তু ঠিক টাকাপয়সা বুঝায় না। অর্থনৈতিক দ্রব্য বা মূল্যবান দ্রব্যই সম্পদ। টাকাপয়সার বিনিময়ে মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যায়। সেজন্য যে ব্যক্তির টাকাপয়সা আছে তাহাকে পরোক্ষভাবে সম্পদশালী ব্যক্তি বলা যায়। যে দ্রব্য আমাদের অভাব মোচন করে এবং যে দ্রব্য যত ইচ্ছা তত পাওয়া যায় না, সে দ্রব্যই সম্পদ। একখানা কাপড় কিংবা একটি কলম আমাদের সম্পদ। ইহারা আমাদের অভাব পূরণ করে এবং এইগুলি যত ইচ্ছা আমরা তত পাইতে পারি না। টাকাপয়সা না থাকিলেও যদি কোন লোকের প্রচুর মূল্যবান দ্রব্য থাকে, তবে সে সম্পদশালী। যে ব্যক্তির গোয়াল-ভরা গরু, গোলা-ভরা ধান, পুকুর-ভরা মাছ, বাগান-ভবা শাক-সব্জি আছে, সে ব্যক্তিব টাকাপয়সা না থাকিলেও সে ব্যক্তি সম্পদশালী।

সম্পদের চারিটি গুণ (Attributes of Wealth) ঃ

অর্থবিদ্যাব ভাষায় সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে, যে-কোন দ্রব্যের চারিটি গুণ থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ এই দ্রব্যের অভাব মোচন কবিবাব বা প্রয়োজন মিটাইবাব ক্ষমতা থাকা চাই। পর্বত-গাত্রেব প্রস্তরগুলি কাহারও কোন প্রয়োজন মিটায় না। কাজেই সেগুলি সম্পদ নহে। দ্বিতীয়তঃ এই দ্রব্য মানুষেব চাহিদার তুলনায় পরিমাণে কম হওয়া চাই। যে দ্রব্য যত চাওয়া যায় ততই যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা অর্থবিদ্যাব ভাষায় সম্পদ নহে। সমুদ্রেব জল যাহারা সমুদ্রের তীরে বাস করে তাহারা যত ইচ্ছা তত পাইতে পারে। তাহাদেব নিকট উহাব পবিমাণ সীমাবদ্ধ নহে। কাজেই সমুদ্রেব জল এ সকল ব্যক্তিব নিকট সম্পদ নহে। তৃতীয়তঃ সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে যে-কোন দ্রব্যকে হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে। যে দ্রব্য অথবা যে দ্রব্যের মালিকানা একজনেব নিকট হইতে অপরেব নিকট দেওয়া যায় না, সে দ্রব্য অর্থবিদ্যার ভাষায় সম্পদ নহে। মানুষেব স্বাস্থ্য অর্থবিদ্যাব ভাষায় সম্পদ নহে; কারণ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি তাহার স্বাস্থ্য অপব ব্যক্তিকে দান কবিতে পারে না। কাজেই ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্য অর্থবিদের ভাষায় সম্পদ নহে। জমি এক স্থান হইতে অপর এক স্থানে লইয়া যাওয়া যায় না। অথচ ইহার মালিকানা একজনের হাত হইতে আর একজনের হাতে যাইতে পারে। কাজেই জমিও সম্পদ। সম্পদের আর একটি গুণ থাকা চাই। সম্পদ বাহিরের দ্রব্য হইবে। মানুষের ভিতরের গুণ সম্পদ নহে। একজন ভাল গায়কের যে গুণ তাহা বাহিরের দ্রব্য নহে। তাহা হস্তান্তর করা যায় না

কাজেই তাহা সম্পদ নহে। যে দ্রব্য চাহিদার তুলনায় কম, যে দ্রব্য অভাব পূরণ করিতে পারে, যে দ্রব্য হস্তান্তরযোগ্য এবং যে দ্রব্য বাহিরের, সে দ্রব্যই অর্থবিদের ভাষায় সম্পদ বা ধন।

উৎপাদন : উপযোগসৃষ্টি (Production : Creation of Utility) :

আমরা কথায় বলি, খনির শ্রমিকগণ দশ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন করিয়াছে। কয়লা ভূগর্ভে সঞ্চিত ছিল। সেখানে থাকিলে যাহারা কয়লা ব্যবহার করে, তাহাদের কোন কাজে লাগে না। সেইজন্য শ্রমিকগণ ভূগর্ভ হইতে কয়লা বাহিরে আনে। তখন এই কয়লা ব্যবহারকারীদের কাজে লাগে। যাহা কাজের অনুপযোগী, শ্রমিকরা তাহাকে কাজের উপযোগী করে। এইভাবে তাহারা কয়লা উৎপাদন করে। তাহারা কয়লা সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করিতে পারে না। আমরা বলি, তাঁতী দশ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপাদন করে। কলে হউক বা চরকাতে হউক, অনেক সুতা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু যাহারা বস্ত্র চায় সুতাতে তাহাদের প্রয়োজন মিটে না। তাঁতী সুতা সংগ্রহ করিয়া তাহা দিয়া বস্ত্র তৈয়ারি করে। সুতাকে তাঁতীরা বস্ত্র-ব্যবহারকারীর ব্যবহারের উপযোগী করে। এইভাবে তাহারা বস্ত্র উৎপাদন করে। তাহারা বস্ত্র সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করিতে পারে না। আমরা আবার বলি, সাইকেলের কারখানার কারিগরগণ দশ হাজার সাইকেল উৎপাদন করে। সাইকেলের বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। বিক্ষিপ্ত অংশগুলি সাইকেল-ব্যবহারকারীর প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। কারখানার কারিগরগণ সেই বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করে। তখন সাইকেল-ব্যবহারকারীর প্রয়োজন মিটে। বিভিন্ন অংশকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া সেইগুলিকে কারিগরগণ সাইকেল-ব্যবহারকারীর কাজের উপযোগী করে। এইভাবে তাহারা সাইকেল উৎপাদন করে। সাইকেল তাহারা সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করিতে পারে না।

এইভাবে আমরা দেখি, পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকিলে কেহই দৈববলে বা মন্ত্রবলে কোন দ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে না। যখন আমরা বলি কেহ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিয়াছে, তখন আমরা বুঝি হয়ত সেই ব্যক্তি কোন ব্যবহারের অনুপযোগী দ্রব্যকে ব্যবহারের উপযোগী করিয়াছে অথবা অল্প উপযোগী দ্রব্যকে অধিকতর উপযোগী করিয়াছে। মানুষ দ্রব্য সৃষ্টি করে না, করে উপযোগ সৃষ্টি। কাজেই আমরা উৎপাদন বলিতে উপযোগ সৃষ্টি করা বুঝি।

বিভিন্ন প্রকারের উপযোগ (Different Kinds of Utilities) :

বিভিন্ন উপায়ে উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ আছে। সেইগুলির

আকার এবং রূপ পরিবর্তন করিয়া ছুতারমিস্ত্রী চেয়ার তৈয়ারি করে। রূপ বদলাইয়া ছুতারমিস্ত্রী কাষ্ঠখণ্ডকে বসিবার উপযোগী করে। এইভাবে সে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে।

কলিকাতা শহরে যাহারা বাস করে অন্য সকলের মত তাহাদেরও খাদ্যের প্রয়োজন। অথচ ধান, চাউল, গম কিংবা আটা কলিকাতায় উৎপন্ন হয় না। এই সকল দ্রব্য পল্লী-অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। পল্লী-অঞ্চলে উৎপন্ন এই সকল দ্রব্য যতক্ষণ কলিকাতায় না আসে, ততক্ষণ ইহা দ্বারা কলিকাতাব লোকের প্রয়োজন মিটে না। কোন ব্যবসায়ী পল্লী-অঞ্চলে উৎপন্ন এই সকল দ্রব্য কলিকাতায় আমদানি করিলে এই সকল দ্রব্য কলিকাতার লোকেদের খাদ্যের প্রয়োজন মিটায়। যে দ্রব্য কলিকাতাবাসীদের ব্যবহারের উপযোগী ছিল না, সে দ্রব্য স্থানান্তরিত করিয়া ব্যবসায়ী কলিকাতাবাসীদেব ব্যবহাবেব উপযোগী করে। এইভাবে ব্যবসায়ী স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে।

শীতকালে আমাদের দেশে আলুর ফসল পাওয়া যায়। সেই সময়ই যদি সব আলু খাদ্যের কাজে লাগানো হয়, তবে বর্ষাকালে খাওয়ার জন্য আলু পাওয়া যায় না। সেইজন্য ব্যবসায়ী বা উৎপাদনকারী আলুব কিছু অংশ শীতল কক্ষে জমা করিয়া রাখে। বর্ষাকালে সেগুলি বিক্রয় করা হয়। এইভাবে আলুব উৎপাদনকাবী কিংবা ব্যবসায়ী এক সময়ে উৎপন্ন আলুকে অন্য সময়ের ব্যবহারেব উপযোগী কবে। ইহারা সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করে।

উপবে তিন প্রকাব উপযোগ সৃষ্টিব কথা বলা হইল। এই তিন প্রকাব ক্ষেত্রেই বস্তুব সাহায্যে উপযোগ সৃষ্টি কবা হয়। ইহা ছাড়া কেবলমাত্র শ্রম বা সেবাব সাহায্যেও উপযোগ সৃষ্টি করা চলে। ডাক্তাব পবামর্শ দিয়া কোন বস্তু সৃষ্টি করে না। শিক্ষক শিক্ষা দান কবিয়া কোন বস্তু সৃষ্টি করে না, কিংবা ভৃত্য বাড়ীতে কাজ করিয়া কোন দ্রব্য সৃষ্টি করে না। অথচ ইহাদের শ্রম প্রয়োজন মিটায়। ইহাবা উপযোগ সৃষ্টি কবে। এই উপযোগ সেবাগত উপযোগ।

উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল শ্রম (Productive and Unproductive Labour) :

পূর্বে কোন কোন অর্থবিদ্ উৎপাদন বলিতে কোন বস্তুর উৎপাদন মনে করিত। কাজেই যে শ্রমের সাহায্যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইত, তাহারা সেই শ্রমকে 'উৎপাদনশীল শ্রম' মনে করিত। যে শ্রমের সাহায্যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইত না, সে শ্রমকে তাহারা

'অনুৎপাদনশীল শ্রম' মনে করিত। তাহাদের মতে একটি শিশু যদি কয়েকটি মাটির ঢেলা তৈয়ারি করিত, তবে তাহার শ্রম উৎপাদনশীল। ডাক্তার তাহার পরামর্শদ্বারা কোন দ্রব্য উৎপন্ন করিত না, কাজেই তাহা অনুৎপাদনশীল।

আমরা দেখিয়াছি, উৎপাদন বলিতে প্রকৃতপক্ষে আমরা উপযোগ সৃষ্টি করা বুঝি। কাজেই যে শ্রমের দ্বারা উপযোগ সৃষ্টি হয়, সে শ্রমই উৎপাদনশীল শ্রম। চেয়ার তৈয়ারি করিতে মিস্ত্রী যে শ্রম নিয়োগ করে, সে শ্রম উৎপাদনশীল। কারণ চেয়ার বসিবার প্রয়োজন মিটায়। আবার ডাক্তার পরামর্শ দিতে গিয়া যে শ্রম নিয়োগ করে, সে শ্রমও উৎপাদনশীল। কারণ ডাক্তারের পরামর্শ রোগীর প্রয়োজন মিটায়। এইভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, শ্রমকে উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল এই দুই ভাগে ভাগ করা কঠিন। কারণ প্রায় সকল প্রকারের শ্রমই কাহারও না কাহারও প্রয়োজন মিটায়। সেইজন্য কোন শ্রমকে বলা যাইতে পারে অল্প উৎপাদনশীল, আবার কোন শ্রমকে বলা যাইতে পারে অধিক উৎপাদনশীল।

উৎপাদনের উপাদান (Factors of Production) :

আমরা ফসল উৎপন্ন হইতে দেখি। ফসল উৎপাদনের জন্য জমি চাই। জমি চাষ করিবার জন্য লাঙ্গল এবং গরু চাই। লাঙ্গল এবং গরু চালাইয়া জমি প্রস্তুত হইলে বপন করিবার জন্য বীজ চাই। তাহার পর ফসলের গাছগুলির পরিচর্যার জন্য আবার শ্রম চাই। পরিশেষে ফসল সংগ্রহ করার জন্যও যন্ত্রপাতি এবং শ্রম চাই। তাহা হইলে দেখা যায়, ফসল উৎপাদনের জন্য জমি, শ্রম, যন্ত্রপাতি, গরু এবং বীজ চাই। বীজ, গরু এবং যন্ত্রপাতিকে বলা হয় মূলধন। কাজেই বলা যাইতে পারে ফসল উৎপাদনের জন্য জমি চাই, শ্রম চাই এবং মূলধন চাই। এই তিনটি ফসল উৎপাদনের উপাদান। এই তিনটি উপাদানকে যথাযথরূপে কাজে লাগাইয়া উৎপাদন-কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য আর একটি উপাদানের প্রয়োজন। তাহার নাম উদ্যোগ বা পরিচালন। এক ব্যক্তির জমি আছে, অপর এক ব্যক্তির মূলধন আছে, অন্য আর এক ব্যক্তির শ্রম আছে। পরিচালক বা উদ্যোক্তা এই তিনটির সংযোগ সাধন করে এবং উৎপাদন পরিচালন করে।

যে-কোন উৎপাদনের ক্ষেত্রেই জমি, মূলধন, শ্রম এবং পরিচালন এই চারিটি উপাদানের প্রয়োজন। বস্ত্র উৎপাদন করিতে হইলেও জমি চাই, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি মূলধন চাই, শ্রম চাই এবং পরিচালনা বা উদ্যোগ চাই। চিনি, কয়লা, মোটরগাড়ি, বাসনপত্র, চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি যে-কোন দ্রব্যের নামই করা যাক না

কেন, আমরা দেখিতে পাই সকল দ্রব্যের উৎপাদনের জন্যই জমি, মূলধন, শ্রম এবং পরিচালন এই চারিটি উপাদান অপরিহার্য। এই চারিটিকে সেইজন্যই বলা হয় উৎপাদনের উপাদান।

প্রশ্ন

১। সম্পদ কাহাকে বলে? সম্পদের গুণ কি? (পৃ ৭-৮)

২। উৎপাদন বলিতে আমরা কি বুঝি? উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল শ্রম কাহাকে বলে? (পৃঃ ৮-৯)

৩। উৎপাদনের উপাদান কি? (পৃঃ ১০-১১)

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় আয়

অভাবমোচনের জন্য মানুষ পরিশ্রম করে। পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করে বা আয় করে। অর্জিত অর্থ বা আয়ের সাহায্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের এই আয়ের উপরই তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনেকখানি নির্ভর করে। আয় যাহার বেশী, তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনা বেশী, আর আয় যাহার কম, তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনাও কম।

ব্যক্তির সুখস্বাচ্ছন্দ্য যেমন তাহার নিজ আয়ের উপর নির্ভর করে, কোন জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্যও নির্ভর করে সেই জাতির আয়ের উপর। জাতীয় আয় সমধিক হইলে জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার জাতীয় আয় কম হইলে জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনাও কম থাকে। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতবাসীর মাথা পিছু বার্ষিক আয় ছিল গড়ে ৩৩০৲ টাকা। জাপানীদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় গড়ে ৯৫৩৲ টাকা। গ্রেট ব্রিটেনে মাথাপিছু গড়ে ৬২৫২৲ টাকা এবং আমেরিকাবাসীদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় গড়ে ৯১১২৲ টাকা। ইহা হইতে একথা প্রতীয়মান হয় যে অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশের লোকেরা দরিদ্র এবং তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনা কম।

কোন একটি গ্রামের লোকসংখ্যা ৫০০। ঐ গ্রামের লোকেদের মোট বার্ষিক আয়ের পরিমাণ মোট ২,০০,০০০৲ টাকা। এই মোট আয় ২,০০,০০০৲ টাকাকে মোট জনসংখ্যা ৫০০ দিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেকের ভাগে মোট ৪০০৲ টাকা পড়ে। এই চারি শত টাকাই হইল গ্রামবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের গড়। কোন দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের গড় বাহির করিতে হইলে এইভাবে বার্ষিক মোট আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিতে হয়। ইহাতে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাই সেই দেশের লোকেদের মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের গড়। মোট আয় বৃদ্ধি পাইলে এবং লোকসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। মোট আয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে এবং জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিলে মাথাপিছু আয় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

মাথাপিছু আয় বা মোট আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই যে কোন দেশের সকল লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তাহা সকল ক্ষেত্রে সত্য নহে। কোন দেশের অল্প

কয়েকজন লোকের আয় অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অন্যদের আয় হয় অপরিবর্তিত থাকিয়া গেল কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ইহার ফলে কিন্তু সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না। কেবল কয়েক জন লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট সকলেব সুখস্বাচ্ছন্দ্য হয়ত অপরিবর্তিত থাকিল অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

আবাব কখনও দেখা যায় জাতীয় আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ফলে মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এমন কি ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলেব আয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু দ্রব্যমূল্য অত্যধিক পবিমাণে বর্ধিত হওয়ায় পূর্বেব আয়েব সাহায্যে মানুষ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যে সকল উপকবণ সংগ্রহ কবিতে পাবিত বর্তমান বর্ধিত আয়েব সাহায্যে তদপেক্ষা কম উপকবণ সংগ্রহ কবিতে সক্ষম হইয়াছে। এই ক্ষেত্রেও দেখা যায় আর্থিক আয় বৃদ্ধি-সত্ত্বেও মানুষেব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না। প্রকৃত আয় বৃদ্ধি হইল না।

উপবেব এই আলোচনা হইতে বুঝা যায় কেবল জাতীয় আয় বাড়িলেই জনসাধাবণেব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে না। সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়িল, না কমিল তাহা বিচাব করিতে হইলে জাতিব জনসংখ্যাব অবস্থা, আয়বণ্টনেব অবস্থা এবং দ্রব্যমূল্যেব কথাও সেই সঙ্গে বিবেচনা কবিতে হয। মোটামুটি জাতিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইতে হইলে সে জাতিব আয় বাড়াইতে হয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা যেন অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি না পায়, দ্রব্যমূল্য যেন আয়ত্তেব মধ্যে থাকে এবং জাতীয় আযেব যেন সুষম বণ্টন হয সেদিকে লক্ষ্য বাখিতে হয। ভাবতেব স্বাধীন সবকাব ভাবতবাসীব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে যত্নবান। এই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানেব জন্যই পবপব এই পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী তিনটি পবিকল্পনা বচনা কবা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব কাজ শেষ হইযাছে। এখন তৃতীয পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব কাজ চলিতেছে। জাতীয আয় বৃদ্ধিকবণ এই পবিকল্পনাগুলিব অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব কাজ যখন শেষ হইল, তখন দেখা গেল জাতীয আয় মোট শতকবা আঠাব ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইযাছে। দ্বিতীয় পবিকল্পনাব কাজ শেষ হইলে দেখা গেল ভাবতেব জাতীয় আয় শতকবা মোট কুডি ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পবিকল্পনা-বচনাকাবীবা আশা কবেন যে তৃতীয পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব কাজ শেষ হইলে জাতীয আয আবাব মোট শতকবা ত্রিশ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

জাতীয আয বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে কি পরিমাণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে লোকসংখ্যা কি পবিমাণ বাড়িয়াছে, মোট আয়েব বণ্টন কিরূপ হইয়াছে এবং দ্রব্যমূল্য কি অবস্থায় আছে।

আমাদের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় বুঝা যায় লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার অপেক্ষা আয়বৃদ্ধির হার কিছুটা বেশী। দ্রব্যমূল্য দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ফলে আয়বৃদ্ধি হইতে যে পরিমাণে সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহা কমিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া আয় বণ্টনের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় শতকরা একজন লোকের আয়ের পরিমাণ মোট আয়ের শতকরা দশ ভাগ। এইরূপ বণ্টনও জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির পথে অন্তরায়।

জাতীয় আয় (National Income) :

দেশের সকল লোক এবং প্রতিষ্ঠান অভাব পূরণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আসবাব পত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং শিক্ষাদান, চিকিৎসা প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করে। বৎসরে মোট যত দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং যত কর্ম সম্পন্ন হয়, তাহার সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। মোট উৎপন্ন দ্রব্যের এবং সম্পন্ন কর্মের মুদ্রামূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলা হয়। একজাতীয় দ্রব্যের সঙ্গে অন্যজাতীয় দ্রব্য যোগ করিয়া বা একজাতীয় কর্মের সঙ্গে অন্যজাতীয় কর্ম যোগ করিয়া একটা সমষ্টি নির্ণয় করা কঠিন কাজ। তাহা ছাড়া দ্রব্য এবং কর্মের সমষ্টির সাহায্যে আয় নির্দিষ্ট হইলে, এক বৎসরের আয়ের সঙ্গে অপর বৎসরের আয়ের তুলনা কখনও কখনও অসম্ভব হয়। কোন এক বৎসর যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইল বা যে সকল কর্ম সম্পন্ন হইল, পরের বৎসর অন্য প্রকার দ্রব্য এবং অন্য প্রকার কর্ম সম্পন্ন হইলে তুলনা করা অসম্ভব হয়। কিন্তু যদি আয়কে মুদ্রামূল্যে বা টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয় তবে সমষ্টি নিরূপণ করা যেমন সহজ হয়, বিভিন্ন বৎসরের আয়ের তুলনামূলক বিচারও সুসাধ্য হয়। আমরা পঞ্চাশ জোড়া ধুতির সঙ্গে ত্রিশ মণ চাউল এবং দশটা বেতার যন্ত্র যোগ করিয়া সমষ্টি নির্ণয় করিতে পারি না। অথচ পঞ্চাশ জোড়া ধুতির মুদ্রামূল্যের সঙ্গে ত্রিশ মণ চাউল এবং দশটা বেতার যন্ত্রের মুদ্রামূল্যের যোগ করিয়া মোট আয় সহজে নির্ণয় করিতে পারি। আবার এই বৎসর ত্রিশ মণ চাল, একশত জোড়া ধুতি এবং পাঁচ মণ তৈল উৎপন্ন হইলে এবং পরের বৎসর পঞ্চাশ মণ গম, পাঁচ শত জোড়া জুতা এবং চল্লিশ মণ চিনি উৎপন্ন হইলে এই দুই বৎসরের আয়ের তুলনা উৎপন্ন দ্রব্যের সাহায্যে করা চলে না। অথচ এক বৎসরের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সঙ্গে অপর বৎসরের মোট উৎপন্ন দ্রব্যের মুদ্রামূল্যের সহজেই তুলনা করা যায়। এই কারণে উৎপন্ন দ্রব্য এবং সম্পন্ন কর্মের সমষ্টিই মোট আয় হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় আয় নিরূপণের সময় ঐ আয়কে টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয়।

জাতীয় আয় নিরূপণ (Determination of National Income) :

মোটামুটি তিনটি পৃথক উপায়ে জাতীয় আয় নিরূপণ করা হইয়া থাকে প্রথমতঃ সকল ব্যক্তির, সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের এবং সম্পন্ন কর্মের সমষ্টি নির্ণয় করিয়া জাতীয় আয় নিরূপণ করা যায়। ইহাকে উৎপাদন পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন কর্মে রত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান-গুলির পৃথক পৃথক আয়ের সমষ্টি নির্ণয় করিয়া মোট জাতীয় আয় নিরূপণ করা হয়। ইহাকে বলা যাইতে পারে আয়-পদ্ধতি। তৃতীয়তঃ সমগ্র জাতির লোকেরা নিজেদের ভোগের জন্য যাহা ব্যয় করে এবং যাহা তাহারা উদ্বৃত্ত হিসাবে সঞ্চয় করিয়া রাখে, এই উভয়ের সমষ্টি নির্ণয় করিয়াও জাতীয় আয় নিরূপণ করা হয়। ইহাকে ভোগ ও সঞ্চয়পদ্ধতি বলা হয়। যে কোন একটি উপায়ে নির্ণীত জাতীয় আয়ের পরিমাণ অন্য উপায়ে নির্ণীত আয়ের পরিমাণের সম্পূর্ণ সমান না হইলেও উহারা প্রায় সমান হইয়া থাকে।

উৎপাদন-পদ্ধতি (Production Method) :

দেশের লোকেরা পৃথকভাবে অথবা মিলিতভাবে পরিশ্রম করিয়া প্রতি বৎসর মানুষের অভাব মোচনের জন্য ধান, গম, পাট, চা, চিনি, ডাল, তেল, লবণ, কাপড়, জামা, ঘর, বাড়ী, গাড়ী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নানা দ্রব্য উৎপাদন করে। আবার চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবিগণ পরিশ্রম করিয়া এমন সব কর্ম সম্পাদন করে যাহা দ্রব্য নহে অথচ যাহা মানুষের অভাব মোচন করে। মোট উৎপন্ন দ্রব্যের ও সম্পন্ন কর্মের একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন কঠিন কাজ। তাহা সত্ত্বেও জাতীয় আয় নির্ধারণের সময় কোন এক নির্দিষ্ট বৎসরে মোট যত দ্রব্য উৎপন্ন হইল এবং মোট যত কর্ম সম্পন্ন হইল তাহার পূর্ণাঙ্গ একটি তালিকা রচনা করিয়া সেইগুলির মোট বাজার দর নির্ণয় করিতে হয়। এই সকল দ্রব্য এবং কর্মের মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বলা হয়। ইহাতে মোট জাতীয় উৎপাদনকে টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয়।

মোট জাতীয় উৎপাদন বা মোট জাতীয় আয় নিরূপণের সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যেন কোন একটি উৎপন্ন দ্রব্য বা তাহার মূল্য একাধিকবার হিসাবের আগলে না আনা হয়। মোট উৎপন্ন বস্ত্র বা তাহার মূল্য যদি ধরা হয়, তবে বস্ত্র উৎপাদনে যে তুলা লাগে তাহার বা তাহার মূল্য ধরা ভ্রান্তিজনক হইবে। কারণ তাহা হইলে তুলা বা তুলার মূল্য একাধিকবার ধরা হইবে। যে সকল দ্রব্য অন্যদ্রব্য উৎপাদনের কাজে লাগে সে সকল দ্রব্য বা তাহাদের মূল্য মোট উৎপাদনের হিসাবে না ধরিয়া যেগুলি পুনরায় অন্য দ্রব্য উৎপাদনের কাজে লাগান হয় না বা হয় নাই সেই শেষ উৎপন্ন দ্রব্যগুলিরই

হিসাব করিতে হয়। টেবিলের মূল্য হিসাবে ধরা হইলে টেবিল নির্মাণে যে কাঠ ব্যবহার করা হয় সেই কাঠ বা তাহার মূল্য হিসাবে ধরিতে হইবে না।

নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Production):

মোট জাতীয় উৎপাদন এবং নীট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে স্বভাবতই কিছুটা ব্যবধান আছে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যেমন কাঁচা মাল ব্যবহার করে তেমনই আবার যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করে। কাঁচা মাল সমাপ্তদ্রব্যে পরিণত হয়। কিন্তু যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতিই থাকিয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ উৎপাদনে সহায়তা করে। তথাপি ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যন্ত্রপাতি পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কিছুকাল পরে এমন এক সময় আসে যখন উৎপাদনের কাজে আর তাহা ব্যবহারের যোগ্য থাকে না। উৎপাদন চালাইয়া যাইবার জন্য উৎপাদনকারীরা যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থা রাখে এবং তাহার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে। তাহার পর যন্ত্রপাতি যখন একেবারে অব্যবহার্য হয়, তখন তাহার বদলে নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্যও অর্থ বরাদ্দ রাখে। একটি কাপড়ের কলের মোট মূল্য যদি ৫০,০০০৲ টাকা হয়, তাহার আয়ু যদি বিশ বৎসর হয় তাহা হইলে উৎপাদনকারী বিশ বৎসর পর এই কাপড়ের কল বদলাইয়া নূতন কল বসাইবার জন্য বছরে ২৫০০৲ টাকা করিয়া মোট আয় হইতে রাখিয়া দিবে। আবার এই বিশ বৎসরের মধ্যে মেরামত ইত্যাদির জন্য বৎসরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যেমন ৫০০৲ টাকা হিসাবে পৃথক তহবিলে রাখিবে। তাহা হইলে দেখা যায় এই উৎপাদনকারীকে বৎসরে মোট তিন হাজার টাকা হিসাবে পৃথক তহবিলে রাখিতে হইবে। এই পৃথক তহবিলকে 'অবপূর্তি তহবিল' বা Depreciation fund বলে। কাপড়ের উৎপাদনকারী তাহার বার্ষিক উৎপাদন নির্ধারণ করিবার সময় প্রথম মোট উৎপাদন নির্ধারণ করে এবং তাহা হইতে অবপূর্তি তহবিলের জন্য রক্ষিত অর্থ বাদ দেয়। এই বাদ দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট বার্ষিক আয়।

জাতির নীট বার্ষিক উৎপাদন বা আয় নিরূপণের সময়ও সকল উৎপন্ন দ্রব্য এবং সম্পন্ন কর্মের সমষ্টি নিরূপণ করার পর তাহার মূল্য হইতে অবপূর্তি তহবিলের জন্য সংরক্ষিত অর্থ বাদ দিতে হয়। ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের বাবদ নির্দিষ্ট অর্থ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় আয়। যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ বা পুনঃ স্থাপনের জন্য বার্ষিক যে ব্যয় বরাদ্দ থাকে, তাহার সাধারণতঃ একটা নিয়ম থাকে। যদি দশ হাজার টাকা মূল্যের একটি যন্ত্র এক নাগাড়ে বিশ বৎসর ব্যবহারের পর পূর্ণ মাত্রায় অব্যবহার্য হয় তাহা হইলে পুনরায় দশ হাজার টাকা দিয়া একটি

নূতন যন্ত্র ঐ স্থানে বসাইতে হয়। এই ক্ষেত্রে যন্ত্রের মালিক বিশ বৎসর পরে ঐ যন্ত্র পুনঃ সংস্থাপনের জন্য বৎসরে পাঁচ শত টাকা করিয়া পৃথক করিয়া রাখিবে। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসরই ছোট-খাট মেরামত ইত্যাদি করাইতে হয়। তাহাকে গড়ে হয় ত বৎসরে দুই শত টাকা ব্যয় করিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ যন্ত্রের মালিক বৎসরের মোট আয় হইতে সাত শত টাকা অবপুর্তি তহবিলে পৃথক করিয়া রাখে। ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট আয় বলিয়া পরিগণিত হয়।

উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য যখন টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয় তখন যদি ঐ দ্রব্যের বাজার দর হিসাবের আমলে আনা হয় তবে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। কোন কোন দ্রব্য উৎপাদন করিলে উৎপাদনকারী দেশের সরকারকে কর দিতে বাধ্য থাকে। বাজার দরের সঙ্গে এই কর যুক্ত হয়। অথচ এই করের অর্থ সরকারের হাতে যায়। যে সকল উপাদানের সাহায্যে ঐ দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে ঐ করের অর্থ বণ্টন করা হয় না। জাতীয় আয় বলিতে যদি উৎপন্ন সকল দ্রব্য এবং সম্পন্ন সকল কর্ম হইতে আয়ের সমষ্টিকে বুঝায় তবে বাজার দর হইতে করের অর্থ বাদ দিতে হইবে। এইরূপ ভাবে ধরা হইলে আয়-পদ্ধতিতে নির্ণীত নীট আয়ের সঙ্গে উৎপাদন-পদ্ধতিতে নির্ণীত নীট আয়ের মিল থাকিবে।

আয়-পদ্ধতি (Income Method) :

কোন ব্যক্তি কাপড় উৎপাদন করিবে। তাহাকে একখণ্ড জমির উপর কলকব্জা আপিস প্রভৃতি বসাইতে হইবে। তাহার যন্ত্রপাতি এবং টাকার প্রয়োজন হইবে। যন্ত্রপাতি চালাইবার জন্য বা অনুরূপ কাজ করিবার জন্য তাহার শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে। কিরূপে উৎপাদন চালাইতে হইবে, কোন উপাদান কি পরিমাণে নিয়োজিত করিতে হইবে, এই সকল উৎপাদনকারীকে নির্ধারণ করিতে হইবে। এই নির্ধারণ করার নাম সংগঠন। কাজেই দেখা যায়—উৎপাদনের জন্য জমি, মূলধন, শ্রম এবং সংগঠনের প্রয়োজন। এইগুলিকে বলা হয় উৎপাদনের উপাদান। যাহা উৎপন্ন হয় তাহা যাহারা উৎপাদনে সাহায্য করিবে তাহাদেরই প্রাপ্য, তাহাদের মধ্যেই বণ্টন করা হয়। কাজেই উৎপন্ন দ্রব্য হইতে যে আয় হয় তাহা পৃথক ভাবে জমির মালিক, শ্রমিক, মূলধনের মালিক এবং সংগঠকের আয়েরই সমষ্টি, অর্থাৎ জমির খাজনা, মূলধনের সুদ, শ্রমিকের মজুরি এবং সংগঠকের বা মালিকের মুনাফার সমষ্টি জাতীয় মোট আয়ের সমান। কখনও কখনও মালিক মুনাফার কিছু অংশ জমা রাখে। জাতীয় আয় নির্ধারণের সময় এই জমা রাখা অর্থও যোগ করিতে হয়। আমাদের দেশের অনেকগুলি শিল্প এবং কোন কোন বাণিজ্য এখন রাষ্ট্রায়ত্ত আছে। এই সকল শিল্পবাণিজ্য বা রাষ্ট্রাধীন অন্য প্রকারের

সম্পত্তি হইতে সরকারের আয় হয়, জাতীয় আয় নিরূপণের সময় তাহাও যোগ করিতে হয়। উৎপাদনকারী নিজের গৃহে বাস করিয়া উৎপাদনের কার্য পরিচালনা না করিলে ঐ বাড়ী হইতে যে ভাড়া হইতে পাবিত তাহাও জাতীয় আয়ের অংশ। উৎপাদনকারী উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ নিজে ভোগ করে, তাহাও জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরিতে হয়। আমাদের দেশে শতকরা প্রায় পঁচাত্তর জন লোক কৃষিকার্যের দ্বারা জীবন যাপন করে। ইহার বেশীর ভাগ লোকই নিজ উৎপন্ন দ্রব্য আবার ভোগও করে। আয়-পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নিরূপণের সময় এই ভোগ্য বস্তুও হিসাবের আমলে আনিতে হয়।

আয়-পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নিরূপণ করিতে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে একই আয় একাধিক বার হিসাবের আমলে যেন না আসে সেদিকে লক্ষ রাখিতে হইবে। এক ব্যক্তি বৎসরে যাহা আয় করে তাহার কিছু অংশ ব্যক্তিবিশেষকে নির্দিষ্ট হারে দান করিতে পারে। এখন জাতীয় আয় নিরূপণের সময় যদি উভয় ব্যক্তির আয় হিসাবের আমলে আনা হয় তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তির আয়ের যে অংশ দান করা হয় সে অংশ একাধিকবার হিসাবের আমলে আসিবে। তাহা ভ্রান্তিজনক হইবে। কাজেই আয়ের যে অংশ দান বা অন্যভাবে হস্তান্তরিত হয় তাহা বাদ দিয়াই জাতীয় আয় নিরূপণ করিতে হয়। এইরূপ কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলে তাহা হইতে বিক্রেতার যে আয় হয় তাহাও জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হয় না। কারণ ঐ বিক্রয়ের ফলে ব্যক্তিবিশেষের আয় এবং ব্যয় হয় কিন্তু মোট জাতীয় আয়ের কোন পরিবর্তন হয় না।

ব্যয় ও সঞ্চয় পদ্ধতি (Expenditure and Savings Method) :

কোন ব্যক্তির বৎসরে যাহা আয় হয় তাহার কিছু অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় হয় এবং অবশিষ্ট অংশ সে সঞ্চয় করে। এই সঞ্চিত অর্থ সে নিজে পুনরায় উৎপাদন কার্য চালাইবার জন্য মূলধন হিসাবে ব্যবহার করে অথবা অপরকে নানা পদ্ধতিতে মূলধন হিসাবে কাজে লাগাইবার জন্য ঋণ দেয়। সেই ব্যক্তি মোট ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিল এবং যে অর্থ সঞ্চয় করিল এই উভয়ের সমষ্টি তাহার আয়। জাতির ক্ষেত্রেও এই উপায়ে মোট আয় নির্ধারণ করা যায়। যে কোন বৎসর জাতি বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্যের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে এবং মূলধন হিসাবে ব্যবহারের জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করে তাহার সমষ্টিই জাতীয় আয়। মোট ব্যয়ের সমষ্টি মোট জাতীয় আয়। এইজন্য ইহাকে ব্যয়-পদ্ধতিও বলা হয়। কোন দেশের সকল লোক এবং প্রতিষ্ঠান মোট যদি পাঁচ হাজার কোটি টাকা মূল্যের ভোগ্য দ্রব্য ক্রয় করে এবং দুই হাজার কোটি টাকা সঞ্চয় করে তবে এই পদ্ধতি অনুসারে মোট জাতীয় আয় হইবে সাত হাজার কোটি টাকা। ভোগ্য দ্রব্য

ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত অর্থের সঙ্গে সঞ্চিত অর্থ যোগ করিলে মোট যে অর্থের পরিমাণ হয় তাহাই জাতীয় আয়।

উপরের এই তিনটি পদ্ধতিই যদি সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা হয়, তবে অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সঠিক ভাবে পরিসংখ্যান গ্রহণ করা কঠিন। কখনও কখনও ইহা যেমন শ্রমসাধ্য তেমনই অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সেইজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। ফলে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগে যে সমষ্টি পাওয়া যায় তাহাতে সামান্য তারতম্য থাকিয়া যায়।

জাতীয় আয় বণ্টন (Distribution of National Income):

মোট জাতীয় আয় বাড়িলেই জাতির সকল লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে তাহা সকল ক্ষেত্রে সত্য নহে। সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছুটা নির্ভর করে মোট জাতীয় আয়ের বণ্টনের উপর। যদি জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ অল্প কয়েকজন লোকের হস্তগত হয় তবে মোট জাতীয় আয় বর্ধিত হইলেও কেবল কয়েক ব্যক্তিরই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্ধিত হয়। সেই জন্যই দেশের সরকার কেবল মোট জাতীয় আয় বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, যাহাতে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করে। কাজটি দুরূহ সন্দেহ নাই, কিন্তু সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে জাতির সকল লোকের ব্যাপক ভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনা থাকিবে না।

বৈষম্যের কারণ:

নানাকারণে একই সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আয়ের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ইহা কোন দেশবিশেষের বিশিষ্টতা নহে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেমন এই তারতম্য বিদ্যমান, সাম্যবাদী রাষ্ট্রেও এই বৈষম্য বিদ্যমান। কোথাও এই বৈষম্য সুস্পষ্ট, কোথাও ইহা স্বল্পায়তন। কোন এক ব্যক্তি অপেক্ষা যদি অপর এক ব্যক্তি অধিকতর দৈহিক শক্তিসম্পন্ন হয়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি অধিকতর উৎপাদন করিতে পারে। কাজেই তাহার আয় বেশী হয়। কোন এক ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি যদি অধিকতর কৌশলী হয়, তবে তাহার উৎপাদন শক্তি বেশী হইবে। তাহার আয়ও বেশী হইবে। কর্মকুশলতা নির্ভর করে কিছুটা নিজ নিজ বুদ্ধির উপর, কিছুটা শিক্ষার উপর। বুদ্ধির উপর কোন ব্যক্তির হাত বিশেষ কিছু নাই। শিক্ষা কেহ পায় কেহ পায় না, যে শিক্ষা পায় সে অশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী আয় করে। দেশের আইন বা সমাজ-ব্যবস্থাও এই প্রকারের তারতম্যের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে দায়ী। সামাজিক বা আইন-গত ব্যবস্থার ফলে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়।

যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক এই ব্যক্তির অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী আয় হয়। এই সকল কারণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আয়ের তারতম্য হইয়া থাকে।

বৈষম্যের ফল :

বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আয়গত যে বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা বর্তমান যুগে সমাজের অকল্যাণ বা অশান্তির অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহার আয় বেশী সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর ভোগবিলাসে কালক্ষেপ করিতে পারে। তাহার মনে অহঙ্কার জাগা অস্বাভাবিক নয়। সে অপরকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে। যাহার আয় কম সে অধিকতর আয়সম্পন্ন ব্যক্তিকে হিংসা করে। ফলে এই দুইএর মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দেয়। মানুষে মানুষে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ ঘটে। সমাজের শান্তি-ভঙ্গ হয়।

এই তারতম্যের ফলে মনুষ্য-শক্তিরও অপচয় হয়। দরিদ্র সন্তান মেধাবী হইলেও সে অর্থাভাবে শিক্ষার সুযোগ পায় না। ফলে তাহার প্রতিভা পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইতে পারে না। ধনী সন্তান মূর্খ হইলেও বহু অর্থ ব্যয়ে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কখনও কখনও অর্থের অপচয় হয়, শিক্ষার কোন ফল হয় না। একদিকে মনুষ্যশক্তির অপচয় হয়, অপর দিকে অর্থের অপচয় হয়।

এই বৈষম্যের ফলে রাষ্ট্রশক্তিও দুর্বল হয়। বিত্তবান ব্যক্তি অযোগ্য হইলেও কেবল মাত্র অর্থশক্তির বলে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা আয়ত্ত করে। অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা দেশ শাসিত হয় বলিয়া রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়। তাহা ছাড়া বিত্তবান ব্যক্তিরা নিজ স্বার্থ কায়েম রাখার জন্য নানা অসদুপায় অবলম্বন করে। রাষ্ট্রশাসনে দুর্নীতি স্থান পায়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ধনবৈষম্য আরও বাড়িয়া যায়।

বৈষম্যহ্রাসের উপায় :

কল্যাণকামী সকল রাষ্ট্রই এখন এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করে যাহার ফলে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন হইতে পারে। বৈষম্য একেবারে লোপ পাওয়া হয় ত অসম্ভব। কিন্তু নানা ব্যবস্থার ফলে তারতম্য কমিয়া যাইতে পারে। জাতীয় আয়ের বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুষম বণ্টনের জন্য দেশের সরকার কর-নীতির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। যখন দেখা যায় অল্পসংখ্যক লোকের হাতে অধিক পরিমাণ অর্থ চলিয়া গিয়াছে, তখন অধিক আয়সম্পন্ন ব্যক্তির উপর অধিক হারে আয়-কর, ব্যয়-কর, সম্পত্তি-কর, উত্তরাধিকার-কর ধার্য করিতে পারে। এই করব্যবস্থার ফলে অধিক আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নীট আয় কমিয়া যায়। কেবল এই ব্যবস্থাতেই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুষম বণ্টন

হইবে না। এই ধরনের কর হইতে সংগৃহীত অর্থ শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতির জন্য ব্যয়িত হইলে সমাজের নিম্ন-আয়-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে। কোন কোন শিল্প ও বাণিজ্য হইতে নিশ্চিত আয়ের সম্ভাবনা আছে। সেই সকল শিল্প স্থাপন বা বাণিজ্য-পরিচালন ব্যবস্থা যদি ধনীদের হাতে যায়, তবে তাহাদের আয় অধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। দেশের সরকার যদি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এই সকল শিল্প স্থাপনের বা বাণিজ্য-পরিচালনের সুযোগ ব্যক্তিবিশেষকে না দিয়া অল্প-আয়-বিশিষ্ট লোকেদের সমবায় সমিতি প্রভৃতিকে দেয়, তাহা হইলে এই সকল শিল্পবাণিজ্যের লভ্যাংশ অল্পবিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন হয়। ধনবৈষম্যও কমিয়া যায়। বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুষম বণ্টনের জন্য এই ধরনের নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন ঃ

মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ এবং কোন কোন সূত্র হইতে কিভাবে ঐ জাতীয় আয় উদ্ভূত হয় তাহার নিরূপণ প্রত্যেক দেশের পক্ষেই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রত্যেক বৎসরের জাতীয় আয়ের সঠিক পরিমাণ জানা গেলে দেশের আর্থিক উন্নতি বা অবনতির সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব হয়। যখন দেখা যায় কোন বৎসর পূর্ব বৎসর অপেক্ষা মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখন মোটামুটি মনে করা যায় যে দেশ আর্থিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং লোকেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আবার যখন দেখা যায় যে কোন বৎসরের মোট জাতীয় আয় পূর্ব বৎসরের মোট জাতীয় আয় অপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখন মনে করা যায় যে দেশের আর্থিক অবস্থা অবনতির দিকে চলিয়াছে এবং লোকেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস পাইতেছে। অবশ্য এই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে দেশের লোকসংখ্যা, দ্রব্যমূল্য এবং আয়বণ্টনের অবস্থার কথা বিবেচনা করিতে হয়। এইগুলির ধারা অপরিবর্তিত থাকিলেই সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটি অভ্রান্ত হইবে।

মোট জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি জাতির জীবনযাত্রার মানেরও সূচক। মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়, আবার হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে মান অবনমিত হয়। কাজেই কোন জাতির জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইয়াছে না অবনমিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইলেও জাতির মোট আয় নিরূপণ করিতে হয় এবং তাহার বণ্টনের কথা বিবেচনা করিতে হয়।

তুলনামূলক বিচার আমাদিগকে অগ্রগতির প্রেরণা দেয়। কাজেই এক জাতির মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে অন্য জাতির মাথাপিছু আয়ের তুলনা হইয়া থাকে। এই তুলনার জন্য মোট জাতীয় আয় নিরূপণ প্রয়োজনীয়। এই তুলনার ফলে কোন জাতি

অপেক্ষা কোন জাতির আয় বেশী বা সুখস্বাচ্ছন্দ্য বেশী তাহা জানা যায়। ইহাতে কম আয় এবং কম সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিশিষ্ট জাতি আয় বৃদ্ধির জন্য যত্নবান হয়।

জাতীয় আয়ের সম্যক বিশ্লেষণ করা গেলে জাতির অর্থনৈতিক গঠনের একটা চিত্র পাওয়া যায়। কোন জাতির অর্থনৈতিক গঠন কৃষিভিত্তিক, কোন জাতির অর্থ-নৈতিক গঠন শিল্প-ভিত্তিক তাহা সম্যক জানিতে পারিলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের ব্যবস্থা করা যায়।

মোট জাতীয় আয় নিরূপণ এবং তাহার সূত্রের বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ দুরূহ কাজ। নানা বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করিয়া উন্নত দেশগুলি নিরূপণপদ্ধতির দোষত্রুটি নিরসনের চেষ্টা করিতেছে। ফলে সংগৃহীত তথ্য এবং সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বলিয়াই মনে করা হয়।

প্রশ্ন

১। জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায়? (পৃঃ ১২-১৪)

২। জাতীয় আয় নির্ণয়ের পৃথক উপায়গুলি বর্ণনা কর। (পৃঃ ১৪-১৯)

৩। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে দেশের জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় কি? (পৃঃ ১৯-২০)

৪। আয় বৈষম্যের কারণ, কুফল বৈষম্যের হ্রাসের উপায় নির্ধারণ কর। (পৃঃ ১৯-২১)

৫। জাতীয় আয়ের পরিমাণ নিরূপণ এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা কি? (পৃঃ ২১-২২)

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের জাতীয় আয়

আমাদের দেশের মোট জাতীয় আয় নিরূপণ এবং বিশ্লেষণ করা খুব দুরূহ কাজ ছিল। নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান বা তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সরকারের কোন বিভাগ ছিল না। দেশের কোন কোন অঞ্চলের পরিসংখ্যান দুর্লভ ছিল। যে সকল পরিসংখ্যান পাওয়া যাইত, তাহার কিছু অংশ অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমাদের দেশের লোকেরা অনেকেই আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে না। যাহারা রাখে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নানা কারণে প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করে না। আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে বহুলোকই যাহা উৎপাদন করে, তাহার একটা বিশিষ্ট অংশ নিজেদের ভোগ্যদ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করে। হিসাবের সময় সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্য বেচাকেনা হয় তাহাই আমলে আনা হয় বলিয়া নিজ নিজ ভোগ্যদ্রব্য রূপে ব্যবহৃত উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাব পাওয়া যায় না। এই সকল দুরূহতা সত্ত্বেও বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতেই মোট জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় নিরূপণের চেষ্টা চলিতেছে। কোন কোন অন্তরায় ধীরে ধীরে দূরীভূত হওয়ার ফলে ক্রমে ক্রমে এই মোট জাতীয় আয়ের হিসাব নির্ভরযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে জাতীয় আয় নিরূপণের চেষ্টা করেন দাদাভাই নওরোজী। তাঁহার হিসাবে তখন মোট জাতীয় আয় ছিল তের শত চল্লিশ কোটি টাকা। তখন লোকসংখ্যা ছিল সতের কোটি। কাজেই দাদাভাই নওরোজীর হিসাবে মাথাপিছু আয় ছিল ২০৲ টাকা। ইহার পর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ব্যারিং ও বারবুর যে তথ্য সংগ্রহ এবং পরিবেশন করেন তাহা হইতে জানা যায় তখন ভারতবর্ষের মোট জাতীয় আয় ছিল পাঁচ শত পঁচিশ কোটি টাকা। তখন ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ১৯,৮৫,৩৯,০০০। কাজেই তখন মাথাপিছু আয় ছিল ২৭৲ টাকা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লর্ড কার্জন মোট জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় নিরূপণ করা। এই হিসাব অনুসারে মোট জাতীয় আয় ছিল সাত শত কোটি টাকা, তখন লোকসংখ্যা ছিল ২৩,১০,০০,০০০। এই হিসাবে মাথাপিছু আয় ছিল ৩০৲ টাকা। ওয়াদিয়া এবং যোশীর হিসাবে ১৯১৩-১৪ সালে ভারতের মোট জাতীয় আয় ছিল ১০৮৭২৭৯৭০১০৲ টাকা, তখনকার মোট লোকসংখ্যা ছিল ২৪,৫১,৮৯,১১৬। ইহা হইতে দেখা যায়

তখন ভারতের মাথাপিছু আয় ছিল ৪৪·৩৩ টাকা। এইরূপে ফিন্‌লে সিরাজের মতে ১৯২০-২১ সালে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ছিল ১০৭৲ টাকা। আর ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও-এর হিসাব অনুসারে ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫৲ টাকা আর ১৯৪২-৪৩ সালে ইহা ছিল ১১৪৲ টাকা।

উপরের হিসাবের সারমর্ম নিম্নরূপ

হিসাবকর্তা	সাল	মাথাপিছু আয়
দাদাভাই নওরোজী	১৮৬৮	২০ টাকা
ব্যারিং ও বারবু	১৮৮২	২৭ „
লর্ড কার্জন	১৮৯৯	৩০ „
ওয়াদিয়া এবং যোশী	১৯১৩-১৪	৪৪·৩৩ „
ফিন্‌লে সিরাজ	১৯২০-২১	১০৭ „
ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও	১৯৩১-৩২	৬৫ „
„	১৯৪২-৪৩	১১৪

উপরের এই হিসাব জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয়ের গড় সম্বন্ধে মোটামুটি একটা চিত্র আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে কিন্তু এই চিত্রগুলি তুলনার নির্ভুল ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সর্বপ্রথম মনে রাখা প্রয়োজন যে বিভিন্ন সময়ে দ্রব্যমূল্য বিভিন্ন-রূপ ছিল। কাজেই মাত্র মাথাপিছু আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য হ্রাসবৃদ্ধি পুরাপুরি সূচিত হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন হিসাব-কর্তা বিভিন্ন এলাকার হিসাব গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে মোট ভারতের অবস্থা নির্ণয় করিয়াছেন। এই সকল হিসাবের তুলনা-মূলক বিচার সহজসাধ্য নহে। কারণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা বিভিন্ন-রূপ। কাজেই এক অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত অন্য অংশের উপর প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। তৃতীয়তঃ হিসাব-কর্তারা সকলে তথ্য সংগ্রহের একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। তাঁহাদের হিসাবের ফলও বিভিন্ন রূপ হইবে না সেকথা নিঃসন্দেহে বলা চলিবে না। চতুর্থতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে পূর্ববর্তী হিসাব অপেক্ষা পরবর্তী হিসাব অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। কাজেই পূর্ববর্তী হিসাবের ফলাফল পরবর্তী হিসাবের ফলাফলের মত সমান নির্ভরযোগ্য নহে। সর্বশেষ এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই হিসাব-কর্তাদের প্রায় সকলেই রাজনৈতিক প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া তাঁহাদের তথ্য-সংগ্রহ কার্যসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজ নিজ মতবাদ তাঁহাদের সংগ্রহ-রীতিকে আংশিকভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারতের সরকার ভারতের মোট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় নিরূপণের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছিল। এই কমিটি আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নির্ধারণ করিল যে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ১৯৪৮-৪৯ সালে ছিল ২৪৬.৯ টাকা। সেই হইতে প্রতি বৎসরই মোট জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নিরূপিত হইতেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের হিসাবে ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের মোট জাতীয় আয় ছিল দশ হাজার দুই শত চল্লিশ কোটি টাকা। তখন মাথাপিছু আয় ছিল ২৮৪৲ টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনা-রচনাকারীদের মতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল বার হাজার এক শত ত্রিশ কোটি টাকা। আর মাথাপিছু আয় ছিল তিন শত ছয় টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা-রচনাকারীদের হিসাবে ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের মোট জাতীয় আয় ছিল চৌদ্দ হাজার পাঁচ শত কোটি টাকা এবং মাথাপিছু আয় ছিল তিন শত ত্রিশ টাকা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-রচনাকারীরা আশা করেন যে ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতের মোট জাতীয় আয় হইবে উনিশ হাজার কোটি টাকা এবং মাথাপিছু আয় হইবে ৩৮৫৲ টাকা।

উপরের হিসাবের সারমর্ম নিম্নরূপ

সাল	মোট জাতীয় আয় (টাকা)	মাথাপিছু আয়
১৯৫০-৫১	১০,২৪০,০০,০০,০০০	২৮৪ টাকা
১৯৫৫-৫৬	১২,১৩০,০০,০০,০০০	৩০৬ „
১৯৬০-৬১	১৪,৫০০,০০,০০,০০০	৩৩০ „
(আশা করা যায়) ১৯৬৫-৬৬	১৯,০০০,০০,০০,০০০	৩৮৫ „

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় শতকরা ত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবার আশা হয়ত পূর্ণ হইবে না। জাতীয় আয় সম্ভবতঃ শতকরা ২২।২৩ ভাগ বর্ধিত হইবে। এখন চতুর্থ পরিকল্পনার কাঠামো রচনা করা হইতেছে। এই পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় শতকরা মোট সাড়ে বত্রিশ ভাগ বর্ধিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে।

পূর্বোক্ত তথ্যগুলি পাঠে যদি আমরা এই সিদ্ধান্ত করি যে ক্রমেই আমাদের দেশের আর্থিক উন্নতি হইতেছে তবে ইহার মধ্যে কিছুটা ভ্রান্তি থাকিয়া যাইবে। কেবলমাত্র দ্রব্যমূল্যের গতি লক্ষ্য করিলেই এই ভ্রান্তির একটা আভাস পাওয়া যাইবে। মাথাপিছু আয় যে হারে বাড়িতেছে দ্রব্যমূল্যও প্রায় সেই হারেই বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই আপাত দৃষ্টিতে আমরা উন্নতির হারকে যেমন দেখি প্রকৃতপক্ষে আর্থিক উন্নতির হার তেমন নহে।

ভারতের জাতীয় আয়ের সূত্র ঃ

কোন কোন সূত্র হইতে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের কত শতাংশ উদ্ভূত হয় তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। নিম্নে এই বিষয়ের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

সূত্র	শতাংশ			
	১৯৫০-৫১	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৬১-৬২
কৃষি ইত্যাদি	৫১.৩	৪৮.৮	৪৬.৪	৪৬.৭
খনির কাজ, কারখানা ও ছোটবড়রের শিল্প	৬১.১	১৭.৭	১৮.৬	১৯.১
বাণিজ্য, পরিবহণ ইত্যাদি	১৭.৭	১৭.৩	১৮.১	১৬.৭
চাকুরি, সেবামূলক কার্য	১৫.১	১৬.১	১৬.৯	১৭.৫

বিভিন্ন সূত্র এবং সেইগুলি হইতে যে আয় হয় তাহার কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। কৃষি ইত্যাদি বলিতে উপরের তালিকায় প্রকৃত কৃষিকার্য ভিন্ন পশুপালন, মাছের চাষ, বন প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন সম্পদ ধরা হয়। উপরের এই তালিকা হইতে দেখা যায় জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক এই সূত্র হইতেই উদ্ভূত হয়। ভারতবাসীরা যে প্রধানতঃ কৃষিজীবী এই তালিকা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই সূত্র হইতে আয়ের গতি দেখিয়া বুঝা যায় যে ক্রমে ভারতীয়দের কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়া আসিতেছে।

আয়ের দ্বিতীয় সূত্র খনি এবং ছোট বড় শিল্প। মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১৬-১৮ অংশ এই সূত্রগুলি হইতে আসে। জগতের উন্নত জাতিগুলির আয়ের একটা বিশিষ্ট অংশ আসে এই সূত্র হইতে। যদিও আমাদের এই সূত্র হইতে আয়ের হার ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, একথা এখনও সম্পূর্ণ সত্য যে, এই সূত্রকে বিস্তৃত করার অনেক সুযোগ এবং প্রয়োজন রহিয়াছে।

আমাদের মোট জাতীয় আয়ের তৃতীয় সূত্র ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যানবাহন। মোট আয়ের ১৭-১৮ শতাংশ আসে এই সূত্র হইতে। এই সূত্রে আয়ের হার প্রায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

মোট জাতীয় আয়ের শেষ সূত্র হইল চাকুরি, ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি বৃত্তি। এই সকল বৃত্তি হইতে মোট আয়ের ১৫-১৭ শতাংশ আসে। এই আয়ের গতি হইতে দেখা যায় ইহা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

ভারতের জাতীয় আয়ের আরও দুইটি দিক বিশেষ লক্ষ্য করিবাব বিষয়। জাতীয় আয়ের বণ্টন লক্ষ করিলে দেখা যায়, আমাদের দেশের মোট লোকসংখ্যার দশ শতাংশের আয় মোট আয়ের তেত্রিশ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ মোট জাতীয় আয়ের অনধিক তিন শতাংশের মালিক। মোট আয়ের তেত্রিশ শতাংশ ভোগ করে মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অতি অল্পসংখ্যক লোক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। ভারতের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে ভারত পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলির অন্যতম। আমাদের দেশের লোকের গড়পড়তা মাসিক আয় ২৭·২৭ টাকা। অথচ আমেরিকাবাসীদের গড়ে মাসিক আয় ৭৮৪৲ টাকা, গ্রেটব্রিটেনবাসীদের গড়ে মাসিক আয় ৩৬৩৲ টাকা। জাপানীদের গড়ে মাসিক আয় ৮১·৫০ টাকা। ইহা হইতেও আমাদের দেশ যে কত দরিদ্র তাহা সহজে বুঝা যায়।

জীবন-যাপনের মান (Standard of Living):

কিছু পরিমাণ খাদ্য, কিছু পরিমাণ বস্ত্র এবং কিছু পরিমাণ আরাম না পাইলে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এইগুলি মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন। কিন্তু যাহা আহার করিলে, যাহা পরিধান করিলে এবং যে পরিমাণ আরাম পাইলে মানুষ কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সেই পরিমাণ আহার, বস্ত্র এবং আরাম পাইয়া অতি অল্প লোকই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটই আহার এবং পরিধেয় প্রভৃতির এমন একটা পরিমাণ আছে যাহা না পাইলে সে ব্যক্তি তাহার জীবনের কোন অর্থ নাই বলিয়া মনে করে। এই পরিমাণই সেই ব্যক্তির জীবনধারণের মান।

সকল ব্যক্তির জীবনধারণের মান এক নহে। এক ব্যক্তি যে খাদ্য, পরিধেয় বা বাসগৃহ পাইলে মোটামুটি সন্তুষ্ট হইতে পাবে, অপর ব্যক্তি তাহা অপেক্ষা বেশী না হইলে সন্তুষ্ট হইতে পাবে না। যাহা পাইলে একজন শ্রমিক মোটামুটি সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করে বলিয়া মনে করে, তাহা পাইলে একজন কারখানার মালিক তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান হইতে পারে বলিয়া মনে করে না। কাজেই জীবন-যাপনের মানের কোন সাধারণ মাপকাঠি নাই।

জীবন-যাত্রার মান তিন প্রকারের হইতে পারে। যে ব্যক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়

খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান প্রভৃতি পাইলে চলিতে পারে বলিয়া মনে করে, তাহার জীবনধারণের মানকে বলা হয় বাঁচিয়া থাকার মান। সুস্থ দেহে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে বিশেষ রকমের এবং পরিমাণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতির প্রয়োজন। যে ব্যক্তি এই রকমের এবং পরিমাণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতি পাইলেই চলিতে পারে মনে করে, তাহার জীবনধারণের মানকে স্বাস্থ্যমান বলা হয়। স্বচ্ছন্দভাবে জীবন-যাপন করিতে হইলে আরও উন্নত রকমের এবং পরিমাণের আহার্য, পরিধেয়, বাসগৃহ, আমোদ প্রভৃতির প্রয়োজন। যে ব্যক্তি এই উন্নত রকমের এবং পরিমাণের আহার্য, পরিধেয়, বাগগৃহ প্রভৃতি অপরিহার্য মনে করে, তাহার জীবন-যাপনের মানকে স্বাচ্ছন্দ্যমান বলা চলে।

জীবন-যাপনের মান নির্ভর করে স্বাস্থ্য, খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ, শিক্ষা প্রভৃতির উপর। ভারতে লোকদের জীবনধারণের মান খুব অনুন্নত ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই মান উন্নত হইতেছে। মৃত্যুর হার কমিয়াছে, মানুষের গড়পড়তা আয়ু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবাসীরা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিতেছে। বস্ত্রের উৎপাদন এবং ব্যবহার বাড়িয়াছে। শিক্ষার জন্য প্রত্যেক রাজ্যসরকাবই অধিক হইতে অধিকতর অর্থ ব্যয় করিতেছে। অবশ্য গৃহ-সমস্যার যথাযথ সমাধান হইতেছে না। পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনৈতিক বিভাগ ১৯৫৫ সালে এ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, ভারতবাসীর জীবন-যাত্রার মান উন্নত হইতেছে।

আয়ের সাহায্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মানুষ আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করে। আয় বৃদ্ধি হইলেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনা বেশী হয়। সেইজন্য মোট জাতীয় আয় বাড়াইবার জন্য দেশের সরকার যত্নবান হয়। কিন্তু এ কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে যে মোট জাতীয় আয় বাড়িলেই যে ব্যক্তির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাঁড়িবে বা জীবনের মান উন্নত হইবে তেমন নহে। মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় অথবা ধন-বণ্টন যদি বৈষম্যপূর্ণ হয়, তবে সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় না বা জীবনের মান উন্নত হয় না।

ভারতবাসীদের জীবনযাত্রার মান ঃ

ভারতবাসীদের মাথাপিছু আয নিতান্ত কম। কাজেই জীবনযাত্রার মানও তাহাদের অত্যন্ত নিম্ন। একে তো আয় কম, তাহাতে আবার অসম বণ্টন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। এই কারণে অধিক সংখ্যক লোকেরই জীবন-যাত্রার মান নিচুতে রহিয়াছে। ভারতের জনগণের দৈনিক গড়ে মাথাপিছু ৭৫ পয়সা ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু শতকবা ৬০ জন লোকই দৈনিক মোট ৪৭ পয়সাব বেশী ভোগ্য দ্রব্যের জন্য ব্যয় করিতে পারে না। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরও শোচনীয়।

লোকেরা পুষ্টিকর খাদ্য বা প্রয়োজনীয় পরিধেয় পায় না। খাদ্যদ্রব্যের জন্য আয়ের অধিকাংশ ব্যয় করিয়াও শতকরা চার জন লোক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। যে ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির ৩০০০ ক্যালোরি খাদ্যমূল্যসম্পন্ন খাদ্যের প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের ভাগ্যে জোটে ১২০০ হইতে ১৫০০ ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য। শীতাতপ নিরোধ বা মানসম্ভ্রম বজায় রাখার মত বস্ত্রের অভাব আরও বেশী। সাধারণ লোক তাহার মোট ব্যয়ের দশ ভাগের এক ভাগও বস্ত্রের জন্য ব্যয় করিতে পারে না। যে ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু সুতী বস্ত্রের ব্যবহার ৫০ গজ এবং জাপানে ৩৫ গজ সে ক্ষেত্রে ভারতে মাথাপিছু সুতী বস্ত্রের ব্যবহার অনূর্ধ্ব ১৫ গজ। পর পর তিনটি পরিকল্পনার শেষেও আশা করা যায় সুতী বস্ত্রের ব্যবহার মাথাপিছু ১৭·২ গজ হইবে।

শিক্ষাব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আজও ৫ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের শিশুদের মধ্যে শতকরা ৪০ জনই শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে না। ভারতের সংবিধানের নির্দেশ সত্ত্বেও বিদ্যালয়গমনোপযোগী ৫ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই।

বাসস্থানের অবস্থাও একই প্রকারের। অধিক-সংখ্যক লোকই যে গৃহে বাস করে তাহাকে নিতান্ত সম্ভ্রমসহকারেই বাসগৃহ বলিয়া অভিহিত করা হয়। ছোট প্রকোষ্ঠে বহুলোক একসঙ্গে কোনক্রমে বাস করিয়া রোদ-বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থাই গৃহব্যবস্থা।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে মোট জাতীয় আয় ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতেছে। আশা করা যায় নানা ব্যবস্থার ফলে আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং তদনুরূপ জীবন-যাত্রার মান উন্নীত হইবে।

প্রশ্ন

১। ভারতের জাতীয় আয় নির্ণয়ের পথে কি বাধা আছে? বিভিন্ন উপায়ে নির্ণীত মোট জাতীয় আয় বিশ্লেষণ কর। (পৃঃ ২৪-২৫)

২। ভারতের জাতীয় আয়ের সূত্রগুলি বিশ্লেষণ কর। (পৃঃ ২৬ ২৭)

৩। ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মানের আলোচনা কর। (পৃঃ ২৭-২৯)

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রম ঃ শ্রমের যোগান ঃ লোকসংখ্যা ঃ কর্মকুশলতা

শ্রম উৎপাদনের একটি উপাদান। কাজ করিবার জন্য মানুষের শরীর ও মনকে খাটাইতে হয়। মন অথবা শরীরকে খাটানোর নামই শ্রম। বৈজ্ঞানিক মন খাটাইয়া পরিশ্রম করে। আবার দিন-মজুর তাহার দেহ খাটাইয়া পরিশ্রম করে। ইহাদের সকলেরই কাজের মূলে আছে শ্রম। নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের দৈহিক শ্রমের প্রয়োজন এখন কমিয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে এখন কঠোর পরিশ্রমের অনেক কাজই অল্প শ্রমে করা যায়। যে বোঝা বন্দর হইতে জাহাজে উঠাইতে একশত জন শ্রমিকের এক ঘণ্টা সময় লাগিত, এখন ক্রেনের সাহায্যে তাহা পাঁচ মিনিটে জাহাজে উঠানো হইতেছে। এভাবে দৈহিক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা কিছু পরিমাণে কমিয়াছে। কিন্তু সকল সময়ই সকল প্রকারের উৎপাদনের জন্য কিছু পরিমাণ শ্রম অপরিহার্য থাকিবে।

জনসংখ্যা (Population) :

দুই উপায়ে উৎপাদনের জন্য শ্রমেব যোগান বৃদ্ধি পাইতে পারে। প্রথম উপায় জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, দ্বিতীয় উপায় কর্মকুশলতা-বৃদ্ধি।

জনসংখ্যাব কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমাদের দেশে প্রতি দশ বৎসর অন্তর একবার করিয়া লোক গণনা করা হয়। ১৯৭১ সালে একবার লোক গণনা করা হইয়াছিল। তাহার পর পুনরায় ১৯৫১ সালে লোক গণনা করা হইয়াছে। এই লোক-গণনার ফলে দেখা গিয়াছে, দশ বৎসরে লোকসংখ্যা শতকরা ১২.৫ জন বাড়িয়াছে। পুনরায় ১৯৬১ সালে যে লোকগণনা হইয়াছিল তাহাতে দেখা গেল লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২১.৫০ ভাগ। এইভাবে লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে ৫০ বৎসরেই লোকসংখ্যা দ্বিগুণের বেশী হইয়া যাইবে। কোন কোন দেশে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার কম। আবার কোন কোন দেশে এই বৃদ্ধির হার খুব বেশী। তবে মোটামুটি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি মিঃ লাড্‌লি স্ট্যাম্প বিংশতিতম আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে প্রতি বৎসরে গোটা পৃথিবীর লোকসংখ্যা সাড়ে ছয় কোটি করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে।

ম্যাল্‌থাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব (Theory of Population: Malthus) :

লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যসামগ্রীর বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। যে-কোন দেশের কথা বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন বা আমদানি বাড়িতেছে। অবশ্য লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হারের সঙ্গে খাদ্যসামগ্রীর বৃদ্ধির হার তাল রাখিতে পারে কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। ইংল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সে-দেশের জ্ঞানী লোকেরা এ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ধনবৈজ্ঞানিক ম্যাল্‌থাস্ এই সময়ে জনসংখ্যা এবং খাদ্যদ্রব্যের হার সম্বন্ধে এক মতবাদ প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে জনসংখ্যা এবং খাদ্যদ্রব্য উভয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য-বৃদ্ধির হার তাল রাখিতে পারিতেছে না। তিনি বলিলেন যে, যদি লোকসংখ্যা ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২—এই হারে বাড়িতে থাকে, তবে খাদ্যদ্রব্য ২, ৪, ৬, ৮, ১০—এই হারে বাড়ে। জনসংখ্যার বেলা দেখা গেল প্রথমবার যদি জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়, দ্বিতীয়বার আবার প্রথমবারের দ্বিগুণ হইবে। আবার তৃতীয়বার দ্বিতীয়বারের দ্বিগুণ হইবে। প্রথমবার যদি তিনগুণ হয় তবে দ্বিতীয়বার প্রথমবারের তিনগুণ এবং তৃতীয়বার দ্বিতীয়বারের তিনগুণ হইবে। এই হারে জনসংখ্যা বাড়ে। খাদ্যদ্রব্যের বেলা প্রথমবার যদি দশ টন বাড়ে, দ্বিতীয়বার প্রথমবারের চাইতে আরও দশ টন বেশী বাড়িবে। তৃতীয়বারে দ্বিতীয়বার অপেক্ষা আর দশ টন বেশী বাড়িবে। জনসংখ্যার বেলায় যে বাড়তির হার দেখানো হইল, তাহাকে অঙ্কের নিয়মে 'জ্যামিতিক প্রগতি' বলে এবং খাদ্যশস্যের বেলায় যে হারে বৃদ্ধি দেখানো হইল, সেই হারকে 'পাটীগণিতিক প্রগতি' বলা হয়।

ম্যাল্‌থাসের মতে লোকসংখ্যা এইভাবে বাড়িতে থাকিলে শীঘ্রই এমন অবস্থার উদ্ভব হয়, যাহার ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ, অনশন, মহামারী প্রভৃতি দেখা দেয়। তখন অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লোকসংখ্যা কমিয়া যায়। লোকসংখ্যা কমিবার এই প্রাকৃতিক উপায়কে Positive check বলা হয়। এইরূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে গোড়াতেই যাহাতে লোকসংখ্যা খুব বৃদ্ধি না পায়, সেইজন্য যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। জন্মের হার কমাইয়া লোকসংখ্যা কমাইবার উপায়কে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বা Preventive check বলা হয়। জন্মের হার কমাইয়া মানুষ যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার না কমায়, তবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিতে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, লোকসংখ্যা আপনা হইতে কমিবে।

ম্যাল্‌থাসের মতবাদের মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়া চলে না। লোকসংখ্যার বৃদ্ধির যে হারের কথা ম্যাল্‌থাস্ বলিয়াছেন, সে হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এমন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম থাকিতে পারে না। তাহা

ছাড়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদনের ফলে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণও বেশ বাড়িতেছে। আবার কোন দেশের খাদ্যসামগ্রী না বাড়িয়াও যদি লোকসংখ্যা বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজ দ্রব্য বাড়ে, তবে সেই দেশে মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা দেয় না, এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ইংল্যাণ্ডে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনের হার সেখানে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল রাখিতে পারে নাই। কিন্তু শিল্পজ দ্রব্য বাড়িয়াছে। ইংল্যাণ্ডবাসীরা তাহাদের শিল্পজ দ্রব্যের বিনিময়ে বাহির হইতে খাদ্যসামগ্রী আমদানি করিয়াছে। তাহারা দুর্ভিক্ষ-মহামারীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। আবার কোন কোন দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করার ফলে খাদ্যের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছে।

শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়িতেছে। অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া মানুষ এখন কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ হইতে বিরত হইতেছে, অধিক বয়সে বিবাহ করিতেছে বা জন্মনিয়ন্ত্রণের নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। ফলে লোকসংখ্যা আতঙ্কজনক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না।

এই সকল সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, লোকসংখ্যাকে আয়ত্তের মধ্যে না রাখিতে পারিলে এক সময় না এক সময় অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হইতেই হয়। মৃত্যুর হার হইতে জন্মের হার যত বেশী হইবে, লোকসংখ্যা তত বৃদ্ধি পাইবে। সকল সভ্য দেশেই এখন মৃত্যুর হার কমিয়াছে। আমাদের দেশেও মৃত্যুর হার পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেখানে মৃত্যুর হার প্রতি বৎসর হাজারে ২৫ জন ছিল, তাহা এখন কমিয়া হাজারে ১০·৪ জন হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু জন্মের হারও যদি এই হারে কমানো না যায়, তবে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর অবনত হইবে।

জনসংখ্যা ও জাতীয় আয়ঃ

জনসংখ্যাকে কেবল খাদ্যশস্যের পরিমাণ বৃদ্ধির হারের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে চলে না। কোন একটি দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যদি খাদ্যশস্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া অন্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তবে ঐ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অসুবিধা সৃষ্টি করে না। এই প্রসংগে গ্রেটব্রিটেনের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িতেছে না। কিন্তু লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িতেছে, জাতীয় আয় বাড়িতেছে। বর্ধিত আয়ের দ্বারা খাদ্যশস্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইতেছে। ফলে বর্ধিত লোকসংখ্যা অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছে না। কাজেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার আয় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হয়।

কোন দেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মূলধন আছে তাহাকে যথাযথ রূপে কাজে লাগাইয়া উৎপাদন চালাইতে হইলে নির্দিষ্ট-পরিমাণ জনসংখ্যার প্রয়োজন। এই জনসংখ্যার সাহায্যে ঐ পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধন উৎপাদনে নিয়োগ করিলে জাতীয় আয় সর্বাধিক হয়। এই পরিমাণ জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা বা Optimum Population বলে। জনসংখ্যা যদি কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম থাকে তবে দেশের মোট প্রাকৃতিক সম্পদ বা মূলধনকে যথাযথ রূপে কাজে লাগান সম্ভব হয় না। ফলে মাথাপিছু আয় কম হয়। আবার যখন জনসংখ্যা এই কাম্য সংখ্যার অধিক হয় তখন জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার অপেক্ষা উৎপাদন-বৃদ্ধির হার কম হয়। ফলে মাথাপিছু আয় কম হয়। জনসংখ্যা যাহা হইলে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয় তাহাই কাম্য জনসংখ্যা।

এই তত্ত্ব অনুসারে যখন কোন দেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম, তখন সেই দেশ জনবিরল (under-populated), আবার যখন কোন দেশের জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যায় যাহার ফলে মাথাপিছু আয় কমিতে থাকে তখন সেই দেশকে জনাধিক্য-জর্জরিত বলা চলে।

এই কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছে। দেখা যায় যে কোন দেশের বাস্তবিক কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। উৎপাদনের রীতি পরিবর্তিত হইলে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় লোকের কাম্য সংখ্যাও পরিবর্তিত হইতে পারে। আবার যদি নূতন প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় বা প্রাকৃতিক কারণে কোন প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হইয়া যায়, দেশের সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য যে লোকসংখ্যার প্রয়োজন তাহাও বদলাইয়া যায়।

এই বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে এই তত্ত্ব আমাদিগকে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করিবার ইঙ্গিত দিয়াছে। জনসংখ্যাকে যে উৎপাদন এবং আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে, এই তত্ত্ব সেই নির্দেশ দিতেছে। প্রকৃতপক্ষে দেশের উৎপাদন বাড়াইয়া মাথাপিছু আয় যদি বাড়ান যায় তবে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি প্রকৃত ভয়ের কোন কারণ সৃষ্টি করে না।

শ্রমের যোগান ও জনসংখ্যা :

উৎপাদন কার্যের জন্য শ্রমের প্রয়োজন। জনগণ শ্রম সরবরাহ করে। কিন্তু কোন দেশের সমগ্র জনগণ শ্রম সরবরাহ করে না। অল্পবয়স্ক শিশু, অতিবৃদ্ধ বা পীড়িত লোকেরা পরিশ্রম করিতে পারে না। কাজেই ইহারা কোন দেশেই শ্রমের উৎস নহে। অতএব শ্রমের যোগানের কথা বিবেচনা করিতে হইলে মোট জনসংখ্যা

হইতে এই সংখ্যা বাদ দিতে হয়। আবার উন্নত বা সমৃদ্ধ দেশগুলিতে বালক-বালিকারা শিক্ষালাভে বা শিক্ষানবিসিতে নিযুক্ত থাকে। ইহারা শ্রম যোগায় না। দেশও ইহাদের নিকট হইতে শ্রম আশা করে না। বরং ভবিষ্যতের জন্য, শিক্ষাদীক্ষার সাহায্যে, ইহাদিগকে অধিকতর উপযোগী করিয়া তোলার চেষ্টা হয়। এই সকল দেশে একটা নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত বালক-বালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বৃদ্ধরাও এই সকল দেশে শ্রমের যোগান দেয় না। ইহাদিগকে বরং নির্দিষ্ট বয়সে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই এই সকল দেশের শ্রমের যোগানের হিসাব করিতে হইলে বালক, বালিকা এবং প্রৌঢ়কেও বাদ দিতে হয়।

শ্রমের যোগান কিছুটা দেশের সামাজিক ব্যবস্থার উপরও নির্ভর করে। কোন কোন দেশে পর্দাপ্রথা আজও বিদ্যমান। সে দেশে মহিলারা অনেকক্ষেত্রেই শ্রম সরবরাহ করে না। সেই সকল দেশের শ্রমেব যোগানের হিসাব করিতে হইলে মোট জনসংখ্যা হইতে মহিলাদেরও বাদ দিতে হয়।

আবার মোট জনসংখ্যার যত জন শ্রমক্ষম তত জনই যে দেশে শ্রমের যোগান দিবে বা সমপরিমাণে পরিশ্রম করিবে সেকথাও বলা চলে না। যে দেশে জীবনযাত্রার মান উচ্চ সে দেশের লোকেরা অধিকতর পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত থাকে। যে দেশের লোকেদের জীবনযাত্রার মান নিচু সে দেশের লোকেরা কিছুটা শ্রমবিমুখ হয়। 'এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের কথা বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেদের জীবনের মান উচ্চ বলিয়া তাহারা সর্বদা আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় পরিশ্রম করে। ভারতের লোকেদের জীবনের মান নিচু বলিয়া তাহারা শ্রম-বিমুখ। অল্প কিছু উপার্জন হইলেই জীবনযাত্রা সাধারণ ভাবে নির্বাহ হয় বলিয়া তাহারা অধিকতর পরিশ্রম করিতে চেষ্টা করে না।

আবার কোনও কোনও ব্যক্তি ধনের অধিকারী হইলে শ্রমবিমুখ হয়। ইহাদের সংখ্যা কম। তথাপি শ্রমের যোগানের হিসাব নিতে হইলে ইহাদিগকেও বাদ দিতে হয়।

উপরের এই আলোচনা হইতে বুঝা যায় কোন দেশের শ্রমের সরবরাহ সেই দেশের মোট জনসংখ্যার উপর নির্ভর না করিয়া নির্ভর করে সেই দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক রীতিনীতির উপর, জীবনযাত্রার মান এবং লোকেদের অভ্যাসের উপর। ইহা আবার নির্ভর করে শ্রমের কুশলতার উপর।

কর্মকুশলতা—তাহার বৃদ্ধির উপায়ঃ

কেবল লোকসংখ্যা বাড়িলেই শ্রমের যোগান বাড়ে না। লোকসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিতে পারে। সেই অবস্থায় যদি লোকের কর্মকুশলতা বাড়ে তবে শ্রমের যোগান

বাড়ে। লোকসংখ্যা না বাড়াইয়া কর্মকুশলতা বাড়াইয়া শ্রমের যোগান বাড়ানো সকল দেশের পক্ষেই লাভজনক। কারণ তাহাতে খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ বাড়ে না, অথচ উৎপাদন বাড়ে।

কর্মকুশলতা বাড়াইতে হইলে শ্রমিকের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ভাল নয়, সে কখনও কুশলী হইতে পারে না। যে ব্যক্তি নিত্য রোগ ভোগ করে, তাহার নিকট হইতে ভাল কাজ আশা করা যায় না। সেইজন্য আমরা বলিতে পারি, কর্মকুশলতা অনেকটা স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। স্বাস্থ্য আবার নির্ভর করে খাদ্য এবং অভ্যাসের উপর। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে ভাল স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়া যায়। আবার ভাল খাদ্য দেওয়া হইলে মন্দ স্বাস্থ্যও ভাল হয়। অভ্যাসের উপরও স্বাস্থ্য কিছুটা নির্ভর করে। ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া করিয়া অলসভাবে দিন কাটাইলে কাজ করিবার আগ্রহ এবং ক্ষমতা উভয়ই নষ্ট হয়। আবার অধিক পরিশ্রম করিলেও শরীরের ক্ষতি হয়।

বুদ্ধি এবং শিক্ষার উপরও কর্মকুশলতা নির্ভর করে। শ্রমিক বুদ্ধিমান না হইলে সকল কাজই আয়ত্ত করিতে সময় লাগে। কোন কাজই সে অল্প সময়ে সুন্দরভাবে করিতে পারে না। আবার কেবল বুদ্ধি থাকিলেও চলে না। বুদ্ধির সঙ্গে শিক্ষারও প্রয়োজন। শিক্ষিত শ্রমিক যত সহজে কোন জটিল কাজ আয়ত্ত করিতে পারে, অশিক্ষিত শ্রমিক তত সহজে সেই কাজ আয়ত্ত করিতে পারে না। সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষা—এই দুই রকমের শিক্ষাই শ্রমিকের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করে। অনেক কাজ আছে যাহার সম্পাদনের জন্য কারিগরী শিক্ষা অপরিহার্য। সেই সকল কাজের জন্য কখনও কখনও শিক্ষানবিসি করিতে হয়। শিক্ষানবিসি করিয়াও শ্রমিক দক্ষতা অর্জন করে।

শ্রমিকের চরিত্রের উপরও তাহার কর্মকুশলতা কিছুটা নির্ভর করে। শ্রমিক যদি সৎ হয়, তবে সে বেশী উৎপাদন করিতে পারে। শ্রমিক যদি মনে করে সে অন্যের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া উৎপাদন করিতেছে, কাজেই সে ফাঁকি দিলেও তাহার নির্ধারিত মজুরি সে পাইবে, তবে সে কর্মে শিথিলতা দেখাইবে। ফলে সে কম কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাহার কর্মকুশলতা নষ্ট হইবে। কিছুকাল পরে ইহার ফলও তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। তাহার নিয়োগকারী যখন দেখিবে যে তাহাকে নিয়োগ করা মোটেই লাভজনক নহে, তখন নিয়োগকারী তাহাকে হয়ত বরখাস্ত করিবে, না হয় তাহার মজুরির হার কমাইয়া দিবে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, শ্রমিকেরা মদ্য পান করে। ইহাতে তাহারা নৈতিক চরিত্র হারাইয়া ফেলে এবং ফলে তাহাদের কর্মকুশলতা হ্রাস পায়।

যে সকল শ্রমিক যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করে, তাহাদেব কর্মকুশলতা আবার নির্ভর করে অনেকটা যন্ত্রপাতির উৎকর্ষের উপর। শ্রমিক কুশলী হইলেও যে যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহাকে কাজ করিতে হয়, সেই যন্ত্রপাতি যদি কাজেব উপযোগী না হয় তবে উৎপাদন কম হয়। যন্ত্রপাতি ভাল হইলে অল্প সময়ে বেশী কাজ করা সম্ভব হয়।

পরিচালক নিজে যদি কুশলী হয় এবং তাহার ব্যবহার যদি সহানুভূতিপূর্ণ ও ভাল হয়, তবে তাহার অধীনস্থ শ্রমিকরা সহজেই কর্মকুশল হয়। কর্মকুশলতা কিছুটা পবিচালকের নিজ নিপুণতার উপরও নির্ভর করে। সহানুভূতিবিহীন পরিচালকের অধীনে যাহারা কাজ করে, তাহাবা গরজে পড়িয়া কাজ করে, নিজের ইচ্ছায় কাজ করে না। এইরূপ শ্রমিকেরা কুশলীও হয় না।

দেশের জলবাযুব উপবও শ্রমিদের কর্মকুশলতা নির্ভব করে। আমাদের দেশের জলবায়ু অপেক্ষা ইউবোপেব জলবায়ু শ্রমেব পক্ষে অনেক অধিক অনুকূল। কাজেই দেখা যায়, আমাদের দেশেব শ্রমিক অপেক্ষা ইউবোপেব বিভিন্ন দেশেব শ্রমিকরা অধিক কর্মকুশল।

আমাদের দেশেব লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু কর্মকুশলতা সেই পরিমাণে বাড়িতেছে না। কাজেই শ্রমেব যোগান তেমন বাড়িতেছে না। পৃথিবীব অন্যান্য জাতির সঙ্গে সমান তালে চলিতে হইলে, আমাদের এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধিব উপর জোর না দিয়া কর্মকুশলতা বৃদ্ধিব উপব জোর দেওয়া উচিত। শ্রমিকেব দক্ষতা বৃদ্ধি পাইলে যাহাবা শ্রমিককে কার্যে নিযুক্ত কবে, তাহারা অধিক পাবিশ্রমিক দিতে আপত্তি করে না। শ্রমিকের আয় বাড়ে। তাহাতে তাহার জীবনেব মান উন্নীত হয়। সে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করিতে পাবে।

শ্রমের যোগান ও বেকার সমস্যা :

পৃথিবীর সর্বত্রই লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি লোকেদের কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যাইতেছে না। ফলে কাজ করিবার ইচ্ছা-ও শক্তি-সম্পন্ন অনেক লোক কর্মবিহীন অবস্থায় কাল কাটাইতেছে। লোকেদের কাজ করিবার ইচ্ছা আছে, শক্তি আছে : অথচ তাহাবা যদি কর্মে নিয়োগেব সুযোগ না পায়, তবে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে বলে বেকাব অবস্থা।

লোকসংখ্যা বাড়িলে শ্রমের যোগান বাড়ে। কিন্তু কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনকার্য চালাইবার জন্য নির্দিষ্ট-পরিমাণ শ্রমেব প্রয়োজন। যখনই লোকসংখ্যা এই পবিমাণের বেশী হয়, তখনই অতিরিক্ত লোকেরা নিয়োগের সুযোগ পায় না। তাহারা বেকার থাকে।

বেকার সমস্যা এখন কম-বেশী সকল দেশেই আছে। আমাদের ভারতে এখন দেড় কোটির বেশী লোক কর্মবিহীন অবস্থায় আছে। যে পরিমাণ উৎপাদন চলিতেছে তাহার জন্য যত-সংখ্যক লোকের প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা লোকসংখ্যা বেশী হইয়াছে বলিয়াই এই বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন রকমের বেকার আছে। আমাদের দেশে অনেক লোক কৃষিকায করে। এই সকল লোক বৎসরের অল্প কয়েক মাস কাজ করে। অবশিষ্ট সময় ইহারা বেকার থাকে। এমন কোন কোন শিল্প আছে যে শিল্পে সারা বৎসর উৎপাদন চলে না। চিনি-শিল্প ইহার একটি দৃষ্টান্ত। যাহারা এই সকল শিল্পে কাজ করে তাহারা কিছুকাল বেকার থাকে। আবার কিছু-সংখ্যক লোক থাকে যাহারা লেখাপড়া শিখিয়াছে অথচ যাহারা কোন কারিগরী বিদ্যা অর্জন করে নাই। যে-কোন দেশেই এই ধরনের লোকের নিয়োগের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ। কাজেই যত বেশী লোক এই ধরনের শিক্ষা লাভ করে, তাহাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ততই বাড়ে। আমাদের দেশে এই ধরনের বেকারের সংখ্যা অনেক।

কোন কোন শিল্পে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়িলে যে কাজ শ্রমের সাহায্যে হইত, সে কাজ যন্ত্রপাতির সাহায্যে হয়। ফলে কিছু-সংখ্যক শ্রমিক বেকার হয়। অবশ্য ধীরে ধীরে শ্রমিকরা নূতন কর্মে নিয়োজিত হয়। কিন্তু কিছুকালের জন্য তাহারা বেকার থাকে। শিল্পে কখনও কখনও মন্দা দেখা দেয়। তখন শিল্পপতিরা ছাঁটাই করিতে বাধ্য হয়। তখন শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া প্রত্যেক শিল্পেই বিশেষ কুশলতাসম্পন্ন কিছু লোকের প্রয়োজন হয়। অথচ যাহারা কর্মপ্রার্থী তাহাদের মধ্যে কুশলতাবিহীন লোক থাকে অনেক। তাহারা বেকার থাকিতে বাধ্য হয়।

বেকার সমস্যার সমাধান :

প্রত্যেক দেশের সরকারই এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি বেকার সমস্যার মূল কারণ। লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার কমাইতে পারিলে বেকার সমস্যার জটিলতা ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। দেশে শিক্ষার প্রসার হইলে জনসাধারণ এই সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং নানা উপায়ে এই হার কমাইবার চেষ্টা করে। জীবন-যাপনের মান উন্নত হইলে লোকেরা পরিবারের আয়তন ছোট করিতে চেষ্টা করে। তাহাতেও জনসংখ্যা-বৃদ্ধির পথে কিছুটা বাধা সৃষ্ট হয়।

কৃষি কার্যে লোক বৎসরে অনধিক ছয় মাস নিয়োজিত থাকে। অবশিষ্ট সময়ে

ঐ সকল লোককে ছোটখাট কুটীরশিল্পে নিয়োজিত করিতে পারিলে বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়।

কোন কোন শিল্পে কিছু সময়ের জন্য কাজ বন্ধ হয়। সেই সময় সরকার দেশের রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি কার্য আরম্ভ করিলে ঐ শিল্পের সাময়িক বেকার লোকেদের সাময়িকভাবে কর্মের সংস্থান হয়।

কোন কোন সময় দেখা যায়, বহু লোক বেকার আছে। অথচ কয়েকটি শিল্পে অনেক লোকের প্রয়োজন আছে। এই শিল্পগুলিতে কিছু পরিমাণে কারিগরী-শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকের প্রয়োজন। অথচ বেকার লোকেদের মধ্যে ঐ ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক নাই। এই সকল বেকার লোকেদের কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে কিছু-সংখ্যক লোক কর্মে নিয়োজিত হইতে পারে।

কখনও কখনও দেখা যায় কোন শিল্পে শ্রমিকের প্রয়োজন। অথচ যেখানে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠিত, সেখানে আর নিয়োগের উপযোগী শ্রমিক নাই। অন্যত্র অনেক বেকার শ্রমিক আছে। এক স্থানের সংবাদ অন্য স্থানের লোকেরা জানে না বলিয়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে নিয়োগ-সংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহ করার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান থাকিলে সহজে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। যাহাদের চাকুরির প্রয়োজন এবং যাহারা লোক নিয়োগ করিতে চাহে, উভয়েই এই প্রতিষ্ঠানে সংবাদ দিলে এই প্রতিষ্ঠান উভয়ের যোগাযোগ সাধন করাইয়া দিতে পারে। ইহাতে কর্মপ্রার্থী কর্ম পাইতে পারে; অপর দিকে যাহাদের লোকের প্রয়োজন, তাহাদেরও প্রয়োজন মিটিতে পারে।

ভারতের জনসংখ্যা ঃ

ভারতের জনসংখ্যা অতি দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ কোটি বিরানব্বুই লক্ষ। ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা হইয়াছে তেতাল্লিশ কোটি বিরানব্বুই লক্ষ। মোট লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে আট কোটি এবং এই বৃদ্ধির শতকরা হার হইয়াছে মোট ২১·৫। ১৯৪১ হইতে ১৯৫১ সালে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল চার কোটি একচল্লিশ লক্ষ এবং বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ১৩·৩। ১৯৬১ সালের বৃদ্ধির হার অত্যন্ত উচ্চ। পশ্চিম বঙ্গে এই বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৩। এইজন্য এই বৎসরের আদমশুমারে এই বৃদ্ধিকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

জনসংখ্যার আয়তনের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে জনসংখ্যায় চীনের স্থান সকলের উপর। ভারতের স্থান তাহারই নিচে। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের বাস ভারতে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার নির্ভর করে জন্মমৃত্যুর হারের উপর। যদিও বিদেশে গত এবং বিদেশাগত লোকেদের হিসাবও এই বৃদ্ধির আমলে আসে, তথাপি ভারতের ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত নগণ্য বলিয়া হিসাবের আমলে না আসিলেও বিশেষ কোন তারতম্য হয় না। আমাদের দেশে জন্মের হার পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ অপেক্ষা উচ্চ। ১৯৪১-৫১ দশকে ভারতে জন্মের হার ছিল হাজারে চল্লিশ, মৃত্যুর হার ছিল হাজারে সাতাশ। ফলে ঐ দশ বৎসরে হাজারে তের জন করিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫১-৬১ সালে বৃদ্ধির হার ২১·৫০। স্বাস্থ্যের নানা উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার ফলে মৃত্যুর হার কমিয়াছে। জন্মের হারও কিছু কমিয়াছে কিন্তু তাহা বিশেষভাবে কমাইবার কোন উদ্যোগ হয় নাই বলিয়াই জনসংখ্যা-বৃদ্ধির এই উচ্চ হার।

ভারতের জনসংখ্যা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি তথ্য জানা প্রয়োজন। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রতি বর্গ মাইল ভূমিতে গড়ে ৩৮৪ জন লোক বাস করে। ইংল্যাণ্ডে প্রতি বর্গ মাইলে বাস করে ৬০০ জন, জাপানে ৫৭৯, চীনে ১২৩ জন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ জন এবং রাশিয়াতে ২৩ জন। আমাদের দেশের লোকবসতি সকল অঞ্চলে সমান নহে, কেরলে বর্গ মাইলে ১১২৫ জন লোক বাস করে আর পশ্চিম বঙ্গে বাস করে ১৩৩১ জন। মধ্যপ্রদেশে বর্গ মাইলে ১৮৯ জন লোকের বাস, আর আন্দামান নিকোবরে বর্গ মাইলে ২০ জন লোকের বাস। কৃষির সুবিধা পশ্চিম বঙ্গে বেশী, কলকারখানাও পশ্চিম বঙ্গে বেশী বলিয়া এখানে বসতি অপেক্ষাকৃত ঘন।

ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ জন কৃষি হইতে জীবিকা অর্জন করে। শিল্পে নিযুক্ত আছে মোট জনসংখ্যার শতকরা এগার জন। এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে এদেশের তুলনা কৌতূহলোদ্দীপক। ইংল্যাণ্ডে শতকরা আট জন কৃষির উপব নির্ভর করে আর শতকরা আটষট্টি জন নির্ভর করে শিল্পের উপর। ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭·৮ জন শহরে বাস করে। আর শতকরা ৮২·২ জন বাস করে গ্রামে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৭ জন আর ইংল্যাণ্ডে মোট জনসংখ্যার ৮০ জন বাস করে শহরে।

একজন ভারতবাসী গড়ে ৪২ বৎসর জীবিত থাকে। ইংরেজগণ গড়ে ৬১ বৎসর এবং নিউজিল্যাণ্ডবাসীরা গড়ে ৬২ বৎসর কাল জীবিত থাকে।

ভারতের জনসংখ্যা ও খাদ্যসমস্যা :

ভারতের জনসংখ্যা-বৃদ্ধি সম্বন্ধে দুইটি ভিন্ন মত আছে। কাহারও মতে ভারতের জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন জনসংখ্যা মোটেই আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। প্রথম-মতাবলম্বীরা বলেন যে ভারত কৃষি-

প্রধান দেশ। কৃষির উৎপাদন, যতই চেষ্টা করা যাক না কেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমান তালে বাড়ান কোন ক্রমেই সম্ভব হইবে না। বাস্তবিকপক্ষে দেখা যাইতেছে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য দেশের লোকেদের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হইতে খাদ্য যোগান সম্ভব হইতেছে না। পর পর অধিক হইতে অধিকতর খাদ্য আমদানি করা হইতেছে। নানাবিধ উপায়ে কৃষির উন্নতির চেষ্টা চলা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলার কালে বৎসরে ভারতের বাহির হইতে ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনা চলার কালে বৎসরে গড়ে ১২০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করা হইতেছে। তাহা সত্ত্বেও খাদ্যাভাব মিটিতেছে না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকা পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল আট কোটি টন। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বৎসরে দশ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে। কিন্তু লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে দেশের মোট প্রয়োজন হইবে তখন এগার কোটি টন। ইহাতে বুঝা যায় খাদ্যশস্য উৎপাদন জন্ম-বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিতে পারিতেছে না। ইহা ছাড়াও জনসংখ্যা অতি বৃদ্ধির অন্যান্য কারণ ভারতে বিদ্যমান। এদেশের জন্মের উচ্চ হাব, মৃত্যুর উচ্চ হার জীবিকা নির্বাহের নিম্নমান, শিল্পের অনগ্রসরতা প্রভৃতি অত্যধিক জনসংখ্যা-বৃদ্ধিরই পবিচায়ক।

যাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করেন তাঁহাদের মতে জনসংখ্যা এখনও আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। দেশে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে তাহাকে কাজে লাগাইতে যে পরিমাণ জনসংখ্যার প্রয়োজন জনসংখ্যা এখনও সেই পরিমাণ ছাড়াইয়া যায় নাই। ক্রমে কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের উৎপাদন বাড়িবে। নূতন নূতন শিল্পস্থাপনের ফলে দেশের আয় বাড়িবে, ফলে লোকসংখ্যা আশংকার সৃষ্টি করিবে না। ক্রমে মাথাপিছু আয় বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের এই মতকে কাম্যজন-সংখ্যা তত্ত্বানুসারে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেছেন।

তত্ত্বগত আলোচনা ছাড়িয়া দিলে যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা হইতেছে দেশে প্রকৃত অভাব আছে। অনাহার দুর্ভিক্ষ দেশে লাগিয়াই আছে। বেকারেব সংখ্যাও অনেক বেশী। ইহা হইতে স্পষ্টই মনে হয় লোকসংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

ভারতে শ্রমের যোগান ঃ

সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায় ভারতে শ্রমের যোগান যথেষ্ট। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৮ ভাগ চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের বালক-বালিকা। আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হইলে এই বয়সের কোনও

বালক-বালিকা শ্রমিকরূপে কাজ করিবে না। নিতান্ত অক্ষম ভিন্ন অন্য সকল ব্যক্তিই পরিশ্রম করে। অবশ্য মহিলাগণ সাধারণত ঘরের বাহিরে শ্রমের কাজ করে না। ইহাদিগকেও শ্রম-যোগানের হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়। এই ভাবে মোটামুটি ধরা যায়, ভারতের জনসংখ্যার শতকরা চল্লিশ ভাগ নানা কাজের জন্য শ্রম সরবরাহ করিতেছে।

সংখ্যার দিক দিয়া পর্যাপ্ত হইলেও ভারতের শ্রমিকগণ দক্ষতায় অন্যান্য অনেক দেশের শ্রমিক হইতে নিকৃষ্ট। ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা জাপান প্রভৃতি দেশের শ্রমিকগণ যাহা উৎপাদন করিতে পারে, ভারতের শ্রমিক তদপেক্ষা অনেক কম উৎপাদন করে। ভারতের একজন শ্রমিক একদিনে যাহা উৎপাদন করে, ইংল্যাণ্ডের একজন শ্রমিক একদিনে তাহার তিন গুণ উৎপাদন করে।

ভারতের শ্রমিকগণের নৈপুণ্যের অভাবের কতগুলি কারণ আছে। ভারতীয় শ্রমিকগণ পূর্ণ আহার বা পুষ্টিকারক আহার পায় না। তাহারা শীতাতপ নিবারণোপযোগী বস্ত্র পায় না। তাহাদেব বাসস্থান অস্বাস্থ্যকর। কাজেই তাহারা দৈহিক শক্তিতে অন্য দেশের শ্রমিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শ্রমের দক্ষতা কিছুটা নির্ভর করে শিক্ষাদীক্ষার উপর। যে দেশে আজও শতকরা ৭৫ জন লোক নিরক্ষর সে দেশের শ্রমিকরা স্বভাবতঃই কর্মকুশল হয় না। বিশেষ বিশেষ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে শ্রমিকগণ ঐ শিক্ষালাভ করিয়া কুশলী হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থাও সামান্য।

শ্রমের কুশলতা নির্ভর করে আংশিকভাবে দেশের জলবায়ুর উপর। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে লোকেরা অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ করে। অথচ শীতপ্রধান দেশগুলিতে বা নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলিতে লোকেরা অত্যধিক পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্তি বোধ করে না।

শিল্পের মালিকগণও ইহার জন্য দায়ী। অনেক সময় যে সকল পুরাতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহারা উৎপাদন পরিচালনা করে, সে সকল যন্ত্রপাতি শ্রমিকদের দক্ষতার পরিপন্থী। তাহা ছাড়া অনেক সময় কারখানার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও শ্রমিকদের দৈহিক এবং মানসিক শ্রমের প্রতিকূল। কখনও কখনও কর্মবিভাগ বা কাজের বন্টন ও তাহাদের কুশলতার প্রতিবন্ধক। যাহার দ্বারা যে কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হইবে তাহাকে সে কাজ না দিয়া অন্যকে সেকাজ করিতে দিলে কর্মসম্পাদনে অধিকতর সময় লাগিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতে শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইলে শ্রমের যোগান বাড়াইতে হইবে। শ্রমের যোগান বাড়াইবার জন্য লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি কামনা করিলে ভুল হইবে। কারণ তাহাতে

খাদ্যশস্যের উৎপাদনের উপর চাপ পড়িবে। কাজেই সংখ্যা না বাড়াইয়া ইহাদের কর্মদক্ষতা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে যে নিরক্ষরতা বিদ্যমান, তাহা দূর করিতে হইবে। ইহাদিগকে নানা ধরনের কারিগরী শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাদের পারিশ্রমিকের হার বাড়াইলে ইহারা প্রয়োজনমত অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিবে। ফলে তাহারা দৈহিক সবলতা অর্জন করিবে এবং অধিক কর্মক্ষম হইবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে, সরকারী সাহায্যে এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের সাহায্যে শ্রমিকদের জন্য আলো-বাতাসের ব্যবস্থা-সম্পন্ন গৃহ নির্মাণ করাইতে হইবে। শিল্পের মালিকগণকে দেখিতে হইবে যেন তাহাদের উৎপাদনের যন্ত্রপাতিও উৎপাদনের উপযোগী হয়। এই সকল ব্যবস্থা করা হইলে শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে এবং আমাদের শিল্পের উন্নতি হইবে, অথচ খাদ্যশস্যের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িবে না।

ভারতে বেকার সমস্যা :

ভারতের বেকার সমস্যা অত্যন্ত আতঙ্কজনক। মোট জনসংখ্যার শতকরা ১·৫ জন বেকার। আবার মোট নিয়োগযোগ্য এবং কর্মপ্রার্থী জনসখ্যার শতকরা ৩৫ জন বেকার। যাহারা কর্মে নিযুক্ত আছে তাহাদের মধ্যেও আবার দশভাগের একভাগ আংশিক ভাবে নিয়োজিত (under-employed)। মোট জনসংখ্যার শতকবা প্রায় সত্তর ভাগ কৃষিতে নিযুক্ত। কৃষি তাহাদিগকে পূর্ণ নিয়োগের (full employment) সুযোগ দেয় না। বৎসরে কয়েক মাস উহারা কাজ করে, অবশিষ্ট সময় তাহারা বেকার

আমাদের দেশের বেকার ব্যক্তিগণকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় :— (১) কৃষিগত বেকার, (২) শিল্পগত বেকাব, (৩) শিক্ষিত বেকার।

(১) কৃষিগত বেকার :

শতকরা প্রায় সত্তর জন লোক কৃষিতে নিযুক্ত। কৃষিক্ষেত্রে যাহারা বেকার তাহাদের প্রায় সকলেই অর্ধ বেকার। কিছু-সংখ্যক লোক পূর্ণ বেকারও আছে। কৃষির উন্নতি সাধিত হইলে এই ধরনের অর্ধ বা পূর্ণ বেকারত্ব হ্রাস পাইবে। সেচ-ব্যবস্থার প্রসার সাধন করিলে, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইলে, ভাল বীজ ও সারের ব্যবস্থা হইলে, পালটি শস্য উৎপাদনের চেষ্টা হইলে, শস্য বিপণন-ব্যবস্থা দ্রুত হইলে কৃষির আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং অধিকতর লোক উহাতে নিয়োজিত হইতে পারিবে। তাহা ছাড়া গো-পালন, মুরগী-পালন প্রভৃতি কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত হইলে এবং গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট শিল্প স্থাপিত হইলে অর্ধ-নিয়োজিত ব্যক্তিরা পূর্ণ নিয়োগের সুযোগ পাইবে। একথা

মনে রাখা উচিত যে কৃষিক্ষেত্রে অত্যধিক লোকের নিয়োগের সম্ভাবনা কম। উদ্বৃত্ত শ্রমকে শিল্পে নিয়োজিত করার ব্যবস্থাই প্রশস্ত।

(২) শিল্পগত বেকার :

আমাদেব দেশের শিল্পের প্রসার সাধন হইতেছে, ইহাতে অধিক হইতে অধিকতর লোক নিয়োজিত হইতেছে। কিন্তু শিল্পগুলি মূলধন-প্রধান অর্থাৎ capital intensive। কাজেই শিল্পের যে পরিমাণে প্রসার হইবে, লোকনিয়োগ সেই পরিমাণে হইবে না। তথাপি নিয়োগের সম্ভাবনা শিল্পেই অধিক। শিল্পের ক্ষেত্রে যাহারা বেকার, তাহাদের নিয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় হইল তাহাদের কারিগবী শিক্ষা নাই। ফলে শিল্পেব প্রসাব হইলেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগের সম্ভাবনা থাকে না। এসকল ক্ষেত্রে কারিগবী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রত্যেক শিল্পের সঙ্গেই থাকা সমীচীন।

(৩) শিক্ষিত বেকার :

আমাদেব দেশে শিক্ষিত বেকাবের সংখ্যা অনেক। বিদ্যালয়ে বা মহাবিদ্যালয়ে যে সাধারণ শিক্ষা আমাদেব দেশের ছাত্রছাত্রীরা এতদিন পাইয়াছিল, তাহা তাহাদেব কর্মনিয়োগেব পথে তাহাদিগকে সহায়তা কবে না। ইহারা কাবণিক, শিক্ষক, শিক্ষিকা হইবাব উপযোগী। অথচ দেশে এত কারণিক, শিক্ষক বা শিক্ষিকার প্রয়োজন নাই। কাজেই ইহাদেব মধ্যে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। শিল্পেব প্রসার সাধিত হইলে অধিকতব কাবণিকের বা পরিচালকের প্রয়োজন হইবে। তাহাতে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হইবে। ১৯৫৫ সালে শিক্ষিত ব্যক্তিদের বেকারত্ব হ্রাস কবার উপায় নির্ধাবণের জন্য একটি অনুসন্ধান-দল নিযুক্ত হইয়াছিল। এই দল দেশে ছোট ছোট শিল্পস্থাপনেব এবং শিক্ষিতদের হাতেব কাজের প্রতি উদাসীনতা অপসাবণের সুপারিশ করিয়াছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যে গলদ রহিয়াছে তাহা দূব কবাও প্রয়োজন। বৃত্তিমূলক শিক্ষা, পাঠ্য-তালিকায় বিভিন্ন বিষয়েব বিন্যাস এই গলদ কিছুটা দূব করিতে পারিবে। গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করিলে লোক নিয়োগেব সম্ভাবনা বেশী থাকিবে। কাবণ ক্ষুদ্র শিল্পগুলি শ্রমপ্রধান। ইহাতে অল্প মূলধনে অধিক লোক নিয়োগ করা যায়।

পরিকল্পনা এবং ভারতের বেকার সমস্যা :

আমাদের দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির অন্যতম লক্ষ্য হইল কর্মসংস্থান। কাজটি অত্যন্ত দুরূহ, ইহা পরিকল্পনা রচনাকারীরা বার বারই স্বীকার করিয়াছেন। বর্তমানে কর্মসংস্থান বা তাহার প্রয়োজন সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। তথাপি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম নিয়োগেব ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা-রচনাকাবীবা মনে কবিয়াছিলেন যে পরিকল্পনাব কাজ চলার কালে মোট এক কোটি লোক কর্মপ্রার্থী হইবে। ইহা ছাড়া প্রায় ৫৩ লক্ষ পূর্বেকার বেকার এই সঙ্গে যোগ হইবে। তাহাবা যে ব্যবস্থা কবিযাছিল, তাহাতে এই সময়ের মধ্যে এক কোটি লোকেব কর্মসংস্থান হইবে ইহা আশা কবা গিয়াছিল। অনুমান কবা হইয়াছিল তিপ্পান্ন লক্ষ লোক দ্বিতীয় পবিকল্পনাব শেষে বেকাব হইয়া যাইবে। কিন্তু জরুরি অবস্থায় দ্বিতীয পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব কিছুটা ছাঁটকাট করিতে হইযাছিল। আবাব শ্রমিকসংখ্যাও অধিকতব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব শেষে প্রায নব্বুই লক্ষ লোক বেকাব রহিযা গিয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা চলাব কালে এই সংখ্যাব সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু আবও এক কোটি সত্তব লক্ষ বেকাব যুক্ত হইবে। ফলে বেকাবেব সংখ্যা হইবে দুই কোটি ষাট লক্ষ। অতএব তৃতীয পাবিকল্পনায় দুই কোটি ষাট লক্ষ বেকাবেব কর্মসংস্থান কবাব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে ব্যবস্থা হইযাছে তাহাতে তৃতীয পবিকল্পনাব কালে নিম্নলিখিত হিসাব অনুসাবে মোট এক কোটি সাড়ে চল্লিশ লক্ষ বেকাবেব কর্মসংস্থান হইতে পারে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত কর্মসংস্থান

র্মেব ক্ষেত্র	লক্ষেব হিসাবে
কৃষি	৩৫·০০
নির্মাণ	২৩ ০০
সেচ ও বিদ্যুৎ	১·০০
বেলওয়ে	১·৪০
অন্যান্য পবিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	৮ ৮০
শিল্প ও খনিজ	৭·৭০
ক্ষুদ্র শিল্প	৯·০০
বন-মৎস্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়	৭·২০
শিক্ষা	৫·৯০
স্বাস্থ্য	১·৪০
অন্যান্য সমাজসেবামূলক কার্যাদি	·৮০
সরকাবি চাকুবি	১·৫০
ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি	৩৭·৮০
	১৪০·৫০

যদি আশানুরূপ কর্মসংস্থান হয় তবে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষেও এক কোটি সাড়ে উনিশ লক্ষ কর্মপ্রার্থী বেকার থাকিয়া যাইবে।

ভারতের এই বিশাল বেকার সমস্যার যথাযথ সমাধান না হইলে ইহা অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার পরিচায়ক হইয়া থাকিবে এবং রাজনৈতিক বিষয়ে ইহা দুর্বলতার সূত্র হিসাবে কাজ করিবে।

প্রশ্ন

১। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোচনা কর। (পৃ: ৩১-৩২)

২। কাম্য জনসংখ্যা কাহাকে বলে? ইহাতে কি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া যায়? (পৃ: ৩২-৩৩).

৩। শ্রমের যোগানের সঙ্গে জনসংখ্যা কি সম্পর্ক? (পৃ: ৩৩-৩৪)

৪। বেকারত্বের মূল কারণগুলির আলোচনা কর। (পৃ: ৩৬-৩৭)

৫। ভারত কি গণাধিক্যের চাপে পীড়িত? (পৃ: ৩৮-৪০)

৬। ভারতের বেকার সমস্যার স্বরূপ বর্ণনা কর এবং তাহা সমাধানের উপায় নির্দেশ কর। (পৃ: ০-৪৪)

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ ভূমি ঃ উৎপাদিকা শক্তি

ভূমি ঃ

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে ভূমি উৎপাদনের চারিটি উপাদানের অন্যতম। অর্থবিদ্যায় ভূমি বলিতে কেবল জমিকে বুঝায় না। যাহা মানুষ প্রকৃতির নিকট হইতে পায়, যাহা মানুষ সরাসরি তৈয়ারি করিতে পারে না, তাহাই অর্থবিদ্যার ভাষায় ভূমি। জমি, জল, বায়ু, আলো, খনিজ পদার্থ, বন প্রভৃতি এই অর্থে ভূমি। এইগুলি প্রকৃতির দান। মানুষ এইগুলি সৃষ্টি করিতে পারে। অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন জল, স্থল, বায়ু, আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি যেসকল শক্তি বা সম্পদ প্রকৃতি মানুষের সাহায্যার্থে দিয়াছে তাহাই জমি।

যে-কোন দ্রব্য উৎপাদনেই ভূমি অপরিহার্য উপাদান। উৎপাদনকার্য যে স্থানে সম্পন্ন হয় তাহা ভূমির অংশ। তাহা ছাড়া উৎপাদনের জন্য জল, বায়ু ও আলোর প্রয়োজন। এইগুলিও অর্থবিদ্যার ভাষায় ভূমি। কাঁচা মাল না হইলে কোন দ্রব্য উৎপন্নই হয় না। এই সকল কাঁচা মাল আমরা পাই ভূমি হইতে।

ভূমির কয়েকটি বিশিষ্টতা আছে। সেই বিশিষ্টতাগুলি থাকায় ভূমির অন্যান্য উপাদান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। একটি বিশিষ্টতা হইল মানুষ নিজের ইচ্ছামত ইহার পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। প্রকৃতি নিজের ইচ্ছায় যে পরিমাণ ভূমির ব্যবস্থা করিয়াছে বা করে, মানুষকে সেই পবিমাণ ভূমির উপরই নির্ভর করিতে হয়। তাহা ছাড়া প্রত্যেক স্থানেব ভূমির প্রকৃতিতে যে বিশিষ্টতা আছে, মানুষ সহজে তাহা পরিবর্তন করিতে পাবে না। প্রকৃতি যে ভূমিকে অনুর্বর করিয়াছে, মানুষ সেই ভূমিকে সহজে উর্বর করিতে পাবে না।

ভূমির অপর বৈশিষ্ট্য হইল ভূমির উৎপাদন ব্যয় নাই। ভূমি এবং তাহার উর্বরতা, অবস্থান প্রভৃতি প্রকৃতি প্রদত্ত। মানুষ নিজ চেষ্টার দ্বারা ইহার সামান্যই পরিবর্তন সাধন কবিতে পারে। ভূমির অন্য বিশিষ্টতা এই যে উহা স্থানান্তরিত করা যায় না। কোন এক স্থানে ভূমিব মূল্য অত্যধিক হইলে অন্য স্থান হইতে উহা আমদানি করা চলে না।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Returns) :

ভূমির আর একটা বিশিষ্ট গুণ আছে। কোন একখণ্ড জমিতে যদি অধিক পরিমাণে শ্রম এবং মূলধন প্রয়োগ করা যায়, তবে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িতে পারে, কিন্তু যে অনুপাতে শ্রম এবং মূলধন বাড়ানো যায়, সে অনুপাতে ফসল বাড়ে না। ইহা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতাসঞ্জাত জ্ঞান। একখণ্ড জমিতে দশ জন শ্রমিক এবং একশত টাকা পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করা হইলে দেখা যাইবে, ঐ জমিতে চল্লিশ কুইণ্টাল ফসল পাওয়া যায়। ঐ জমিতে আরও দশ জন শ্রমিক এবং আরও একশত টাকা পরিমাণ অধিক মূলধন নিয়োজিত হইলে ঐ জমির উৎপাদন বাড়ে। তবে প্রথম দশ জন শ্রমিক এবং একশত টাকা পরিমাণ মূলধন নিয়োগের ফলে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়বার সমপরিমাণ অধিকতর শ্রম এবং মূলধন নিয়োগ করার ফলে যে অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হইবে, তাহার পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হইবে। অর্থাৎ এই অতিরিক্ত শ্রম এবং মূলধন নিয়োগের ফলে এইবারের অতিরিক্ত ফসল চল্লিশ কুইণ্টাল অপেক্ষা কম হইবে। মনে করা যাইতে পারে আরও অতিরিক্ত পঁয়ত্রিশ কুইণ্টাল ফসল হইবে। এইবার যদি ঐ জমিতে আরও দশ জন অতিরিক্ত শ্রমিক এবং আরও একশত টাকা পরিমাণের অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ করা যায়, তবে ফসল আরও বাড়িবে। কিন্তু ফসল সমানুপাতে বাড়িবে না। দ্বিতীয় বারের বাড়তি ফসল ছিল পঁয়ত্রিশ কুইণ্টাল। এইবার বাড়তি ফসলের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ কুইণ্টাল অপেক্ষা কম হইবে। মনে করা যায় এই বারের বাড়তি ফসল হইবে ত্রিশ কুইণ্টাল। এইভাবে দেখা যাইবে যে, আরও দশ জন শ্রমিক এবং আরও একশত টাকা পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিলে ফসল বাড়িবে পঁচিশ কুইণ্টাল। তাহা হইলে দেখা যায়, যে অনুপাতে শ্রম এবং মূলধন নিয়োজিত হইতেছে সে অনুপাতে ফসল বাড়িতেছে না। এই নিয়মটিকে একটি ছকের সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে :—

নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণ	নিয়োজিত মূলধন	মোট ফসলের পরিমাণ	বৃদ্ধির পরিমাণ
১০ জন শ্রমিক এবং	১০০ টাকা পরিমাণ	৪০ কুইণ্টাল	—
আরও ১০ ”	” ১০০ ” ”	৭৫ ”	৩৫
আরও ১০ ”	” ১০০ ” ”	১০৫ ”	৩০
আরও ১০ ”	” ১০০ ” ”	১৩০ ”	২৫

পূর্বেই বলিয়াছি এই নিয়মটি আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা দিয়াই যাচাই করিতে পারি। দিন দিন লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই খাদ্যের উৎপাদন

বাড়াইতে হইতেছে। জমির পরিমাণ বাড়াইবার জন্য কিছু কিছু বনজঙ্গল কাটা হইতেছে, বা অনাবাদী জমি আবাদ করা হইতেছে। কিন্তু যে পরিমাণ লোক বাড়িতেছে, জমি সেই পরিমাণে বাড়িতেছে না। কাজেই একই জমিতেই অধিকতর ফসল ফলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রত্যেক খণ্ড জমিতেই পূর্বাপেক্ষা অধিক শ্রম এবং মূলধন নিয়োগ করা হইতেছে। কিন্তু বর্ধিত শ্রম এবং মূলধনের অনুপাতে ফসল বাড়িতেছে না। কোন জমিতে অধিক হইতে অধিকতর হারে শ্রম এবং মূলধন নিয়োজিত হইতে থাকিলে ফসল বাড়িতে থাকে। কিন্তু সমানুপাতে না বাড়িয়া ফসল ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। এই নিয়মকে অর্থবিদ্‌গণ নাম দিয়াছেন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বা উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Returns)।

প্রয়োগের অপরাপর ক্ষেত্র :

এই নিয়মটি জলাশয়ে মাছ ধরার ব্যাপারে এবং খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের ব্যাপারেও খাটে। দশ জন শ্রমিক দশখানা জালের সাহায্যে কোন একটি জলাশয়ে মনে করি দশ কুইণ্টাল মাছ ধরিতে পারে। আরও অতিরিক্ত দশ জন শ্রমিক এবং দশখানা জাল নিয়োজিত হইলে মোট মাছের পরিমাণ বাড়িবে। কিন্তু সমান অনুপাতে বাড়িবে না। দশ জন শ্রমিক এবং দশ টাকা পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিলে যদি কোন খনি হইতে দশ টন কয়লা উত্তোলন করা যায়, তবে অতিরিক্ত দশ জন শ্রমিক এবং অতিরিক্ত দশ টাকা পরিমাণের মূলধন নিয়োগ করিলে যে অতিরিক্ত কয়লা উত্তোলন হয়, তাহার পরিমাণ দশ টনের কম হইবে।

এই বিধির ব্যতিক্রম :

কখনও কখনও এই নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। একখণ্ড জমিতে দশ জন শ্রমিক এবং দশ টাকা পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিলে দশ কুইণ্টাল ফসল পাওয়া যায়। অতিরিক্ত দশ জন শ্রমিক এবং অতিরিক্ত দশ টাকা পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিলে অতিরিক্ত পনের কুইণ্টাল অর্থাৎ মোট পঁচিশ কুইণ্টাল ফসল পাওয়া যায়। অতিরিক্ত মূলধন এবং শ্রমের জন্য অনুপাতে বেশী অতিরিক্ত ফসল পাওয়া গেল। ইহার কারণ আছে। দশ জন শ্রমিক এবং দশ টাকা পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করা হইলে ঐ জমিখণ্ড যথাযথরূপে চাষ করা হইত না। আরও অতিরিক্ত দশ জন শ্রমিক এবং দশ টাকা পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিলে জমিখণ্ড যথোপযুক্তরূপে চাষ করা হয়। কিন্তু ইহার পর এমন এক অবস্থা অবশ্য আসিবে যে অবস্থায় যদি অতিরিক্ত শ্রম এবং মূলধন নিয়োগ করা হয়, তবে ফসলের বৃদ্ধির হার অনুপাতে কম হইবে। এই বিধি উৎপন্ন দ্রব্যের

হ্রাসবৃদ্ধির কথাই বিবেচনা করে, ইহার মূল্যের কথা নহে। মূল্য-বৃদ্ধি-হেতু কখনও কখনও পরবর্তী উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য পূর্ববর্তী উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অনুপাতে অধিকতর হইতে পারে।

উন্নত ধরনের চাষের প্রবর্তন করিলে কিছু কাল হ্রাসমান উৎপাদনকে ঠেকাইয়া রাখা চলে। আমাদের দেশে আজও প্রাচীন ধরনের চাষের রীতি প্রচলিত আছে। আমরা যে যে ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ আরম্ভ করিয়াছি, সেই সেই ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে দ্বিগুণ শ্রম এবং মূলধন প্রয়োগ করিলে ফসল দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। কিন্তু এই ধরনের ফসল-বৃদ্ধিরও সীমা আছে। যখন সেই সীমায় উপনীত হওয়া যায়, তখন দেখা যায় অতিরিক্ত শ্রম এবং অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ করিলে ফসলের বৃদ্ধির হার অনুপাত অপেক্ষা কম হইবে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন-বিধির একটা কারণ সহজে বুঝা যায়। ফসল উৎপাদনের জন্য ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং পরিচালন এই চারিটি উপাদানের প্রয়োজন। এইগুলির সহযোগিতায় উৎপাদন-কায চলে। যদি উৎপাদন বাড়াইতে হয় তবে চারিটিই বাড়াইতে হয়। জমিতে সাধারণতঃ তাহা করা হয় না। করা সম্ভবও নয়। কারণ জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। সেইজন্য ভূমি ব্যতীত অন্যান্য উপাদান বাডাইতে হয়। ফলে ফসল বাড়ে কিন্তু সমানুপাতে বাড়ে না। এইজন্যই ভূমির ক্ষেত্রে এই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন-বিধি প্রযোজ্য।

ফসলের উৎপাদন বাড়াইবার দুইটি উপায় আছে। একখণ্ড জমিতে অধিকতর মূলধন এবং শ্রম নিয়োগ করিয়া অধিকতর বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিলে অধিকতর ফসল পাওয়া যায়। যে জমিতে দশ জন শ্রমিক এবং দশ একক মূলধন নিয়োগ করিলে পঞ্চাশ কুইণ্টাল ফসল হয়, সে জমিতে বিশ জন শ্রমিক এবং বিশ একক মূলধন নিয়োগ করিলে ফসল নব্বই কুইণ্টাল হইতে পারে। শ্রম এবং মূলধন বাড়াইলে এবং চাষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে করিলে ফসল আরও বাড়িবে। এই ধরনের চাষকে নিবিড় চাষ (intensive cultivation) বলে। কিন্তু এইরূপ চাষের একটা সীমা আছে। নিবিড়ভাবে চাষ করিতে করিতে ইহা এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে তখন অধিকতর শ্রম এবং মূলধন নিয়োগ করিলে নিয়োগকারীর ক্ষতি হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐ জমিতে অধিকতর শ্রম এবং মূলধন না খাটাইয়া বেশী ফসল উৎপাদন করিবার জন্য আর একখণ্ড জমি চাষ করিবে। পূর্বের জমি-খণ্ড সর্বাপেক্ষা বেশী উর্বর ছিল। দ্বিতীয় জমি-খণ্ড তদপেক্ষা কম উর্বর। ইহার নিবিড়ভাবে চাষ করিয়া প্রয়োজন হইলে তৃতীয় একখণ্ড জমি চাষ করিবে। এইরূপ চাষকে ব্যাপক চাষ (extensive cultivation) বলে। ইহারও সীমা আছে। প্রাচীনকালে যখন লোকসংখ্যা কম ছিল এবং অনেক জমি অনাবাদী

ছিল, তখন এরূপ চাষ সম্ভব ছিল। কিন্তু লোকসংখ্যা এখন অনেক অথচ জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কাজেই এখন ব্যাপক চাষ অপেক্ষা নিবিড় চাষের সম্ভাবনাই বেশী।

ভারতের জমি ঃ

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে বা আয়ের ক্ষেত্রে ভারতে জমির গুরুত্ব খুব বেশী। জমি হইতে আয়-বৃদ্ধির সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ হওয়ায় ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ একটা অসুবিধা বিদ্যমান। অবশ্য জমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকৃতির দান বলিয়া এই বিজ্ঞানের যুগে গ্রহণ করা চলে না। নিজ চেষ্টায় মানুষ এই শক্তি-বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহার প্রভূত প্রমাণ উন্নত দেশগুলিতে রহিয়াছে। মানুষ নিজের চেষ্টায় ভূমির ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন-বিধিকে অনেককাল প্রতিহত করিতে পারে, ইহার প্রমাণের অভাব নাই।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশের জমির উৎপাদনের হার খুব কম। ভারতে যে ক্ষেত্রে প্রতি একর জমিতে ৯৯১ পাউণ্ড ধান্য উৎপন্ন হয়, সে ক্ষেত্রে ব্রহ্মদেশে প্রতি একরে উৎপন্ন হয় ১২৪০ পাউণ্ড, মিশরে উৎপন্ন হয় ৩৩৩৩ পাউণ্ড এবং জাপানে উৎপন্ন হয় ৩৫৩৩ পাউণ্ড। ভারতে যে ক্ষেত্রে প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন হয় ৬৭০ পাউণ্ড গম, সে ক্ষেত্রে চীনে প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন হয় ৭৬৬ পাউণ্ড, জাপানে উৎপন্ন হয় ২০১৬ পাউণ্ড এবং মিশরে উৎপন্ন হয় ২০৪০ পাউণ্ড। বর্তমান অবস্থা শোচনীয় হইলেও ধীরে ধীরে যে এই অবস্থার উন্নতি হইতেছে, ইহা হইতে বুঝা যায় এই অবস্থায় যথেষ্ট পরিবর্তন একেবারে অসাধ্য ব্যাপার নহে। চাষের ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। এই উৎপাদিকা শক্তি পুনঃস্থাপনের জন্য জমিতে সার প্রয়োগ করিতে হয়। আমাদের দেশের জমিতে সার প্রয়োগ খুব কমই হইয়া থাকে। সহজলভ্য গোময় প্রভৃতি যে সার আছে তাহার অপচয় হয়। অপচয় না হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অত্যন্ত কম। কাজেই কৃত্রিম সার উৎপাদনের জন্য আমাদের দেশে সিন্ধ্রিতে সারের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। আরও কারখানা স্থাপিত না হইলে প্রয়োজনের তুলনায় ইহার উৎপাদনও খুব কম হইবে।

জমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবিলোপ রোধ করার জন্য জমিতে পর পর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ করা যায়। আমাদের দেশে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে।

জমির উর্বরতা নির্ভর করে পরিমিত জল সরবরাহের উপর। জল সরবরাহের জন্য দীর্ঘকাল আমাদের দেশের কৃষকগণ বৃষ্টিপাতের উপরই নির্ভর করিত। বৃষ্টিপাত

কখনও পরিমিত, কখনও অধিক, কখনও বিরল হওয়ার ফলে উৎপাদনও নিতান্ত অনিশ্চিত ছিল। সেচব্যবস্থার সাহায্যে জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সেইজন্য আমাদের দেশে সেচব্যবস্থার উন্নতি এবং প্রসার সাধনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তনের পূর্বে ভারতে পাঁচ কোটি একর জমি সেচব্যবহারের সুযোগ পাইত। ব্যবস্থা-প্রসারের ফলে বর্তমানে পৌনে আট কোটি একর জমি এই সুযোগ পাইতেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিচালনার শেষে, আশা করা যায়, নয় কোটি একর জমি এই সুযোগ পাইবে।

উৎপাদন-প্রসঙ্গে জমির উর্বরতা শক্তি ছাড়াও অন্য সমস্যার কথা বিবেচনা করিতে হয়। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, এই বৈজ্ঞানিক যুগেও আমাদের দেশের চাষীরা সেই পুরাতন পদ্ধতিতে লাঙল ও বলদের সাহায্যেই ভূমি কর্ষণ করে। উন্নত দেশগুলিতে ট্র্যাক্টর প্রভৃতি উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া স্বল্পব্যয়ে অধিকতর ফসল উৎপাদন করিতেছে। আমাদের দেশে ধীরে ধীরে সেই সকল যন্ত্রপাতির চলন হইলে আমাদেরও স্বল্পব্যয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার করিলে জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। আমাদের কৃষকগণ নিজেরা উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ বিধি জানে না। কাজেই তাহাদের জমিতে ফলনও ভাল হয় না। কৃষকরা যাহাতে নিজে উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করিতে বা অন্য উপায়ে উৎকৃষ্ট বীজ পাইতে পারে, সে ব্যবস্থা প্রত্যেক রাজ্যের সরকারেরই করা প্রয়োজন।

প্রথম হইতেই যে পরিমাণ লোকের জমির উপর নির্ভরশীল হওয়া যুক্তিযুক্ত তদপেক্ষা বেশী লোক আমাদের দেশে জমির উপর নির্ভরশীল। এই কারণে এবং উত্তরাধিকারের আইনের ফলে অনেকক্ষেত্রে চাষবাস লাভজনক হইতেছে না। জমির উপর চাপ কমাইবার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। চাষে সমবায়পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজন। নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কিছু-সংখ্যক লোক কৃষি পরিত্যাগ করিয়া শিল্পমুখী হইয়াছে। সমবায়ি পদ্ধতিতেও কোথাও কোথাও চাষ হইতেছে। ফলে উৎপাদন-বৃদ্ধির একটি বাধা অপসারিত হইতেছে।

আজকাল ভূমিসংস্কারমূলক ব্যবস্থার ফলে চাষীরা জমির প্রকৃত মালিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। মালিকানা বোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা তাহাদের জমির উন্নয়নের জন্য নানা ব্যয়- এবং শ্রম-সাধ্য উপায় অবলম্বন করিতেছে। তাহা ছাড়া দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি অঞ্চলে বহু অনাবাদী জমির সংস্কার সাধন করিয়া এইগুলিকে আবাদযোগ্য করিয়া তোলা হইতেছে। নানা ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে বিগত দশ বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ছেচল্লিশ ভাগ এবং সমগ্র ভারতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে

শতকরা চল্লিশ ভাগ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয় হইয়াছিল ছয় শত পঁচাত্তর কোটি টাকা। আর তৃতীয় পরিকল্পনায় এই ব্যয় বরাদ্দ আছে আট শত পঞ্চাশ কোটি টাকা। আশা করা যায় তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে কৃষির উৎপাদন ১৯৪৯-৫০ সালের উৎপাদন অপেক্ষা শতকরা ৭৬ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

প্রশ্ন

১। উৎপাদনের উপাদান হিসাবে ভূমির কি কি বিশিষ্টতা আছে? (পৃ: ৪৬)

২। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নবিধি বিশ্লেষণ কর। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য? (পৃ: ৪৭-৪৮)

৩। নিবিড় ও ব্যাপক চাষ কাহাকে বলে? (পৃ: ৪৯)

৪। ভারতের জমির উৎপাদন কম কেন? উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে বা হইতে পারে? (পৃ: ৫০-৫১)

———

সপ্তম অধ্যায়

মূলধন

(Capital)

সম্পদ এবং মূলধন (Wealth and Capital) :

যে দ্রব্য আমাদের অভাব পূরণ করে, যে দ্রব্য চাহিদার তুলনায় কম এবং যে দ্রব্য হস্তান্তরযোগ্য, তাহাই সম্পদ। এই সম্পদ দুই প্রকারের হইতে পারে। যে সকল গুণ থাকিলে কোন দ্রব্যকে সম্পদ বলা যাইতে পারে, তাঁত এবং কাপড় এই উভয়েরই সে সকল গুণ আছে। কাজেই এই দুইটি উভয়েই সম্পদ। তথাপি এই দুইটি একই শ্রেণীর সম্পদ নহে। তাঁত এবং কাপড় আমরা কিভাবে ব্যবহার করি, সে কথা আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই দুইটি পৃথক শ্রেণীর সম্পদ। কাপড় সরাসরি ভাবে আমাদের অভাব-মোচন করে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে ইহা ভোগ করি। তাঁত আমরা সরাসরি ভাবে ভোগ করি না। তাঁতের সাহায্যে কাপড় তৈয়ারি হয়। সেই কাপড় আমাদের অভাব-মোচন করে। কাজেই তাঁত পরোক্ষভাবে আমাদের অভাব-মোচন করে।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, সকল প্রকারের সম্পদকেই এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর সম্পদ আমরা সরাসরি ভাবে ভোগ করি। অপর শ্রেণীর সম্পদ আমাদের ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পরোক্ষভাবে আমাদের অভাব-মোচন করে। যে সম্পদ সরাসরি ভাবে আমাদের অভাব-মোচন করে, তাহাকে আমরা বলিতে পারি ভোগ্য সম্পদ। কাপড় আমাদের ভোগ্য সম্পদ। আর যে সম্পদ সরাসরি ভোগের কাজে না লাগিয়া ভোগ্য সম্পদ উৎপাদনের কাজে লাগে, তাহাকে আমরা উৎপাদনকারী সম্পদ বা 'মূলধন' বলিতে পারি। তাঁত উৎপাদনকারী সম্পদ বা মূলধন।

সাধারণ কথায় মূলধন বলিতে আমরা টাকাপয়সা বুঝি। টাকাপয়সার হিসাবেই আমরা মূলধনের পরিমাপ করি। আমরা বলি কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ে এক লক্ষ টাকা বা দুই লক্ষ টাকা মূলধন খাটাইতেছে। ইহা হইতে মনে হয় টাকাই বুঝি মূলধন। প্রকৃতপক্ষে অর্থবিদ্গণ মূলধন বলিতে উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি বা যে-সকল দ্রব্য উৎপাদনের সহায়তা করে, তাহাকে বুঝাইয়া থাকেন। টাকাপয়সা

উৎপাদনের উপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহের উপায়। সেই অর্থেই টাকাপয়সাকেও মূলধন বলা হয়।

ভোগ্য সম্পদ উৎপাদনের কাজে জমিও নিয়োজিত হয়। জমির সাহায্য-ব্যতিরেকে উৎপাদন প্রায় অসম্ভব। জমি হইতে আমরা কাঁচা মাল পাই। জমির উপরেই উৎপাদন-কার্য সম্পন্ন হয়। ইহা সত্ত্বেও জমিকে অর্থবিদ্‌গণ মূলধনের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন না। ইহা পৃথক শ্রেণীর অন্তর্গত। সম্পদের যে অংশ মানুষ নিজে সৃষ্টি করিয়া উৎপাদনের কাজে লাগায়, এবং যে অংশের পরিমাণ মানুষ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে, সেই অংশই মূলধন। মানুষ জমি সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহার পরিমানও মানুষ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না, ইহা প্রকৃতির দান। এই কারণে অর্থবিদ্‌গণ জমিকে মূলধনের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন না।

একই দ্রব্য সরাসরি ভোগের কাজে লাগিতে পারে, আবার উৎপাদনের কাজেও লাগিতে পারে। একখানা মোটরগাড়ি মানুষ নিজের চলাফেরার কাজে লাগাইতে পারে। আবার দ্রব্যাদি বহন করাইয়া উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত করিতে পারে। নিজের ব্যবহারের জন্য যে ক্ষেত্রে ইহাকে নিয়োজিত করা হয়, সে ক্ষেত্রে ইহা ভোগ্য সম্পদ। যে ক্ষেত্রে মোটরগাড়ি উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত হয়, সে ক্ষেত্রে ইহা মূলধন। সেইরূপ একটি বাড়ী সম্পদও হইতে পারে, মূলধনও হইতে পারে।

মূলধন ছাড়া কোন রকম উৎপাদনই সম্ভব নহে। সাধারণ কৃষির কথাই ধরা যাক। কৃষিকার্য করিতে হইলে লাঙ্গল চাই, গরু চাই, বীজ চাই—এইগুলি মূলধন। তাহা ছাড়া কৃষির ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। কোন উৎপাদনের ক্ষেত্রেই উৎপাদন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায় না। উৎপাদন সময়সাপেক্ষ। যে সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, সেই সময়ের জন্য উৎপাদনকারী শ্রমিক প্রভৃতির ভরণপোষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন। সেইজন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহাও মূলধন। এইরূপে আমরা দেখি, মূলধন ভিন্ন কোন ক্ষেত্রেই উৎপাদন সম্ভব নয়।

মূলধনের প্রকার-ভেদ (Kinds of Capital) :

তাঁত উৎপাদনের কার্যে সহায়তা করে। সেইজন্য তাঁত মূলধন। সূতাও সেইরূপ মূলধন। কিন্তু এই দুইটির প্রকৃতি পৃথক। একখানা তাঁতকে বহুবার কাপড় উৎপাদনের কাজে লাগানো যায়। কিন্তু এক বাণ্ডিল সূতাকে একবারের বেশী কাপড় উৎপাদনের কাজে লাগানো চলে না। যে মূলধন উৎপাদনের কাজে বার বার ব্যবহার করা যায়, তাহাকে বলা হয় স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital)। যে মূলধন কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কেবল একবারই ব্যবহার করা চলে, তাহাকে চলতি

মূলধন (Circulating Capital) বলা হয়। তাঁত স্থায়ী মূলধন, আর সুতা চলতি মূলধন।

কোন কোন মূলধন এমন আকার ধারণ করে যে, সেই মূলধনকে একাধিক কাজে ব্যবহার করা যায় না। কাঠ মূলধন, আবার কাঠের তৈয়ারী তাঁতও মূলধন। কাঠকে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন উৎপাদনের কাজে লাগানো যাইতে পারে। কিন্তু কাঠের তৈয়ারী তাঁতকে কেবল কাপড় তৈয়ারির কাজেই লাগানো যাইতে পারে। যে মূলধনকে কেবল এক রকমে উৎপাদনের কাজে লাগানো যাইতে পারে, তাহাকে বিশিষ্ট মূলধন (Specialised Capital) বলা হয়। আর যে মূলধনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজে লাগানো যাইতে পারে, তাহাকে নির্বিশেষ মূলধন (Unspecialised Capital) বলা হয়। তাঁতকে আমরা বিশিষ্ট মূলধন বলিতে পারি এবং কাঠকে আমরা নির্বিশেষ মূলধন বলিতে পারি।

মূলধনের কাজ (Functions of Capital) ঃ

উৎপাদনকারীরা মূলধনকে দুই অংশে ভাগ করিয়া কাজে লাগায়। এক অংশ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় অংশ নগদ অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই দুই অংশের কাজ পৃথক পৃথক রূপে আলোচনা করা চলে। যন্ত্রপাতি হিসাবে মূলধন উৎপাদন ত্বরান্বিত করিয়া পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ বিধান করে। এক ব্যক্তিকে যদি কামিজ তৈয়ার করিতে হয় তবে সে হাতে ইহা তৈয়ার করিতে পারে, অথবা সেলাই-এর কলের সাহায্যেও সে কামিজ তৈয়ার করিতে পারে। সেলাইএর কল ব্যবহার করিলে অতি অল্প সময়েব মধ্যে অনেক কামিজ তৈয়ার করিতে পারিবে। অথচ হাতে তৈয়ার করিলে অল্প কয়েকটি কামিজ তৈয়ার করিতে তাহার দীর্ঘ সময় লাগিবে। আবার হাতে সেলাই করিলে সর্বত্র সমান ভাবে নিখুঁৎ সেলাই না হইবারই সম্ভাবনা। অথচ সেই ব্যক্তি কলে যদি সেলাই করে তবে সমান ভাবে সুন্দর রূপে সেলাই হইবে। এই ভাবে আমরা সকল প্রকারের উৎপাদনের ক্ষেত্রেই দেখি যন্ত্রপাতি রূপে মূলধন কাজ ত্বরান্বিত করে এবং নিখুঁত করে।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখি অন্য উপায়েও যন্ত্রপাতি উৎপাদন-বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করে। সূক্ষ্মতম শ্রমবিভাগ থাকিলে উৎপাদন অধিক হয়। একই শ্রমিক একটি ঘড়ি তৈয়ারির বিভিন্ন কাজ করিলে তাহার একটি ঘড়ি তৈয়ারি করিতে অনেক সময় লাগে। অথচ বিভিন্ন ব্যক্তি যদি ঘড়ির বিভিন্ন অংশ তৈয়ারি করে তবে অতি অল্প সময়ে অনেক ঘড়ি তৈয়ারি হয়। সূক্ষ্মতম শ্রমবিভাগ যন্ত্রপাতির সাহায্যেই সম্পূর্ণ সম্ভব। উৎপাদনে যন্ত

বেশী যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইবে, ততই সূক্ষ্মতম শ্রমবিভাগ সম্ভব হইবে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

কোন উৎপাদন-কার্য পরিচালনা করিতে হইলে কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়। এই কাঁচা মাল হইতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে সম্পূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যায়। উৎপাদনকারী নগদ অর্থের সাহায্যে এই কাঁচা মাল ক্রয় করে। নগদ অর্থরূপে মূলধন এই ভাবে উৎপাদনের কাজে সহায়তা করে।

নগদ অর্থরূপে মূলধন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখার কাজে সাহায্য করে। বহু দ্রব্য আছে যাহার উৎপাদনের সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান থাকে। কোন একটি মোটরগাড়ি তৈয়ারির কারখানায় অনেকগুলি গাড়ি এক সঙ্গে তৈয়ারি হয় বটে কিন্তু বিভিন্ন অংশ তৈয়ারির সূচনা হইতে গাড়ি-নির্মাণ শেষ হওয়া পর্যন্ত ছয় মাসের ব্যবধান থাকে। এই ব্যবধানের সময় শ্রমিকদের বা অন্যান্য কর্মচারীদের মজুরি বা পারিশ্রমিক না দিলে উৎপাদন-কার্য অব্যাহত থাকে না। নগদ অর্থরূপে মূলধন শ্রমিকদের মজুরি এবং কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার কাজে সাহায্য করিয়া উৎপাদন অব্যাহত রাখে। কাজেই দেখা যায় উৎপাদনে মূলধন অপরিহার্য।

মূলধনের উদ্ভব ও বৃদ্ধি (Origin and Accumulation of Capital) :

সকল-প্রকার উৎপাদনের জন্যই মূলধন চাই। কাজেই উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে মূলধন বৃদ্ধি করিতে হইবে। শিল্পে এবং কৃষিতে আমাদের ভারত অনগ্রসর। ভারতকে উন্নত করিতে হইলে সকল ক্ষেত্রেই উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে মূলধনও বাড়াইতে হইবে।

টাকাপয়সাকে একান্তভাবে মূলধন না বলিলেও বর্তমান যুগে টাকাপয়সাই মূলধনের মূল। টাকাপয়সা থাকিলেই উৎপাদনের উপযোগী সকল উপাদানই সংগ্রহ করা যায়। সেইজন্য মূলধন বাড়াইতে হইলে টাকাপয়সার সঞ্চয় বাড়াইতে হয়। প্রত্যেকেরই যদি যাহা আয় হয় তাহাই ব্যয় হয়, তবে মূলধনের উপযোগী আর কিছু থাকে না।

সঞ্চয় করা নির্ভর করে মানুষের সঞ্চয় করার ক্ষমতা এবং ইচ্ছার উপর। যখন আয় অপেক্ষা ব্যয় কম হয়, তখনই মানুষের সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা থাকে। আমাদের ভারতে অতি অল্প লোকেরই এই ক্ষমতা আছে। জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার পর আর প্রায় কোন লোকেরই সঞ্চয় করিবার মত কিছু থাকে না। বেশীর ভাগ লোকই দরিদ্র। তাহারা অতি কষ্টে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিতেছে। ব্যয় মিটাইয়া উদ্বৃত্ত প্রায় কিছুই থাকে না। শিল্পক্ষেত্রে উন্নতিশীল জাতিগুলির অবস্থা অন্যরূপ। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের প্রায় লোকেরই ব্যয়

অপেক্ষা আয় বেশী। তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে এবং এই উদ্বৃত্ত অর্থের সাহায্যে তাহারা মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারে।

সঞ্চয় মানুষের প্রবৃত্তির উপরও নির্ভর করে। নানা কারণে মানুষের মনে সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা জাগে। বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপার্জন করিবার শক্তি কমিয়া যায়। যাহাতে বৃদ্ধ বয়সে অর্থের অভাবে অসুবিধায় না পড়িতে হয়, সেইজন্য বিবেচক ব্যক্তিরা যথাসময়ে সঞ্চয় করে। ভবিষ্যৎ চিন্তা ইহাদিগকে সঞ্চয়ের কাজে প্রেরণা দেয়। নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি স্নেহ-মমতাও মানুষের মনে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলে। পরবর্তী কালে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যেন সুখে কাল কাটাইতে পারে, এই কথা ভাবিয়া অনেক লোক সঞ্চয় করে। অনেকে আবার সমাজে প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি লাভের জন্যও অর্থ সঞ্চয় করে। বর্তমান সমাজে বিত্তবান ব্যক্তি সকলের নিকট সম্মান পাইয়া থাকে। বিত্তবান ব্যক্তিকেই সমাজের নেতা হিসাবে লোকে গ্রহণ করে। কাজেই যাহারা সম্মান এবং প্রতিপত্তি পাইতে চাহে, তাহারা অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে।

বাহিরের কতগুলি সুযোগ-সুবিধার উপরও সঞ্চয় নির্ভর করে। যেখানে জীবন এবং সম্পত্তি নিরাপদ নহে, সেখানে লোকে সঞ্চয় করে না। কারণ তাহারা জানে সঞ্চয় করিয়া কোন লাভ নাই। যে-কোন মুহূর্তে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ চোর-ডাকাত প্রভৃতিতে লইয়া যাইতে পারে। এই কারণে আদিম কালের লোকেরা সঞ্চয় করিত না। তখন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত সরকার ছিল না। কিন্তু এখন সকল সভ্য দেশেই মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি মোটামুটি নিরাপদ। কাজেই এদিক হইতে সঞ্চয়ের পথে বিশেষ কোন বাধা কোন সভ্য দেশে নাই।

সঞ্চিত অর্থ খাটাইয়া যত বেশী আয় করিবার উপায় থাকিবে, লোকে তত বেশী করিতে চেষ্টা করিবে। আজকাল লোকে ব্যাঙ্ক, বীমা, শিল্প প্রভৃতিতে সঞ্চিত অর্থ নিয়োজিত করে। এইগুলি হইতে আয়ের হার যত বেশী হইবে, লোকের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও ততই বাড়িবে।

ভারতে মূলধন (Capital in India) :

আমাদের ভারতে লোকের সঞ্চয় করিবার ইচ্ছার অভাব নাই। অপর সভ্য জাতির মানুষদের মত ভারতবাসীরাও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি তাহাদের স্নেহ-মমতা অপর জাতির লোকের স্নেহ-মমতা অপেক্ষা কম নহে। তথাপি প্রয়োজনীয় মূলধন আমাদের দেশে নাই। মূলধনের জন্য আমাদের অন্য দেশের সাহায্য লইতে হয়। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ আজ মূলধন দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে।

আমাদের মূলধনের স্বল্পতার প্রধান কারণ হইল, প্রায় কোন লোকেরই প্রয়োজনানুগ ব্যয় মিটাইয়া আর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না। তাহা ছাড়া ভারতবাসীরা নানারকমের উৎসব-পর্ব প্রভৃতিতে অযথা অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। আমাদের দেশের লোকে বিবাহাদি কার্যে ব্যয় করিবার জন্য অনেক সময় ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। মূলধনের স্বল্পতার আর একটি কারণ হইল সঞ্চিত অর্থ ভালভাবে বিনিয়োগ করিবার উপায়গুলি এখনও আমাদের দেশে ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই। ব্যাঙ্কগুলি এখনও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া অনেক জায়গাতেই ব্যাঙ্ক নাই। অবশ্য আজকাল ব্যাঙ্ক স্থাপন এবং পরিচালনের নিয়মগুলি একটু কঠোর হওয়ার ফলে ইহাদের নির্ভর-যোগ্যতা বাড়িয়াছে। বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্কের কাজ ভালভাবে চলিতেছে। বীমা কোম্পানিগুলির অবস্থাও নির্ভরযোগ্য ছিল না। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও এখন কঠোর ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে পারিতেছে। আমাদের দেশের শিল্পগুলি এখনও ভালরূপ গড়িয়া উঠে নাই; শিল্পের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার ফলে শিল্পেও লোকে টাকাপয়সা খাটাইতে পারিতেছে না।

অনেক ক্ষেত্রে ভারতবাসীরা যে ভাবে সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করিতেছে তাহাও মূলধন-বৃদ্ধির পরিপন্থী। দুষ্ট ব্যবসায়ীরা মাল মজুত করে, চোরা কারবারে টাকা খাটায়। এদেশে অনেক লোক সোনাতে অনেক টাকা আটক রাখিয়াছে।

বর্তমানে ভারত সরকার দেশে যাহাতে অধিকতর মূলধন সৃষ্টি হইতে পারে সেইজন্য কতগুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছে। মূলধন গঠন নির্ভর করিবে প্রথমতঃ আয়-ব্যয়ের ব্যবধানের উপর। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির প্রধান লক্ষ্য মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা। ক্রমে ক্রমে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যয় যাহাতে কমে তাহার জন্যও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। ব্যয়কর বসান হইয়াছে। যে ব্যক্তি অত্যধিক ব্যয় করিবে তাহাকে ব্যয়ের জন্য কর দিতে হয়। বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমদানি বন্ধ করা হইয়াছে।

যাহাতে লোকেদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের আগ্রহ এবং সুযোগ বাড়ে তাহার জন্য সরকার জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট, প্রাইজ বণ্ড প্রভৃতিতে অর্থ-বিনিয়োগের নানা ধরনের ব্যবস্থা করিয়াছে। পল্লী অঞ্চলেও ব্যাঙ্ক পোস্ট-আপিসের মাধ্যমে স্বল্প সঞ্চয়কারীদেরও লাভজনকভাবে বিনিয়োগের সুবিধা দিতেছে। অনেক শিল্প রাষ্ট্র নিজে পরিচালনা করিয়া লভ্যাংশ হইতে নূতন মূলধন সৃষ্টি করিতেছে। দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য আয়-করের হার বাড়াইয়া মৃত্যু-কর, দানকর, সম্পদকর প্রভৃতি বসাইয়া সরকার অধিকতর অর্থ-সংগ্রহ করিতেছে। নির্দিষ্ট আয়ের উর্ধ্বে যাহাদের আয় তাহাদের জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। সম্প্রতি স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আদেশের ফলে অনেক সঞ্চিত স্বর্ণ

বাহিরে আনা হইয়াছে। পূর্ণ স্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাণ বন্ধ করা হইয়াছে। এইরূপ নানা উপায় অবলম্বন করিয়া দেশের সরকার মূলধন-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ চলার কালে মোট জাতীয় আয়ের ৮·৫ শতাংশ সঞ্চয় হইত। ইহা হইতেই পরিকল্পনার জন্য অর্থ বিনিয়োগ হইত। তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে প্রয়োজনীয় মূলধন পাইতে হইলে এই সঞ্চয়ের হার ৮·৫ শতাংশ হইতে ১১·৫ শতাংশে উন্নীত করিতে হইবে। এই উন্নয়নের জন্য সরকার নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

প্রশ্ন

১। মূলধন কি? তাহার কাজ কি? (পৃঃ ৫৪-৫৫)

২। মূলধন-বৃদ্ধি কি অবস্থার উপর নির্ভর করে? (পৃঃ ৫৬-৫৭)

৩। ভারতের মূলধনের অবস্থার পর্যালোচনা কর। (পৃঃ ৫৭-৫৮)

অষ্টম অধ্যায়

যান্ত্রিক-কুশলতা

(Technical Skill)

যান্ত্রিক-কুশলতা (Technical Skill) :

বর্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ। এযুগে মানুষের জটিলতর হাতের কাজগুলি সম্পাদন করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে যন্ত্রপাতি। জলসেচন, ভারোত্তোলন প্রভৃতি যে-সকল কাজ মানুষ অল্প আয়াসে সম্পন্ন করিত সে সকল কাজও এখন যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে। যন্ত্র মানুষের নিত্য সহচর, অপরিহার্য সহায়ক। কাল যতই উত্তীর্ণ হইতেছে, যন্ত্রও অধিকতর উন্নত ও জটিল হইতেছে। ফলে সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আর যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। যন্ত্র স্থাপন, চালন, মেরামত, নির্মাণ প্রভৃতির জন্য বিশেষ জ্ঞানের এখন প্রয়োজন। যেই বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যন্ত্র স্থাপন করিতে পারে, চালাইতে পাবে, মেরামত করিতে পারে, নির্মাণ করিতে পারে, এবং নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে, সেই জ্ঞানই যান্ত্রিক-কুশলতা বা কারিগরী দক্ষতা।

যান্ত্রিক-কুশলতা ও আর্থিক উন্নতি (Technical Skill and Economic Development) :

কোন দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হয়। সেইজন্য যথেষ্ট-পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মূলধনের যেমন প্রয়োজন, যথেষ্ট-পরিমাণ যান্ত্রিক-কুশলতা-সম্পন্ন কর্মীরও প্রয়োজন। যন্ত্রপাতির সাহায্য-ব্যতিরেকে বর্তমান যুগে উন্নত ধরনের উৎপাদন অসম্ভব। যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইলে যন্ত্র স্থাপন করিতে হয়, ইহা চালাইতে হয়, প্রয়োজনবোধে মেরামত করিতে হয়, নির্মাণ করিতে হয়। কেবল বিশেষ-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিই এই সকল কাজ কারতে পারে। কাজেই আর্থিক উন্নতির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের এবং মূলধনের যেমন প্রয়োজন, যন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ-জ্ঞান-সম্পন্ন কুশলী কর্মীরও প্রয়োজন। কি কৃষির ক্ষেত্রে, কি শিল্পের ক্ষেত্রে এখন সর্বপ্রকার উৎপাদনেই যন্ত্রের ব্যবহাব হয়। যন্ত্রেব যথাযথ ব্যবহারের জন্য যান্ত্রিক-কুশলতা-সম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজন কাজেই দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। উৎপাদনের

ক্ষেত্রে এখন সাধারণ শ্রমিক অতি সামান্য অংশই গ্রহণ করিতেছে। যে দেশে যান্ত্রিক-কুশলতা-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা বেশী, সে দেশ আর্থিক জগতে তত বেশী উন্নত। অনুন্নত দেশগুলি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলে যান্ত্রিক-কুশলতা-সম্পন্ন কর্মীর সংখ্যা বাড়াইতে যত্নবান হয়। জাপান, সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশ শিল্পোন্নয়ন সাধনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মূলধন বাড়াইবার যেমন চেষ্টা করিয়াছে, কর্মীদের কারিগরী দক্ষতা বাড়াইবার জন্যও অনুরূপ চেষ্টা করিয়াছিল।

কোন কোন দেশে বেকার সমস্যা একটা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় যান্ত্রিক দক্ষতার অভাব এই নিয়োগবিহীনতার মূলে বিদ্যমান। দেশ যতই উন্নতির দিকে যাইতেছে, ততই উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে যন্ত্রকুশল লোকের প্রয়োজন হইতেছে। অথচ বেকার ব্যক্তিদের মধ্যে যান্ত্রিক দক্ষতার অভাব। সাধারণ-দক্ষতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের নূতন শিল্পে নিয়োগ করা যাইতেছে না। কোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হইলে পুরাতন সাধারণ-দক্ষতা-সম্পন্ন ব্যক্তিরাও কর্মচ্যুত হইয়া বেকার হইতেছে। ফলে বেকার সমস্যা জটিলতর হইতেছে। এই সকল ক্ষেত্রে অধিকতর সংখ্যায় লোক যদি যান্ত্রিক দক্ষতা অর্জন করে, তবে নূতন নিয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। বেকার সমস্যার সহজ সমাধান হয়।

যান্ত্রিক-কুশলতা প্রসারের উপায় (Factors governing the formation of Technical Skill) :

উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্ধোন্নত বা অনুন্নত দেশগুলিতে উৎপাদনে উন্নতি বিধানের জন্য যান্ত্রিক-দক্ষতা-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহাতে ভবিষ্যতে যে-পরিমাণ লাভ হইবে সেই কথা বিবেচনা করিয়া কিছু-পরিমাণ ভোগ্য দ্রব্যের ব্যবহার কমাইয়া যথেষ্ট-পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিতে হয়। কখনও কখনও কর্মরত শ্রমিকদেরও যান্ত্রিক দক্ষতা-সম্পন্ন করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের নিয়োগ-ক্ষেত্র হইতে কিছু কালের জন্য সরাইয়া লইতে হয়। তাহাতে স্বাভাবিক উৎপাদন কিছুটা ব্যাহত হয়। ইহা হইতে যে ক্ষতি হয় জাতিকে সাময়িকভাবে তাহাও মানিয়া লইতে হয়।

যান্ত্রিক-কুশলতা শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করার পূর্বে কৃষি বা শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত সংখ্যায় কুশলকর্মীর প্রয়োজন হইবে তাহার সঠিক হিসাব লইতে হয়। তাহা না হইলে কোন ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর অভাব হয়। আবার কোন ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীও বেকার হয়।

নিম্নবর্ণিত কয়েকটি উপায়ে যান্ত্রিক-কুশলতা-শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় :—

(১) সাধারণ শিক্ষার প্রসার :

যান্ত্রিক দক্ষতা সম্প্রসারিত করিতে হইলে সাধারণ শিক্ষা সম্প্রসারিত করিতে হয়। সাধারণ শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সহায়তা করে। এই সাধারণ শিক্ষা এবং তাহা হইতে লব্ধ বুদ্ধি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তি হয়। সাধারণ শিক্ষার ফলে কর্মী পড়াশুনা করিয়া নানা উপায় জানিতে পারে এবং বুদ্ধির সাহায্যে সেগুলি প্রয়োগ করিতে পারে। বুদ্ধির সাহায্যে যন্ত্রের জটিলতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারে। সেইজন্য যে-সকল দেশ যান্ত্রিক দক্ষতা সম্প্রসারিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, সেই-সকল দেশ সর্বপ্রথমে সাধারণ শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ এই ভাবে উন্নতির দিকে গিয়াছে। সাধারণ শিক্ষা একদিকে যেমন যান্ত্রিক-কুশলতা-লাভের পথ প্রশস্ত করিয়াছে, অপর দিকে মানুষের মনে দায়িত্ব-বোধ বর্ধিত করিয়া তাহাদের সাধারণ দক্ষতা বর্ধিত করিয়াছে।

(২) বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাদান (Technical Institution) :

বিভিন্ন স্তরের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল বা কলেজ স্থাপন করিয়া যান্ত্রিক দক্ষতা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। কিছু-পরিমাণ শিক্ষা-লাভের পর দেশের ছাত্রছাত্রীরা এই ধরনের স্কুল বা কলেজে ভর্তি হইয়া যন্ত্রের স্থাপন, ব্যবহার, মেরামত, নির্মাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সাধারণতঃ ইহাদের এই জ্ঞান সকল যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ জ্ঞান। এই জ্ঞান শিক্ষার্থী প্রয়োজন মত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারে। আর্থিক উন্নতিকামী প্রত্যেক দেশই এই ধরনের স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বাড়াইয়া লয়।

(৩) শিক্ষানবিসি (Apprenticeship) :

কলকারখানায় শিক্ষার্থীদিগকে হাতে কলমে কারিগরী কাজ শিখানই এই পদ্ধতির মূল কথা। বৃত্তিমূলক শিক্ষাও অনেক ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে পারে না। বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রায়ই সাধারণ তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান দান করা হয়। সাধারণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বড় বড় কল কারখানায় অভিজ্ঞ কুশলীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষানবিস হিসাবে হাতে কলমে কাজ শিখিলে তাহাদের শিক্ষা পাকাপাকি ভাবে কার্যকরী হয়। শিল্পে উন্নত সকল দেশেই এই ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই শিক্ষাকে সেই-

সকল দেশে অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া মনে করা হয়। যে-সকল দেশ শিল্পে অনুন্নত সেই-সকল দেশে এই পদ্ধতি বাস্তবিক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ; কারণ স্বভাবতই সেই-সকল দেশে কুশলী কর্মীর অভাব দ্রুত মিটাইতে হয়। আমাদের দেশে বড় বড় কারখানা-গুলিতে এই ধরনের শিক্ষানবিসির ব্যবস্থা আছে। কারখানার সংখ্যা কম। আবার সকল কারখানায় এই ব্যবস্থা নাই। কাজেই শিক্ষানবিসির ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। এই ব্যবস্থা পর্যাপ্ত করিতে হইলে যদি কলকারখানার মালিকরা স্বেচ্ছায় সহযোগিতা না করে, তবে আইনের সাহায্যে তাহাদিগকে বাধ্য করা প্রয়োজন।

(৪) আভ্যন্তরীণ শিক্ষা (In-service training) :

কলকারখানায় কুশলী কর্মীর প্রয়োজনই খুব বেশী। প্রয়োজনমত কুশলী কর্মী নিয়োগ সুরুতে সম্ভব হয় না। কাজেই অনেক কলকারখানার মালিক মোটামুটি সাধারণ-জ্ঞান-সম্পন্ন কর্মী নিয়োগ করিয়া তাহাদের কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। কারখানার অভ্যন্তরেই কারিগরী তত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীকে শেখানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে হাতে কলমে কাজ করিতে শেখান হয়। কখনও কখনও নূতন যন্ত্রপাতি আমদানি করা হইলে পুরাতন কুশলী কর্মীদিগকে নূতন ধরনের শিক্ষা দিতে হয়। আভ্যন্তরীণ শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে ইহাদিগকেও নূতন কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৫) ভিন্ন দেশের সাহায্য :

কুশলী কর্মীর অভাব ভিন্ন দেশের সাহায্য লইয়া দুই ভাবে পূরণ করা যায়। কোনও সময়ে নূতন ধরনের কারখানা স্থাপিত হইলে দেশে কুশলী কর্মীর যদি অভাব থাকে, তবে বিদেশ হইতে কুশলী কর্মী আনা হয়। এই কর্মীরা কারখানার মধ্যেই দেশের কর্মীদের কারিগরী কাজ শিখায়। কিছু কাল পরে দেশের কুশলী কর্মীরাই কাজ চালাইতে পারে।

অন্য আর এক উপায়ে এই শিক্ষার কাজে বিদেশী সাহায্য লওয়া যায়। দেশ হইতে বিদেশে যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী পাঠাইয়া তাহাদিগকে কারিগরী শিক্ষাদানান্তে দেশে আনিয়া কাজে নিয়োগ করা যায়। ইহাতে বিদেশীরা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। কখনও কখনও বৃত্তি দিয়াও সাহায্য করিতে পারে।

উপরে বর্ণিত এই বিভিন্ন উপায়ে কারিগরী কুশলতা অর্জনের ব্যবস্থা করা যায়। তুলনামূলক ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় উচ্চতর বৃত্তিমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন সকল দেশেই আছে। তবে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন সাধারণ কারিগরী শিক্ষা দানের। এই প্রয়োজন শিক্ষানবিসি পদ্ধতি এবং আভ্যন্তরীণ শিক্ষাপদ্ধতিতেই সহজে মিটিতে পারে।

ভারতে যান্ত্রিক-কুশলতা-শিক্ষার ব্যবস্থা ঃ

ভারতে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করে। তবে এই শিল্পায়ন কি ক্ষুদ্র শিল্প-স্থাপনের সাহায্যে হইবে, না, বৃহদাকার-শিল্প-স্থাপনের সাহায্যে হইবে, সেই সম্বন্ধে সকলে একমত নহে। আমাদের দেশে মূলধনের অভাব এবং অধিক লোক নিয়োগ-প্রার্থী। এই অবস্থায় ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত হয়। কারণ ক্ষুদ্র শিল্পে মূলধন কম লাগে এবং অধিক লোক কাজ করিতে পারে। আবার অন্য দেশের সঙ্গে সমানভাবে তাল রাখিয়া অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নত হইতে হইলে দ্রুত শিল্পায়ন প্রয়োজন। তাহা বৃহদায়তন শিল্পের সাহায্যে অধিকতর সহজে সম্ভব। সম্প্রতি যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে উভয়-প্রকার শিল্প-স্থাপনেই আমাদের আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে।

শিল্পের আয়তন যেরূপই হউক না কেন, কুশলী কর্মীর প্রয়োজন আমাদের খুব বেশী। ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য অত্যন্ত উন্নত ধরনের কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলেও চলে। বৃহদায়তন শিল্পের জন্য উন্নত ধরনের কারিগরী শিক্ষা অত্যাবশ্যক।

প্রথম ব্রিটিশ আমলে যখন দেশে শিল্পায়নের চেষ্টা সুরু হয়, তখনই দক্ষ কারিগরের অভাব অনুভূত হয়। তখনই সরকারী প্রচেষ্টায় একটি সর্বভারতীয় কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং চারিটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। এই সংস্থাগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ফলে দেশের চাহিদার আংশিকভাবে পূরণ হইতেছিল। সম্প্রতি ভারত শিল্পায়নের পথে অধিকতর বেগে অগ্রসর হইতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে এই বেগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার সময়ে হিসাব করিয়া বলা হইয়াছে তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অতিরিক্ত ৫১০০০ ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতকের এবং অতিরিক্ত ১,০০,০০০ ইঞ্জিনিয়ারিং উপাধিধারীর প্রয়োজন হইবে। চতুর্থ যোজনার কালে এই সংখ্যা হইবে যথাক্রমে ৮০০০০ ও ১,২৫,০০০। এই পর্যন্ত এই ধরনের কুশলী কর্মীর-শিক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, ফলাফল-

সহ তাহার যে তালিকা পরিকল্পনা-রচনাকারীগণ দিয়াছেন তাহার অংশবিশেষ নিম্নে দেওয়া গেল :—

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পলিটেকনিক সংখ্যা—মোট আসন-সংখ্যা এবং উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা।

স্নাতক পাঠ্যক্রম

বৎসর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আসন-সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১৯৫০-৫১	৪৯	৪,১২০	২,২০০
১৯৫৫-৫৬	৬৫	৫৮৯০	৪০২০
১৯৬০-৬১	১০০	১৩৮৬০	৫৭০০
*১৯৬৫-৬৬	১১৭	১৯১৪০	১২০০০

উপাধি পাঠ্যক্রম

বৎসর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আসন-সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১৯৫০-৫১	৮৬	৫৯০০	২৪৮০
১৯৫৫-৫৬	১১৪	১০৪৮০	৪৫০০
১৯৬০-৬১	১৯৬	২৫৫৭০	৮০০০
*১৯৬৫-৬৬	২৬৩	৩৭৩৯০	১৯০০০

তৃতীয় যোজনাকালে শিল্পায়নের জন্য তের লক্ষ সাধারণ কারিগরের প্রয়োজন হইবে। এই যোজনাকালে শিল্পশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ১৬৭ হইতে ৩১৮তে উন্নীত করা হইবে এবং ভর্তির আসন-সংখ্যাও ৪২০০০ হইতে ১০০০০০এ উন্নীত করা হইবে। তাহা ছাড়া শিক্ষানবিশী পদ্ধতিতে ১২০০০ কর্মীকে শিক্ষাদানের প্রস্তাব হইয়াছে। যোজনার পূর্বে মধ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০০০ কর্মীর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করিয়া ১১০০০ কর্মীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। তাহা ছাড়া রেলওয়ে, ডাক, তার প্রভৃতি বিভাগ নিজ নিজ কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান চালাইতেছে ও চালাইবে।

কারিগরী শিক্ষার সহায়তার জন্য দ্বিতীয় যোজনার কালে শতকরা ৫ জন ছাত্রকে মেধাবৃত্তি বা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। তৃতীয় যোজনায় শতকরা ১৮ জন শিক্ষার্থীকে এইভাবে সাহায্য করা হইবে।

* তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইবে আশা করা হইয়াছে।

বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পূরণের জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয় যোজনায় কারিগরী শিক্ষার জন্য আর্থিক বরাদ্দ করা হইয়াছে এক শত বিয়াল্লিশ কোটি টাকা। ইহা শিক্ষার জন্য মোট বরাদ্দের শতকরা ২৫ ভাগ। প্রথম যোজনায় শিক্ষার জন্য মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা তের ভাগ এবং দ্বিতায় পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের ১৯ ভাগ কারিগরী শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল। একথা আজ সর্বত্র স্বীকৃত হইতেছে যে কারিগরী শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে না পারিলে আমাদের শিল্পায়নের স্বপ্ন সফল হইবে না।

প্রশ্ন

১। কারিগরী বা যান্ত্রিক-কুশলতা কি? ইহার সঙ্গে আর্থিক উন্নতির সম্পর্ক কি? (পৃঃ ৬০-৬১

২। কারিগরী বা যান্ত্রিক-কুশলতা প্রসারের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়? (পৃঃ ৬১-৬৩)

৩। ভারতে কারিগরী বা যান্ত্রিক কুশলতা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবস্থার আলোচনা কর। (পৃঃ ৬৪–৬৫)

অষ্টম অধ্যায়

আর্থিক গঠন

(Economic Structure)

আর্থিক গঠন (Economic Structure) :

বিভিন্ন দেশের আয়ের উপায় এবং জীবনের মান বিভিন্ন প্রকারের। কোন দেশ কৃষির উপর নির্ভর করে। দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য করে এবং তাহাদের কৃষি হইতেই আয় হয়। কোন দেশ আবার শিল্পপ্রধান। সেখানকার লোকেরা জীবিকার জন্য প্রধানতঃ শিল্পের উপর নির্ভর করে। শিল্পের আয়ই জাতীয় আয়ের প্রধান অংশ। কোন দেশের শিল্প আবার বৃহদায়তন। কোন দেশের অধিকাংশ শিল্পই ক্ষুদ্রায়তন। ইংল্যাণ্ডে বৃহদায়তন শিল্পের প্রাধান্য আছে। জাপানের অধিকাংশ শিল্প ক্ষুদ্রায়তন। কোন দেশের লোকেরা সহজে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে এবং ভোগ করে। আবার কোন দেশের লোকেদের অধিকাংশই জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও অতি কষ্টে সংগ্রহ করে। কোন দেশের লোকেদের আয়ের উপায় এবং জীবনের মানের দ্বারা সেই দেশের আর্থিক গঠন নির্ণয় করা হয়।

স্বল্পোন্নত বা অনগ্রসর আর্থিক গঠন (Underdeveloped Economy : its main features) :

ভারতবাসীদের মাথাপিছু আয় ২৮১৲ টাকা। গ্রেট ব্রিটেনের লোকেদের মাথাপিছু আয় ৪০৫৭৲ টাকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেদের মাথাপিছু আয় ৮৭৮৪৲ টাকা। ইহাতে বুঝা যায়, কোন দেশের লোকের মাথাপিছু আয় অন্য দেশের লোকের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় খুব কম। জাতিসংঘের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সংজ্ঞা অনুসারে যে দেশের লোকের মাথাপিছু আয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের লোকের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় খুব কম, সেই দেশের আর্থিক গঠনকে স্বল্প উন্নত বা অনগ্রসর আর্থিক গঠন বলা হয়। ভারতের আর্থিক গঠন সেই সংজ্ঞা অনুসারে স্বল্প উন্নত।

স্বল্পোন্নত আর্থিক গঠন-সম্পন্ন দেশগুলির আরও কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই সকল দেশে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক হয়। ফলে এই সকল দেশে বেকারের সংখ্যা বেশী। যাহারা কর্মে নিযুক্ত তাহাদের অনেকে আবার পূর্ণ সময়ের জন্য কাজ পায় না।

স্বল্পোন্নত দেশে সাধারাণতঃ প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব থাকে না, তবে তাহার সদ্ব্যবহার হয় না।

অনগ্রসর দেশ সাধারণতঃ কৃষিপ্রধান হয়। অধিকসংখ্যক লোকই জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। কৃষি প্রাচীন এবং অনুন্নত প্রথায় পরিচালিত হয়। ফলে ফসলও কম উৎপন্ন হয়।

এই সকল দেশের শ্রমিকের শ্রম-নৈপুণ্যও খুব কম। ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন শক্তি এবং আয়ও খুব কম।

অনুন্নত দেশের লোকেদের আয় কম অথচ খরচ আয়ের তুলনায় বেশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঞ্চয় বলিয়া কিছু থাকে না। ফলে মূলধনেরও অভাব হয়। মূলধন কম বলিয়া উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। সঞ্চয় যেমন কম, সঞ্চিত অর্থ নিয়োগের উপায়ও সেই প্রকার কম। ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কিংবা শিল্প প্রভৃতিতে লোকে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করে। অনুন্নত দেশে এই সকল সুযোগও কম থাকে। ফলে সঞ্চিত অর্থের বিনিয়োগও কম হয়।

স্বল্পোন্নত দেশে অর্থবণ্টন-ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নয়, অতি অল্প লোক খুব বিত্তবান হয়, অন্য সকলে দরিদ্র।

আর্থিক অনুন্নত দেশের আর একটা বিশিষ্টতা এই যে, এ সকল দেশের লোকেরা অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। শহরের সংখ্যা কম। শহরবাসীর সংখ্যাও কম। স্বল্পোন্নত দেশের একদিকে জন্মের হার যেমন বেশী, অন্যদিকে মৃত্যুর হারও বেশী।

অনগ্রসর দেশের লোকেদের জীবনযাপনের মানও নিম্ন স্তরের। জীবনধারণের জন্য অতি-প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুও তাহারা অতি কষ্টে সংগ্রহ করে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, পুষ্টিবিধানের জন্য এবং আরামের জন্য যে-সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, সে সকল দ্রব্য অধিকাংশ লোকই সংগ্রহ করিতে পারে না। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে-সকল দ্রব্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাহা লইয়াই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এই সকল বিশিষ্টতা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। আমাদের দেশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। শতকরা সত্তর জন লোক কৃষির উপর নির্ভর করে। অবশ্য কৃষির উপর নির্ভর করিলেই যে কোন দেশ অনুন্নত হইবে, তেমন নহে; ডেনমার্ক প্রধানতঃ কৃষি-নির্ভর দেশ। অথচ ইহার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব উন্নত। ইহার কারণ এই দেশের কৃষিকার্য উন্নত প্রণালীতে পরিচালিত হয়। কিন্তু ভারতের কৃষি পুরাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। ভারতের শতকরা ৮২ জন লোক গ্রামে বাস করে। অনেকেরই সঞ্চয়ের কোন উপায় নাই। অর্থ-বিনিয়োগের ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নহে। মাথাপিছু আয়ও অত্যন্ত কম। জীবনধারণের মানও নিম্নস্তরের।

ভারতে জন্মের হার যেমন উচ্চ, মৃত্যুর হারও প্রায় তেমনই উচ্চ ; কাজেই ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে অনগ্রসর কাঠামো বলিয়া গণ্য করা হয়।

অনগ্রসর বা স্বল্লোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধান (Requirements for the Development of Under-developed Countries) :

অর্থ নৈতিক দিক হইতে যে-সকল দেশ অনগ্রসর বা স্বল্লোন্নত আছে, সে সকল দেশে নিজ স্বার্থে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বার্থে দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন ত্যাগকে অত্যধিক বলিয়া মনে করা যায় না। কোন দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং দেশের সরকারকে পরিকল্পনা রূপায়ণে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে হয়। ইহার নানা তাৎপর্য উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

দেশের অনগ্রসরতার বিশেষ লক্ষণ হইল লোকেদের মাথাপিছু আয় কম এবং জীবনযাত্রার মান নিচু। কাজেই সর্বপ্রথমেই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে দেশবাসীর মাথাপিছু আয় বাড়ে এবং কাম্য বস্তু ক্রয়ের ক্ষমতা বাড়ে। মোট জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বাড়াইতে হইলে ক্রমাগত উৎপাদন এবং উৎপাদনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ বাড়াইতে হইবে। অনগ্রসর দেশ সাধারণতঃ কৃষিপ্রধান। প্রথমতঃ উন্নত ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া সেচ ব্যবস্থার উন্নতি-বিধান করিয়া কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইবে। ফলে কৃষির উৎপাদন উন্নত প্রণালীতে এবং উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকার্য পরিচালনার ফলে কিছু-সংখ্যক লোক বেকারও হইতে পারে। বর্তমান যুগে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া কোন জাতিই নিজেদের অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও প্রসার সাধন প্রয়োজন। শিল্পস্থাপনে এই সকল দেশের সাধারণতঃ দুই প্রকারের সুবিধা থাকে। কৃষি বা খনি হইতে কাঁচা মাল পাওয়া যায় প্রচুর, আর শ্রম সরবরাহও পর্যাপ্ত। শিল্প স্থাপনের সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যেন যেই সকল শিল্প অন্য শিল্প স্থাপনে এবং সম্প্রসারণে সাহায্য করে সেই সকল শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, লৌহ শিল্প বা রাসায়নিক শিল্প। তাহা ছাড়া যে সকল শিল্প কৃষির সহায়তা করে সেই সকল শিল্পও স্থাপন করা উচিত। শিল্প স্থাপিত হইলে কৃষিতে উদ্বৃত্ত লোক শিল্পে নিযুক্ত হইতে পারে।

অনগ্রসর দেশে শিল্প স্থাপনের সময় ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভাব্যতার কথা মনে রাখা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র শিল্প অল্প মূলধনে পরিচালিত হয়। তাহাতে অধিকসংখ্যক লোক

নিয়োগের সম্ভাবনা থাকে। তাহা ছাড়া কৃষিপ্রধান অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প কৃষকদের জন্য অবসর সময়ের জন্য সাময়িক নিয়োগের ব্যবস্থা করে। ভারতের মত দেশে ক্ষুদ্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে জাপানের কথা উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাধান্য সত্ত্বেও সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয় নাই।

একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিল্পের সাহায্য ব্যতীত কৃষির উন্নয়ন কঠিন। কৃষির উন্নতির জন্য চাই সার, চাই উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি। এই সরবরাহ করে শিল্প আবার শিল্পের উন্নতির জন্য কৃষির উন্নতি সাধন প্রয়োজন। শিল্পের জন্য কাঁচা মাল চাই। কাঁচা মাল সরবরাহ করে কৃষি। শিল্প পরিচালিত করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। কৃষির সাহায্য ভিন্ন সে ব্যবস্থা অসম্ভব।

কৃষির উন্নতির জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার, সার প্রয়োগ, উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থা, কৃষি মূলধনের ব্যবস্থা, কৃষিদ্রব্য বিপণন ব্যবস্থার প্রয়োজন। আমাদের দেশে নানা কারণে জমিগুলি টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে যাহার ফলে চাষ মোটেই লাভজনক নয়। যে-সকল অনুন্নত দেশে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সে সকল দেশে ভূমির সংহতি সাধন (consolidation of holdings) প্রয়োজন।

শিল্প-প্রসারের জন্য মূলধন-বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-উপাদন-বৃদ্ধি, কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণ, মূল শিল্প (key industry) স্থাপন, দেশে সাধারণ শিক্ষার প্রসার প্রয়োজনীয়। শিল্প-সম্বন্ধে পরিকল্পনা রচনায় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন দেশে সমগ্র প্রাকৃতিক সম্পদ এক শ্রমশক্তিকে যথাযথ রূপে উৎপাদনে নিয়োগ করা যায়। বেকার সমস্যার সমাধানেও যেন শিল্প যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে সে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। শিল্পায়নে বিদেশী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। অনগ্রসর দেশের দেখা উচিত যেন বিদেশে রপ্তানী করা মালের মূল্য হইতে এই যন্ত্রপাতির মূল্য দেওয়া চলে।

দেশের কর-ব্যবস্থায় অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে দেখা উচিত যেন তাহাতে মূলধন সৃষ্টি হয় এবং অসম বণ্টন রোধ করা যায়। প্রয়োজনবোধে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা চলে। অবশ্য সে ধরনের ব্যবস্থা হইতে অল্প-আয়-বিশিষ্ট লোকেদের বাদ দিতে হয়।

দেশের মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও যদি লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকে, তবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। অনগ্রসর দেশগুলির লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি একটি সমস্যা। পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি ব্যবস্থার সাহায্যে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অনগ্রসর দেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন: জীবন-যাত্রার মান উন্নীত হইলে লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে।

আমাদের ভারত সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনা রচনা করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন তৃতীয় পরিকল্পনায় কাজ চলিতেছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে আবার চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবে। প্রত্যেক পরিকল্পনা কালের শেষে দেখা গিয়াছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের মাথাপিছু আয় ছিল ২৮৪৲ টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৩০৬ টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে মাথপিছু আয় দাঁড়াইয়াছে ৩৩০৲ টাকা। আশা করা যায় ১৯৬৫-৬৬ সালে এই মাথাপিছু আয় হইবে ৩৮৫৲ টাকা। উৎপাদন বাড়িয়াছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে। কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি আশানুরূপ, কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতি আশানুরূপ নহে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মান অনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহার কারণ ভোগ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল শিল্পের উৎপাদনই বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন তেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। চতুর্থ পরিকল্পনায় মূল্যবৃদ্ধি রোধের একটি উপায় হিসাবে ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখা হইবে। ভোগের মান উন্নয়নই চতুর্থ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া খসড়া পরিকল্পনার উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন

১। অনগ্রসর বা স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিশিষ্টতা কি ? (পৃঃ ৬৭-৬৯)

২। অনগ্রসর দেশগুলির অনগ্রসরতা অপসারণের উপায় নির্ণয় কর। (পৃঃ ৬৯-৭১)

— ——

নবম অধ্যায়

ব্যবসায় পরিচালন

(Business Organisation)

বর্তমান যুগে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবসায় পরিচালনা করা হইয়া থাকে। পরিচালনা-ব্যবস্থার দিক হইতে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন —একমালিকী ব্যবসায়, অংশীদারী ব্যবসায়, যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়, সরকারী ব্যবসায় এবং সমবায়ী ব্যবসায়।

একমালিকী ব্যবসায় (Single Ownership) :

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় এক ব্যক্তি ব্যবসায় পরিচালনা করে, সেই ব্যক্তি ঐ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে, নিজস্ব অর্থে মূলধনের প্রয়োজন না মিটিলে বাহির হইতে ধার করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে। ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থাও সেই ব্যক্তিই করে। সেই ব্যক্তিই ব্যবসায়ের মালিক। ব্যবসায়ে যদি লাভ হয়, তবে সম্পূর্ণ লাভই তাহার প্রাপ্য। আবার যদি ক্ষতি হয়, তবে সম্পূর্ণ ক্ষতিই তাহাকে বহন করিতে হয়। ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ ঝুঁকিই তাহার।

একমালিকী ব্যবসায়ের যেমন সুবিধাও আছে, তেমন অসুবিধাও আছে। ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ ঝুঁকি মালিককে লইতে হয় বলিয়া সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সতর্কভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে। একটু অসতর্ক হইলেই তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সে সকল দিকে লক্ষ্য রাখে এবং দক্ষতার সহিত কার্য পরিচালনা করে।

অসুবিধার কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক সময়ই যে ব্যক্তির ব্যবসায় পরিচালনা করিবার যোগ্যতা আছে, তাহার মূলধনের অভাব আছে। আবার যাহার মূলধন প্রচুর আছে, তাহার ব্যবসায়-পরিচালনায় যোগ্যতা কম। এইরূপ ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা করা কঠিন। বিশেষতঃ আজকাল বৃহদায়তন ব্যবসায়ের যুগ। এই যুগে যে-কোন এক ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া এক ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিকের উপর সমান নজর রাখাও সম্ভব নহে।

অংশীদারী ব্যবসায় (Partnership) :

কখনও কখনও দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে মূলধন সরবরাহ করিয়া ব্যবসায় পরিচালনা করে। সকলেই নির্দিষ্ট হারে লাভ-ক্ষতির অংশও গ্রহণ করে। এই ধরনের

ব্যবসায়কে অংশীদারী ব্যবসায় বলা হয়। এই ধরনের ব্যবসায়ে কখনও কখনও যে ব্যক্তি কোন মূলধন সরবরাহ করিতে পারে না অথচ যাহার পরিচালনার যোগ্যতা আছে, তেমন ব্যক্তিকেও অংশীদার হিসাবে নেওয়া হয়। এই রকম অংশীদারকে কার্যকর অংশীদার (Working Partner) বলা হয়। কার্যকর অংশীদার লাভের অংশ পায়, কিন্তু ক্ষতির অংশ গ্রহণ করে না।

এই ধরনের ব্যবসায়ের সুবিধা এই যে, ইহাতে বেশী পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া কয়েক ব্যক্তি মিলিতভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করিলে, বিভিন্ন ব্যক্তি ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে তাহারা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া লইতে পারে। ফলে ব্যবসায়ও খুব দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়।

এই ধরনের ব্যবসায়ের অসুবিধাও আছে। অংশীদারগণ সকলে সমান যোগ্যতা-সম্পন্ন না-ও হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্পযোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির ত্রুটির ফলে অপর অংশীদারদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কখনও কখনও এক ব্যক্তির অসাবধানতা বা অসৎ আচরণের ফলে ব্যবসায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। অংশীদারদের মধ্যে মত-বিরোধ হওয়াও অসম্ভব নয়। মত-বিরোধ বা ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিলেও ব্যবসায় নষ্ট হয়। কোন এক অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে যে ব্যক্তি তাহার উত্তরাধিকারী হিসাবে অংশীদার হয়, সে ব্যক্তি যোগ্যতাসম্পন্ন না হইলে ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারেও অংশীদারী ব্যবসায়ের কিছুটা অসুবিধা আছে। সাধারণতঃ এই ধরনের ব্যবসায়ে অংশীদারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নহে। পাওনাদার ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ পাওনা টাকা যে-কোন একজন অংশীদারের নিকট হইতে আদায় করিতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে অনেক ধনী ব্যক্তি অংশীদার হইতে অস্বীকার করে। তাহাদের ভয় থাকে, যদি ব্যবসায়ে ঋণ হয়, তবে মহাজন ইচ্ছা করিলে ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য আজকাল অংশীদারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

যৌথমূলধনী ব্যবসায় (Joint Stock Business) :

আজকাল এই ধরনের ব্যবসায়ের প্রচলন খুব বাড়িয়াছে। এই ব্যবস্থায় বহু ব্যক্তির নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া যৌথ কারবার পরিচালনা করা হয়। যাহারা মূলধন সরবরাহ করে, তাহারা সকলেই অংশীদার। এই অংশীদারগণ কিন্তু সকলে ব্যবসায় পরিচালনা করে না। তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে যোগ্যতাসম্পন্ন কয়েক ব্যক্তিকে পরিচালক নিযুক্ত করে। এই পরিচালকবর্গ (Board of Directors) ব্যবসায়ের

নীতি নির্ধারণ করে। কার্য পরিচালনের জন্য একজন ম্যানেজার এবং অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত করে। কার্যতঃ নিয়োজিত কর্মচারীরাই ব্যবসায়ের কার্য নির্বাহ করে। ইহারা নির্দিষ্ট হারে বেতন পায়, অংশীদারগণ ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতির মালিক।

যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানে মোট মূলধনকে কতগুলি অংশে বিভক্ত করা হয়। যেমন—যদি কোন প্রতিষ্ঠানের একলক্ষ টাকা মূলধন স্থির হয়, তবে ইহাকে হয়ত এক হাজার অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক অংশের মূল্য তখন হয় দশ টাকা। এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি দশ টাকা মূলধন সরবরাহ করে, সে ব্যক্তি একটি অংশের মালিক হয়। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে অনেকগুলি অংশেরও মালিক হইতে পারে। তাহার লাভ-লোকসান তাহার অংশের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের অংশীদারগণের আর্থিক দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। ব্যবসায়ের ঋণ শোধ করিতে যে-কোন অংশীদারকে তাহার নিজ অংশের মূল্যের অধিক অর্থ দিতে হয় না। এই ব্যবস্থার ফলে যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের অংশ ক্রয় করিতে সাধারণতঃ লোকেরা অনিচ্ছা প্রকাশ করে না। মূলধন সংগ্রহ করাও কঠিন হয় না।

যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের জন্য অংশ বা শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা হয়। তাহা ছাড়া কখনও কখনও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান নিজ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া একপ্রকার ঋণপত্র বা তমসুকের (Debenture) সাহায্যেও মূলধন সংগ্রহ করে। যাহারা এই সকল ঋণপত্র (Debenture) ক্রয় করে, তাহারা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার নহে। তাহারা লাভ-লোকসানের অংশ গ্রহণ করে না। লাভ হউক বা লোকসান হউক, ঋণপত্রের ক্রেতাকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতেই হয়।

সাধারণতঃ এই প্রকারের ব্যবসায়ের অংশ (Share) দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথম-প্রকার অংশের নাম সর্বাগ্রগণ্য অংশ (Preferential Share), দ্বিতীয় প্রকার অংশের নাম সাধারণ অংশ (Ordinary Share)। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে ঋণপত্র-ক্রেতার দাবী সকলের আগে মিটাইতে হয়। এই দাবী মিটাইয়া যদি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের লাভ হয়, তবে সর্বাগ্রগণ্য অংশের মালিকদের নির্দিষ্ট হারে লাভের অংশ দিতে হয়। তাহার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা সাধারণ অংশের মালিকগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

এই ধরনের ব্যবস্থার অনেক সুবিধা আছে। আজকাল বৃহদায়তন ব্যবসায়ের যুগ। বৃহদায়তন ব্যবসায় চালাইতে হইলে অনেক মূলধনের প্রয়োজন। অধিক-পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করার পক্ষে ইহাই বর্তমানে যোগ্য ব্যবস্থা। অল্প কয়েক ব্যক্তির পক্ষে এত অধিক-পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন। অনেক লোক আছে যাহাদের অর্থ আছে। তাহারা অর্থ ব্যবসায়ে বা শিল্পে খাটাইতে পারে। অথচ শিল্প বা ব্যবসায়

চালাইবার মত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তাহাদের নাই। এইরূপ লোকের পক্ষে অর্থ বিনিয়োগের পক্ষে যৌথমূলধনী ব্যবসায় খুব উপযোগী। তাহা ছাড়া যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের অংশীদারগণের দায় সীমাবদ্ধ বলিয়া, লোকে অংশ ক্রয় করিতে কোন প্রকারের আশঙ্কা বোধ করে না। তাহা ছাড়া যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের অংশগুলি হস্তান্তরযোগ্য বলিয়াও ক্রেতারা অংশ ক্রয় করিতে দ্বিধাবোধ করে না। তাহারা জানে, তাহাদের অর্থের প্রয়োজন হইলে তাহাদের অংশগুলি তাহারা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিবে। সর্বশেষে একথাও বলা চলে যে, যৌথমূলধনী ব্যবসায় স্থায়ী হয়। একমালিকী ব্যবসায় অনেক সময় মালিকের মৃত্যু হইলে নষ্ট হইয়া যায়। অংশীদারী ব্যবসায়, কোন একজন অংশীদার চলিয়া গেলে বা তাহার মৃত্যু ঘটিলে, নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যৌথমূলধনী কারবারে কোন অংশের মালিক ব্যবসায় ত্যাগ করিলে বা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

এই যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের অসুবিধা যে নাই, তেমন নহে। যৌথমূলধনী ব্যবসায়ে অংশের মালিকদের সঙ্গে পরিচালকবর্গের যোগাযোগ বিশেষ থাকে না। ফলে পরিচালকবর্গ কখনও কখনও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবে, তখন তাহারা তাহাদের অংশ বাজারে বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। যাহারা জানিতে পারিত না, তাহাদিগকে ক্ষতির বোঝা বহন করিতে হইত। আবার তাহারা যদি বুঝিতে পারে যে ব্যবসায়ে খুব লাভ হইবে, তখন তাহারা কৌশলে অধিকসংখ্যক অংশ ক্রয় করিবে। ফলে যে-সকল অংশের মালিকদের নিকট হইতে কৌশলে অংশ ক্রয় করা হইল, তাহারা লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হইল। ইহা ছাড়াও নানা উপায়ে তাহারা অংশের মালিকগণকে বঞ্চিত করিতে পারে।

যৌথমূলধনী কারবার অনেক সময় বেতনভুক্ কর্মচারীর দ্বারা পরিচালিত হয়। বেতনভুক্ কর্মচারী নিয়ম-নির্দেশ মাফিক কাজ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। নূতন নূতন অভিযানের ঝুঁকি তাহারা লইতে ইচ্ছুক হয় না। তাহারা গতানুগতিক পদ্ধতিতে ব্যবসায় চালায়। ফলে ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি ক্ষুণ্ণ হয়।

যৌথমূলধনী কারবারের দুই-একটি অসুবিধা থাকিলেও, ইহার সুবিধা বেশী বলিয়া এখন এই ধরনের ব্যবসায়ই বেশী পরিমাণে চলিতেছে।

সরকার-পরিচালিত ব্যবসায় (State Ownership) :

আজকাল কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের সরকার ব্যবসায় বা শিল্প পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। রেল, ডাক, তার, বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা বেশী

পরিমাণে দেখা যায়। সরকার নিজ উদ্যোগে এই ধরনের ব্যবসায় স্থাপন করে বা কোন কোন ক্ষেত্রে এইগুলি পূর্ব মালিক হইতে ক্রয় করিয়া লয়। এই দায়িত্ব গ্রহণের কয়েকটি কারণ আছে। সরকার-পরিচালিত শিল্প বা ব্যবসায় অধিকতর পরিমাণে লোকের কল্যাণ সাধন করিতে পারে। ব্যক্তিগত মালিকানায়, অংশীদারী ব্যবস্থায় বা যৌথমূলধনী ব্যবস্থায় যদি রেল, ডাক প্রভৃতি পরিচালিত হয়, তবে মালিকগণ নিজেদের সুবিধার জন্য জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে। সেইজন্য সরকার নিজ হাতে লইয়া জনসাধারণের স্বার্থে এই ব্যবসায় বা শিল্প পরিচালিত করে। আজকাল এই ধরনের ব্যবসায়ের বা শিল্পের সংখ্যা অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে বাড়িতেছে। আমাদের দেশে দুর্গাপুরের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, চিত্তরঞ্জনের রেল-কারখানা, কলিকাতার মোটর পরিবহণ প্রভৃতি সরকার পরিচালনা করিতেছে।

সরকার-পরিচালিত ব্যবসায়ের বা শিল্পের লভ্যাংশ দেশের জনসাধারণ ভোগ করে। পরিচালন ব্যাপারে প্রধান লক্ষ্য থাকে জনসাধারণের কল্যাণ। কোন ব্যবসায়ে একটু বেশী পরিমাণে লাভ করিতে গেলে, জনসাধারণের অহিত সাধন করা হয়। সেইরূপ ক্ষেত্রে লাভের কথা বিবেচনা না করিয়া জনসাধারণের মঙ্গলের কথাই চিন্তা করা হয়। সরকার-পরিচালিত ব্যবসায়ে বা শিল্পে অধিক-পরিমাণে মূলধন নিয়োজিত হইতে পারে। এমন অনেক ব্যবসায় বা শিল্প আছে যাহাতে প্রথমদিকে লোকসানের আশঙ্কাই বেশী। সেইরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ অগ্রসর হইতে আগ্রহ দেখায় না। সরকার সেই ক্ষেত্রে জনসাধারণের মঙ্গলের কথা মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারে। সরকার-পরিচালিত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকে না বলিয়া প্রচার প্রভৃতি কার্যের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয় না।

সরকার-পরিচালিত ব্যবসায় বা শিল্প-পরিচালনায় সম্পূর্ণ ভার থাকে বেতনভুক্ কর্মচারিগণের উপর। বিশেষজ্ঞ কয়েকজন সভ্য লইয়া কখনও কখনও বোর্ড গঠিত হয়। ইহারা নীতি নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। পরিচালনার ভার কর্মচারীদের উপরই থাকে। ব্যবসায়ে লাভ হউক বা লোকসান হউক, ইহাদের নিয়মিত বেতনের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হইবে না। কাজেই পরিচালনার ক্ষেত্রে বড় একটা উৎসাহ-উদ্যোগের ভাব দেখা যায় না। কর্মচারিগণ রুটিন মাফিক কাজ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। কখনও কখনও উচ্চ-কর্মচারিগণ অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া সরকার-পরিচালিত ব্যবসায়ের বা শিল্পের ক্ষতি সাধন করে। এই প্রকারের অসুবিধা সত্ত্বেও সরকার-পরিচালিত ব্যবসায় এবং শিল্পের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সমবায়ী ব্যবসায় (Co-operative Organisation) :

অনেক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া প্রত্যেকে অল্প পরিমাণে মূলধন সরবরাহ করিয়া, সমান দায়িত্ব বহন করিয়া এবং সমান অধিকার ভোগ করিয়া যে ব্যবসায় পরিচালনা করে, সেই ব্যবসায়ের নাম সমবায়ী ব্যবসায়। প্রত্যেককে অল্প-পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করিতে হয় বলিয়া দরিদ্র ব্যক্তিও সমবায়ী ব্যবসায়ে যোগদান করিতে পারে। সকল যোগদানকারীর সমান অধিকার আছে বলিয়া কোন ধনী ব্যক্তি যোগদান করিলে, সে ব্যক্তি যে সুবিধা ভোগ করিবে, দরিদ্র ব্যক্তিও ঠিক সেই সুবিধাই ভোগ করিবে। এই ধরনের ব্যবসায়ে শ্রমিকগণও যোগদান করে। প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের সমবায়ী ব্যবসায় শ্রমিকগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। ফলে আজকাল বিভিন্ন ব্যবসায়ে বা শিল্পে শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে যে-সকল বিরোধ দেখা দেয়, সমবায়ী ব্যবসায়ে বা শিল্পে সে ধরনের বিরোধ দেখা দেয় না। যে-সকল ব্যবসায়ে শ্রমিকগণ মালিক, সে সকল ব্যবসায়ে শ্রমিকগণ স্বেচ্ছায় অধিক পরিশ্রম করে। অবশ্য যে-সকল ব্যবসায়-পরিচালনে অতি উচ্চশ্রেণীর নৈপুণ্যের প্রয়োজন, সেই সকল ক্ষেত্রে সমবায়ের সুবিধা একটু কম। সাধারণতঃ কৃষি, কুটীরশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সমবায়ী ব্যবসায়েব সুযোগ খুব বেশী।

সমবায়ের মূলনীতি (Principles of Co-operation) :

সমবায় প্রতিষ্ঠান কয়েকটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রথম নীতি হইল, ‘একতাই বল’। ক্ষুদ্রশক্তি দরিদ্র ব্যক্তিরাও যদি একতাবদ্ধ হয়, তবে তাহারা অনেক বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে। কথায় বলে, ‘দশের লাঠি একের বোঝা’। দশজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্বল একত্র করিলে তাহার আকার বেশ বড় হয়। সমবায়ের দ্বিতীয় নীতি হইল সমবায় প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলে সমান। অধিকারের কোন তারতম্য নাই। ইহারা স্বেচ্ছায় মিলিত হয়। সমবায়ের তৃতীয় নীতি হইল সমবায় প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানে এবং সর্বদা একে অন্যকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকে। ইহার চতুর্থ নীতি হইল সমবায়ের সভ্যগণ নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধানে যত্নবান হয়। সর্বশেষ নীতি হইল সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি মিতব্যয়ী হইবে। ইহাদের পরিচালন-ব্যয় সামান্য।

বিভিন্ন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বা শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে। যেমন—ক্রয় সমিতি, বিক্রয় সমিতি, ঋণদান সমিতি, বণ্টন সমিতি এবং সর্বার্থসাধক সমিতি।

ক্রয় সমিতি (Purchase Society : Consumers' Society) :

কোন এক অঞ্চলে অনেক তাঁতী বাস করে। তাহারা তাঁতের বস্ত্র উৎপাদন করে এবং বিক্রয় করে। ইহারা তাঁত, তাঁতের বিভিন্ন অংশ, সূতা, রং প্রভৃতি নানা দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। বিচ্ছিন্নভাবে যখন এক-একজন তাঁতী নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে, তখন অল্প ক্রয় করে বলিয়া অধিক মূল্য দিতে হয়। কিন্তু সকলের জন্য যদি একসঙ্গে ক্রয় করা হয়, তখন মূল্যের দিক দিয়া ইহাদের সুবিধা হয়। ভাল দ্রব্য কিনিতে ইহারা সহজে সক্ষম হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে এই তাঁতীরা মিলিত হইয়া একটি সমবায়ী সমিতি গঠন করিলে, ঐ সমবায় সমিতির সাহায্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। এই ধরনের সমিতিকে সমবায়ী ক্রয় সমিতি বলা হয়।

বিক্রয় সমিতি (Sale Society) :

কোন এক অঞ্চলে অনেক কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করে। তাহারা পৃথকভাবে যখন বিক্রয় করে, তখন ফড়িয়াগণ তাহাদের নিকট হইতে অল্প মূল্যে তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্য কিনিয়া লয়। এই ফড়িয়াগণ বেশী মূল্যে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করে। উৎপাদনকারীরা দরিদ্র বলিয়া তাহারা নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য ধরিয়া রাখিতে পারে না। বিশেষ করিয়া কোথায় কিভাবে বিক্রয় করিলে অধিক মূল্য পাওয়া যাইবে, তাহা জানা থাকে না বলিয়া বা সেভাবে কাজ করিবার সময় থাকে না বলিয়া তাহারা অধিক মূল্যের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না। এই সকল কৃষক একসঙ্গে মিলিত হইয়া যদি সমবায় সমিতি গঠন করে, তবে কৃষকগণ ঐ সমবায় সমিতির সাহায্যে ঠিক সময়ে ন্যায্য মূল্যে নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে। এই ধরনের সমিতিকে সমবায়ী বিক্রয় সমিতি বলা হয়।

সমবায় ঋণদান সমিতি (Co-operative Credit Society) :

যাহারা ব্যবসায়ে বা উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে, অনেক সময় মূলধনের অভাবে তাহাদের অসুবিধা হয়। ছোট ছোট ব্যবসায়ীর বা উৎপাদনকারীর এই অসুবিধা খুব বেশী। ইহাদিগকে প্রয়োজনের সময় কখনও কখনও অতি উচ্চ হারে সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে হয়। ফলে অনেকেই ঋণের দায়ে জড়িত হইয়া সর্বস্ব হারায়। ইহা রোধ করিবার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতিতে যাহারা যোগদান করে, তাহারা নিজ নিজ সামান্য অর্থ দিয়া সমিতির অংশ ক্রয় করে এবং সমিতি বাহির হইতে ঋণ সংগ্রহ করে। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ হইতে প্রয়োজনমত সমিতি সদস্যগণকে অর্থ ঋণ দেয়। সকল সভ্য সকল সভ্যকে জানে। ঋণের প্রস্তাব পরীক্ষা করা সহজ

হয়। আদায়ের ব্যবস্থাও সহজ হয়। অল্প সুদে ঋণ দেওয়া হয়। ফলে সভ্যদের মূলধনের অভাবে অসুবিধায় পড়িতে হয় না। সকলেই অল্প সুদে সমিতি হইতে সঙ্গত প্রয়োজন অনুসারে ঋণ গ্রহণ করিয়া কাজ চালায়। এই ধরনের সমিতিকে বলা হয় সমবায় ঋণদান সমিতি।

সমবায় বণ্টন সমিতি (Co-operative Distribution Society) :

কোন অঞ্চলে দরিদ্র শ্রমিকগণ বা কৃষকগণ বাস করে। তাহাদিগকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অনেক সময়ই অতি উচ্চ মূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়। স্বল্প-সঙ্গতি ব্যক্তিদের ইহাতে বিশেষ অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সেই অঞ্চলের লোকেরা সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারে। এই সমিতি সভ্যদের নিকট অংশ বিক্রয় করিয়া এবং বাহির হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। এই অর্থ দিয়া সুবিধামত পাইকারী মূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া প্রয়োজনমত সভ্যদের নিকট সামান্য লাভে বিক্রয় করিতে পারে। সভ্যরা পাইকারী মূল্য অপেক্ষা সামান্য বেশী মূল্য দিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সুযোগ পায়। যদি সমিতির কিছু লাভ হয়, তবে তাহারও অংশ আবার সভ্যগণ পায়। এই ধরনের সমিতিকে সমবায় বণ্টন সমিতি বলা হয়।

সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি (Multi-purpose Co-operative Society) :

কখনও কখনও ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান, বণ্টন প্রভৃতি সকল উদ্দেশ্য বা কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এই সকল সমিতিকে সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি বলা হয়। সদস্যগণ নিজেদের সকল প্রকারের কাজই সমিতির সাহায্যে করিতে পারে। তাহাতে তাহাদের আর্থিক সুবিধাও হয়। আবার নানা ধরনের কাজ করিতে হয় বলিয়া এই ধরনের সমিতিকে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

ভারতের সমবায় সমিতির গোড়ার রূপ :

সমবায় সমিতির জন্ম হয় জার্মানীতে প্রথম। তখন দুই প্রকারের সমবায় সমিতি সেদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এক প্রকারের সমিতি গ্রামের কৃষকদের উন্নতি-বিধানের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সমিতি স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাইফিজেন (Raiffeisen)। সেইজন্য এই ধরনের সমিতিকে বলা হয় রাইফিজেন সমিতি। এই ধরনের সমিতি কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য গঠিত হয়। সভ্যগণ পরস্পরকে জানে। শেয়ারের মূল্যও খুব কম রাখা হয়। ইহার ফলে দরিদ্র ব্যক্তিরাও এই সমিতির সভ্য

হইতে পারে। সমিতির সভ্যগণের দায় অসীম। সমিতির ঋণের জন্য একজন সদস্যকে তাহার শেয়ারের মূল্যের চাইতেও বেশী দিতে হইতে পারে। কোন পাওনাদার তাহার পাওনা টাকা সমিতির সকল সদস্য হইতে আদায় না করিয়া কয়েক জন, এমন কি একজনের নিকট হইতেও আদায় করিতে পারে। কেবল কোন উৎপাদনমূলক কাজের জন্যই সমিতির সভ্যগণ সমিতির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। সমিতির সভ্যগণ সমিতির জন্য যে পরিশ্রম করে, তাহার জন্য কোন পারিশ্রমিক পায় না।

এই সমিতিগুলি দরিদ্র কৃষকগণকে অল্প হারে সুদ দিয়া সাহায্য করার জন্যই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল মহাজনদের শোষণ হইতে দরিদ্র অভাবগ্রস্ত কৃষকদের মুক্ত করা। জার্মানীতে এই সমিতিগুলি সাফল্য অর্জন করিলে, পৃথিবীর নানা দেশে এই ধরনের সমিতি স্থাপন করা হইল। ভারতেও গ্রামাঞ্চলের জন্য এই ধরনের সমিতি স্থাপন করা হইয়াছে।

জার্মানীর শহরাঞ্চলে ছোট ছোট উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার জন্য যে সমবায় সমিতি স্থাপন করা হয়, তাহার উদ্যোক্ত ছিলেন স্থলজে-ডেলিতস্ (Schulze-Delitsch)। সেইজন্য এই ধরনের সমিতিকে বলা হয় স্থলজে-ডেলিতস্ সমিতি; এই সমিতিগুলি শহরাঞ্চলের জন্য বলিয়া সভ্যগণ সকলে সকলকে না-ও জানিতে পারে। কোনও একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্যও এইগুলি স্থাপিত হয় না। ইহাদের কর্মক্ষেত্র অনেক দূর বিস্তৃত হইতে পারে। সদস্যগণের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করার উপর এই ধরনের সমিতি বিশেষ জোর দেয়। সমিতির সদস্যগণের দায় সীমাবদ্ধ। সমিতির পাওনাদার যে-কোন সদস্য হইতে তাহার নিজ অংশের মূল্যের বেশী অর্থ আদায় করিতে পারে না। সভ্যগণ সাধারণতঃ প্রায় সকল প্রকার প্রয়োজনেই ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। যাহারা সমিতির কার্য পরিচালনা করে, তাহারা সমিতির নিকট হইতে পারিশ্রমিক পায়। শহরাঞ্চলে প্রায় সকল দেশেই এই ধরনের সমিতি গঠন করা হইয়াছে।

সমবায় সমিতির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Co-operative Society) :

সমবায় প্রথায় দরিদ্রগণ তাহাদের আর্থিক উন্নতি-বিধান করিতে পারে। তাহাদের সামান্য সঙ্গতিও তাহারা মূলধনরূপে খাটাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র শ্রমিকগণও ব্যবসায়ে বা শিল্পের মালিক হইতে পারে। তাহার ফলে তাহারা ভালভাবে কাজও করিতে পারে। ছোট ছোট মালিকেরা নিজেরাই শিল্পে বা ব্যবসায়ে কাজ করে বলিয়া ধনিকে এবং শ্রমিকে বিদ্বেষভাব থাকে, সমবায় প্রতিষ্ঠানে তাহা থাকে না। সমবায় পদ্ধতিকে যেখানে কাজ চলে, সেখানে লোকেদের নৈতিক উন্নতিও হয়। পরস্পরের

মধ্যে সাহায্য সহানুভূতির ভাবও নিজেদের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে; ফলে শিল্পের উন্নতি হয়।

সমবায় পদ্ধতির অসুবিধা এই যে, কোন ব্যবসায়ে বা শিল্পে যদি প্রচুর পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন হয়, তবে সে ব্যবসায় বা শিল্প সমবায়-পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। ব্যবসায় বা শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে যে ধরনের নৈপুণ্যের প্রয়োজন, তাহা অল্প কয়েক জনেরই থাকা সম্ভব। সমবায়-প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার ক্ষমতা সকলের সমান বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। তাহাতে পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়।

ভারতে সমবায়:

১৯০৪ সালে ভারতে সর্বপ্রথম সমবায় প্রথার প্রবর্তন হয়। অত্যধিক ঋণদায়ে জর্জরিত কৃষকগণকে ঋণের হাত হইতে মুক্তি দিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধানই ছিল সমবায়-আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। ১৯০৪ সালে প্রথম সমবায়-সংক্রান্ত আইন পাশ হয়। তখন কেবল সমবায় ঋণ সমিতি স্থাপনেরই ব্যবস্থা করা হয়। আট বৎসর পরে অন্য ধরনের সমবায়-সমিতি স্থাপনেরও ব্যবস্থা হয়। অর্ধশতাব্দীকাল সমবায়-আন্দোলন দেশে চলা সত্ত্বেও দেখা গেল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে ইহা একটা বড় সহায়ক হইয়া উঠিতে পারে নাই। লোকেদের শিক্ষার অভাব, স্বার্থপরতা, অসৎ প্রবৃত্তি, ইচ্ছার অভাব এই অসাফল্যের জন্য দায়ী। ১৯৫৪ সালে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি গ্রামীণ ঋণ পরিমাপ কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটির মতে সমবায় আন্দোলন দেশে তখন পর্যন্ত মোটেই সফল হইতে পারে নাই। কৃষকদের ঋণ সমস্যার সমাধান করা ছিল ইহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। অথচ কৃষকদের মোট ঋণের শতকরা তিন ভাগ মাত্র সমবায়-সমিতিগুলি যোগাইতে পারিয়াছে। তাহা ছাড়া মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ জনও সমবায়-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় নাই।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রচনাকারিগণ সমবায়-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া বিপুলভাবে ইহার প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে নিষ্ঠাবান। এই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সমবায়ের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠা উচিত। কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিলে গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে আমাদের অগ্রগতি সুনিশ্চিত হইবে। গ্রামপর্যায়ে সমবায়ের অর্থ হইবে গ্রামবাসীদের স্বার্থে গ্রামের ভূমি এবং অন্যান্য সম্পদের উন্নয়ন ও বণ্টন এবং সামাজিক দিক হইতে গ্রামবাসীদের পরস্পরের প্রতি বাধ্যবাধকতায় বন্ধনের ব্যবস্থা। পরিকল্পনা-রচনাকারীরা মনে করেন যে সমবায় ভারতের গ্রাম্যজীবনে বিপুল এক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হইবে।

সমবায়ের উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আনুমানিক মোট চৌত্রিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বাবদে বরাদ্দ করা হইয়াছে মোট আশি কোটি টাকা। যোজনাকালে সমবায় আন্দোলন অনেক পরিমাণে তেজী হইয়াছে। প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান-সমিতির সংখ্যা এক লক্ষ পাঁচ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া দুই লক্ষ দশ হাজার হইয়াছে। ইহাদের সদস্য-সংখ্যা চুয়াল্লিশ লক্ষ হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এক কোটি সত্তর লক্ষ হইয়াছে। প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ তেইশ কোটি হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দুই শত কোটি টাকা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে আশা করা যায় প্রাথমিক ঋণদান সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার হইবে, সদস্য-সংখ্যা হইবে তিন কোটি সত্তর লক্ষ এবং ঋণের পরিমাণ হইবে ছয় শত আশি কোটি টাকা। এইরূপে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমবায়ের উন্নতি হইয়াছে। সঠিকভাবে চালাইতে পারিলে বলা যায় সমবায় আমাদের দেশের জন্য প্রভূত পরিমাণে সম্ভাবনাপূর্ণ।

প্রশ্ন

১। একমালিকী ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা কি ? (পৃ: ৭২)
২। যৌথমূলধনী ব্যবসায় কিভাবে পরিচালিত হয় ? তাহার সুবিধা কি ? (পৃ: ৭৩-৭৫)
৩। অংশীদারী ব্যবসায়ের বিশিষ্টতা কি ? ইহার ত্রুটি কি ? (পৃ: ৭৩)
৪। সরকার পরিচালিত ব্যবসায় বা শিল্পের অসুবিধা কি ? (পৃ: ৭৬)
৫। সমবায়ের মূলনীতি কি ? (পৃ: ৭৭)
৬। বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতির কার্যাবলী বর্ণনা কর। (পৃ: ৭৭-৭৯)
৭। ভারতের সমবায় আন্দোলন এখনও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই কেন ? (পৃ: ৮১-৮২)
৮। সমবায় সমিতি কিরূপে আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করিতে পারে ? (পৃ: ৭৭-৮১)
৯। সমবায় সমিতির সুবিধা ও অসুবিধা কি ? (পৃ: ৮০-৮১)

একাদশ অধ্যায়

উৎপাদনের আয়তন

বৃহদায়তন উৎপাদন—সুবিধা ও অসুবিধা :

আমাদের পল্লী-অঞ্চলের তাঁতী একখানা তাঁতের সাহায্যে হয়ত বা দুই দিনে একখানা কাপড় বুনিতেছে। গ্রামের কামারশালায় কামার প্রতিদিন দুই-একটি করিয়া হাতিয়ার বা ছোটখাট যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতেছে। মানুষের মোট প্রয়োজনীয় কাপড়, হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতির অতি অল্প অংশই কিন্তু এইভাবে তাঁতী বা কামার তৈয়ার করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে এইগুলির একটা মোটা অংশই তৈয়ারি হইতেছে বড় বড় কলে বা কারখানায়। সেখানে অনেক যন্ত্রপাতি এবং অনেক শ্রমিকের সাহায্যে কারখানার মালিকেরা একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। ইহা কেবল কাপড়, হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে নয়। প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যেরই মোটা একটা অংশ উৎপন্ন হয় এই ভাবে কলে বা কারখানায়। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ছোটখাট কারখানায়ও কিছু পরিমাণে উৎপাদন চলিতেছে। তবে মোটামুটি ইহা বৃহদায়তন উৎপাদনেরই যুগ।

ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী অপেক্ষা বৃহদায়তন উৎপাদনকারীর নানা দিক দিয়া সুযোগ-সুবিধা খুব বেশী বলিয়াই আজকাল বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। বৃহদায়তন উৎপাদনকারী একসঙ্গে অনেক কাঁচা মাল খরিদ করে। স্বভাবতঃই সে সুবিধা দরে ভাল কাঁচা মাল খরিদ করিতে পারে। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও বৃহদায়তন উৎপাদনকারীর সুবিধা। তাঁতী তিনখানা কাপড় বুনিয়া সেইগুলি বাজারে গিয়া একদিন সময় ব্যয় করিয়া বিক্রয় করে। কাপড়-কলের মালিক দশ হাজার গজ কাপড় উৎপন্ন করিয়া একদিনেই এক ব্যক্তির সাহায্যেই সেগুলি বিক্রয় করে। সেজন্য তাহার বিক্রয়ের আনুষঙ্গিক খরচও কম পড়ে।

বিজ্ঞাপন দিয়া আজকাল দ্রব্যাদি বিক্রয় করার রীতি হইয়াছে। ছোটখাট উৎপাদনকারীর মূলধন কম। তাহার পক্ষে বিজ্ঞাপনের জন্য অর্থ ব্যয় করা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। অথচ বড় উৎপাদনকারীর মূলধন খুব বেশী। সে বিজ্ঞাপনের জন্য সহজেই কিছু অর্থ ব্যয় করিতে পারে।

উৎপাদনের জন্য নিপুণ কর্মী বা পরিচালক নিযুক্ত করিতে হইলে, উৎপাদনকারীকে উচ্চ হারে তাহাদের বেতন দিতে হয়। ছোট উৎপাদনকারীর পক্ষে এই উচ্চ হারে বেতন দিয়া কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। অথচ বড় উৎপাদনকারী সহজেই এইরূপ নিপুণ কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারে। মূল্যবান যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন ভাল-ভাবে করা যায়। ছোট উৎপাদনকারী এই ধরনের মূল্যবান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে না।

বড় উৎপাদনকারী উৎপাদনের নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য পৃথকভাবে পরীক্ষামূলক কার্য চালাইতে পারে। ছোট উৎপাদনকারীর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। উৎপাদন-কার্য চালাইতে গেলে দেখা যায়, একটি দ্রব্য উৎপাদন করিলে সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাট আরও একটি দ্রব্যও উৎপন্ন হয়। এই সকল দ্রব্যকে সহ-উৎপন্ন দ্রব্য বলা চলে। সুতা তৈয়ার করিতে গেলে তুলার বীজ পৃথক হইয়া একটা সহ-উৎপন্ন দ্রব্য হয়। সরিষার তৈল উৎপাদন করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু খইল উৎপন্ন হয়। উৎপাদনকারী ছোট হইলে এই সকল অল্প পরিমাণ সহ-উৎপন্ন দ্রব্য কাজে লাগাইতে পারে না। কিন্তু বড় উৎপাদনকারীর এই সকল সহ-উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বেশী হয়। তাহারা লাভজনকভাবে এইগুলি কাজে লাগাইতে পারে বা বিক্রয় করিতে পারে।

ছোট উৎপাদনকারীর ছোট কারখানায় একই ব্যক্তিকে দুই, তিন বা ততোধিক রকমের কাজ করিতে হয়। কিন্তু বড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন কাযের জন্য নিয়োজিত করা যায়। তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার যোগ্যতানুরূপ কাজ পায় বলিয়া কাজও ভাল হয়। এই সকল কারণে বড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় কম হয়। ফলে ছোট উপাদনকারীরা বড় উৎপাদনকারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া উঠিতে পারে না।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন—সুবিধা ও অসুবিধা :

বৃহদায়তন শিল্পের নানা সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এখন কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প টিকিয়া আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদেরও সুবিধা আছে বলিয়াই তাহারা ছোটখাট আকারে উৎপাদন চালাইতেছে। বড় বড় কাপড়ের কল থাকা সত্ত্বেও তাঁতী একখানা তাঁতের সাহায্যে অল্প পরিমাণে কাপড় উৎপাদন করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কতগুলি সুবিধা আছে। তাঁতী তাহার বাড়ীতে তাঁতে কাপড় উৎপাদন করে। অবসর সময়ে তাহার পরিবারের লোকেরা তাহাকে সাহায্য করে।

বাড়ীর লোকেরা দেখিয়া দেখিয়া কাজ শিখে। তাহারা সহজে তাহার সঙ্গে যোগ দেয়। নিজের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে বলিয়া তাহার মনেও বেশ একটা নিশ্চিন্ত ভাব থাকে। তাহার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ধর্মঘটের কোন সম্ভাবনা বা আশঙ্কা নাই। বড় উৎপাদনকারীর এ সকল সুবিধা নাই।

ছোট উৎপাদনকারীর পক্ষে সকল ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু বড় উৎপাদনকারী সেরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারে না বলিয়া তাহার অপব্যয় এবং অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে। তাহার কর্মচারীরা ইচ্ছা করিলে কাজে অবহেলা করিতে পারে। ছোট উৎপাদনকারীর উৎপন্ন দ্রব্য অনেক সময় বড় উৎপাদনকারীর কলে বা যন্ত্রে তৈয়ারি দ্রব্য অপেক্ষা মজবুত হয়। অনেকে বেশী মূল্য দিয়াও তাঁতের কাপড় প্রভৃতি ক্রয় করে। কারণ তাহা কলের তৈয়ারি কাপড়ের চাইতে বেশী মজবুত। আবার বড় উৎপাদনকারী কলে দ্রব্যাদি তৈয়ার করে বলিয়া বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী দ্রব্য তৈয়ার করিতে পারে না। ছোট উৎপাদনকারী অনেক কাজ হাতে করে বলিয়া নানা রকমের ফরমায়েস অনুযায়ী কাজ করিতে পারে। মেয়েদের গহনা তৈয়ার করার ব্যাপারে একথা খুব খাটে। গহনার ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন প্রায় সম্ভবই নহে। জামা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ইহা অনেকটা সেইরূপ। এই ধরনের সুবিধা আছে বলিয়া বৃহদায়তন উৎপাদনের দিনেও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনকারী টিকিয়া আছে।

ভারতে শিল্পায়ন (Industrialisation in India) :

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধানের জন্য দ্রুত শিল্পায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই শিল্পায়নে বৃহদায়তন শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এই উভয়কেই নিজ নিজ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইতেছে এবং হইবে। বিগত কয়েক বৎসরে যোজনার আমলে দ্রুতগতিতে শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসার হইয়াছে। এই শিল্পায়নে সরকার যেমন অংশ গ্রহণ করিয়াছে, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা বৃহদায়তন শিল্প স্থাপনে এবং পরিচালনে আর বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন এই উভয় ধরনের ক্ষেত্রেই কাজ করিয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরে বৃহদায়তন সরকারী শিল্পে ৭৭০ কোটি টাকা এবং বৃহদায়তন বেসরকারী শিল্পে ৮৫০ কোটি টাকা নিয়োজিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্পে মোট ২৯৯৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় যোজনাকালে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৮০ কোটি টাকা। তৃতীয় যোজনাকালে এই বাবদে বরাদ্দ হইয়াছে ২৬৪ কোটি টাকা।

বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগে যে-সকল বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেইগুলির মধ্যে ভিলাই, রাউরকেল্লা ও দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা, রাঁচীর ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা, ভূপালের ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং নেভেলির লিগনাইট কারখানা উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁতশিল্প, রেশম শিল্প, ছোবড়া শিল্প প্রভৃতির অবদান উল্লেখযোগ্য।

ভারতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small-scale Industry in India) :

ভারতের মত দেশে কয়েকটি কারণে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বা কুটির শিল্পের বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইতেছে। বৃহদায়তন শিল্প পরিচালনার জন্য প্রভূত পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন হয়। সেই মূলধন ভারতে সংগ্রহ করা কঠিন। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না। কাজেই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বা কুটির শিল্প এই দেশের পক্ষে উপযোগী। আমাদের দেশে বেকার সমস্যা গুরুতর। কৃষির উপর অনেক লোকের চাপ। বেকার কিছু লোকের কর্মসংস্থান করিতে হইলে এবং কৃষির উপর অত্যধিক চাপ কমাইতে হইলে শিল্পে লোক নিয়োগ করিতে হইবে। বৃহদায়তন শিল্প মূলধন প্রধান (capital intensive)। ইহাতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধনের প্রয়োজন বেশী। শ্রমশক্তির প্রয়োজন তুলনায় কম। বৃহদায়তন শিল্প অনেক লোকের কর্মসংস্থান করিতে পারে না। ক্ষুদ্রশিল্প শ্রমপ্রধান (labour intensive)। এখানে মূলধনের তুলনায় লোক-নিয়োগের সুযোগ বেশী। কাজেই ছোট শিল্প আমাদের দেশে বেশী উপযোগী। আমাদের দেশের কৃষকগণ বৎসরের অধিক সময় বিনা কাজে বসিয়া থাকে। ইহাতে শ্রমশক্তির অপচয় হয়। এই শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাইতে হইলে গ্রামে গ্রামে ছোট শিল্প অধিকতর পরিমাণে স্থাপন প্রয়োজন। এই সকল শিল্পে কৃষিতে অর্ধ-নিয়োজিত ব্যক্তিরা কৃষি-বর্হিভূত সময়ে কাজ করিতে পারিবে। অন্য আর একটি কারণেও কুটির শিল্পের পোষকতা করিতে হয়। আমরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে চলিয়াছি। সেই ব্যবস্থায় ধনবৈষম্য অচল। বেসরকারী বৃহদায়তন শিল্পের লাভ নগণ্য কয়েক জন লোকের হাতেই সাধারণতঃ গিয়া থাকে। ইহা ধনবৈষম্য বাড়ায়। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের লাভ অল্প হইলেও ইহা অনেকেই পায় বলিয়া কুটির শিল্প ধনবৈষম্য দূরীকরণে সাহায্য করে। এই সকল কারণে কুটির শিল্পের উপযোগিতা এই দেশে বেশী।

ভারতের কুটির শিল্পের অসুবিধা ঃ দূরীকরণের উপায় ঃ

আমাদের দেশের কুটির শিল্পগুলি নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করিয়া যাইতেছে। কুটির শিল্পীরা অতি পুরাতন পদ্ধতিতে তাহাদের কাজকর্ম চালাইতেছে। তাহাদের

পিতৃ-পিতামহ যেই-সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত, অনেকক্ষেত্রে তাহারা সেই সকল যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করিতেছে। অথচ কলকারখানায় নিত্য নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে ক্রমে উৎপাদন বাড়িয়া যাইতেছে এবং উৎপাদন ব্যয় কম হইতেছে। কিন্তু কুটির শিল্পীদের উৎপাদন ব্যয় তাহারা কমাইতে পারিতেছে না।

কুটির শিল্পের উৎপাদনকারীরা অনেকেই পিতৃ-পিতামহের নিকট হইতে যে কৌশল শিখিয়া লইয়াছে তাহা সম্বল করিয়াই কাজ করিতেছে। সে কৌশলের উন্নতি-বিধান করিতে পারিতেছে না। কাজেই তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িতেছে না বা উৎপাদন ব্যয় কমিতেছে না।

কুটির শিল্পীদের মূলধনের অভাব। তাহারা অনেকেই মহাজনের নিকট অধিক সুদে টাকা ধার লইয়া কাজ চালায়। তাহার জন্যও তাহাদের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। মূলধনের অভাবে উহারা কাঁচা মাল কিনিতে পারে না, উৎপন্ন দ্রব্য ধরিয়া রাখিতে পারে না। তাহাতেও তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কুটির শিল্পের মালিকরা নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের খবর রাখিতে পারে না। তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের সুব্যবস্থা উহারা করিতে পারে না। কাজেই তাহাদিগকে পাইকারের নিকট সামান্য লাভে, কখনও কখনও বিনা লাভে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়।

কুটির শিল্পের উন্নতি-বিধান করিতে হইলে কুটির শিল্পীদের অসুবিধাগুলি দূর করিতে হইবে। উৎপাদনের জন্য ভাল যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে কুটির শিল্পীদিগকে সাহায্য করা দরকার। প্রয়োজনমত উন্নততর উৎপাদন প্রণালী ইহাদিগকে শিখাইতে হইবে। ইহারা যাহাতে মূলধনের অভাবে অসুবিধায় না পড়ে তাহা দেখিতে হইবে। ইহাদের জন্য সমবায় পদ্ধতিতে ঋণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কুটির শিল্পীরা যাহাতে তাহাদের কাঁচা মালের বাজার ও উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার সম্বন্ধে জানিতে পারে সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। সময় সময় প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া কুটির শিল্পীদের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি ক্রেতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। ইহারা যাহাতে নূতন নূতন নমুনার দ্রব্যাদি তৈয়ারি করিতে পারে সেজন্য নূতন নূতন নক্‌সা তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। সম্ভব ক্ষেত্রে ইহাদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া আধুনিক প্রণালীতে উৎপাদন ইহাদিগকে শিখাইতে হইবে। আজকাল কোন কোন কুটির শিল্পে বা ছোট শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার উৎপাদনের কার্যে সহায়তা করিতেছে। সম্ভাব্যক্ষেত্রে ছোট শিল্পের মালিকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সরকারের নানা ব্যবস্থার ফলে কুটির শিল্পগুলির প্রভূত

উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ছয়টি বোর্ড গঠন করিয়াছে। এই বোর্ডগুলি কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে এবং ইহাদিগকে অর্থ সাহায্য দিতেছে।

প্রশ্ন

১। বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা কি ? (পৃঃ ৮৩-৮৪)

২। বৃহদায়তন শিল্পের যুগে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কিরূপে টিকিয়া আছে ? (পৃঃ ৮৪-৮৫)

৩। ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অবস্থা এবং সম্ভাবনা বর্ণনা কর। (পৃঃ ৮৫-৮৬)

—— ——

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

(Government and Economic Development)

সরকার কোন্ কোন্ কার্য সম্পন্ন করিবে, ইহা লইয়া সকল যুগেই মতভেদ ছিল, এখনও এই মতভেদ আছে। কাহারও মতে সরকার দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবে। এই কার্যগুলি সম্পন্ন হইলেই সরকারের করণীয় কার্য শেষ হইবে। যে-যুগে মানুষ স্বাভাবিকভাবে দেশের নিয়ম-কানুন মানিত না, শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলের উপর অত্যাচার করিত এবং যে-যুগে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে গ্রাস করিয়া নিজ আয়তন বাড়াইতে সচেষ্ট থাকিত, সে-যুগে আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা সরকারের একমাত্র কাজ না হইলেও এইগুলি যে প্রধান কাজ ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। অধিকাংশ লোকই নিজেরাই শান্তি এবং শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছে। সহজে কেহ আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে না। সাধারণতঃ কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে গ্রাস করিয়া নিজ নিজ আয়তন বাড়াইতে চেষ্টা করে না বা করিতে পারে না। তথাপি সকল সরকারকেই আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষাও করিতে হয়। এইগুলি সরকারের প্রধান কাজগুলির অন্যতম। কিন্তু ইহা ছাড়াও সরকারের এখন অনেক কর্তব্য আছে।

মানুষের কল্যাণ-সাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য রাষ্ট্রের সরকার নানা কাজ এখন করিয়া থাকে। কেবল শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধ করিয়াই এখন আর কোন সরকারই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। সকল সরকারকেই এখন জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধানে যত্নবান্ হইতে হয়। বর্তমান যুগে যে সরকার নাগরিকদের অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধান করিতে পারে, সেই সরকারই অধিক কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধানে সফল হইলেই নাগরিকগণের দিক হইতে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিশেষ কোন কারণ থাকে না।

সরকারের অর্থনৈতিক কার্য (Economic Functions of the Government) :

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। সরকারকে দেশের জনগণকে দারিদ্র্য এবং অভাবের হাত হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। সরকারকে নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। অভাব এবং দারিদ্র্যের হাত হইতে মানুষকে মুক্তি দিতে হইলে সরকারকে কর্মের সংস্থান করিতে হয়। কেহ যেন বেকার না থাকে, সে ব্যবস্থা করিতে হয়। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হয় এবং সেই সম্পদের যাহাতে সুষম বণ্টন হয়, তাহা দেখিতে হয় এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান বাড়াইতে হয়। এই কার্যগুলির পৃথকভাগে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বেকার সমস্যার সমাধান (Solution of the problem of Unemployment) :

স্বাভাবিক অবস্থাতে জনসংখ্যা সকল দেশেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহা কোন দেশে বেশী, কোন দেশে কম। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি কার্যে যত লোকের প্রয়োজন, সকল দেশেই লোকসংখ্যা তাহা অপেক্ষা বেশী। এই অবস্থায় সকল দেশেই কিছু-সংখ্যক লোক কর্মবিহীন অবস্থায় আছে। এই কর্মবিহীন ব্যক্তিদের অধিকসংখ্যকই অভাবগ্রস্ত। সামান্য কয়েক জন হয়ত অন্যের সাহায্যে নিজের অভাব-মোচন করে। যাহাঁরা অভাবগ্রস্ত তাহাদের অভাব-মোচন করিতে না পারিলে, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরা নিজেরাও অশান্তিতে কালাতিপাত তো করেই, পরন্তু দেশেও নানা অশান্তির সৃষ্টি করে। এই অশান্তি দূর করিবার জন্যও সরকারকে কর্মবিহীনদের কর্মের সংস্থান করিতে হয়। কর্মের সংস্থান করিবার জন্য সরকার নূতন নূতন শিল্প গঠন করে, ব্যবসায় পরিচালনা করে। দেশের রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি নূতন নূতন উন্নয়নমূলক কার্যে হাত দেয়। ইহা সত্ত্বেও কিছু-সংখ্যক লোক কর্মবিহীন থাকে। কাহারও কর্মবিহীনতার মূলে থাকে নিয়োগযোগ্য কর্মের অভাব, কাহারও কর্মবিহীনতার মূলে থাকে রোগ, বার্ধক্য প্রভৃতি শারীরিক অক্ষমতা। এই সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন কল্যাণ রাষ্ট্র বেকার ভাতার ব্যবস্থা করে। এই ভাবে বেকার ব্যক্তিদের কর্মের সংস্থান করিয়া অথবা তাহাদের বেকার ভাতার ব্যবস্থা করিয়া, কল্যাণ রাষ্ট্রের সরকার দারিদ্র্য এবং অভাবের হাত হইতে লোককে মুক্ত করে। কর্মের সংস্থান করিয়াই সরকার যদি মনে করে লোকের কল্যাণ-সাধন করা হইয়াছে এবং সরকারের কর্তব্য শেষ হইয়াছে, তবে ভুল হইবে। স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে যেন মানুষ কর্ম সম্পন্ন করিতে পারে সে ব্যবস্থাও সরকারকে করিতে হয়। এইজন্য সরকার শ্রমিকদের শ্রমের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। কারখানায় কাজ করিবার অনুকূল অবস্থার ব্যবস্থা করে। আইন প্রণয়ন করিয়া শ্রমিকদের নানাপ্রকার নিরাপত্তা বিধান করে।

দেশের সম্পদ বৃদ্ধি :

বর্ধিত লোকসংখ্যার বর্ধিত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বর্ধিত হারে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয়। সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়মে স্বাভাবিক অবস্থাতে এই সকল দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কোন দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে উৎপাদন বাড়ে। উহা সত্ত্বেও কল্যাণ রাষ্ট্রের সরকার এই স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। নির্ভর করার বিপদও আছে। স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করিলে স্বার্থপর ব্যক্তিদের চেষ্টায় উৎপাদন এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, যাহাতে দেশের জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি হয়, লোকের অভাব থাকিয়া যায়। সেইজন্য দেশের সম্পদ-বৃদ্ধির জন্য সরকারকে নানা ধরনের কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। কৃষির ফলন-বৃদ্ধির জন্য সার উৎপাদন করিতে হয়, বণ্টন করিতে হয়। সরকারকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়। উন্নত উপায়ে চাষ-আবাদ শিক্ষা দিতে হয়। জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সকল ব্যাপারে স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করিলে, স্বার্থপর ব্যক্তিদেব চেষ্টায় জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

শিল্পের ক্ষেত্রেও সেইরূপ। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হইয়া নূতন নূতন শিল্প-স্থাপন করিতে হয়, অথবা শিল্প-স্থাপনে অপরকে উৎসাহিত করিতে হয়। লৌহ শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগী না হইলে, স্বার্থপর ব্যক্তিরা নিজ স্বার্থে এইগুলি পরিচালনা করিয়া জনসাধারণের নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসারে এই সকল ক্ষেত্রে কার্য আরম্ভ করিলে, সরকার সহজে শিল্পের ক্ষেত্রে সম্পদ-বৃদ্ধির উপায় করিতে পারে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও সরকার এই ধরনের ব্যবস্থা করিতে পারে। কোন কোন ব্যবসায় ব্যক্তিবিশেষের হাতে ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবসায়-পরিচালনা করিয়া জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে এবং দেশের সম্পদ-বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে। সেই সকল ক্ষেত্রে সরকারকে দেশের সম্পদ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য কোন কোন ব্যবসায় বা বাণিজ্য নিজেকে পরিচালনা করিতে হয়। কখনও কখনও শিল্পের ক্ষেত্রে বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কৌশলে একচেটিয়া কাজ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করে। পরে এই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ স্বার্থে মূল্য-নীতি বা উৎপাদন-নীতি এমনভাবে নির্ধারণ করে, যাহার ফলে দেশের সম্পদ-বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি হয় এবং নাগরিকদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এই সকল রোধ করিবার জন্যও সরকারকে শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়।

দেশের সম্পদের সুষম বণ্টন :

কোন দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির উন্নতির ফলে দেশের সম্পদ-বৃদ্ধি পাইলেই, সকল নাগরিকের সম্পদ-বৃদ্ধি পাইবে বা অভাব-মোচন হইবে, একথা বলা চলে না। দেশের মোট সম্পদ-বৃদ্ধির ফলে এমনও হইতে পারে যে, অল্প কয়েক জন ধনী ব্যক্তি আরও ধনী হইতে পারে এবং অধিকসংখ্যক দরিদ্র ব্যক্তি পূর্বের মতই দরিদ্র হইতে পারে বা পূর্বাপেক্ষা দরিদ্র হইতে পারে। এইরূপ হইলে দেশের সম্পদ-বৃদ্ধি সত্ত্বেও অধিকসংখ্যক লোক অভাবগ্রস্ত থাকিয়া যায়। তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব, বাসোপযোগী গৃহের অভাব এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব-মোচন হয় না। সেইজন্য সম্পদ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা একমাত্র সরকারই প্রবর্তন করিতে পারে। যাহারা নিজেরা সম্পদ অর্জন করে, তাহারা সাধারণতঃ তাহা অপরকে দিতে চাহে না। সেইজন্য সরকারকেই এমন ব্যবস্থা করিতে হয়, যে ব্যবস্থার ফলে সম্পদের অংশ সকলেই পাইতে পারে।

এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। ধনীদের নিকট হইতে অধিক হারে কর আদায় করিয়া তাহা জনসাধারণের শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির কাজে লাগাইতে পারে। দরিদ্র শ্রমিকদের যেন শিল্পের বা ব্যবসায়ের মালিকরা না ঠকাইতে পারে, সেইজন্য তাহাদের মজুরির সর্বনিম্ন হার নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। যখন প্রয়োজন হয়, বড় বড় শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকার নিজে পরিচালনা করিতে পারে। তাহাতে ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টনের পথে কোন অন্তরায় থাকে না। প্রত্যেক উন্নত দেশের সরকারই অধুনা এই ধরনের ব্যবস্থা করিতেছে।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন :

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত না হইলে, তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন হইয়াছে একথা বলা চলে না। অনেক দেশেই, বিশেষ করিয়া ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে, অধিকসংখ্যক লোকের জীবনযাত্রার মান খুব নিম্ন। যে খাদ্য, বস্ত্র বা বাসগৃহ তাহাদের সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অতি কম খাদ্য, বস্ত্র বা বাসগৃহ তাহাদের ভাগ্যে জোটে। দেশের লোকের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে, ইহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা তাহাদের শরীর এবং মন অসুস্থ থাকিবে।

কোন ব্যক্তির আয় বাড়িলেই তাহার জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার উপায় হয় না। যদি আয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া যায়, তবে বর্ধিত আয়েও

লোকে বর্ধিত পরিমাণে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারে না। বিগত দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর হইতেই আমাদের দেশের লোকের প্রায় সকলেরই আয় বাড়িয়াছে ; কিন্তু দ্রব্যমূল্য এত বেশী পরিমাণে বাড়িয়াছে যে, অনেকেই পূর্বে যে পরিমাণে দ্রব্যাদি ক্রয় করিত তাহা অপেক্ষা কম দ্রব্যই ক্রয় করিতে পারিতেছে। ফলে আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উপায় হয় নাই।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে হইলে, সরকারকে দেশের কৃষি, শিল্প প্রভৃতি উন্নত করিতে হইবে। তাহার ফলে উৎপাদন বাড়িবে। ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতির সুযোগ যেন জনসাধারণ বিনা ব্যয়ে বা অতি অল্প ব্যয়ে পায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশের প্রচলিত মুদ্রার মূল্য মোটামুটি অপরিবর্তিত রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়। কখনও টাকায় দুই কিলোগ্রাম চাউল, কখনও টাকায় এক কিলোগ্রাম চাউল বিক্রয় হইলে আর্থিক অবস্থা অনিশ্চিত থাকে। কারণ সাধারণতঃ মানুষের আয় অল্পকালের মধ্যে প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। এই অবস্থায় যদি মুদ্রার মূল্য দ্রুত পরিবর্তিত হয়, তবে একই আয়ে কখনও কম, কখনও বেশী দ্রব্য পাওয়া যাইবে। মানুষ অনিশ্চিত অবস্থায় দিন কাটাইবে। আয় ঠিক থাকিয়া যাইবে, অথচ কখনও সে অতি কষ্টে, কখনও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইবে। এই অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। সেইজন্য দেশে মুদ্রার মূল্য যেন অপরিবর্তিত থাকে, সে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security) ঃ

কোন মানুষের মনে সকল সময়েই যদি ভবিষ্যতের অনিশ্চিত আর্থিক অবস্থার আশঙ্কা থাকে, তবে তাহার মন হইতে শান্তি লোপ পায়। এক ব্যক্তিকে যদি সকল সময়েই ভাবিতে হয় যে, তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার পরিজনবর্গের কি অবস্থা হইবে, অথবা তাহার বার্ধক্য বা রোগবশতঃ শারীরিক অক্ষমতা দেখা দিলে কি ঘটিবে, তবে ভবিষ্যতের চিন্তায় তাহার বর্তমানও অন্ধকার হইয়া যায়। দেশের লোকের মন হইতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই ধরনের চিন্তা দূর করা কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইহার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা আছে। সেখানে বার্ধক্য ভাতা, বেকার ভাতা, অনাথ ভাতা, বীমা, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা আছে। কোন ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হইয়া সম্বলহীন হইলে, শারীরিক অক্ষমতাবশতঃ অকর্মণ্য হইলে বা কর্মবিহীন অবস্থায় থাকিলে তাহাকে ভাতা দেওয়া হয়। ইনসিওরেন্স, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড প্রভৃতির সুযোগ যাহাতে লোকে পায়, সেই ব্যবস্থা করা হয়। দুর্ঘটনায় কাহারও উপার্জনের উপায় বন্ধ হইলে, তাহাকে এককালীন অর্থসাহায্য বা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়।

আমাদের রাষ্ট্রও কল্যাণ রাষ্ট্র। কাজেই আমাদের দেশের সরকারও ধীরে ধীরে এই সকল ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতেছে। ইহার ফলে ভবিষ্যৎ আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে লোকের মনে অনিশ্চয়তা কমিয়া আসিতেছে।

প্রশ্ন

১। জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি-বিধান করিতে সরকার কি কি কর্ম সম্পাদন করে? (পৃঃ ৮৮-৯২)

২। সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতে পারে? (পৃঃ ৯০-৯১)

৩। ভবিষ্যৎ আর্থিক অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরকার কিরূপ ব্যবস্থা করে? (পৃ ৯২)

৪। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে? (পৃঃ ৯১-৯২)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সরকার

(Government and Development Planning)

পরিকল্পনার প্রয়োজন (Necessity of Planning) :

অনগ্রসর বা স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হইতে হইলে তাহাদের উন্নয়নের কাজে দ্রুত অগ্রসর হইতে হয়। দেশের গতানুগতিক অবস্থার উপর নির্ভর করিলে দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অবনতিরও সম্ভাবনা থাকে। উৎপাদনকারীদের ইচ্ছামত উৎপাদন করিবার সুযোগ দিলে যে-সকল দ্রব্য উৎপাদনে অধিকতর লাভ সেই সকল দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদনকারীরা দেশের প্রয়োজনের কথা মনে রাখিবে না। দেশের ভবিষ্যতের কথা তাহাদের মনে স্থান পাইবে না। দেশে অর্থের বণ্টনও সুষম হইবে না। অল্প কয়েক জন লোকের হাতে বহু অর্থ চলিয়া যাইবে। অধিকসংখ্যক লোক দরিদ্রই থাকিবে। দেশের কৃষি সম্ভাবনাপূর্ণ হইলেও কৃষিসমূহ লাভজনক নহে বলিয়া অবহেলিত হইবে। ফলে খাদ্য বা বস্ত্রের উৎপাদন কম হইবে। উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে লোক-নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাবনার কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগ থাকিবে না। কাজেই কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের গতানুগতিক অবস্থার উপর নির্ভর করিলে অর্থনৈতিক অবনতির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

সকল উন্নতিকামী অনগ্রসর দেশ পরিকল্পনা রচনা করিয়া সেই অনুসারে অগ্রসর হইয়া নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধান করে। পরিকল্পনা রচনা করিবার পূর্বে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, তাহার উৎস, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি হইতে দেশের উৎপাদনের অবস্থা, তাহার প্রয়োজন এবং সকল দিক দিয়া দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনের একটা খতিয়ান তৈয়ারি করা হয়। তাহার পর দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, নূতন উৎসের সন্ধান, নানাবিধ উপায়ে উৎপাদনব্যবস্থার সুষম সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, আয়ের বণ্টন প্রভৃতির কথা মনে রাখিয়া রচনাকারীরা উন্নয়নের পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। কোন এক শিল্পের উন্নতি-বিধান করিতে গেলে দেখিতে হয় যেন অন্য কোন শিল্পের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নই পরিকল্পনা রচনাকারীদের মূল উদ্দেশ্য হইলেও দেশের

বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের কথা বা অভাবের কথা বিবেচনা করিয়া রচনাকারারা কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য নির্দেশ করেন। উন্নয়ন কার্যের নীতি এবং পদ্ধতি ঐসকল বিশেষ উদ্দেশ্য-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন—বেকার সমস্যার সমাধান যদি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় তবে নানাক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা করিতে হয় যাহাতে অধিক হইতে অধিকতর-সংখ্যক লোক নিয়োজিত হইতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। এই উদ্দেশ্যে সকল কাজই রাষ্ট্রকে করিতে হয়। অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধান-কল্পে পরিকল্পনা-রচনা সরকারের দায়িত্ব। ইহাকে কার্যে পরিণত করাও সরকারের কর্তব্য। দেশের সরকারই এখন তাহা করে। সরকারের দায়িত্ব হইলেও ইহাতে বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকাও আবশ্যক হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনা সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়। যে-সকল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত, তাহারা তাহাদের উন্নতি বা অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পরিকল্পনা রচনা করে। এই ধরনের পরিকল্পনাকে বলা হয় সংরক্ষণ পরিকল্পনা বা Maintenance Planning। কোন অনগ্রসর দেশ যখন নিজের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করে তখন সেই পরিকল্পনাকে বলা হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বা Development Planning। স্বভাবতঃই সংরক্ষণ পরিকল্পনা অপেক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা অধিকতর জটিল এবং ব্যয়সাধ্য।

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা (Development Planning in India) ঃ

ভারত স্বল্পোন্নত দেশ। ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় সামান্য। ভারতবাসীর জীবন-যাত্রার মান নিচু। এদেশে কৃষিই জনগণের জীবিকার প্রধান উপায়। অথচ কৃষির উৎপাদন অন্য উন্নত দেশের উৎপাদন অপেক্ষা অনেক কম। শিল্প তেমন প্রসার লাভ করে নাই। শিল্পজাত অনেক দ্রব্যের জন্যই বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতে অর্থের বণ্টন সুষম নহে। অল্প কয়েক জন লোক প্রভূত অর্থের অধিকারী। অধিকসংখ্যক লোকই দারিদ্র্য-কবলিত। বেকার সমস্যা এখানে অতি প্রবল। এই অনুন্নত অবস্থা হইতে মুক্তি পাইেত হইলে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন, পরিকল্পনার প্রয়োজন।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতও পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধানের জন্য আগ্রহশীল হইয়া উঠিল। তখন হইতেই পরিকল্পনার সূচনা হইল।

আমাদের ভারত অতি বিশাল দেশ। এখানে চুয়াল্লিশ কোটি লোকের বাস। অথচ এই দেশই অনুন্নত। এই অনুন্নত দেশকে উন্নত করার কাজ সত্যই খুব কঠিন।

এই দেশের উন্নতির জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করা হইবে, তাহাতে দরিদ্র জনসাধারণকে জীবনের নানা সুখ-সুবিধা ভোগ করার অধিকতর সুযোগ দিতে হইবে। এই সুযোগ দিতে হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। তাহাতে জাতীয় আয় বাড়িবে। জাতীয় আয় বাড়িলেই কিন্তু সকল লোকের সুযোগ-সুবিধা বাড়িবে না। এমন হইতে পারে যে, অল্প কয়েক জন লোকের আয় খুব বাড়িয়া গেল, আর বহুসংখ্যক লোকের আয় পূর্ববৎ থাকিয়া গেল বা আরও কমিয়া গেল। এই অবস্থায় জাতীয় আয় বাড়িল বটে, কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত হইতে অনেকেই মুক্তি পাইল না। সেইজন্য পরিকল্পনাকারীকে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে জাতির সম্পদ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পদ সুষমভাবে বণ্টন হয়। আমাদের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ বেকার। ইহাদের কর্মসংস্থান না করিলে দেশের দারিদ্র্য ঘুচিবে না। সেইজন্য ইহাদের কর্ম-সংস্থান দেশের পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। এই জনসংখ্যা-বৃদ্ধি একটা জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। মোটামুটি উৎপাদন-বৃদ্ধি, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং জনসংখ্যা-বৃদ্ধি-নিরোধ, জীবনের মান-উন্নয়ন এবং বেকার অবস্থা দূরীকরণ আমাদের মত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইবে। এই উন্নয়ন-কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। যানবাহন, রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতির উন্নতি-বিধান করিতে হইবে।

আমাদের দেশের সমস্যা অনেক। সকলগুলির একসঙ্গে সমাধান করা কঠিন কাজ। অথচ একটি সমস্যা অপর এক সমস্যার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত আছে যে, সকলগুলির একই সঙ্গে সমাধান না হইলে কোনটিরই সুষ্ঠু সমাধান হইবে না। যেমন ধরা যাউক, কৃষির উন্নতি-সাধন আমাদের দেশের অতি বড় একটি সমস্যা। এই কৃষির উন্নতি করিতে গেলে ভালভাবে চাষ করা প্রয়োজন, ভাল বীজ বপন করা প্রয়োজন। চাষের এবং বীজের সমস্যার সমাধান হইলেই, কৃষির সমস্যার সমাধান হইল না। ভাল জলসেচের ব্যবস্থা থাকা চাই। ভাল সার চাই। সার উৎপাদনের ব্যবস্থা চাই। কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য নূতন নূতন কারখানা স্থাপন করা চাই। যন্ত্রপাতি চলাচল করিবার জন্য, উৎপন্ন দ্রব্য আনা-নেওয়ার জন্য রাস্তাঘাট চাই। কাজেই কৃষির উন্নতি করিতে হইলে শিল্প, যানবাহন, রাস্তাঘাট, জলসেচ প্রভৃতির উন্নতি-বিধান করিতে হইবে। শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে সেইরূপ কাঁচা মাল প্রভৃতির জন্য কৃষির উন্নতি করিতে হইবে। যানবাহন, রাস্তাঘাট প্রভৃতির উন্নতি করিতে হইবে। কাজেই এই সকলের উন্নতি-বিধানের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (India's First Five Year Plan) :

স্বাধীন ভারতের সরকার ১৯৫০ সালে ভারতের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করিতে একটি কমিশন নিয়োগ করে। এই কমিশন বিশেষজ্ঞ লোকেদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল। যদিও এই কমিশনের রচিত পরিকল্পনা ১৯৫২ সালে পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করা হয়, তথাপি এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে। এই পরিকল্পনার কাল নির্ধারিত হয় ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল। ইহা একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা এবং এইটিই ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনা অনুসারে ভারতের উন্নয়ন কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রথম ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল মোট ২,০৬৯ কোটি টাকা। তাহার পর এই ব্যয়-বরাদ্দ একটু বাড়াইয়া ধরা হইয়াছিল মোট ২৩৫৬ কোটি টাকা। বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যের জন্য কিভাবে ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

	প্রাথমিক ব্যয়-বরাদ্দ	পরিবর্তিত ব্যয়-বরাদ্দ	মোট ব্যয়ের শতকরা ভাগ
কৃষি এবং সমাজ-কল্যাণকর কাজের জন্য	৩৬০·৪৩	৩৫৭·০০	১৫·১
জলসেচ এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য	৫৬১·৪১	৬৬১·০০	২৮·১
শিল্প এবং খনিজ পদার্থের জন্য	১৭৩·০০	১৭৯·০০	৭·৬
পরিবহণ প্রভৃতির জন্য	৪৯৭·১০	৫৫৭·০০	২৩·৬
সমাজ-সেবা প্রভৃতির জন্য	৩৩৯·৮১	৫৩৩·০০ (দুই সারি মিলিয়ে)	২২·৬
পুনর্বাসন	৮৫·০০		
অন্যান্য বাবদ	৫১·৯৯	৬৯·০০	৩·০০
	২০৬৮·৭৪	২৩৫৬·০০	১০০·০০

প্রাথমিক ব্যয়-বরাদ্দের টাকা নিম্নলিখিত রূপে পাওয়া যাইবে, আশা করা হইয়াছিল। সরকারের উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে ৭৩৮ কোটি, জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ, আমানত জমা প্রভৃতি বাবদ ৫২০ কোটি, বিদেশ হইতে ঋণ, নূতন কর এবং অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া অবশিষ্ট অংশ।

পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছিল। মোট ব্যয়ের পনের শতাংশ বরাদ্দ করা হইয়াছিল কৃষির

জন্য। তাহা ছাড়া, জলসেচ এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল মোট ব্যয়ের আটাশ শতাংশ। জলসেচ মুখ্যতঃ কৃষিরই সহায়ক। যে দেশের লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সেই দেশে কৃষির উপর জোর দেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নহে। তাহা ছাড়া, শিল্পায়নের জন্যও কৃষির উন্নতি-বিধান করা প্রয়োজন। শিল্পের জন্য প্রচুর কাঁচা মালের প্রয়োজন। সেই কাঁচা মাল আসে কৃষি হইতে।

প্রাথমিকভাবে যে ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল, পরে তাহা পরিবর্তিত করা হইয়াছিল। চূড়ান্তভাবে যে পরিমাণ ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তদপেক্ষা কিছু কম টাকা প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয় হইয়াছিল। নিম্নে সে ব্যয়ের পরিমাণ দেওয়া হইল :—

কৃষি ও সমাজ-কল্যাণকর কাজের জন্য	২৯১ কোটি টাকা
জলসেচ ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য	৫৭০ ” ”
শিল্প ও খনিজ পদার্থের জন্য	১১৭ ” ”
পরিবহণ প্রভৃতির জন্য	৫২৩ ” ”
সমাজ-সেবা ও বিবিধ	৪৫৯ ” ”
মোট	১৯৬০ কোটি টাকা

প্রথম পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হইলে কয়েকটি ক্ষেত্রে কিরূপ ফল পাওয়া যাইবে আশা করা গিয়াছিল এবং কিরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা নিম্নে দেখানো হইল।

	আশা করা হইয়াছিল	বৃদ্ধি পাইয়াছে
জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে	১২ শতাংশ	১৮ শতা
প্রত্যেক ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি পাইবে	১১ ”	১১ ”
খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে	১৪ ”	২০ ”
তূলার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে	৪১ ”	৪৪ ”
পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে	৬৩ ”	২১ ”
চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে	১২ ”	৫৫ ”
লৌহ এবং ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িবে	৩৯ ”	১৮ ”
সিমেণ্টের উৎপাদন বাড়িবে	৭৮ ”	৭০ ”
কলের কাপড়ের উৎপাদন বাড়িবে	২৬ }	৪৮ ”
তাঁতের কাপড়েব উৎপাদন বাড়িবে	১০০ }	

ইহা ছাড়া প্রথম পরিকল্পনার শেষে দেশে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন প্রায় ৪৯ শতাংশ বাড়িয়াছে। রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতিও আশানুরূপ বাড়িয়াছে। এই

পরিকল্পনার ফলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান হইয়াছে। সকল দিক বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মোটামুটি সফল হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হইয়াছে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Second Five Year Plan) :

দেশকে সম্যকরূপে উন্নত করিতে হইলে, পর পর কয়েকটি পরিকল্পনারই প্রয়োজন। পাঁচসালা একটি পরিকল্পনার পক্ষে ইহা মোটেই সম্ভব নহে। পরিকল্পনা-প্রণয়নকারীরা সে-কথা স্মরণ রাখিয়াই কাজে অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ যখন শেষ হইবার মুখে, তখন দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনা আরম্ভ হইল। প্রথম পরিকল্পনার কার্যে লব্ধ অভিজ্ঞতা-রচনাকারীদের কাজে লাগিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of the Second Five Year Plan) :

নিম্নলিখিতগুলি দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল :—

১। জাতির মোট আয় আরও চারি ভাগের এক ভাগ বাড়াইতে হইবে।

২। দেশের প্রয়োজনীয় সকল প্রকারের শিল্প যত শীঘ্র সম্ভব গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩। দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

৪। দেশে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান যতখানি সম্ভব দূর করিতে হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। তখন ইহা প্রয়োজনীয় ছিল। দেশে খাদ্যের অভাব ছিল খুব বেশী। বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য আমদানি করিতে হইত। তাহা ছাড়া শিল্পের উন্নতির জন্যও কৃষির উন্নতির প্রয়োজন। প্রথম পরিকল্পনার পরে দেখা গেল যে, দেশে কৃষির মোটামুটি উন্নতি-সাধন হইয়াছে। সেইজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উন্নতির উপর জোর দেওয়া হইল।

দেশে বেকার সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। দেশের আয় বাড়িলে যাহাতে সেই আয় অল্প কয়েক জন ধনী ব্যক্তির হস্তগত না হয়, সেইজন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই পরিকল্পনার কার্যকাল বলিয়া ধরা হইল।

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছিল যে, পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার জন্য সরকার মোট ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করিবে এবং বেসরকারী তহবিল হইতে ব্যয় হইবে মোট ২৪০০ কোটি টাকা। পরে আর্থিক অনটনবশতঃ সরকারী ব্যয়ের

বরাদ্দ একটু সঙ্কুচিত করিয়া ৪,৫০০ কোটি টাকায় আনা হয়। নিম্নলিখিত বিভিন্ন কাজে বরাদ্দের হিসাব দেওয়া হইল :—

সরকারী ব্যয়-বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

বিভিন্ন ক্ষেত্র	মূল ব্যয়-বরাদ্দ	শতকরা ব্যয়	পরিবর্তিত ব্যয়-বরাদ্দ	শতকরা ব্যয়
কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮	১২%	৫১০	১১·৩%
সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৯১৩	১৯%	৮২০	১৮·২%
শিল্প ও খনি	৮৯০	১৮%	৯৫০	২১·১০%
পরিবহণ প্রভৃতি	১,৩৮৫	২৯%	১,৩৪০	২৯·৮%
সমাজ-কল্যাণ	৯৪৫	২০%	৮১০	১৮%
বিবিধ	৯৯	২%	৭০	১·৬%
	৪,৮০০	১০০%	৪,৫০০	১০০%

বেসরকারী ব্যয়-বরাদ্দের ক্ষেত্র (কোটি টাকায়)

বিভিন্ন ক্ষেত্র	অনুমিত মোট ব্যয়
সুগঠিত শিল্প ও খনি	৫৭৫
পরিবহণ ও বৈদ্যুতিক শিল্প প্রভৃতি	১২৫
নির্মাণকার্য	১,০০০
কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩০০
অন্যান্য	৪০০
	২,৪০০

পরিকল্পনা রচনার সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত রূপ ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল :—

জাতীয় আয় বাড়িবে	২৫ শতাংশ	
প্রত্যেক ব্যক্তির গড়পড়তা আয় বাড়িবে	১৮ ”	
প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যয়-ক্ষমতা বাড়িবে	২১ ”	
কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িবে	১৮ ”	(পরিবর্তিত ৩০ শতাংশ)
খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িবে	১৫ ”	(পরিবর্তিত ২৫ ”)
তুলার উৎপাদন বাড়িবে	৩১ ”	
পাটের উৎপাদন বাড়িবে	২৫ ”	
চায়ের উৎপাদন বাড়িবে	৯ ”	
জলসেচের সুবিধা বাড়িবে	৩১ ”	
লৌহজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িবে	২৩১ ”	
সিমেণ্টের উৎপাদন বাড়িবে	২০২ ”	
নূতন কর্মের সংস্থান হইবে	৮০ লক্ষ ব্যক্তির	

ইহা ছাড়া, পাঠশালায় পড়িবার মত বয়সের যত ছেলেমেয়ে আছে তাহার মোট তিন ভাগের দুই ভাগ ছেলেমেয়ে পড়িবার সুযোগ পাইবে। এগার বৎসর বয়স হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত যত ছেলেমেয়ে এখন বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পায়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ঐ বয়সের আরও শতকরা ৫০ জন বেশী ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার মত প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালে রোগী রাখিবার ব্যবস্থা বাড়িবে আরও ২৫ শতাংশ।

সরকারী ব্যয়ের জন্য অর্থ-সংগ্রহের উপায় (Sources of Finance) ঃ

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য সরকার মোট ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। এই টাকা নিম্নলিখিত উপায়ে সংগ্রহ করা করিবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল :—

সরকারের রাজস্ব হইতে নিয়মিত ব্যয় মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকিবে	৮০০	কোটি	টাকা
জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ	১,২০০	,,	,,
রেলওয়ের উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে	১৫০	,,	,,
প্রভিডেণ্ট ফণ্ড প্রভৃতিতে যে টাকা জমা আছে তাহা হইতে	২৫০	,,	,,
বিদেশ হইতে ঋণ	৮০০	,,	,,
নূতন কর হইতে এবং সরকার-পরিচালিত শিল্পের লভ্যাংশ হইতে	৪০০	,,	,,
নূতন নোট ছাপাইয়া	১,২০০	,,	,,
	৪,৮০০	কোটি	টাকা

বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, আমাদের দেশে এখনও নূতন কর বসাইবার উপায় আছে। কাজেই মনে করা হইয়াছিল যে নূতন কর বসাইয়া সরকার কিছু আয় করিবে। তাহা ছাড়া কিছু-সংখ্যক লোক নানা উপায়ে কর ফাঁকি দেয়। এই ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করিতে পারিলেও, সরকারের আয় বৃদ্ধি হইবে এরূপ আশা করা হইয়াছিল।

নূতন নোট ছাপাইয়া এক হাজার দুই শত কোটি টাকা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ছিল। নূতন নোট ছাপাইলে দেশে মোট টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। মোট টাকার পরিমাণ বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ না বাড়ে তবে দ্রব্যমূল্য বাড়ে। পরিকল্পনার কাজ চলিলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও বাড়ে। হয়ত সমান হারে বাড়ে না, কাজেই দ্রব্যমূল্য বাড়ে। কার্যত দেখা গেল দ্রব্যমূল্য বাড়িয়াছে।

শিল্প-সম্প্রসারণের কাজ (Development of Industries) ঃ

শিল্পের ক্ষেত্রে দেশকে দ্রুত উন্নত করা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। ঐ পরিকল্পনায় যে শিল্প সম্প্রসারণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল তাহা ব্যয়-বরাদ্দ হইতেই বুঝা যায়। আমাদের কলকব্জা প্রভৃতি নানা শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাহাতে দেশে প্রস্তুত হইতে পারে, সেদিকে পূর্বাহ্লেই লক্ষ্য রাখা উচিত।

আমাদের শিল্পকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা চলে। কতগুলি শিল্প আছে যেগুলি অন্য শিল্পপ্রসারের জন্য প্রয়োজনীয়। যেমন—কলকব্জা-নির্মাণ শিল্প। এই শিল্পে উৎপন্ন কলকব্জার প্রয়োজন হয় অন্য শিল্পের উৎপাদনের কাজের জন্য। আবার লৌহশিল্পের কথা ধরা যাউক। এই শিল্প লৌহ উৎপাদন করে। এই উৎপন্ন লৌহ অন্য শিল্পের কাজে লাগে। কোন দেশ যদি শিল্প গড়িয়া তুলিতে চায়, তবে সেই দেশকে এই ধরনের মূল শিল্প আগে গড়িয়া তুলিতে হয়। এইগুলি অন্য শিল্পের ভিত্তি। আমাদের দেশেও এই ধরনের শিল্পই প্রথম গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিছু কিছু এই ধরনের শিল্প বেসরকারী উদ্যোগে পূর্বেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থির হইল যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ সুরু হওয়ার পর এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠা সরকারী উদ্যোগেই সম্পন্ন হইবে।

আর এক প্রকারের শিল্প আছে যাহার উৎপন্ন দ্রব্য দেশরক্ষার কাজে প্রয়োজনীয়। স্থির হইল এই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি নির্মাণ শিল্প সম্পূর্ণরূপে সরকার স্থাপন এবং পরিচালনা করিবে। কারণ এইগুলি বেসরকারী পরিচালনার উপর ছাড়িয়া দিলে দেশরক্ষার কাজে বিপদের আশঙ্কা আছে।

অন্যান্য প্রায় সকল শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য সরাসরি মানুষের ভোগের কাজে লাগে। যেমন—বস্ত্রশিল্প। স্থির হইল, এই সকল শিল্প স্থাপন বা পরিচালনার ভার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকিতে পারে। তবে প্রয়োজনবোধে সরকার এইগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, এমন কি পরিচালন-ভারও সরকার নিজে গ্রহণ করিতে পারে।

কুটিরশিল্প আমাদের দেশের শিল্পের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কাপড়, রেশম বস্ত্র, মাটির পাত্র, কাঁসা-পিত্তলের বাসন, খেলনা, বাঁশ-বেতের দ্রব্যাদি নির্মাণের জন্য আমাদের দেশে অনেক কুটিরশিল্প আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইগুলি বাঁচাইয়া রাখার এবং বিশেষভাবে উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইল। এই উদ্দেশ্যে দুই শত কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ করা হইল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে স্থাপিত কয়েকটি শিল্প :

দ্বিতীয় যোজনাকালে আমাদের দেশে কয়েকটি বড় অথচ অতি-প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপন করা হইয়াছে। বিহার রাজ্যের সিন্দ্রিতে কৃষির সার তৈয়ারির জন্য একটি বড় কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। এই কারখানায় প্রতিদিন এক হাজার টনের উপর সার তৈয়ারি হয়।

পশ্চিম বঙ্গে মিহিজাম স্টেশনের নিকটে প্রায় পনের কোটি টাকা ব্যয়ে একটি রেল ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। এই কারখানায় দ্বিতীয় যোজনা-কালেই প্রায় পাঁচ-শতাধিক রেল ইঞ্জিন তৈয়ারি হইয়াছে।

মাদ্রাজ শহরের নিকটে পেরাম্বুরে রেলগাড়ির মাল এবং যাত্রিবাহী কামরা তৈয়ারি করার জন্য কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হইলে এই কারখানায় বৎসরে সাড়ে তিন শত মাল এবং যাত্রিবাহী রেলগাড়ির কামরা নির্মাণ করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল।

পশ্চিম বঙ্গের রূপনারায়ণপুরে টেলিফোনের তার তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। এই কারখানায় বৎসরে ছয়-সাত শত মাইল লম্বা টেলিফোনের তার তৈয়ারি হইতেছে। বাঙ্গালোর শহরের নিকটে কৃষ্ণরাজপুরমে টেলিফোনের যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য একটি কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে।

মাদ্রাজের ভিজাগপট্টম্ বন্দরে একটি জাহাজ-নির্মাণের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজের শেষে এই কারখানায় বৎসরে চারিটি জাহাজ নির্মাণ করা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল।

বাঙ্গালোর শহরের নিকটে একটি বিমান তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। এখানে এখন ছোট ছোট বিমান এবং রেলগাড়ির যাত্রিবাহী কামরা তৈয়ারি হয়। বাঙ্গালোরের নিকটে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয়ে কল-কারখানার দরকারী যন্ত্রপাতি তৈয়ারির জন্য আর একটি কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনের নিকটে বিভিন্ন কারখানা, বিমানপোত প্রভৃতির জন্য সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। এই কারখানায় এখন চশমার কাচ তৈয়ারির ব্যবস্থাও হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের পুণা শহরের নিকট প্রেগনীতে পেনিসিলিন তৈয়ারির কারখানা স্থাপন

করা হইয়াছে। এই কারখানায় প্রতি বৎসর প্রায় নব্বই কোটি ইউনিট্ পেনিসিলিন তৈয়ারি হয়। ইহা ছাড়া এই কারখানায় অন্যান্য ঔষধও তৈয়ারি হয়।

দিল্লীতে একটি ডি. ডি. টি.-র কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। এই কারখানায় প্রতি বৎসর প্রায় চৌদ্দ হাজার টন ডি. ডি. টি. প্রস্তুত হইবে।

মধ্যপ্রদেশে খবরের কাগজের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। এখন এই কারখানায় প্রতি বৎসর দশ হাজার টনের মত কাগজ উৎপন্ন হইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই কারখানায় প্রতি বৎসর ষাট হাজার টনের মত কাগজ তৈয়ারি হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল।

পশ্চিম বঙ্গের দুর্গাপুরে, মধ্যপ্রদেশের ভিলাইয়ে এবং উড়িষ্যার রাউরকেল্লায় তিনটি লৌহ এবং ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে।

পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শেষ হইলে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে দেশের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল শিল্পই দেশে গড়িয়া উঠিবে এইরূপ ভরসা করা হইয়াছিল।

বেকার সমস্যা :

আমাদের দেশের বেকার সমস্যার সমাধান পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। বেকার বিভিন্ন প্রকারের আছে। কিছু-সংখ্যক লোক আছে যাহারা কোন বিশেষ বিশেষ শিল্পের কাজে নিপুণ। অথচ এই সকল লোককে শিল্পে নিয়োগ করার সুযোগ আর নাই। আবার কিছু-সংখ্যক লোক আছে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে; অথচ এই ধরনের লেখাপড়া-জানা লোকের নিয়োগের আর কোন ক্ষেত্র নাই। এক ধরনের লোক আছে যাহাদের দৈহিক ক্ষমতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের বিশেষ কোন যোগ্যতা নাই। অথচ মাত্র দৈহিক শক্তির নিয়োগের কোন অবকাশ নাই। এই কয়েক শ্রেণী ছাড়া আমাদের দেশের কৃষকরাও অর্ধ-বেকার। কারণ বৎসরে মাত্র কয়েক মাস তাহাদিগকে চাষের কাজ করিতে হয়। অবশিষ্ট সময় তাহারা বেকার অবস্থায় থাকে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক পূর্ণ বেকার ছিল। প্রতি বৎসর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অনুমান করা হইল, দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে যদি দেড় কোটি লোকের কর্মসংস্থান হয়, তবে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে নিম্নলিখিতরূপ কর্ম-সংস্থান হইবে বলিয়া আশা করা হইল :—

গৃহ, রাস্তা, পুল প্রভৃতি নির্মাণ-কার্যে আরও		২১,০০,০০০
জলসেচ ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কার্যে	”	৫১,০০০
রেলে	”	২,৫৩,০০০
যানবাহনে	”	১,৮০,০০০
শিল্প এবং খনিতে	”	৭,৫০,০০০
কুটিরশিল্পে	”	৪,৫০,০০০
শিক্ষার কার্যে	”	৩,১০,০০০
বন, মৎস্য চাষ প্রভৃতিতে	”	৪,১৩,০০০
স্বাস্থ্য-বিভাগে	”	১,১৬,০০০
সেবামূলক কার্যে	”	১,৪২,০০০
সরকারী কার্যে	”	৪,৩৪,০০০
বাণিজ্য প্রভৃতিতে	”	২৭,০৪,০০০
		৭৯,০৩,০০০

অর্থাৎ প্রায় আশি লক্ষ।

ইহা ছাড়া, নূতন জমি আবাদ, সেচের সুবিধা এবং বন-সৃষ্টির ফলে প্রায় ১৬ লক্ষ ব্যক্তির কর্ম-সংস্থান হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। অনেক কৃষক কুটিরশিল্প প্রভৃতি পরিচালনা করিয়া অর্ধ-বেকারত্ব ঘুচাইতে পারিবে। তথাপি মোটামুটি এক কোটির বেশী লোকের কর্ম-সংস্থান হইবার সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না। পরিকল্পনার শেষে দেখা গেল মোট ৮০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হইয়াছে। কাজেই দেশের বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান হইল না।

সম্পদের সুষম বণ্টন :

প্রায় সকল দেশেই দেশের অধিক পরিমাণ সম্পদ্ অল্প কয়েক ব্যক্তির হাতে আছে। বেশী-সংখ্যক লোকেরই অবস্থা খুব মন্দ। দেশের সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। তখন দেখা যায়, অল্প কয়েক জন কোটিপতি, অবশিষ্ট সকলেই দারিদ্র্য-কবলিত। এই অবস্থার নিরসন বা প্রতিরোধ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার আর একটি উদ্দেশ্য। নানা উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যে-সকল লাভজনক নূতন শিল্প স্থাপন করা হইবে, সেগুলি যদি ধনী ব্যক্তিদের হাতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা আরও ধনী হইবার সুযোগ পাইবে। দরিদ্রগণ দরিদ্র থাকিয়াই যাইবে। ব্যবধান আরও বাড়িবে। সেইজন্য ব্যবস্থা করা হইল, এই ধরনের মূল শিল্প সরকার স্থাপন এবং পরিচালনা করিবে। এই শিল্পের

লভ্যাংশ সরকারের মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধারূপে বণ্টন করা হইবে। দেশের সাধারণ লোকেরা মিলিত হইয়া সমবায় সমিতি গঠন করিলে, এই সমবায় সমিতির হাতেও নূতন লাভজনক শিল্প স্থাপন এবং পরিচালনের ভার দেওয়া হইবে। এইরূপ হইলে লাভের অংশ অল্প কয়েক জনের হাতে না গিয়া অনেকের হাতে যাইবে।

স্থির করা হইল, কর-ব্যবস্থা এবং সরকারী সাহায্য-ব্যবস্থা দ্বারাও ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কিছুটা লাঘব করা হইবে। ধনী ব্যক্তিদের উপর সম্ভাব্য নূতন কর বসাইয়া সেই করের আয়ের অর্থ দরিদ্রদের কল্যাণে ব্যয় করা হইবে। করের হারও একই উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

এই সঙ্গে আরও একটি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক তারতম্য নিরসনের জন্য অনুন্নত অঞ্চলে নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

জাতীয় আয়-বৃদ্ধি :

জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা পরিকল্পনার বিশেষ উদ্দেশ্য। প্রথম পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবার পূর্বে জাতীয় আয় ছিল ১০২৪০ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনার কাজ শেষ হইবার পর এই জাতীয় আয় হইল মোট ১২১৩০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আশা করা হইয়াছিল এই জাতীয় আয় হইবে ১৩৪৮০ টাকা। পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় কার্যত হইল বার্ষিক ১৪৫০০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু আয় হইল ৩৩০৲ টাকা। জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িবে আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু বাড়িল ২০ ভাগ। জাতীয় আয় যদি এই হারে বাড়ানো যায়, তবে মোট ২১ বৎসরে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি লক্ষণীয় ত্রুটি :

ব্যয়-বরাদ্দের দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল খুব বেশী। প্রথম পরিকল্পনার শেষে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পরিকল্পনা কমিশন মনে করিল যে অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। কাজেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির ব্যয়-বরাদ্দ হইল প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দের দ্বিগুণের কম। অথচ শিল্পোন্নয়নের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ হইল প্রথম পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দের পাঁচগুণেরও বেশী। শিল্পসম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু ভারতের মত প্রধানতঃ কৃষি-নির্ভর দেশে কৃষির উন্নয়ন, বিশেষতঃ খাদ্য শস্যের উৎপাদন

বৃদ্ধির কথা উপেক্ষা করা মোটেই সমীচীন নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত কাল পরেই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দ্রুত বাড়িতে লাগিল। তখন পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যকে শতকরা ১৫ ভাগ হইতে ২৫ ভাগ নির্দিষ্ট করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যে-পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল, প্রথম হইতেই দেখা গেল যে, সে-পরিমাণ অর্থ, বিশেষতঃ বিদেশ হইতে, সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না। কাজেই পরিকল্পনার কার্য চলার সময়ই ছাঁটকাট করিয়া ইহার আয়তন কমাইতে হইয়াছিল। প্রথম ব্যয়-বরাদ্দ অনুসারে সরকারী উদ্যোগে মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবার কথা ছিল। প্রকৃত পক্ষে ঐ বাবদে ব্যয় হইয়াছিল ৪৬০০ কোটি টাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রকৃত ব্যয় নিম্নে বর্ণনারূপ দেখান হইল।

	উন্নয়ন ক্ষেত্র	প্রথম পরিকল্পনার মোট ব্যয়	দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয়
১।	কৃষিও সমাজোন্নয়ন	২৯১,০০,০০,০০০	৫৩০,০০,০০,০০০
২।	সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৫৭০,০০,০০,০০০	৮৬৫,০০,০০,০০০
৩।	গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	৪৩,০০,০০,০০০	১৭৫,০০,০০,০০০
৪।	বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ	৭৪,০০,০০,০০০	৯০০,০০,০০,০০০
৫।	পরিবহণ ও সংসরণ	৫২৩,০০,০০,০০০	৫২৩০০,০০,০০,০০০
৬।	সমাজসেবা ও অন্যান্য	৪৫৯,০০,০০,০০০	৮৩০,০০,০০,০০০
		১৯৬০,০০,০০,০০০	৪৬০০,০০,০০,০০০

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগে ব্যয় হইবার কথা ছিল ২৪০০ কোটি টাকা। প্রকৃতপক্ষে বেসরকারী উদ্যোগে ব্যয় হইয়াছিল ৩৩০০ কোটি টাকা। পরবর্তী পরিকল্পনা রচনার কালে এই বিষয়টি লক্ষ করা প্রয়োজনীয়। বেসরকারী উদ্যোগে অধিকতর ব্যয়-বরাদ্দ করা নানা দিক হইতে সুবিধাজনক হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে মোট ব্যয়-বরাদ্দের এক-চতুর্থাংশ অর্থ ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হইবে স্থির ছিল। ইহাতে মূল্যবৃদ্ধি স্বাভাবিক। সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য কোন প্রকারের ব্যবস্থা করা হয় নাই। ভোগ্য পণ্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইলে মূল্য-বৃদ্ধি রোধ করার সম্ভাবনা ছিল। এই ধরনের ব্যবস্থা না থাকার ফলে প্রথমতঃ খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইল। তারপর সাধারণ মূল্য বৃদ্ধি হইল। ইহার ফলে পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যয়ও বাড়িয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কয়েকটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হয় নাই।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল ৮.৫ কোটি টন। কার্যতঃ দেখা গেল উৎপন্ন হইল ৭.৬ টন। ইস্পাত পিণ্ডের ক্ষেত্রে অনুমান করা হইয়াছিল ৪৫ লক্ষ টন। প্রকৃতপক্ষে মোট উৎপাদন হইয়াছিল ৩৫ লক্ষ টন। কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ছয় কোটি টন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই উৎপাদন দাঁড়ায় ৫.৪৬ কোটি টন।

এই সকল ছোটখাট ত্রুটির ফলে পরিকল্পনার কাজ কিছুটা ব্যাহত হইয়াছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক অসাফল্য দেখা গিয়াছিল। তবে নানা ক্ষেত্রে মোটামুটি যে অগ্রসরণ হইয়াছিল তাহা সত্যই প্রশংসার বিষয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা :

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ চলার মধ্যদিকে তৃতীয় পরিকল্পনা রচনার কাজ আরম্ভ হয়। চূড়ান্তভাবে এই পরিকল্পনা গৃহীত এবং প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :—

(১) এমন ব্যবস্থা হইবে যাহার ফলে প্রতি বৎসর পাঁচ শতাংশ করিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী পরিকল্পনার কালেও যেন এই বৃদ্ধির হার অটুট থাকে সেই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হইবে।

(২) খাদ্য শস্যের জন্য যেন অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে না হয় সে ব্যবস্থা করা হইবে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন এমন ভাবে বাড়াইতে হইবে যাহার ফলে দেশের শ্রমশিল্পের এবং রপ্তানির প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটে।

(৩) ইস্পাত, রসায়ন ও শিল্পজ্বালানি, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন প্রভৃতি সকল মৌল শিল্প সম্প্রসারিত এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইবে, যাহার ফলে অনূর্ধ্ব দশ বৎসরের মধ্যেই দেশজ উপকরণ এবং উপাদানের সাহায্যে বৃহত্তর রকমের শিল্পায়ন সম্ভব হয়।

(৪) দেশের গণশক্তিকে সর্বাধিক পরিমাণে কাজে লাগানো হইবে এবং যথেষ্ট-পরিমাণ কর্মসৃষ্টির ব্যবস্থা হইবে।

(৫) অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা সাধিত হইবে। ব্যক্তিগত আয় এবং সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করিয়া অর্থনৈতিক শক্তির সুসমঞ্জস বণ্টন সাধন করা হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনা রচনাকারীরা উপরের এই কয়েকটি উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় কৃষি-সংক্রান্ত ব্যবস্থা আরও দৃঢ় হইবে, বিদ্যুৎশক্তি এবং যানবাহন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা উন্নত করা হইবে। শিল্পোন্নয়নের গতি

ত্বরান্বিত করা হইবে এবং কর্মসংস্থানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যেমন শিল্পের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল, তৃতীয় পরিকল্পনায় তেমন কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। একদিকে যেমন ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ শিল্পের সংহতি সাধন করার চেষ্টা হইয়াছে, অপরদিকে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগেরও সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ছোট শহরে বা পল্লী অঞ্চলেও শিল্পস্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্রব্যমূল্য আয়ত্তে রাখার এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার নির্দেশ এই পরিকল্পনায় রহিয়াছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতি যতদূর অগ্রসর হইয়াছে আশা করা হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতি অন্ততঃ ততদূর অগ্রসর হইবে।

পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে:

উন্নয়ন ক্ষেত্র	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	শতকরা হার
(ক) সরকারী ক্ষেত্রে		
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	১০৬৮	১৪
বড় ও মাঝারি সেচ কার্য	৬৫০	৯
বিদ্যুৎশক্তি	১০১২	১৩
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র-শিল্পসমূহ	২৬৪	৪
সংগঠিত শিল্প ও খনিজ দ্রব্য	১৫২০	২০
পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৪৮৬	২০
সমাজসেবামূলক ও বিবিধ	১৩০০	১৭
অন্যান্য	২০০	৩
মোট	৭৫০০ কোটি টাকা	১০০

(খ) বেসরকারী ক্ষেত্রে	
কৃষি ও সেচ	৮৫০
বৈদ্যুতিক শক্তি	৫০
পরিবহণ	২৫০
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র-শিল্প	৩২৫
বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ	১১০০
গৃহনির্মাণ ইত্যাদি	১১২৫
অন্যান্য	৬০০
মোট	৪৩০০ কোটি টাকা

তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য সরকার নিম্নপ্রকারে ৭৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবে আশা করিয়াছে :—

চলতি রাজস্বের উদ্বৃত্ত	৫৫০ কোটি টাকা
রেল হইতে প্রাপ্য	১০০ "
সরকারী ব্যবসায় হইতে লভ্যাংশ	৪৫০ "
সরকারী ঋণ	৮০০ "
ক্ষুদ্র সঞ্চয়	৬০০ "
অন্যান্যভাবে	৫৪০ "
অতিরিক্ত কর প্রভৃতি	১৭০০ "
বৈদেশিক সাহায্য	২২০০ "
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ধার	৫৬০ "
	মোট—৭৫০০ কোটি টাকা

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য (Target) :

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্য যথাযথ সম্পন্ন হইলে আশা করা যায় জাতীয় আয় মোট ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কৃষি এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ২৫ শতাংশ। খনি এবং কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ৮২ শতাংশ, অন্যান্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ৬২ শতাংশ। খাদ্যশস্য বৃদ্ধি পাইবে ৩ কোটি টন। সাত কোটি একর জমিতে সেচের সুবিধা বিদ্যমান ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সেচের সুযোগ পাইবে নয় কোটি একর জমি। কর্মসংস্থান হইবে এক লক্ষ চল্লিশ কোটি লোকের।

তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। প্রথম দুই বৎসরে মোট ২৫৯২ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। তৃতীয় বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ১৬৫৩ কোটি টাকা। ইস্পাত সিমেণ্ট প্রভৃতির উৎপাদন আশানুরূপ বাড়িতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি লক্ষণীয়। বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদনও বাড়িয়াছে। কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ বাড়ে নাই। মূল্য নিয়ন্ত্রণও সম্ভব হয় নাই। পরিকল্পনার কাল শেষ হইলে সঠিক নির্ণয় করা যাইবে।

ইহার মধ্যে চতুর্থ পরিকল্পনার কাঠামো তৈয়ারি হইয়াছে। ঠিক হইয়াছে ২১৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইবে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে। সম্ভব হইলে এই বরাদ্দ আরও এক হাজার টাকা বাড়ান হইবে। এই পরিকল্পনার জন্য মোটামুটি

স্থির হইয়াছে যে প্রয়োজনীয় অর্থ এই যোজনায় ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয়ে অর্থাৎ নোট ছাপাইয়া মিটান হইবে না। পূর্বেকার যোজনাগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয়ের অধিক অংশ বহন করিয়াছিল। এই যোজনায় রাজ্য সরকারকে অধিক অংশ বহন করিতে হইবে। এই যোজনায় শিক্ষা, কৃষি এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য অধিকতর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হইবে। এই সময় ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনও বাড়ান হইবে। আশা করা যায় চতুর্থ যোজনার কালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৎসরে ৬·৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ৫·৭ শতাংশ।

প্রশ্ন

১। আর্থিক উন্নয়নে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। (পৃ: ৯৫-৯৬)

২। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং লব্ধ ফলাফলের আলোচনা কর। (পৃ: ৯৮-১০৯)

৩। তৃতীয় পরিকল্পনার কাঠামো বর্ণনা কর। (পৃ: ১০৯-১১১)

৪। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ কর। (পৃ: ১০০-১০৭)

চতুর্দশ অধ্যায়

সরকারের আয়-ব্যয়

(Public Income and Expenditure)

সরকারী আয়-ব্যয় ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় (Public and Private Income and Expenditure) :

প্রত্যেক দেশের সরকারকেই নানা কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। যে সরকার যত বেশী কল্যাণকামী, সেই সরকারকে তত বেশী কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করা, আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করার ব্যবস্থা প্রত্যেক সরকারের অবশ্য কর্তব্য। তাহা ছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ-ব্যবস্থাও সকল কল্যাণকামী সরকারই করিয়া থাকে। অনেক সরকার শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনের ব্যবস্থাও করে। কোন ব্যক্তিবিশেষের যেমন নানা কার্য সম্পাদন করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, সরকারকেও বহুবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের সঙ্গে সরকারী আয়-ব্যয়ের পার্থক্য আছে। ব্যক্তিবিশেষ নিজের আয় অনুসারে ব্যয়ের ব্যবস্থা করে। আয় বৃদ্ধি করা তাহার ইচ্ছাসাধ্য নহে। যখন সে দেখে যে, আয় অপেক্ষা ব্যয়ের সম্ভাবনা বেশী, তখন সে ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করে। তাহাকে আয়ের কথা আগে ভাবিয়া পরে ব্যয়ের বরাদ্দ করিতে হয়। কিন্তু সরকারী আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে ইহা অন্যরূপ। সরকার ব্যয় অনুসারে আয় নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে। কি কি খাতে কত টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন, পূর্বে তাহা নির্দিষ্ট হয়। তাহাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সে পরিমাণ অর্থ সরকার সংগ্রহ করিবার উপায় নির্ধারণ করে। যদি দেখা যায়, পূর্ব-নির্দিষ্ট আয়ের পন্থা হইতে ব্যয় মিটানো সম্ভব নহে, তখন নূতন কর স্থাপন করে। ব্যক্তিবিশেষ এইরূপ ব্যয়ের প্রয়োজনে আয় বাড়াইতে পারে না। সরকারী আয়-ব্যয়-নীতি এবং ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়-নীতির মধ্যে আর একটি পার্থক্য আছে। ব্যক্তিবিশেষ যদি চেষ্টা করিয়া ব্যয়কে আয় অনুসারে কমাইতে না পারে, তবে ধার করে। সরকারও প্রয়োজনবোধে দেশবাসীর নিকট হইতে বা বিদেশ হইতে এইরূপ ক্ষেত্রে ধার করে। ইচ্ছা করিলে সরকার অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা ছাপাইয়া নিজ ব্যয় মিটায়। এই কাগজী মুদ্রা বাজারে প্রচলিত পূর্ব মুদ্রার মত কার্যকরী হয়। ব্যক্তিবিশেষ কিন্তু এই প্রকারে নিজ ব্যয় মিটাইতে পারে না।

সরকারের আয়ের উপায় (Sources of Public Income) :

সরকারের আয়ের বিভিন্ন উপায় আছে। অবশ্য সবগুলি হইতে সমান আয় হয় না। নিম্নে বিভিন্ন আয়ের উপায়ের আলোচনা করা হইতেছে :

(ক) ব্যক্তিবিশেষের যেমন নিজস্ব সম্পত্তি থাকিতে পারে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরও সেইরূপ নিজস্ব সম্পত্তি থাকে। বন আমাদের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের এইরূপ বিশিষ্ট নিজস্ব সম্পত্তি। বনে উৎপন্ন বৃক্ষাদি হইতে সরকারের প্রচুর অর্থ আয় হয়। প্রত্যেক সরকারেরই এইরূপ নিজস্ব সম্পত্তি হইতে আয় হয়।

(খ) ব্যক্তিবিশেষ যেমন শিল্প বা ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া অর্থ উপার্জন করে, সরকারও তেমনি শিল্প বা ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া অর্থ অর্জন করে। আমাদের দেশের সরকারের রেল, ডাক প্রভৃতি হইতে অর্থাগম হয়।

(গ) কোন এক ব্যক্তি অপরের জন্য কোন কাজ করিলে, সেজন্য সে ফী আদায় করিতে পারে বা করে। যেমন, ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করিয়া ফী আদায় করে। সরকারও সেইরূপ কাহাকেও কোন কাজের সুবিধা দিয়া তাহার নিকট হইতে ফী আদায় করে। দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, এক ব্যক্তি সরকারের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। সরকার বিচার করে। এই বিচারের জন্য বিচারপ্রার্থীকে ফী দিতে হয়। এই ফী হইতে সরকারের আয় হয়।

(ঘ) পূর্বোক্ত উপায়গুলি হইতে সরকারের আয়ের পরিমাণ খুব বেশী নহে। সরকারের আয়ের বিশিষ্ট অংশ আসে কর হইতে। সরকারী কার্য নির্বাহের জন্য সরকার সরাসরি কোন প্রতিদান না দিয়া জনসাধারণ হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করে, তাহাকে বলা হয় কর। করের কতগুলি বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। সরকার যাহার উপর যে হারে কর ধার্য করে, তাহাকে সেই হারে কর দিতেই হয়। ইহা বাধ্যতা-মূলক। শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া সরকার মূল্য আদায় করে। বিচার-কার্য করিয়া সরকার ফী আদায় করে। মূল্য এবং ফীর বিনিময়ে সরকার দ্রব্য বা সুযোগ দিয়া থাকে। কিন্তু করের ব্যাপারে এইরূপ বিনিময়ের প্রশ্ন নাই। যে ব্যক্তির নিকট হইতে সরকার আয়-কর সংগ্রহ করে, তাহাকে তাহার বিনিময়ে অন্ততঃ সরাসরি কোন দ্রব্য বা সুযোগ দেয় না। সরকারী শিল্পের বা বাণিজ্যের কোন দ্রব্য না লইয়া যে-কোন ব্যক্তি মূল্য এড়াইতে পারে। সরকার-প্রদত্ত বিচার প্রভৃতির সুযোগ না লইয়া যে-কোন ব্যক্তি ফী এড়াইতে পারে। কিন্তু কর যাহার উপর ধার্য করা হয়, তাহাকে দিতেই হয়।

করের শ্রেণীবিভাগ (Different kinds of Tax : Direct and Indirect) :

কর প্রত্যক্ষ হইতে পারে, আবার পরোক্ষ হইতে পারে। সরকার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের নিকট হইতে কর আদায় করে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই দুই প্রকারের কর আছে। এমন কতগুলি কর আছে যেগুলির ভার করদাতা অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে পারে। আমাদের বিক্রয়-করের কথা ধরা যাউক। সরকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বা দোকানদারের নিকট হইতে বিক্রয়-কর আদায় করে। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এই বিক্রয়-কর আবার ক্রেতার নিকট হইতে বর্ধিত মূল্যের মাধ্যমে আদায় করে। কাজেই করের ভার অপরের উপর গিয়া পড়ে। এইরূপ যে করের ভার করদাতা অপরের স্কন্ধে চাপাইতে পারে, সে করকে বলা হয় পরোক্ষ কর। আবার কতগুলি কর আছে, যাহার ভার করদাতা অপরের স্কন্ধে চাপাইতে পারে না, নিজেই বহন করে। আয়-করের কথা ধরা যাউক। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আয়-কর আদায় করা হয়, সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্যের নিকট হইতে উহা আদায় করিতে পারে না, ইহার ভার নিজেই বহন করে। এইরূপ যে করের ভার করদাতাকেই বহন করিতে হয়, সে করকে বলা হয় প্রত্যক্ষ-কর। আয়-কর প্রত্যক্ষ শ্রেণীর কর। আয়-কর যাহার উপর বসানো হয়, তাহাকে সেই কর দিতে হয়। করদাতা অন্য কাহারও স্কন্ধে ঐ কর চাপাইয়া দিতে পারে না।

প্রত্যক্ষ-করের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Direct Taxes) :

প্রত্যক্ষ-কর ধনীদের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে এবং দরিদ্রদের নিকট হইতে কম পরিমাণে আদায় করা সহজ। সরকার ইচ্ছা করিলে অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের কর হইতে অব্যাহতিও দিতে পারে। আয়-কর সকল দেশেই ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে অধিক হইতে অধিকতর হারে আদায় করা হয়।

প্রত্যক্ষ-কর নিশ্চিত কর। করদাতা জানে, তাহাকে কত কর দিতে হইবে। কাজেই সে পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা করিতে পারে। যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করা হয়, সে ব্যক্তি করের নিশ্চিত পরিমাণ জানে বলিয়া তাহার নাগরিকতাবোধ বৃদ্ধি পায়। আদায়ীকৃত কর কিভাবে ব্যয়িত হয়, সেদিকে সে লক্ষ্য রাখে।

জরুরী প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ-কর বৃদ্ধি করা বা হ্রাস করা চলে। সরকার যদি মনে করে যে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন, তবে আয়-কর বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ-করের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারে। আবার যদি সরকার মনে করে যে, কর হইতে

আয় কিছু কমাইলেও সরকারের কোন অসুবিধা হইবে না, তবে প্রত্যক্ষ-করের হার কমাইয়া দিতে পারে।

এই করের অসুবিধা এই যে, এই কর সরকারকে অপ্রিয় করিয়া তোলে। এই কর সরাসরি দিতে হয়, হারের বাড়তি-কমতি সম্বন্ধে করদাতা সকল সময়েই অবহিত। কাজেই হার বাড়িলেই অসন্তোষ বাড়ে। প্রত্যক্ষ-কর ফাঁকি দিতে করদাতারা চেষ্টা করে এবং মিথ্যা হিসাব দাখিল করিয়া ফাঁকি দিতে সফল হয়। আয়-কর ফাঁকি দিবার কথা প্রায়ই শোনা যায়। নাগরিক চেতনা পূর্ণভাবে জাগরিত না হইলে এই ধরনের শঠতা অবশ্যম্ভাবী।

পরোক্ষ-করের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Indirect Tax) :

পরোক্ষ-করের কথা করদাতা অনেক সময় জানিতে পারে না। চিনির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাহা পরোক্ষ-কর। উৎপাদনকারীর নিকট হইতে এই কর আদায় করা হয়। উৎপাদনকারী মূল্য বৃদ্ধি করিয়া চিনি ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে সেই প্রদত্ত কর আদায় করিয়া লয়। এইরূপ ক্ষেত্রে চিনির ব্যবহারকারী বর্ধিত মূল্যে চিনি খরিদ করিল অথচ জানিল না যে চিনির জন্য সে কর দিল। এইরূপ হওয়ায় পরোক্ষ-কর মানুষের মনে বেশী পরিমাণে অসন্তোষ জন্মাইতে পারে না।

সকল নাগরিকেরই সরকারী কার্য-সম্পাদনের ব্যয় কিছু না কিছু পরিমাণে বহন করা উচিত। পরোক্ষ-কর-ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলে সকলকেই কিছু না কিছু কর দিতে হয়। চিনি, কেরোসিন, দেশলাই, বস্ত্র প্রভৃতির উপর যে কর বসানো হয়, তাহা ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলকেই দিতে হয়।

এই করের সাহায্যে প্রয়োজনবোধে অবাঞ্ছনীয় দ্রব্যের ব্যবহার কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়। মদ, গাঁজা প্রভৃতির অধিক হারে কর বসাইলে এইগুলির মূল্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে এইগুলির ব্যবহারও কমিয়া আসে।

পরোক্ষ-করের প্রধান অসুবিধা হইল যে, এই কর-ব্যবস্থা ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যমূলক নহে। ফলে ধনী এবং দরিদ্রকে সমান কর দিতে হয়। কখনও কখনও দরিদ্রদের বেশী কর দিতে হয়। আমাদের দেশে লবণের উপর যে কর ছিল, তাহা ধনী ব্যক্তি অপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তিদিগকেই বেশী দিতে হইত।

পরোক্ষ-করদাতা কর দিতেছে বলিয়া জানে না। কাজেই তাহার নাগরিক চেতনা জাগরিত হয় না।

পরোক্ষ-করও ফাঁকি দেওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। বিক্রয়-কর ফাঁকি দেওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। উৎপাদন-করও কখনও কখনও ফাঁকি দেওয়া যায়। পরোক্ষ-করের পক্ষে ইহাও একটি অসুবিধা।

হারের দিক হইতে করকে সমানুপাতিক (proportional) এবং প্রগতিশীল (progressive) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যে সব কর সকলের নিকট হইতে সমান হারে আদায় করিতে হয়, তাহাকে সমানুপাতিক কর বলা হয়। এক ব্যক্তির আয় এক শত টাকা। অপর ব্যক্তির আয় পাঁচ শত টাকা। করের হার যদি শতকরা দশ টাকা হয়, এবং প্রথম ব্যক্তি হইতে যদি দশ টাকা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতে যদি পঞ্চাশ টাকা কর আদায় করা হয়, তবে এই করকে সমানুপাতিক কর বলা হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, করের নীতি এমন হওয়া চাই যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর দিতে হয়। এই ক্ষেত্রে যদি প্রথম ব্যক্তি দশ টাকা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকা কর দেয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী কর দেওয়া হইল না। বাস্তবিক পক্ষে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর-প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি এক শত টাকা আয় করে, তাহার নিকট টাকার যে মূল্য, যে ব্যক্তি পাঁচ শত টাকা আয় করে, সে ব্যক্তির নিকট টাকার মূল্য তদপেক্ষা কম। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তিকে যদি দশ টাকা হারে কর দিতে বলা হয় এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যদি পনের কি কুড়ি টাকা হারে কর দিতে বলা হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী কর ধার্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। এইরূপ করকে প্রগতিশীল-কর (progressive) বলা হয়। আমাদের আয়-করে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। যাহার আয় পাচ শত টাকা, তাহাকে যদি পঞ্চাশ টাকা কর দিতে হয় তবে যাহার আয় এক হাজার টাকা, তাহাকে এক শত টাকার অধিক কর দিতে হয়। ব্যয়-কর, সম্পদ-কর প্রভৃতিও এই ধরনের কর। এই ধরনের করের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার দ্বারা ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কিছু হ্রাস করা সম্ভব হয়।

কর ধার্যের নীতি (Principles of Taxation) :

কর ধার্য করিবার সময় সরকারকে কয়েকটি নীতি মানিয়া চলিতে হয়। এই নীতিগুলি না মানিলে সরকারকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এ্যাডাম স্মিথ নামক অর্থনীতি-বিশারদ চারিটি নীতির কথা বলিয়াছেন :—

(ক) সাম্যের নীতি (Canon of Equality)—রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা সকল নাগরিক সমানভাবে ভোগ করে। কাজেই সকল ব্যক্তির সরকারী কার্যের ব্যয়ভার বহন করা উচিত। কিন্তু সকলের কর-প্রদানের ক্ষমতা সমান নহে। এই নীতি

অনুসারে প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে কর দিতে বাধ্য করা উচিত। যে ব্যক্তির আয় এক শত টাকা তাহার কর দিবার ক্ষমতা, যে ব্যক্তির আয় পাঁচ শত টাকা তাহার ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক কম। কাজেই প্রথম ব্যক্তির নিকট হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক কম কর আদায় করা উচিত।

(খ) নিশ্চয়তার নীতি (Canon of Certainty)—প্রত্যেক কর-দাতাকে কি হারে বা পরিমাণে কর দিতে হইবে, এবং কখন দিতে হইবে, তাহা জানাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে করদাতা কর-প্রদানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(গ) সুবিধার নীতি (Canon of Convenience)—কর এমনভাবে আদায় করা উচিত, যাহাতে করদাতার বিশেষ কোন অসুবিধা না হয়। কখনও কখনও দেখা যায়, করদাতাকে একসঙ্গে সমুদায় করের অর্থ আদায় করিয়া দিতে বলিলে তাহার পক্ষে অসুবিধা হয়। সেইজন্য বিভিন্ন সময়ে কর-আদায়ের ব্যবস্থা থাকে। যাহারা চাকুরি করে, তাহাদের নিকট হইতে মাসে মাসে কর আদায়ের ব্যবস্থা হয়। যাহারা কৃষিকার্য করে, তাহাদিগকে তাহাদের সুবিধামত কিস্তিতে কিস্তিতে কর দিতে বলা হয়।

(ঘ) ব্যয়বাহুল্যহীনতার নীতি (Canon of Economy)—কর আদায় করার ব্যয় যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। যে কর আদায় করিতে করের একটি বিশিষ্ট অংশ ব্যয় হইয়া যায়, সেই কর বাদ দেওয়াই ভাল। যে পরিমাণ কর কর-দাতৃগণ দিয়া থাকে, দেখা উচিত যেন তাহার সামান্য অংশই আদায়ের জন্য ব্যয়িত হয়।

এ্যাডাম স্মিথের নীতি ছাড়া আরও কয়েকটি নীতি আছে। সেই নীতিগুলি নিম্নে বিশ্লেষণ করা হইল।

(ঙ) স্থিতিস্থাপকত্বের নীতি (Canon of Elasticity)—সমগ্র কর-ব্যবস্থার মধ্যে এমন দুই-একটি কর থাকা প্রয়োজন, যাহা সহজেই একটু বাড়াইয়া দিলে প্রচুর রাজস্ব আদায় হইতে পারে। সরকারের জরুরী ব্যয় মিটাইবার জন্য অনেক সময় এই ধরনের কর-বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। আয়-কর এই ধরনের কর। হার একটু বাড়াইয়া দিলেই প্রচুর রাজস্ব আদায় হয়।

(চ) উৎপাদনশীলতার নীতি (Canon of Productivity)—এমন কর ধার্য করা উচিত, যাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব আসিতে পারে। যাহা হইতে সামান্য রাজস্ব আদায় হয়, তেমন কর ধার্য করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কর-ব্যবস্থায় মোটামুটি উৎপাদনশীল কয়েকটি করের ব্যবস্থা থাকাই ভাল। আবার ইহাও দেখা প্রয়োজন

যে, কর ধার্যের ফলে যেন উৎপাদন কার্য ব্যাহত না হয়। অধিক পরিমাণে উৎপাদন-কর বসাইলে শিল্পের মালিকগণ উৎপাদন কমাইয়া দেয়।

(ছ) সরলতার নীতি (Canon of Simplicity)—কর-ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যাহাতে করদাতারা সহজে তাহা বুঝিতে পারে। জটিল কর-ব্যবস্থা লোকের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে, আদায়কারীদেরও অসুবিধা সৃষ্টি করে।

উত্তম কর-ব্যবস্থা এই সকল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে ব্যবস্থা যত বেশী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ব্যবস্থা তত উত্তম।

সরকারী ব্যয় (Public Expenditure) :

সরকার বিভিন্ন কাজের জন্য অর্থ ব্যয় করে। এই সকল ব্যয়কে বিভিন্ন নীতি অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা চলে। সরকারী ব্যয় আমাদের দেশে তিন প্রকারের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হইয়া থাকে। সেই অনুসারে ব্যয়কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে; যেমন—কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়, রাজ্য সরকারের ব্যয় এবং মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় সরকারের ব্যয়। আমাদের রাষ্ট্রে সৈন্য রাখার জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা রাজ্য সরকারের ব্যয়। আবার জল-সরবরাহ বা ময়লা-নিষ্কাশনের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা স্থানীয় সরকারের ব্যয়। আবার ব্যয়ের ফলে কাহারা সুবিধা পাইল, সে-কথা বিচার করিলে ব্যয়কে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কতগুলি ব্যয় আছে যাহা সর্বসাধারণের সুবিধা বিধান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যেমন—শিক্ষার জন্য ব্যয়। আবার কোন কোন্ ব্যয় আছে যাহার সুবিধা কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ পেনসানের জন্য ব্যয়ের কথা ধরা যাউক। এই ব্যয়ের সুবিধা কেবল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরাই পাইয়া থাকে।

ব্যয়ের উৎপাদনশীলতার কথা বিবেচনা করিলে করকে উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল (productive এবং unproductive) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এমন কতগুলি কাজ আছে, যাহার জন্য ব্যয় করিলে সরকারের ভবিষ্যতে আয় বাড়ে—যেমন, জলসেচের জন্য ব্যয়। এই ব্যয়ের ফলে সরকারের পরবর্তী কালে আয় বাড়ে। ইহাকে বলা হয় উৎপাদনশীল ব্যয়। আবার কতগুলি কাজ আছে, যাহার জন্য ব্যয় করিলে পরবর্তী কালে সরকারের কোন আয়ের উপায় হয় না। এই সকল ব্যয়কে বলা হয় অনুৎপাদনশীল ব্যয়। যুদ্ধের জন্য সরকার যে ব্যয় করে, তাহা হইতে পরবর্তী কালে কোন আয়ের আশা থাকে না। সেইজন্য ইহা অনুৎপাদনশীল ব্যয়।

সরকারী ঋণ (Public Debt) :

সরকারী ব্যয় মিটাইবার জন্য কখনও কখনও ঋণ গ্রহণ করা হয়। এই প্রকার ঋণের নানা শ্রেণীবিভাগ আছে। একটি শ্রেণীবিভাগ হইল—আভ্যন্তরীণ (Internal) এবং বৈদেশিক (External)। যে ঋণ রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয়, সেই ঋণকে বলা হয় আভ্যন্তরীণ (Internal) ঋণ। যে ঋণ বিদেশ হইতে গ্রহণ করা হয়, তাহাকে বলা হয় বৈদেশিক ঋণ। আবার ঋণকে পরিশোধের সময় অনুসারে স্বল্পকালীন (short term) এবং দীর্ঘকালীন (long term) ঋণ বলা হয়। যে ঋণ দেশের সরকার সাধারণতঃ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে তিন মাস বা ছয় মাসের জন্য গ্রহণ করে, তাহা স্বল্পকালীন ঋণ। যে ঋণ সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে বা বিদেশ হইতে দীর্ঘকালের জন্য গ্রহণ করে, সে ঋণ দীর্ঘকালীন ঋণ।

সরকারী ঋণকে আবার উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যে ঋণের অর্থ উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করা হয়, সে ঋণকে বলা হয় উৎপাদনশীল ঋণ। জলসেচের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয়, তাহা উৎপাদনশীল ঋণ। আবার যে ঋণের অর্থ অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করা হয়, তাহাকে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলা হয়। যুদ্ধের জন্য যে ঋণ করা হয়, উহা অনুৎপাদনশীল ঋণ। উৎপাদনশীল ঋণ করিয়া যে কাজ সম্পন্ন হয়, সে কাজের ফলে যে আয় হয় তাহা হইতে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা চলে।

উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থ-ব্যবস্থা (Financing Development Projects) :

দেশে যখন বিশেষ ধরনের কোন উন্নয়নমূলক কার্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তখন অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। চলতি আয় হইতে ইহা ব্যয়-বরাদ্দ করা চলে না। তখন সরকারকে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। উপায়গুলি মোটামুটি এইরূপ :—

(ক) কর-বৃদ্ধি ;
(খ) ঋণ-গ্রহণ ;
(গ) বৈদেশিক মূলধন নিয়োগ ;
(ঘ) ঘাটতি ব্যয়।

কর-বৃদ্ধি :

কর হইতে যে আয় হয়, তাহা সকল সরকারেরই আয়ের একটা বিশিষ্ট অংশ। প্রয়োজনবোধে সরকার এই করের হার বাড়াইয়া বা নূতন কর বসাইয়া আয় বৃদ্ধি

করিতে পারে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিতে পারে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এইরূপ হার বৃদ্ধি বা নূতন কর ধার্য করা সম্ভব হয় না। অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশে ইহার কোনটিরই সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি কর-ধার্য কমিটি স্থাপন করা হইয়াছিল। এই কমিটির মতে কিন্তু আরও নূতন কর ধার্য করিবার অবকাশ আছে। কিছু কিছু নূতন নূতন কর ধার্য করাও হইয়াছে।

ঋণ গ্রহণ (Public Debt) :

যখন দেখা যায় যে কর ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন, তখন সরকার ঋণ গ্রহণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। পূর্বেই এই ঋণের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই ঋণ আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক এই দুই প্রকারের হইতে পারে। আভ্যন্তরীণ ঋণ নির্ভর করে দেশবাসীর সঞ্চয়ের এবং ঋণ-সংগ্রহের জন্য উপযোগী সংগঠনের উপর। এইজন্য সরকারের উচিত, জনসাধারণকে সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত করা এবং সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। সঞ্চিত অর্থ যাহাতে সুন্দরভাবে সংগ্রহ করা যায়, সে ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন।

আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ সকল সময় যথেষ্ট হয় না। সেইজন্য বিদেশ হইতে ঋণ সংগ্রহ করিতে হয়। অনেক সময় ইহা অপরিহার্য হয়। পরে ইহা পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হয়।

বৈদেশিক মূলধন নিয়োগ (Employment of Foreign Capital) :

বিদেশ হইতে ঋণ হিসাবে অর্থ সংগ্রহ না করিয়া বিভিন্ন শিল্পে বা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করিয়াও বৈদেশিক মূলধন দেশের কাজে লাগানো যায়। স্বল্পোন্নত দেশে মূলধনের অভাবে নূতন শিল্প স্থাপন যখন সম্ভব হয় না, তখন বিদেশীকে সেই শিল্প স্থাপন করিতে দিয়া বিদেশী মূলধন নিয়োগ করা চলে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধনের উপর সকল সময়ই কিছু বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। বিদেশীরা যে-সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, তাহাতে কিছু-সংখ্যক দেশী অংশীদার রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। দেশী কর্মচারী নিয়োগের সর্ত আরোপ করা হয়। দেশী কাঁচা মাল ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এই সকল সর্তাদি আরোপ করা প্রয়োজনীয়।

ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing) :

বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়াও যখন উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করা কঠিন হয়, তখন ঘাটতি ব্যয়ের নীতি অবলম্বন করা হয়। সাধারণতঃ ঋণ গ্রহণ করিয়া,

গচ্ছিত অর্থ কাজে লাগাইয়া বা অধিকতর নোট ছাপাইয়া ঘাটতি ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের পরিকল্পনার ব্যয় মিটাইবার জন্য যে ঘাটতি ব্যয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষভাবে নূতন করিয়া নোট ছাপাইয়া অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টির কথাই বলা হইয়াছে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নূতন নোট ছাপাইয়া অর্থের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে এবং সরকার এই নবসৃষ্ট অর্থ ঋণ গ্রহণ করিয়া পরিকল্পনার কাজে লাগাইবে। আমাদের দেশে এই পদ্ধতিকে ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতি বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন

১। ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? (পৃঃ ১১৩)

২। সরকার কোন্ কোন্ উপায়ে নিজ ব্যয় মিটাইবার জন্য আয় করে? (পৃঃ ১১৪)

৩। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের সুবিধা-অসুবিধা কি? (পৃঃ ১১৫-১১৬)

৪। সরকারী ব্যয়কে কি কি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়? (পৃঃ ১১৯-১২০)

৫। উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয়? (পৃঃ ১২০-১২১)

৬। কর ধার্যের সময় কি নীতি অবলম্বন করা উচিত? (পৃঃ ১১৭-১১৮)

পঞ্চদশ অধ্যায়

অর্থ বা টাকাপয়সা
(Money)

অদল-বদল (Barter) :

অতি প্রাচীনকালে প্রত্যেক মানুষ নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজে উৎপাদন করিত। মানুষের প্রয়োজনও তখন কম ছিল। কাজেই তখন তাহা সম্ভব হইত। কালক্রমে শ্রম-বিভাগ হইল। কেহ ফসল উৎপাদন আরম্ভ করিল, কেহ কাপড় উৎপাদন আরম্ভ করিল, কেহ-বা বাসন-পত্র উৎপাদন আরম্ভ করিল। প্রত্যেকেরই এসকল জিনিসের প্রয়োজন। তখন দ্রব্যের বিনিময় আরম্ভ হইল! যে ফসল উৎপাদন করিত সে ফসলের বিনিময়ে কাপড়-উৎপাদনকারীর নিকট হইতে কাপড় সংগ্রহ করিত। কাপড়-উৎপাদনকারী কাপড়ের বিনিময়ে বাসন-উৎপাদনকারীর নিকট হইতে বাসন সংগ্রহ করিত। এই বিনিময়-ব্যবস্থাকে বলা হয় অদল-বদল বা দ্রব্য-বিনিময়। এই ব্যবস্থায় দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য লওয়া হয় বা দেওয়া হয়।

অদল-বদলের অসুবিধা ((Disadvantages of Barter) :

এই ধরনের বিনিময় মানবসমাজে কিছু কাল প্রচলিত ছিল। অদল-বদলের কতগুলি অসুবিধা আছে। অসুবিধার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিময় অসম্ভব হইতে পারে। এক ব্যক্তির ধান্য আছে। সে ধান্যের বিনিময়ে কাপড় চাহে। তাহাকে কাপড়-উৎপাদনকারীর নিকট যাইতে হইবে। কিন্তু কাপড়-উৎপাদনকারীর তখন হয়ত বাসনের প্রয়োজন। সে ধান্য চাহে না। কাজেই ধান্য-উৎপাদনকারী ধান্যের বিনিময়ে কাপড় পাইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে অদল-বদল অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, মনে করা যাইতে পারে একটি লোকের একটি গরু আছে। সে উহা দিয়া কিছু ধান্য, কিছু কাপড় এবং কিছু বাসন-পত্র পাইতে চায়। যে ধান্য উৎপাদন করে, সে ধান্যের বিনিময়ে গরু লইতে রাজী আছে। কিন্তু গরুটি যদি ধান্য-উৎপাদনকারীকে দিতে হয়, তবে গরুর মালিক বিনিময়ে ধান্য পাইবে। কিন্তু সে কাপড়, এবং বাসন পাইবে না। গরুর কিছুটা অংশের বিনিময়ে ধান্য, কাপড় বা বাসনের কোনটাই সে পাইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে অদল-বদল অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, অদল-বদল ব্যবস্থার একটা বড় অসুবিধা এই যে, কোন দ্রব্যেরই মূল্য নির্ধারণ করার সঠিক কোন মান নাই। এক মণ ধান্যের মূল্য চারিখানা কাপড়, দশখানা বাসন, চল্লিশটা আপেল। প্রত্যেকটি দ্রব্যের নানারকম মূল্য। আপেল-উৎপাদনকারীর নিকট ধান্যের মূল্য এক-রকম, বাসন-উৎপাদনকারীর নিকট অন্য-রকম, আবার কাপড়-উৎপাদনকারীর নিকট অন্য-রকম। প্রত্যেকটি দ্রব্যের উৎপাদনকারীকে বিভিন্ন মানে মূল্য ঠিক করিতে হয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানুষ অর্থ বা টাকাপয়সার প্রচলন আরম্ভ করিল। ফলে এই সকল অসুবিধা দূর হইল।

কি'ভাবে টাকাপয়সা এই অসুবিধা দূর করিল, তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে পারা যায়। এক ব্যক্তি ধান্যের বিনিময়ে কাপড় চাহে। কিন্তু কাপড়-উৎপাদনকারীর ধান্যের প্রয়োজন নাই। তাহার বাসনের প্রয়োজন আছে। বাসন-উৎপাদনকারীর ধান্যের প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে ধান্য-উৎপাদনকারী টাকা লইয়া বাসন-উৎপাদনকারীর নিকট ধান্য বিক্রয় করিল। সেই টাকা দিয়া ধান্য-উৎপাদনকারী কাপড়-উৎপাদনকারীর নিকট হইতে কাপড় কিনিল। কাপড়-উৎপাদনকারী কাপড় বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইল, সেই টাকা দিয়া বাসন-উৎপাদনকারীর নিকট হইতে বাসন খরিদ করিল। টাকার সাহায্যে বিনিময় করায় কাহারও কোন অসুবিধা হইল না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইল।

আবার দেখা যায়, এক ব্যক্তির কিছু ধান্য, কিছু বাসন এবং কিছু কাপড়ের প্রয়োজন। বিনিময়ে দিবার মত সে ব্যক্তির কেবল একটি গরু আছে। তাহাকে বিনিময় করিতে হইবে তিন জনের সঙ্গে। অথচ তাহার গরু খণ্ড খণ্ড করিয়া তিন জনকে দিলে তাহা কেহই লইবে না। অন্য এক ব্যক্তির গরুর প্রয়োজন আছে। যে ব্যক্তির গরু আছে সে এই গরুটি যাহার গরুর প্রয়োজন আছে, তাহার নিকট অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। যে অর্থ সে পাইল তাহার কিছু অংশ দিয়া সে ধান্য, কিছু অংশ দিয়া কাপড় এবং কিছু অংশ দিয়া বাসন খরিদ করিল। বিনিময় সহজেই সাধিত হইল।

আমরা দ্রব্যের মূল্য ঠিক করার যে অসুবিধার কথা বলিয়াছিলাম, সে অসুবিধাও দূর হইল। প্রত্যেকটি দ্রব্যের মূল্য অর্থ বা টাকাপয়সার সাহায্যে প্রকাশ করা যাইবে। ধানের মণ পনের টাকা, কাপড় প্রত্যেকখানা পাঁচ টাকা, বাসন প্রত্যেকটা এক টাকা। ইহার ফলে প্রত্যেকটা দ্রব্যের বিনিময়ে প্রত্যেকটা দ্রব্য কতখানি পাওয়া যাইবে, তাহাও বুঝা সহজ হইল।

ইহা ছাড়া অর্থ বা টাকাপয়সা প্রচলনের ফলে মানুষ সঞ্চয় করিবার সুবিধা পাইল। গরু, ধান্য, কাপড় বা বাসন সঞ্চয় করিয়া রাখা অসুবিধাজনক। এইগুলি অনেক দিন থাকে না। কিন্তু টাকাপয়সা সঞ্চয় করার সে-রকম অসুবিধা নাই।

অর্থ বা টাকাপয়সা (Money) :

যে দ্রব্য সকলে মূল্যের মান হিসাবে গ্রহণ করে এবং যে দ্রব্যের সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাহাকে বলা হয় অর্থ। বিভিন্ন দেশের অর্থের নাম বিভিন্ন। আমাদের দেশের অর্থের নাম টাকাপয়সা, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থের নাম ডলার-সেণ্ট, জাপানের অর্থের নাম ইয়েন। যে নামেই অর্থকে অভিহিত করা যাউক না কেন, ইহা কোন দেশের সকল লোকই দ্রব্য বা শ্রমের বিনিময়ে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করে।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দ্রব্য অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। আমাদের দেশে এক সময়ে গরু, অন্য সময়ে কড়ি অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। তামাক পাতা, লবণ, চা প্রভৃতিও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। শেষে সোনা এবং রূপা অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে সোনা-রূপার সঙ্গে অর্থ হিসাবে কাগজী মুদ্রার প্রচলন হইল।

সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে হইলে অর্থের কয়েকটা গুণ থাকা প্রয়োজন। ইহা স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে লইয়া যাইবার সুবিধা থাকা প্রয়োজন। ইহাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করার সুবিধা থাকা প্রয়োজন। অর্থরূপে ব্যবহৃত দ্রব্যটি সকলের সহজে চিনিবার সুযোগ থাকা চাই। এই গুণ থাকিলে দ্রব্যটি সহজে গ্রহণযোগ্য হয়। সোনা এবং রূপার এই সকল গুণ আছে। কাজেই ইহা সহজে অর্থ হিসাবে অনেক দিন ধরিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। কাগজী মুদ্রারও এই সকল গুণ আছে বলিয়া এবং খুব কম ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া এখন ইহা অন্য ধরনের মুদ্রার স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

অর্থ বা টাকাপয়সার কাজ (Functions of Money) :

অর্থ কি তাহা ভাল করিয়া জানিতে হইলে অর্থের দ্বারা কি কাজ সম্পন্ন হয় তাহা জানা প্রয়োজন। অর্থ বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করে। অর্থ গ্রহণ-যোগ্য পদার্থ বলিয়া সকলেই নিজ দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে। যে ধান্য বিক্রয় করে সে অর্থের বিনিময়ে ধান্য বিক্রয় করে। সেইরূপ যে কাপড় বিক্রয় করে সে-ও অর্থের বিনিময়ে কাপড় বিক্রয় করে। তাহারা আবার অর্থের বিনিময়ে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে। কাহারও কোন অসুবিধা হয় না।

অর্থের দ্বিতীয় কাজ হইল ইহার সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হয়। অর্থের ব্যবহার যখন ছিল না তখন বিনিময়ের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য বিভিন্ন দ্রব্যের হিসাবে বিভিন্নরূপে নিরূপিত হইত। এক মণ ধান্যের মূল্য তিনখানা কাপড়, পাঁচখানা বাসন, পাঁচখানা লাঙ্গল এইরূপ হইত। এখন প্রত্যেকটি দ্রব্যের মূল্য অর্থের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। এক মণ ধান্যের মূল্য পনের টাকা, একখানা কাপড়ের মূল্য পাঁচ টাকা, একটা বাসনের মূল্য তিন টাকা। এখন সহজে বুঝা যায়, পাঁচটা বাসন দিলে বা তিনখানা কাপড় দিলে এক মণ ধান্য পাওয়া যায়।

অর্থের তৃতীয় কাজ সঞ্চয়ের কাজে সাহায্য করা। মানুষ সকল সময়ে পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করিতে পারে না। যে সময়ে উপার্জন করিতে পারে না, সে সময়ের জন্য অন্য সময় মানুষ সঞ্চয় করে। অর্থ আছে বলিয়া এই সঞ্চয় সুবিধাজনক হইয়াছে। অর্থ নষ্ট হয় না এবং ইহার মূল্য দীর্ঘদিনস্থায়ী। কাজেই ইহা সঞ্চয় করিলে মানুষের ক্ষতি হয় না। অন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে বা তাহার মূল্য কমিয়া যাইতে পারে।

সর্বশেষে আমরা দেখিতে পাই অর্থ মানুষকে ধার দেওয়া এবং ধার শোধ করার কাজে সাহায্য করে। ধারের রীতি অনেক দিন ধরিয়াই সমাজে চলিয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি ধার দেয় সে সকল সময়ে যে-পরিমাণ ধার দেয় অন্ততঃ সে পরিমাণ ফিরিয়া পাইতে আশা করে। অর্থের মূল্য স্থায়ী। অর্থের আকারে ধার দিলে এবং অর্থের আকারে ধার পরিশোধ করা হইলে যে ধার দেয় সে সহজেই যে পরিমাণ ধার দেয় সে পরিমাণ ফিরিয়া পায়। সেজন্যই এখন সকল দেনা-পাওনাকেই অর্থের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন প্রকারের টাকা বা মুদ্রা (Different Kinds of Money) :

মুদ্রার একটি কাজ হইল বিনিময়ের কাজে হিসাব-নিকাশের সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যে মুদ্রাকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। (ক) হিসাব-নিকাশে ব্যবহার্য এবং (খ) প্রচলিত মুদ্রা। যাহা হিসাব-নিকাশে ব্যবহার্য তাহা প্রকৃত প্রচলিত মুদ্রা না-ও হইতে পারে। পাই আমাদের দেশে অনেক দিন ধরিয়া প্রচলিত নাই। অথচ সেদিন পর্যন্তও পাই-এর মাধ্যমে হিসাব-নিকাশ চলিত। যে অর্থ হিসাবের কাজে সাহায্য করে তাহাই হিসাব-নিকাশে ব্যবহার্য অর্থ। কাজেই পাই প্রচলিত না থাকিলেও হিসাব-নিকাশে ব্যবহার্য অর্থ ছিল। কখনও কখনও হিসাব-নিকাশে ব্যবহার্য অর্থ এবং প্রচলিত অর্থ একই হয়। যেমন—টাকা এবং পয়সা। এখন টাকা এবং পয়সা হিসাব-নিকাশেও ব্যবহৃত হয়। এইগুলিই এখন প্রচলিত অর্থ।

উপাদানের দিক দিয়া বিচার করিলে মুদ্রা আবার কাগজী এবং ধাতব এই দুই প্রকারের হইতে পারে। কাগজী মুদ্রা সরকার প্রচলিত করিতে পারে কিংবা ব্যাঙ্ক প্রচলিত করিতে পারে। আমাদের দেশে এখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজী মুদ্রা প্রচলিত করে। কাগজী মুদ্রা আবার দুই প্রকারের হইতে পারে, যেমন—পরিবর্তনীয় এবং অপরিবর্তনীয়। যে কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে প্রচলনকারী কর্তৃপক্ষ ধাতব মুদ্রা দিতে বাধ্য তাহাকে পরিবর্তনীয় (convertible) এবং যে কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে প্রচলনকারী কর্তৃপক্ষ ধাতব মুদ্রা দিতে বাধ্য নহে তাহাকে অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা বলা হয়। আমাদের দেশে এক টাকার নোট অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা এবং অন্যান্য নোট পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা। যে পরিমাণ মূল্যের কাগজী মুদ্রা প্রচলিত করা হয় সেই পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ যদি মুদ্রা কর্তৃপক্ষ জমা রাখে, তবে প্রচলিত কাগজী মুদ্রাকে প্রতিভূ কাগজী মুদ্রা বা representative paper money বলা হয়। যে টাকাপয়সা ধাতু-গঠিত, সেগুলিকে ধাতব অর্থ বা মুদ্রা বলা হয়। ধাতব টাকাপয়সা আবার দুই প্রকার হইতে পারে, যেমন—প্রামাণিক (Standard) এবং নিদর্শন (Token) মুদ্রা। প্রামাণিক মুদ্রা সাধারণতঃ স্বর্ণ- বা রৌপ্য-নির্মিত হয়। ইহার ধাতুমূল্য উপরে লিখিত মূল্যের সমান হয়। আগে গ্রেট বৃটেনে যে স্বর্ণমুদ্রার (sovereign) প্রচলন ছিল, তাহার ধাতুমূল্য ছিল উপরে লিখিত মূল্যের সমান। কাজেই উহা প্রামাণিক মুদ্রা ছিল। নিদর্শন মুদ্রা সাধারণতঃ তামা, সীসা প্রভৃতি অল্পমূল্যের ধাতু-নির্মিত হয়। এই মুদ্রার উপরে লিখিত মূল্য মুদ্রামূল্য অপেক্ষা বেশী। আমাদের দেশের পয়সা প্রভৃতি নিদর্শন মুদ্রা।

মুদ্রাকে আবার সসীমবিহিত মুদ্রা এবং অসীমবিহিত মুদ্রা এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যে মুদ্রা ঋণ মিটাইবার কাজে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী দিলে পাওনাদার লইতে অস্বীকার করিতে পারে তাহাকে সসীমবিহিত মুদ্রা (limited legal tender) বলা হয়। আমাদের দেশের পুরাতন সিকি, দুয়ানি, নূতন পয়সা প্রভৃতি সসীমবিহিত মুদ্রা ছিল। এক টাকা মূল্যের অধিক সিকি, দুয়ানি দিলে পাওনাদার লইতে অস্বীকার করিতে পারিত। যে মুদ্রা ঋণ মিটাইবার কাজে যে-কোন পরিমাণ দেওয়া হউক না কেন পাওনাদার লইতে বাধ্য, সে মুদ্রাকে বলা হয় (unlimited legal tender)। আমাদের ১ টাকার নোট বা ২ টাকার নোট প্রভৃতি অসীমবিহিত মুদ্রা।

মুদ্রামান (Monetary Standard) :

কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রার প্রচলনের যে বিশেষ রীতি থাকে তাহাকে মুদ্রামান

(Monetary Standard) বলা হয়। মুদ্রা প্রধানতঃ দুই প্রকারের, কাজেই মুদ্রামানও প্রধানতঃ দুই প্রকারের—ধাতব মুদ্রামান ও কাগজী মুদ্রামান।

যখন স্বর্ণ বা রৌপ্য বা উভয় ধাতু-নির্মিত মুদ্রা প্রামাণিক এবং অসীমবিহিত মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে তখন প্রচলিত মুদ্রামানকে ধাতব মুদ্রামান বলা হয়। স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে-কোন এক ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে তাহাকে এক-ধাতু মুদ্রামান (Monometallic Standard) বলা হয়। স্বর্ণ এবং রৌপ্য এই উভয় ধাতুর মুদ্রা পাশাপাশি প্রচলিত থাকিলে মুদ্রামানকে দ্বিধাতুমান (Bimetallic Standard) বলা হয়। দ্বিধাতুমান প্রচলিত থাকিলে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মধ্যে একটা বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট থাকে। যখন এই নির্দিষ্ট হারের সঙ্গে বাজারের হারের কোন পার্থক্য দেখা দেয়, তখন সমতা রক্ষার জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে পূর্ব-নির্দিষ্ট হারে মুদ্রা দিবার ব্যবস্থা থাকে।

যেই মুদ্রামানে অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রাকে অসীমবিহিত মুদ্রা বলিয়া চালানো হয়, সেই মুদ্রামানকে কাগজী মুদ্রামান বলা হয়। কাগজী মুদ্রা পরিবর্তনীয় হইলে প্রচলিত মুদ্রামানকে কাগজী মুদ্রামান বলা চলে না। কারণ এই ধরনের কাগজী মুদ্রা ধাতব মুদ্রার প্রতিনিধিত্ব করে। নিজ শক্তিতে প্রচলিত থাকে না।

স্বর্ণমান (Gold Standard) :

স্বর্ণমান কয়েক প্রকারের হইতে পারে। যেই স্বর্ণমানে স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত থাকে, সেই মুদ্রামানকে প্রকৃত স্বর্ণ মুদ্রামান বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত না রাখিয়াও স্বর্ণমান বিভিন্ন প্রকারে চালু রাখা যায়। প্রকার অনুসারে এই মুদ্রামানের পৃথক পৃথক নাম আছে, যেমন—(ক) স্বর্ণ-পিণ্ডমান, (খ) স্বর্ণ-বিনিময়মান, (গ) স্বর্ণ-সমতামান।

(ক) স্বর্ণ-পিণ্ডমান (Gold Bullion Standard)—স্বর্ণ-পিণ্ডমান প্রচলিত থাকিলে কাগজের নোট বা কোনও নিকৃষ্ট ধাতুর মুদ্রার প্রচলন থাকে। এই প্রচলিত মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রায় কিংবা স্বর্ণে পরিবর্তন করা যায় না। অবশ্য মুদ্রা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে। কাজেই স্বর্ণের মূল্যের সঙ্গে প্রচলিত মুদ্রার মূল্যের সঙ্গতি থাকে।

(খ) স্বর্ণ-বিনিময়মান (Gold Exchange Standard)—স্বর্ণ-বিনিময়মান প্রচলিত থাকিলে কাগজের মুদ্রা বা কোন নিকৃষ্ট ধাতুর মুদ্রা অসীমবিহিত মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে। নিজ দেশের বিনিময় কার্য-সম্পাদনের জন্য এই প্রচলিত

মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ হইতে স্বর্ণ পাওয়া যায় না। মুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে না। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেন মিটাইবার জন্য স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন দেশের মুদ্রার সঙ্গে দেশের প্রচলিত মুদ্রার বিনিময় হয়। ১৮১৮ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ভারতে প্রচলিত মুদ্রা ছিল টাকা (rupee)। এই টাকার পরিবর্তে স্বর্ণ পাওয়া যাইত না। কিন্তু বৈদেশিক লেন-দেন মিটাইবার জন্য কাহারও যদি স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন হইত তবে প্রচলিত মুদ্রা টাকার বিনিময়ে সে ব্যক্তি ১ টাকা=১ শি. ৪ পে. এই হারে স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ মুদ্রা পাইতে পারিত। এই ব্রিটিশ মুদ্রার সাহায্যে বৈদেশিক লেন-দেন সহজে সম্পন্ন হইত। এইরূপ প্রচলিত মানের নাম স্বর্ণ-বিনিময়মান।

(গ) স্বর্ণ-সমতামান (Gold Parity Standard)—স্বর্ণ-সমতামান প্রচলনকারী দেশকে নিজ দেশের প্রচলিত মুদ্রার স্বর্ণমূল্য কি তাহা ঘোষণা করিতে হয় এবং সকল সময় সেই মূল্য বজায় রাখিতে হয়। যে সকল দেশ একসঙ্গে স্বর্ণ-সমতামান গ্রহণ করে সেই সকল দেশের মধ্যে মুদ্রার পারস্পরিক মূল্য সকল সময়ে অপরিবর্তিত থাকে। ভারতে এক টাকার স্বর্ণমূল্য যাহা, গ্রেট ব্রিটেনের ১ শি. ৬ পেন্সের স্বর্ণমূল্য ঠিক তাহা, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২১ সেন্টের স্বর্ণমূল্য ঠিক তাহা। যতক্ষণ ভারত, গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ নিজ মুদ্রামূল্য অক্ষুণ্ণ রাখিবে, ততক্ষণ এই পারস্পরিক মূল্যও অপরিবর্তিত থাকিবে। এই ধরনের মুদ্রামানকে স্বর্ণ-সমতামান বলা হয়।

কাগজী মুদ্রা (Paper Money) ঃ

আজকাল কাগজী মুদ্রার প্রচলন সকল দেশেই আছে। একটি দ্রব্যের যে-সকল গুণ থাকিলে অর্থ হিসাবে ব্যবহার করা যায়, কাগজের সে সকল গুণ আছে। অবশ্য ইহা দীর্ঘদিন স্থায়ী নহে। কিন্তু ইহার উৎপাদন-মূল্য কম বলিয়া একবার যে কাগজী মুদ্রা ব্যবহারের ফলে জীর্ণ হয়, তাহা উঠাইয়া লইয়া তাহার পরিবর্তে নূতন কাগজী মুদ্রার প্রচলন করা খুব সহজ এবং অল্পব্যয়সাধ্য। সেইজন্য মুদ্রার প্রয়োজনে ধাতুর ব্যবহার না করিয়া প্রায় সকল মুদ্রা কর্তৃপক্ষ আজকাল কাগজী নোটের প্রচলন করে।

কাগজী মুদ্রার কতগুলি সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা আছে। কাগজী মুদ্রা সহজে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। ধাতব মুদ্রা পরীক্ষা করিতে যে পরিমাণ শ্রমের বা সময়ের প্রয়োজন হয়, কাগজী মুদ্রা পরীক্ষা করিতে সে পরিশ্রম বা সময় লাগে না।

ধাতব মুদ্রাব উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় কাগজী মুদ্রার উৎপাদন ব্যয় খুব কম। কাগজী মুদ্রা একবার নষ্ট বা জীর্ণ হইলে পুনরায় সহজে ছাপা যায়।

ব্যবহারের ফলে ধাতব মুদ্রার যে পরিমাণে ক্ষতি হয়, কাগজী মুদ্রার ব্যবহারের ফলে সে পরিমাণ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কাগজী মুদ্রা সহজে জীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পুনর্মুদ্রণ কার্য স্বল্পব্যয়সাধ্য। কাগজী মুদ্রার সরবরাহ অতি দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। কখনও কখনও দ্রুত মুদ্রা-বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে এই প্রকার বৃদ্ধি-সাধন খুব সহজ। ধাতব মুদ্রার সরবরাহ এত সহজে বৃদ্ধি করা চলে না। অবশ্য প্রতিভূ কাগজী মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করিতে হইলে সমমূল্যের ধাতু বা ধাতব মুদ্রা গচ্ছিত রাখা প্রয়োজন হয়। তখন কাগজী মুদ্রার যোগান বাড়ানো তত সহজ নহে।

কাগজী মুদ্রার প্রধান অসুবিধা এই যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন যখন বাড়িতে থাকে, তখন রাষ্ট্র অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে মুদ্রা ছাপাইতে আরম্ভ করে। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। মুদ্রার মূল্য কমিয়া যায়। স্বদেশে এবং বিদেশে তখন মুদ্রার মর্যাদা কমিয়া যায়। মুদ্রার মূল্য কমার ফলে যাহাদের হাতে নোট থাকে তাহারা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুদ্রাসৃজন ও ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট মুদ্রা (Creation of Money and Bank Money) ঃ

আগের দিনে রাজ-সরকার হইতে মুদ্রা তৈয়ারি ব্যবস্থা হইত। অপর কেহ এই কাজ করিতে পারিত না। তখন ধাতব মুদ্রাই ছিল একমাত্র মুদ্রা। ধীরে ধীরে যখন কাগজী মুদ্রার প্রচলন হইল, তখন দেখা গেল সরকার নিজে এই মুদ্রা সৃষ্টি না করিয়া কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের হাতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কাগজী মুদ্রা-সৃষ্টির ভার দিলে অনেক সুবিধা হয়। আজকাল সেইজন্য সকল দেশেই কাগজী মুদ্রার সৃষ্টির কাজটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কই আমাদের দেশের কাগজী মুদ্রা তৈরি করে। অবশ্য সরকার ছোট ধাতব মুদ্রা তৈরী করে।

কেবল যে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকারই দেশে টাকাকড়ির সৃষ্টি করে, এমন নহে। দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কও পরোক্ষভাবে টাকাপয়সার সৃষ্টি করিয়া যোগান বৃদ্ধি করে। লোকে ব্যাঙ্কের নিকট টাকা জমা রাখে। ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে ব্যাঙ্কের উপর গচ্ছিত টাকার পরিমাণ চেক কাটিবার সুযোগ দেয়। আমানতকারী তাহার পাওনাদারদের নগদ টাকা না দিয়া চেক দেয়। পাওনাদার যদি নগদ টাকা দাবী

না করিয়া এই চেক লয়, তবে সেই চেক-ই সমূহ টাকার কার্য সম্পাদন করে। তাহা হইলে ব্যাঙ্কের চেক সাময়িকভাবে টাকার কার্য করে।

চেক (Cheque) ঃ

লোকে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে। এই আমানতকারী ঐ জমা টাকা হইতে অন্য কাহাকেও টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্ককে যে লিখিত নির্দেশ দেয়, তাহাকে বলে চেক। চেক মুদ্রিত আকারে থাকে। ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে মুদ্রিত চেকের একখানা বহি দেয়। চেকে লেখা থাকে—(১) .... কে..... (২)..... টাকা দিবেন। প্রথম শূন্য স্থানে যাহাকে টাকা দিতে হইবে তাহার নাম এবং দ্বিতীয় শূন্য স্থানে টাকার পরিমাণ লিখিতে হয়। তলদেশে আমানতকারীর স্বাক্ষর থাকে।

আমানতকারী দ্রব্যের বিনিময়ে বা অন্য বাবদে কাহাকেও অর্থ দিতে হইলে নগদ অর্থ না দিয়া চেক দেয়। যে চেক গ্রহণ করে সে আমানতকারীকে বিশ্বাস করে বলিয়াই চেক গ্রহণ করে। চেকগ্রহণকারী সঙ্গে সঙ্গে টাকা পায় না, কিছু কাল পরে টাকা পায়।

চেক অর্থেব কাজ কবে, তথাপি চেক অর্থ নহে। অর্থের সঙ্গে ইহার পার্থক্য আছে। অর্থ বা মুদ্রা সকলে গ্রহণ করে। কিন্তু চেকপ্রদানকারীকে যে জানে এবং বিশ্বাস করে, মাত্র সেই ব্যক্তিই চেক গ্রহণ করে। কাজেই বলা যায় চেকের সর্বজনগ্রাহ্যতা নাই। দ্বিতীয়তঃ অর্থ বা মুদ্রা দিয়া দেনা পাওনার কাজ করিলে দেনা-পাওনা সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়া যায়। চেক দিয়া দেনা-পাওনাব কার্জ করিলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে মিটে না। চেকেব সঙ্গে অর্থেব বা মুদ্রার আর একটি পার্থক্য আছে। মুদ্রা অনেকবার হাত বদলাইতে পাবে, কিন্তু চেক অল্প কয়েক বার হাত বদলাইতে পাবে। এই সকল কারণে চেককে পুরাপুবি অর্থ বলা যায় না।

ব্যাঙ্ক (Bank) ঃ

এইবার ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে এবং ব্যাঙ্কের কি কাজ তাহা আলোচনা করা যাউক।

যে প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে মানুষ টাকা ধার লয় এবং যে প্রতিষ্ঠানের নিকট মানুষ টাকা জমা রাখে, সেই প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলা হয়। জমা-রাখা টাকার জন্য ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে কিছু সুদ দেয়। আবার ব্যাঙ্ক যে টাকা ধার দেয় তাহার জন্য ঋণগ্রহণকারীর নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করে।

ব্যাঙ্কের উপর লোকের বিশ্বাস থাকা চাই। তাহা না হইলে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কেহ

কারবার বা লেন-দেন করে না। ব্যাঙ্ক লোকের জমা-রাখা টাকার সাহায্যে কারবার করে। লোকের যদি ব্যাঙ্কের উপর আস্থা না থাকে, তবে তাহারা টাকা জমা রাখে না। কাজেই ব্যাঙ্ক অচল হয়।

তিন প্রকারের আমানত লইয়া ব্যাঙ্ক কাজ করে। এক প্রকারের আমানতকে বলে চলতি আমানত (current deposit)। এই আমানতকারী যখনই টাকা ফেরৎ চাহে তখনই তাহাকে টাকা ফেরত দিতে হয়। আর এক প্রকারের আমানতকে বলা হয় সঞ্চয়ী আমানত (savings deposit)। এই আমানতকারী অল্প ব্যবধানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর টাকা ফেরত পাইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সঞ্চয়ী আমানতকারীকে টাকা ফেরৎ লইতে হইলে পূর্বাহ্নে ব্যাঙ্ককে সংবাদ দিতে হয়। তৃতীয় প্রকার আমানতের নাম স্থায়ী আমানত (Fixed-deposit)। এই ধরনের আমানতকারী নির্দিষ্ট সময়ের পর টাকা ফেরৎ পায়। সাধারণতঃ আমানতের এক বৎসরের মধ্যে টাকা ফেরৎ পায় না।

ব্যাঙ্ক জানে যে, আমানতকারীরা সকলে এক সঙ্গে সমস্ত টাকা ফেরত চাহে না। সব সময় ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর টাকা মজুত থাকে। ব্যাঙ্ক সেই টাকা কিছুটা যাহারা টাকা জমা রাখে, তাহাদের চাহিদা মিটাইবার জন্য মজুত রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা ধার দেয়। ধার দিবার সময় ব্যাঙ্ক ঋণকারীর নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ জামানত লয়। ধার হইতে যে সুদ পায় তাহা ব্যাঙ্কের অন্যতম আয়ের উপায়।

ব্যাঙ্ক কোন কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশ (share) ক্রয়-বিক্রয় করে। আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক হুণ্ডিও ব্যাঙ্ক ক্রয়-বিক্রয় করে। কেহ কেহ অলঙ্কার-পত্র বা মূল্যবান দলিল-আদি ব্যাঙ্কে জমা রাখে। সেইজন্যও ব্যাঙ্ক আমানতকারীর নিকট হইতে সামান্য অর্থ আদায় করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank) :

প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্ক দেশের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করে। কাগজী মুদ্রা চালু করার ভার এই ব্যাঙ্কের হাতে। প্রচলিত মুদ্রার প্রয়োজনমত হ্রাস-বৃদ্ধি করার দায়িত্বও এই ব্যাঙ্কের। এই ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্কের কাজ করে। সরকারী অর্থ এই ব্যাঙ্কে জমা হয় এবং এই ব্যাঙ্কের সাহায্যে সরকারের দেনা টাকা পরিশোধ হয়। দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট টাকা জমা রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন উপায়ে দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণদাননীতি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক কি হারে সুদ গ্রহণ করিবে, কি ভাবে ঋণ দিবে—এই সব ব্যাপারে নির্দেশ দিবার আইন-গত অধিকার কোন কোন

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আছে।. কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক সবকাব-পবিচালিত অথবা সরকাব-সমর্থিত ব্যাঙ্ক।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিব কার্য নিযন্ত্রণ কবে, কিন্তু সেগুলির সঙ্গে কোনও প্রকারের প্রতিযোগিতা করে না। সাধারণতঃ কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক জামানতের উপব সুদ দেয না বা সম্পত্তি জামানত বাখিযা ঋণ দেয না। অন্যান্য ব্যাঙ্ক এই সকল কাজ করে। কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ককে দেশের মুদ্রানীতি অটুট রাখিবাব ভার দেওযা হয। ব্যবসায় করিযা আয বাড়াইবাব দিকে মনোযোগ দেওয়া কেন্দ্রীয ব্যাঙ্কেব কাজ নহে। এই ব্যাঙ্ক ব্যবসাযী ব্যাঙ্ক নহে।

বিভিন্ন ব্যাঙ্কেব ঋণ নিযন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয ব্যাঙ্কের একটি বিশিষ্ট কাজ। দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক যদি হঠাৎ অধিক পবিমাণে ঋণ দিতে আরম্ভ কবে, তখন টাকাপযসার যোগান বাড়িযা যায। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায। লোকেব অসুবিধা হয। আবার হঠাৎ ঋণেব পবিমাণ, কমাইযা ফেলিলে টাকাপযসার যোগান কমিযা যায। দ্রব্যমূল্য কমিযা যায। তাহাতেও অসুবিধা হয। দেশের মোট টাকাপযসা দেশেব মোট প্রযোজনের অনুরূপ না হইলেই লোকেব অসুবিধা হয। সেইজন্য ব্যাঙ্কগুলিব ঋণ নিযন্ত্রণ কবা প্রযোজন। ঋণ নিযন্ত্রণ কবা কেন্দ্রীয ব্যাঙ্কেব কাজ। নিযন্ত্রণ করিতে কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত উপায অবলম্বন কবিতে পাবে।

(ক) কেন্দ্রীয ব্যাঙ্কেব সুদের হাব পরিবর্তন :—যখন দেখা যায যে ব্যাঙ্কগুলি অধিক পবিমাণে ঋণ দিতেছে তখন কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক তাহাব সুদেব হাব বাড়াইয়া দেয। অপবাপব ব্যাঙ্ককে সাধারণতঃ কেন্দ্রীয ব্যাঙ্কেব নিকট হইতে ঋণ করিতে হয। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদেব হাব বাড়াইযা দিলে ঋণপ্রার্থী ব্যাঙ্ককে অধিক সুদে ঋণ নিতে হয। ঋণ-গ্রহণকারী ব্যাঙ্ককে কাজেই অধিকতব সুদে ঋণ দিতে হয। সুদেব হাব বৃদ্ধি পায়—ঋণগ্রহণকাবীদেব ঋণ গ্রহণে উৎসাহ কমিযা যায। ব্যাঙ্কেব ঋণদানেব পরিমাণও কমিযা যায। আবাব যখন দেখা যায ব্যাঙ্কগুলি ঋণদান সংকোচন কবিযাছে, তখন ঋণদান সম্প্রসাবণ প্রযোজন মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদেব হাব কমাইয়া দেয়। ব্যাঙ্কগুলি অধিক পবিমাণে কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ কবে এবং কম সুদে টাকা ধাব দিতে পাবে। ঋণগ্রহণকাবীবাও ঋণ গ্রহণে উৎসাহ পায়। ব্যাঙ্কের ঋণদান বৃদ্ধি পায।

(খ) খোলা বাজারেব কাববাব :—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন দেখে যে সুদের হার বাড়াইযা কমাইযাও প্রযোজনানুসাবে ঋণেব পরিমাণ নিযন্ত্রণ করা যাইতেছে না, তখন কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক খোলা বাজারে সবকাবী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে। ব্যাঙ্কেব ঋণদানের

পরিমাণ কমানো প্রয়োজন মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলা বাজারে সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় আরম্ভ করে। সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিতে লোকেরা খুব আগ্রহশীল হয়। তাহারা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে আমানতের টাকা উঠাইয়া লয় এবং এই টাকা দিয়া ঋণপত্র ক্রয় করে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের জমা টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা হয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ঋণদান-ক্ষমতা কমিয়া যায়। আবার যখন লোকেরা খোলা বাজারে ঋণপত্র ক্রয় করে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের টাকা অন্য ব্যাঙ্কের হাতে গিয়া পড়ে। তাহাদের ঋণদান-ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। এই ভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমার অনুপাত পরিবর্তন :—বিভিন্ন ব্যাঙ্ককে নিজ চলতি এবং স্থায়ী আমানতের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলিকে চলতি আমানতের শতকরা পাঁচ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা দুই ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে এই জমার অনুপাত বাড়াইয়া দিতে পারে। যখন দেখা যায় ব্যাঙ্কগুলির হাতে টাকা বেশী এবং ইহারা অবাঞ্ছিতভাবে বেশী ঋণ দিতেছে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জামানতের অনুপাত বাড়াইয়া দেয়। ফলে ব্যাঙ্কগুলিকে অধিক পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়। তাহাদের আমানত কমিয়া যায় ও ঋণদান-ক্ষমতা কমিয়া যায়।

(ঘ) নৈতিক প্রণোদন :—যখন দেখা যায়, যে ঋণদানকারী ব্যাঙ্কগুলি দেশের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিতেছে না, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির নিকট দেশের স্বার্থবিরোধী কার্য না করিতে অনুরোধ করে। সাধারণ অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলি এই অনুরোধ রক্ষা করে।

(ঙ) ঋণ বরাদ্দ নীতি :—কখনও কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অন্যান্য ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দেওয়ার আইন-গত ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ঋণ দিবার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে এবং এইভাবে ঋণদান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

অপরাপর ব্যাঙ্ক (Other Banks) :

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া লাভ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য নহে। দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কের অবশ্য উদ্দেশ্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ে অর্থ খাটাইয়া লাভ করা। সেইজন্য এই সকল ব্যাঙ্ককে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক (Commercial Banks) বলা হয়।

এই সকল ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে টাকা জমা লয়। এই জমার জন্য ব্যাঙ্ক জমাকারীকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়। জমা-রাখা

টাকা বিভিন্নভাবে খাটাইয়া ব্যাঙ্ক লাভ করে। যাহারা টাকা জমা রাখে তাহারা সময় সময় কেহ সম্পূর্ণ টাকা, কেহ জমা-রাখা টাকার কিছু অংশ ফেরৎ লয়। কাজেই জমা-রাখা টাকার কিছু অংশ ব্যাঙ্ক অন্য কাজে খাটাইতে পারে। ব্যাঙ্কগুলি অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারে, মোট জমা টাকার কত অংশ আমানতকারীদের সময় সময় চাহিদা মিটাইবার জন্য রাখিতে হইবে। সে পরিমাণ টাকা মজুত রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্ক খাটাইতে পারে।

ব্যাঙ্ক বিভিন্ন উপায়ে অর্থ বিনিয়োগ করে। ব্যক্তি-বা প্রতিষ্ঠান-বিশেষকে উপযুক্ত পরিমাণ জামানত রাখিয়া ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়। যে সুদে ব্যাঙ্ক টাকা জমা রাখে, তাহা অপেক্ষা অধিক সুদে ব্যাঙ্ক এই ভাবে টাকা ধার দেয়। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্ক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশ (share) ক্রয় করে বা অংশ জামানত রাখিয়া ঋণ দেয়। প্রয়োজন-বোধে এই অংশ (share) আবার বিক্রয় করিয়া দেয়। ইহা হইতে ব্যাঙ্কের লাভ হয়। এই ধরনের অন্যান্য কার্যের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সকল কার্যের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকে। তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট পবিমাণ অর্থ জমা রাখিতে হয়। কি কি কাজে তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহারও নির্দেশ দিতে পারে। সুদের হারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ককে কয়েকটি নীতি মানিয়া কাজ করিতে হয়। কোন ব্যাঙ্কের পক্ষেই দীর্ঘকালের জন্য ঋণ বা স্থায়ী ঋণ দেওয়া সঙ্গত নহে। এইরূপ ঋণ দিলে নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সংগ্রহ করা কঠিন হয়। ব্যাঙ্কের পক্ষে কোন একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হওয়া সঙ্গত নহে বা নিজে কোন শিল্প-পরিচালনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব লওয়া সঙ্গত নহে। তাহাতে কোন কারণে ঐ শিল্পের অবস্থা খারাপ হইলে ব্যাঙ্কের অবস্থা খারাপ হয়। ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহার অর্থ যে-কোন এক উপায়ে না খাটাইয়া বিভিন্ন উপায়ে খাটানো উচিত। যে-কোন এক উপায়ে টাকা খাটাইলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিভিন্ন উপায়ে টাকা খাটাইলে এক উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও অন্য উপায়ে লাভের ভরসা করা চলে। সর্বশেষে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের মনে রাখা উচিত যে, এমনভাবে তাহার টাকা খাটানো উচিত যাহার ফলে প্রয়োজনমত যে-কোন সময় ব্যাঙ্ক নগদ টাকা হাতে আনিতে পারে। এই সকল নীতি মানিয়া চলিলে ব্যাঙ্কের পক্ষে বিপদের আশঙ্কা কম থাকে।

চেকের সাহায্যে লেন-দেন হওয়ার ফলে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক ব্যাঙ্কের অন্য ব্যাঙ্কের নিকট যেমন কিছু টাকা পাওনা হয়, তেমন আবার দেনাও হয়। হিসাব

করিলে দেখা যায়, এক জায়গায় যতগুলি ব্যাঙ্ক কাজ করে, তাহাদের সবগুলির একের অন্যের নিকট পাওনা থাকে। এই পাওনা টাকা নিকাশ করিয়া বাদ দিলে এক ব্যাঙ্কের অন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে হয়ত পাওনা থাকে না বা সামান্যই পাওনা থাকে। কাজেই প্রত্যেকখানা চেক নগদ টাকা দিয়া শোধ না করিয়া হিসাবে কাটাকাটি করিয়া দেওয়া প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পক্ষেই সুবিধাজনক। হিসাব শেষ হইয়া গেলে সামান্য দেনা-পাওনা থাকিলে তাহা নগদ মিটাইয়া দেওয়া চলে অথবা হিসাবে দেনা-পাওনা বাড়াইয়া-কমাইয়া লইলেই চলে।

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে দৈনন্দিন দেনা-পাওনার হিসাব মিটাইয়া দিবার জন্য যে প্রতিষ্ঠান থাকে, তাহাকে নিকাশ ঘর (Clearing House) বলে। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের উপর দেওয়া যে সকল চেক পায়, তাহা নিকাশ ঘরে পাঠায়। সেখানে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনার নিকাশ হয়। অবশেষে যদি কোন ব্যাঙ্কের অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট পাওনা থাকে, তবে দেনা ব্যাঙ্ক পাওনাদারকে নগদ টাকা দিয়া হিসাব মিটাইতে পারে। আজকাল নগদ টাকা দিয়া হিসাব মিটাইবার প্রয়োজন হয় না। দেশের বড় কোন ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট সকল ব্যাঙ্ক টাকা জমা রাখে। নিকাশ ঘবের হিসাবে যদি দেখা যায় 'ক' নামক ব্যাঙ্কের 'খ' নামক ব্যাঙ্কে এক হাজাব টাকা দেনা হইয়াছে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 'ক' নামক ব্যাঙ্কের জমার টাকা এক হাজাব কমিয়া যাইবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 'খ' নামক ব্যাঙ্কেব জমা-টাকা এক হাজার বাড়িয়া যাইবে। এই ভাবে নিকাশ ঘবেব সাহায্যে চেকে লেন-দেন সহজ হইয়াছে এবং নগদ অর্থ লেন-দেন না করিয়াও ব্যাঙ্কগুলি সহজে কাজ করিতে পারিতেছে।

ভারতের বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্ক (Different kinds of Banks in India) :

ভারতে এখন নানাপ্রকাবের ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে ভারতেব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। চৌদ্দ জন সদস্য লইয়া একটি পরিচালক সংস্থা আছে। এই সংস্থা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য পরিচালনা করে। এই ব্যাঙ্ক কাগজী মুদ্রা চালু করে এবং সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কেরও টাকা এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা থাকে। ইহা সরকারকে এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্ককে টাকা ধার দেয়।

ভারতের অপরাপর ব্যাঙ্কগুলিব মধ্যে বর্তমানে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। পূর্বে ইহাব নাম ছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক। ইহা যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক ছিল। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার আইন পাস করিয়া এই ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনে।

তখন ইহার নূতন নামকরণ হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি ঋণ দিবার উদ্দেশ্য লইয়া এই সুগঠিত ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রের অধীনে আনা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপন করিতেছে। বর্তমানে যে-সকল অঞ্চলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই, সেই সকল অঞ্চলে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেণ্ট হিসাবে সরকারী কাজ করে। ইহা ছাড়া স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া অন্যান্য ব্যাঙ্কের ন্যায় টাকা জমা রাখে, ধার দেয় এবং অন্যান্য কাজ করে।

ভারতে কতগুলি যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক (Joint Stock Banks) আছে। সাধারণের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া এই ব্যাঙ্কগুলি ইহাদের প্রথম মূলধন সংগ্রহ করিয়াছে। শেয়ারের মালিকগণ যৌথভাবে এই সকল ব্যাঙ্কের মালিক। এই ধরনের ব্যাঙ্কগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে-সকল ব্যাঙ্কের মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা কিংবা তাহার বেশী, সেগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত করা হয়। এই-গুলিকে বলা হয় তালিকাভুক্ত (Scheduled) ব্যাঙ্ক। অন্যগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। সেইগুলি নন-সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক। সকল ব্যাঙ্ককেই কার্য আরম্ভ করিয়া পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে লাইসেন্স লইতে হয়। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক-গুলিকে প্রয়োজনমত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়া সাহায্য করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ইহাদিগকে ইহাদের স্থায়ী আমানতের শতকরা ২৲ টাকা হইতে ৮৲ পর্যন্ত জমা রাখিতে হয় এবং চলতি আমানতের শতকরা ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্যন্ত জমা রাখিতে হয়।

যৌথ ব্যাঙ্কগুলি সাধারণের নিকট হইতে টাকা জমা লয় এবং উপযুক্ত জামানত লইয়া ঋণ দেয়। ইহারা আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয় করে। অলঙ্কার এবং মূল্যবান দলিলপত্রাদিও জমা রাখে। এক কথায় ব্যাঙ্কের করণীয় প্রায় সকল কাজই এইগুলি করিয়া থাকে।

আর একপ্রকারের ব্যাঙ্ক আছে। সেগুলির নাম জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক। জমির স্থায়ী উন্নয়নের জন্য কৃষকদের দীর্ঘকালের জন্য ঋণের প্রয়োজন হয়। যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক বা সমবায় ব্যাঙ্ক এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে পারে না। সেইজন্য নূতন এই জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলি জমি বন্ধক রাখিয়া কৃষকদের দীর্ঘকালের জন্য টাকা ধার দেয়। সাধারণতঃ জমির স্থায়ী উন্নতি-বিধান করার জন্য, পুরাতন ঋণ শোধ করার জন্য কিংবা নূতন জমি কিনিবার জন্য ঋণ দেওয়া হয়। এই ঋণের পরিমাণ জমির মূল্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী নহে। ভিন্ন কিস্তিতে সাধারণতঃ বিশ বছরে এই টাকা শোধ দেওয়া হয়।

অনেকগুলি বড় বড় বিদেশী ব্যাঙ্ক আমাদের দেশে তাহাদের শাখা খুলিয়াছে। ইহারা বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য টাকা লেন-দেন করে বলিয়া ইহাদিগকে বিনিময় ব্যাঙ্ক (**Exchange Banks**) বলে। যাহারা বিদেশী মাল আমদানি করে এবং বিদেশে মাল রপ্তানি করে, তাহাদের সঙ্গে এই বিনিময় ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। এই সকল বিনিময় ব্যাঙ্ক আমদানি-রপ্তানিকারীদের লেন-দেনের কাজে সাহায্য করে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনিলে বা বিদেশে পাট পাঠাইলে, তাহাদের লেন-দেনের কাজে এই সকল বিনিময় ব্যাঙ্ক সাহায্য করে। আবার বিদেশীরা এই দেশে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিলে বা এদেশ হইতে দ্রব্য ক্রয় করিলে এই সকল ব্যাঙ্ক লেন-দেনের কাজে সাহায্য করে। আজকাল এদেশেরও কোন কোন ব্যাঙ্ক এই ধরনের কাজ করিতেছে।

পোস্ট আফিসের সঙ্গেও এক ধরনের ব্যাঙ্ক আছে। এইগুলির নাম সেভিংস্ ব্যাঙ্ক। এইগুলি সাধারণের নিকট হইতে টাকা জমা লয়। তাহার জন্য আমানতকারীকে সুদ দেয়। অবশ্য এই ব্যাঙ্ক ধার দেয় না। আগে এই রকমের জমা-টাকা চেকের সাহায্যে উঠানো যাইত না। এখন বড় বড় শহরে পোস্ট আফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের জন্যও চেকের প্রবর্তন হইয়াছে।

এই সকল ব্যাঙ্ক ছাড়া আমাদের দেশে গ্রাম্য মহাজনরাও লোকের নিকট হইতে টাকা জমা লয় এবং লোককে টাকা ধার দেয়। ইহারা আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে হুণ্ডির কারবার করে। এইগুলি প্রায়ই পারিবারিক ব্যাঙ্ক। ইহাদের মোট কারবারের পরিমাণ অন্যান্য সকল ব্যাঙ্কের মোট কারবারের তুলনায় কম নহে।

প্রশ্ন

১। টাকাপয়সা বা মুদ্রার কাজ কি? (পৃঃ ১২৫-২৬)

২। কাগজী মুদ্রা কত প্রকারের হইতে পারে? (পৃঃ ১২৯-৩০)

৩। মুদ্রামান কি? কত প্রকারের মুদ্রামান হইতে পারে? পৃঃ ১২৭-২৮)

৪। ব্যাঙ্কের কাজ কি? ব্যাঙ্ক কি ভাবে টাকাপয়সা সৃষ্টি করে? (পৃঃ ১৩১-৩২)

৫। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ কি? কি ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে? (পৃঃ ১৩২ ৩৪)

৬। ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের কার্যাবলী আলোচনা কর। (পৃঃ ১৩৬-৩৮)

ষোড়শ অধ্যায়

অর্থ এবং দ্রব্যমূল্য

অর্থের মূল্য :

একখানা কাপড়ের বিনিময়ে পাঁচ টাকা পাওয়া যায়। কাপড়খানার বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায় তাহাই কাপড়খানার মূল্য। এই ক্ষেত্রে পাঁচ টাকা কাপড়খানার মূল্য। কোন দ্রব্যের বিনিময়ে কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তাহা দিয়া সেই দ্রব্যের মূল্য ঠিক হয়। অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ অন্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা দিয়া অর্থের মূল্য ঠিক হয়। সকল দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয় অর্থের পরিমাপে। অর্থের মূল্য নির্ধারিত হয় অন্য সকল দ্রব্যের পরিমাপে। এক টাকায় এক সময় দশ কিলোগ্রাম চাউল, আট কিলোগ্রাম ডাল, অথবা আধ কুইন্টাল আলু পাওয়া যাইত, অন্য সময় এক টাকায় দেড় কিলোগ্রাম চাউল, এক কিলোগ্রাম ডাল এবং তিন কিলোগ্রাম আলু পাওয়া যাইত। তাহা হইলে বলিতে পারি পূর্বে টাকার মূল্য বেশী ছিল, পরে কম হইল। কোন দ্রব্যের মূল্য বলিতে আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের কথা বলিতে পারি। একখানা কাপড়ের মূল্য পাঁচ টাকা, এক কুইন্টাল চাউলের মূল্য পঁচিশ টাকা। অর্থের মূল্যের কথা সেইভাবে বলা হয় না। অর্থের মূল্যের বাড়তি-কমতির কথাই বলা হয়। বাড়তি-কমতির হারের কথাও বলা হয়। অর্থের মূল্য যখন বাড়ে অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে যখন বেশী পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায়, তখন বলা হয় অর্থের উপচয় (Appreciation) হইয়াছে। আবার অর্থের মূল্য যখন কমে অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে যখন কম পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায়, তখন বলা হয় অর্থের অপচয় (Depreciation) হইয়াছে।

সাধারণ মূল্যস্তর ও তাহার পরিবর্তনের পরিমাপ :

অর্থমূল্যের বৃদ্ধি অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের হ্রাস—এইরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যের হ্রাস বলিতে দ্রব্যাদির গড়পড়তা মূল্যের হ্রাস বুঝায়। দ্রব্য বিভিন্ন শ্রেণীর হয়। বিবিধ দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্যকে বলা হয় মূল্যস্তর। চাউল, আটা, কাপড়, লবণ, কেরোসিন, কয়লা প্রভৃতি সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্যকে সেই হিসাবে সাধারণ মূল্যস্তর বলা যায়। সাধারণ মূল্যস্তর হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণের সুখ-দুঃখের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। কাজেই মূল্যস্তরের পরিবর্তন দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বৎসরের মূল্যস্তরের তুলনা করিয়া এই পরিবর্তন নির্ণয় করা হয়। এই তুলনামূলক কাজে সাহায্য করে সূচক সংখ্যা (Index Numbers)। এইবার সূচক সংখ্যা কি এবং কিভাবে ইহা মূল্যস্তরের পরিবর্তন পরিমাপে সাহায্য করে, তাহার আলোচনা করা যাউক।

সূচক সংখ্যা (Index Numbers) :

দ্রব্যের মূল্যের বাড়তি-কমতির একটা রীতি আছে। সাধারণতঃ প্রায় সকল দ্রব্যের মূল্যই একসঙ্গে বাড়ে, আবার একসঙ্গে কমে। সকল দ্রব্যের বাড়তি-কমতির হার একরকম হয়ত হয় না। চাউলের মূল্য যদি চারি-গুণ বাড়ে, ডালের মূল্য তিন-গুণ বাড়ে। কাপড়ের মূল্য হয়ত আবার পাঁচ গুণ বাড়ে। এই ভাবে দেখা যায়, মূল্য বাড়িতে থাকিলে সকল দ্রব্যেরই মূল্য বাড়ে। মূল্য কমিতে থাকিলে সকল দ্রব্যেরই মূল্য কমিতে থাকে। অর্থের মূল্য বাড়িল না কমিল, তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে যে-কোন সময়ে সকল দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য ঠিক করিতে হয়। একটি স্বাভাবিক বৎসরকে হিসাবের ভিত্তি বলিয়া ধরা হয়। এই সময়ে সাধারণতঃ মানুষ যে-সকল জিনিস খরিদ করে, সেইগুলির গড়পড়তা মূল্যকে বাড়তি-কমতি হিসাবের ভিত্তি বলিয়া মনে করা হয়। আবার পরেব যে-কোন বৎসরের ঐ সকল দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য হিসাব করা হয়। এই দুই বৎসরের গড়পড়তা মূল্যের তুলনা করিয়া মূল্য বাড়িল না কমিল, তাহা ঠিক করা হয়। ভিত্তি বৎসরের মূল্যের গড় মনে করা যাক ১০০। পরের বৎসরের মূল্যের গড় যদি ১৮০ হয়, তবে হিসাব অনুসারে শতকরা আশি হারে দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে বলা হয়। যে অনুপাতে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে, সে অনুপাতে অর্থের মূল্য কমে।

তুলনার উদ্দেশ্যে রচিত বিভিন্ন বৎসরের দ্রব্যমূল্যের গড়কে সূচক সংখ্যা বলা হয়। কোন-একটি স্বাভাবিক বৎসরকে ভিত্তি বৎসর বলিয়া ধরা হয়। ভিত্তির বৎসরের সূচক সংখ্যার সঙ্গে অন্য যে-কোন এক বৎসরের সূচক সংখ্যার তুলনা করিলে মূল্যের বাড়তি-কমতির হার ঠিক করা যায়। কিভাবে এই সূচক সংখ্যার তুলনা করা হয়, তাহা নিম্নে দেখানো যাইতেছে।

মনে করি ১৯৩৯ সাল ভিত্তি বৎসর। এই বৎসরের কয়েকটি মোটামুটি ব্যবহার্য দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের মূল্য ১০০ ধরা হইল। ২৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে সেই সকল দ্রব্যের মূল্যের পরিবর্তনের হার দেখানো হইল।

	১৯৩৯	১৯৫৫
চাউল	১০০	৪০০
ডাল	১০০	৩৫০
মাছ	১০০	৪২৫
কাপড়	১০০	৩৭৫
তরকারি	১০০	৩০০
	৫০০	১৮৫০

যে সকল দ্রব্যের মূল্য মোট ৫০০৲ ছিল তাহার মূল্য এখন ১৮৫০৲ হইল।

" " " " " ১৲ " " " " $\frac{১৮৫০}{৫০০}$ "

" " " " ১০০৲ " " " " $\frac{১৮৫০ \times ১০০}{৫০০}$

=৩৭০৲ হইল।

১৯৩৯ সালে যে পরিমাণ চাউলের মূল্য ১০০৲ ছিল, সে পরিমাণ চাউলের মূল্য ১৯৫৫ সালে ৪০০৲ টাকা হইয়াছে। সেইরূপ যে পরিমাণ ডালের মূল্য ১০০৲ টাকা ছিল, সে পরিমাণ ডালের মূল্য ৩৫০৲ টাকা হইয়াছে। যে পরিমাণ মাছের মূল্য ১০০৲ টাকা ছিল, সে পরিমাণ মাছের মূল্য ৪২৫৲ টাকা হইয়াছে। যে পরিমাণ কাপড়ের মূল্য ১০০৲ টাকা ছিল, সে পরিমাণ কাপড়ের মূল্য ৩৭৫৲ টাকা হইয়াছে। যে পরিমাণ তরকারির মূল্য ১০০৲ টাকা ছিল, সে পরিমাণ তরকারির মূল্য ৩০০৲ টাকা হইয়াছে। উভয় বৎসরের মূল্য যোগ করিলে দেখা যায় ৫০০৲ টাকায় যে পরিমাণ চাউল, ডাল প্রভৃতি ১৯৩৯ সালে পাওয়া যাইত, এখন তাহার জন্য ১৮৫০৲ টাকা ব্যয় করিতে হয়। ত্রৈরাশিক নিয়মে দেখা যায় ১০০৲ টাকায় যে পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যাইত, এখন সেই পরিমাণ দ্রব্য পাইতে ৩৭০৲ টাকা লাগে। ইহাতে বুঝা যায় দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে ২৭০%। এইরূপ ভিত্তির বৎসরের সূচক সংখ্যার সঙ্গে যে-কোন-বৎসরের সূচক সংখ্যার তুলনা করিলে মূল্যের পরিবর্তনের হিসাব পাওয়া যায়।

অর্থের মূল্য-পরিমাণ তত্ত্ব (Quantity Theory of Money) :

নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ অপরাপর দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা দিয়া ঐ পরিমাণ অর্থের মূল্য হিসাব করা হয়। অর্থের মূল্য নির্ভর করে অর্থের পরিমাণের উপর। যে অনুপাতে অর্থের পরিমাণ বাড়ে, সেই অনুপাতে অর্থের মূল্য কমে এবং যে অনুপাতে অর্থের পরিমাণ কমে, সেই অনুপাতে অর্থের মূল্য বাড়ে। অবশ্য অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা চাই। যে-কোন সময়ে দেশে যদি অর্থের পরিমাণ পূর্বের দ্বিগুণ হয়, তবে অর্থের মূল্য অর্ধেক হইবে। অর্থাৎ পূর্বে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে যে-সকল দ্রব্য পাওয়া যাইত, এখন তাহার অর্ধেক দ্রব্য পাওয়া যাইবে। যে-কোন ভাবে মোট প্রচলিত অর্থের অর্ধেক যদি সরাইয়া লওয়া যায়, তবে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হইবে। অর্থাৎ পূর্বে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যাইত, এখন তাহার দ্বিগুণ দ্রব্য পাওয়া যাইবে। একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলেই এইরূপ হয়।

অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তন হইলে এইরূপ হয় না। **অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে** *সঙ্গে সঙ্গে যদি দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ে, তবে অর্থের মূল্য পরিমাণের অনুপাতে কমিবে না।*

অন্যান্য দ্রব্যের মত অর্থের মূল্যও তাহার চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভর করে। যদি চাহিদা স্থির থাকে, তবে যোগানের উপর অর্থের মূল্য নির্ভর করে। যদি যোগান স্থির থাকে, তবে চাহিদার উপর মূল্য নির্ভর করে। আর উভয় যদি বদলাইতে থাকে তবে উভয়ের দ্বারা মূল্য স্থির হয়। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় টাকার চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থির। কাজেই টাকার মূল্যের উপর যোগানের প্রভাবই বেশী।

টাকার চাহিদা এবং যোগান বলিতে কি বুঝা যায়, তাহা দেখা প্রয়োজন। দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। যখন বেশী ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন হয়, দ্রব্যাদি যখন বাড়ে, তখন বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থের চাহিদা বাড়ে। অন্য-দিকে অর্থের মোট পরিমাণ দিয়া অর্থের যোগান ঠিক হয়। কোন এক সময়ে যদি বাজারে দশ লক্ষ টাকা চালু থাকে, তবে যোগান দশ লক্ষ টাকাই বলিতে হইবে। কোন এক সময়ের মধ্যে একটি মুদ্রা তিন-চারি বার বিনিময়ের কাজে সাহায্য করিতে পারে। সময় যদি এক সপ্তাহ আমরা ধরি, তবে দেখি এক ব্যক্তি একটি টাকা দিয়া চাউল কিনে। চাউল-বিক্রেতা ঐ টাকা দিয়া মাছ কিনে। মাছ-বিক্রেতা ঐ টাকা দিয়া সুতা কিনে। তাহা হইলে দেখা যায, এক সপ্তাহের মধ্যে একটি টাকা তিন-বার বিনিময়ে কাজের ব্যবহৃত হইতে পারে। একটি মুদ্রা সপ্তাহের মধ্যে তিনটি মুদ্রার কাজ করে। যদি এইভাবে দশ লক্ষ মুদ্রা প্রত্যেকটি তিন বার করিয়া বিনিময়ের কাজে ব্যবহৃত হয়, তবে দশ লক্ষ মুদ্রা ত্রিশ লক্ষ মুদ্রার সমান কাজ করে। কাজেই বাজারে দশ লক্ষ মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেও অর্থের যোগান ত্রিশ লক্ষের সমান হইবে। একটি মুদ্রা যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিন বার বিনিময়ের কাজে লাগে, তবে বলা হয় ঐ মুদ্রার প্রচলন-বেগ (Velocity of Circulation) তিন। মুদ্রার সংখ্যাকে প্রচলন-বেগ দিয়া গুণ করিলে মুদ্রার মোট যোগান পাওয়া যায়। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে জিনিসের গড়পড়তা মূল্যকে ঐ সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হয়, তাহা দিয়া গুণ করিলে তাহা মোট অর্থের চাহিদার সমান হয়। মনে করি, দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য 'ম' এবং নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ 'স', অর্থের পরিমাণ 'অ' এবং প্রচলনের বেগ 'প'। তাহা হইলে আমাদের নিয়ম অনুসারে $ম \times স = অ \times প$ অর্থাৎ $ম = \frac{অ \times প}{স}$। আমেরিকান অর্থবিদ্ ফিসার (Fisher) এই সমীকরণটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই এই সমীকরণকে বলা হয় ফিসারের পরিমাণ-

তত্ত্বের সমীকরণ। ফিসার দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্যের জন্য ধরিয়াছেন P, বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণের জন্য ধরিয়াছেন T, অর্থের পরিমাণের জন্য ধরিয়াছেন M এবং প্রচলন-বেগ (Velocity of Circulation)-এর জন্য ধরিয়াছেন V। তাঁহাব সমীকরণটি হইল $P=\frac{M\times V}{T}$ অর্থাৎ $P\times T=M\times V$। মূল্যস্তব টাকাব পবিমাণের উপর নির্ভর করে। টাকার পরিমাণ বাড়িলে মূল্যস্তর বাড়ে অর্থাৎ টাকার মূল্য কমে। আবার টাকার পরিমাণ কমিলে মূল্যস্তর নামে অর্থাৎ টাকাব মল্য বাড়ে।

উপরের সমীকরণে আমরা বাজারে মোট প্রচলিত ধাতব মুদ্রা বা কাগজী নোটকে প্রচলন বেগ দিয়া গুণ করিয়া যাহা গুণফল পাইলাম তাহাকেই টাকার মোট পরিমাণ ধরিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান কালে লোকেরা নগদ টাকা না দিয়া চেকের সাহায্যেও ক্রয় বিক্রয়ের কাজ করে। সুতরাং মোট টাকার পরিমাণ হিসাব করিতে হইলে এই চেকের পরিমাণও যোগ করিতে হইবে। কেবল তাহা হইলেই চলিবে না। একখানা চেক কোন নির্দিষ্ট সময়ে একাধিক বার ক্রয় বিক্রয়ের কাজ করিতে পারে। যেমন—রাম শ্যামের নিকট হইতে এক শত টাকার চেক গ্রহণ করিয়া পাঁচ কুইণ্টাল গম বিক্রয় করিল। রাম আবার ঐ চেকখানায় নিজ নাম সহি করিয়া উহা হরিকে দিয়া পর দিনই তিন কুইণ্টাল চাউল ক্রয় করিল। তাহা হইলে দেখা যায় এক শত টাকার চেক দুই শত টাকার কাজ করিল। এই চেকের প্রচলিত বেগ দুই। তাহা হইলে মোট চেকের টাকাব পরিমাণ ঠিক করিতে হইলে উহাকে আবার উহার প্রচলন বেগ দিয়া গুণ করিতে হইবে। নগদ টাকার প্রচলন বেগ আর চেকের প্রচলন বেগ এক নহে। নগদ টাকা সহজে হাত বদল করে, চেক কখনও তত সহজে হাত বদল করে না। কাজেই নগদ টাকাব সঙ্গে চেক যোগ করিয়া তাহাকে একই প্রচলন বেগ দিযা গুণ করিলে মোট টাকার পরিমাণ পাওয়া যাইবে না। নগদ টাকাকে তাহার প্রচলন বেগ দিয়া গুণ করিয়া গুণ ফলের সহিত চেক এবং চেকের প্রচলন বেগের গুণ ফল যোগ করিতে হয়। এক্ষেত্রে আমরা যদি চেককে M'-এর সমান মনে করি এব চেকেব গতি বেগকে V'-এর সমান মনে করি তবে মোট টাকার পরিমাণ জানিতে MV-এর সঙ্গে $M'V'$ যোগ করিতে হইবে। অর্থাৎ তখন মোট টাকার পরিমাণ হইবে $MV+M'V'$। সে অবস্থায় আমাদেব পরিমাণতত্ত্বেব সমীকরণ হইবে $P=\frac{MV+M'V'}{T}$.

পরিমাণ তত্ত্বের নিয়মে টাকার যোগান বাড়িলে টাকার মূল্য কমে। অর্থাৎ প্রতি টাকায় পূর্বাপেক্ষা কম দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। সকল সময় এই নিয়ম পুরাপুরি

ঠিক নাও হইতে পারে। দেশে যখন টাকার পরিমাণ বাড়ে তখন লোকেদের হাতে বেশী টাকা যায়। বেশী টাকা হাতে আসিলে লোকেরা বেশী দ্রব্য কিনিতে চাহে। দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। মূল্যও বাড়ে। দ্রব্য-উৎপাদনকারীরা বেশী মূল্য চায়। অধিকতর লাভে উৎসাহিত হইয়া তাহারা অধিকতর দ্রব্য উৎপাদন করে। অবশ্য চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদন বাড়ে না। কিছু সময়ের ব্যবধানে এই উৎপাদন বাড়া সম্ভব হয। অবশেষে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে আবার মূল্যস্তর কমিয়া যায়। কারণ এক দিকে যেমন চাহিদা বাড়িযাছে আবার অন্য দিকে যোগানও বাড়িয়াছে। দেশে কোন সময় নিযোগ বহির্ভূত মূলধন এবং শ্রম থাকিলেই, সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা যায। কেবল সেই অবস্থাতেই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে কিছুকাল পরে দ্রব্যেরও পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং তখন অর্থের পরিমাণতত্ত্বের হিসাব আংশিকভাবে ব্যাহত হয়। সাধারণতঃ অর্থের পরিমাণ বাড়িলে মূল্য কমে এবং পরিমাণ কমিলে মূল্য বাড়ে।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) মুদ্রাসঙ্কোচ (Deflation) :

মুদ্রাস্ফীতির সাধারণ অর্থ, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি। স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায। সেই অর্থে মুদ্রাস্ফীতির অর্থ মূল্য বৃদ্ধি। বাস্তবিক পক্ষে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির তাৎপয একটু পৃথক। দেশের সরকার অথবা সরকারের অনুমোদিত ব্যাঙ্ক দেশে মুদ্রার প্রচলন করে। এই প্রচলনকারী কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইলে দেশে যদি কিছু-সংখ্যক লোক বেকার থাকে, তবে তাহারা কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে। তাহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইল। এই অবস্থায অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও মূল্যবৃদ্ধি পায় না। এই ধরনের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিকে সঠিক ভাবে মুদ্রাস্ফীতি বলা চলে না। এমন অবস্থা বিদ্যমান থাকিতে পারে যেই অবস্থায় দেশের সকল লোকই কর্মে নিযুক্ত আছে, উৎপাদন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আর নাই। এই অবস্থায যদি অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখন দ্রব্য মূল্য বাড়িয়া যায। এই ধরনের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং তৎসহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)। অধিকতর মুদ্রার প্রচলনের ফলে লোকের আয় বৃদ্ধি পায। বর্ধিত-আয়-সম্পন্ন লোকেদের দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। অধিকতর দ্রব্য তাহারা কিনিতে চায়। দ্রব্যের উৎপাদন অপরিবর্তিত আছে। এই অবস্থায় মূল্য বাড়িতে থাকে। দ্রব্যের যোগানের তুলনায অর্থের পরিমাণ বেশী বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে

যে মূল্য বৃদ্ধি হয় তাহাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলে। কেবল মুদ্রার পরিমাণ বাড়াকেই মুদ্রাস্ফীতি বলা হয় না।

• মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত- অবস্থাকে বলা হয় মুদ্রাসঙ্কোচ। এই অবস্থার মুদ্রা-প্রচলনকারী কর্তৃপক্ষ মুদ্রার পরিমাণ সঙ্কোচিত করিলে যদি নিয়োগব্যবস্থার রদবদল সাধন করিয়া উৎপাদন সঙ্গে সঙ্গে কমান না যায় তবে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে। এই অবস্থায় মুদ্রাসঙ্কোচন এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাসকে মুদ্রাসঙ্কোচ বা মূল্যহ্রাস বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়ে। যাহাদের নির্দিষ্ট আয় তাহারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে বিপন্ন হয়। যাহারা দ্রব্য উৎপাদন করে তাহারা লাভবান হয় এবং আরও উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। অধিক লোক কর্মে নিযুক্ত হয়। অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়। আরও বেশী মুদ্রা বাজারে চালু হয়। মূল্য আরও বাড়ে। অর্থের মূল্য ক্রমে কমিতে থাকে। এমন অবস্থাও হইতে পারে যে, দেশের লোকেরা দেশের মুদ্রার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানিতে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার ফলে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থা হইলে দেশের মুদ্রানীতি ভাঙ্গিয়া পড়ে। ব্যবসায়-বাণিজ্য সব-কিছুই সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থা অমঙ্গলজনক।

আজকাল সেইজন্য মুদ্রা কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়-বাণিজ্য, উৎপাদন এবং নিয়োগের প্রয়োজন অনুসারে মুদ্রার পরিমাণ বাড়ায় বা কমায়। যখন দেখা যায় বাজারে অর্থের বা মুদ্রার চাহিদা বাড়িয়াছে, তখন তাহারা অধিকতর মুদ্রা বাজারে ছাড়ে। আবার যখন দেখা যায় মুদ্রার চাহিদা কম, তখন বাজার হইতে মুদ্রা উঠাইয়া লয়। ইচ্ছামত মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করার মত উপায় মুদ্রা কর্তৃপক্ষের আছে।

বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে একটি উপায়ের কথা দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর মুদ্রানীতি পরিচালনার ভার আছে। এই ব্যাঙ্ক যদি মনে করে বাজারের প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ কমাইতে হইবে, তবে ব্যাঙ্কের সুদের হার বাড়াইয়া দিবে। লোকে কম টাকা ধার লইবে এবং বেশী টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিবে। ফলে বাজার হইতে টাকা ব্যাঙ্কের হাতে গিয়া পড়িবে। আবার যদি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ মনে করে যে বাজারে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইতে হইবে, তখন ব্যাঙ্ক তাহার সুদের হার কমাইয়া দিবে। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য বেশী টাকা লোকে ধার করিবে এবং ব্যাঙ্কে কম টাকা জমা দিবে। ফলে বাজারে টাকার

পরিমাণ বাড়িবে। এই মুদ্রানীতিকে পরিচালিত মুদ্রানীতি (Managed monetary system) বলা হয়। আজকাল প্রায় সকল দেশেই এই ধরনের মুদ্রানীতি প্রচলিত আছে।

ভারতে দ্রব্যমূল্য ঃ

দ্রব্যের মূল্য সকল দেশেই কখনও বাড়ে, আবার কখনও কমে। আজকাল দেশে দেশে বাণিজ্য থাকার ফলে দেখা যায়, প্রায় একসঙ্গেই দ্রব্যের মূল্য বাড়ে অথবা কমে। বিগত কুড়ি বৎসরের মধ্যে ভারতে কিভাবে দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

১৯৩৯ সালে ভারতের নানাদিক দিয়া অবস্থা স্বাভাবিক ছিল। দ্রব্যের মূল্যও স্বাভাবিক ছিল। সেইজন্য দ্রব্যের মূল্য উঠা-নামার হিসাব করিতে হইলে ঐ বৎসরের সূচক সংখ্যাকে ১০০ হিসাবে ধরা হয়। ইহার পর দেখা যায় ১৯৪০ সালে যুদ্ধের ফলে দ্রব্যের মূল্য বাড়িতে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ সাল পর্যন্ত এই মূল্য বাড়িয়া প্রায় তিনগুণ হয়। দ্রব্যমূল্য বাড়িলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপেই ভারতে তখন দেখা দেয়। ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা ভাল হইল। কিন্তু নির্দিষ্ট আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের এবং মধ্যবিত্ত লোকদের অবস্থার অবনতি হইল।

সরকার এই সময়ে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য কয়েকটি নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। কতকগুলি দ্রব্যের উচ্চতম মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিল এবং শহরাঞ্চলের লোকেদের নির্দিষ্ট হারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু খুব ভালভাবে কার্যকরী করিতে না পারায় এই নীতি আশানুরূপ ফলবতী হয় নাই। দ্রব্যমূল্য বাড়িয়াই চলিল। যুদ্ধের শেষে মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ (Rationing) ১৯৪৭ সালের পর ধীরে ধীরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে দ্রব্যমূল্যের সূচক ৪৫০ হইল। ইহার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। দেশে মুদ্রাস্ফীতি ইতিমধ্যে কমানো হয়। দ্রব্যমূল্য ধীরে ধীরে সামান্য কমিতে থাকে। ১৯৫৫-৫৬ সালে দ্রব্যমূল্যের সূচক হইল ৩৫৬। ইহার পর আবার দ্রব্যমূল্য কিছু বাড়িতে থাকে। ১৯৫৬-৫৭ সালে দ্রব্যমূল্যের সূচক হইল ৩৯০। বর্তমানে মূল্য বাড়তির দিকেই। খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস, মাল মজুত, আয় বৃদ্ধি, উন্নয়ন কার্যের জন্য অধিকতর কাগজী

মুদ্রার প্রচলন প্রভৃতি এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের অধিক-সংখ্যক লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত জনসাধারণের অসুবিধার অন্ত নাই।

প্রশ্ন

১। সাধারণ মূল্যান্তর কি? মূল্যান্তরের পরিবর্তন কি ভাবে নির্ণয় করা হয়? (পৃঃ ১৩৯)

২। সূচক সংখ্যা কি? একটি সূচক সংখ্যা প্রস্তুত কর। (পৃঃ ১৪০-১৪১)

৩। অর্থের মূল্য কি ভাবে নির্ণয় করা হয়? (পৃঃ ১৪১-১৪৪)

৪। মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে? ইহার ফলাফল কি? (পৃঃ ১৪৪-১৪৭)

সপ্তদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

(International Trade)

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য :

দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে বাণিজ্য বলে। একই দেশের লোকেদের মধ্যে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে বলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। ভারতের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা যদি বোম্বাইয়ের লোকেদের নিকট হইতে কাপড ক্রয় করে, তবে যে বাণিজ্য হয় তাহা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। এক দেশের লোকেদের সঙ্গে অন্য দেশের লোকেদের কোন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আমেরিকার লোকেরা ভারতের লোকেদের নিকট হইতে পাট ক্রয় করিলে যে বাণিজ্য হয়, তাহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

অনেক দিন হইতেই এক দেশের লোকের সঙ্গে অপর দেশের লোক বাণিজ্য করিয়া আসিতেছে। রোমের লোকেরা ভারতের মসলিন ক্রয় করিত। ভারতের লোকেরা ইংল্যাণ্ডের কাপড ক্রয় করিত। তবে যত দিন যাতায়াতেব তেমন সুবিধা ছিল না, তত দিন এক দেশেব সঙ্গে অপর দেশেব বাণিজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। নৌকা, স্টীমার, রেল, এরোপ্লেন প্রভৃতির সাহায্যে যাতায়াত এবং মাল-চলাচলেব সুবিধা যতই বাড়িতে লাগিল, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্যও ততই বাড়িতে লাগিল। এখন পৃথিবীর এক প্রান্তের লোকের সঙ্গে অপর প্রান্তের লোক বাণিজ্য করে।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য আছে। যে কোন একটি দেশের অভ্যন্তরে শ্রম বা মূলধন সহজে এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে নিয়োজিত হইতে পারে। অধিকতর লাভের সম্ভাবনা থাকিলে শ্রম বা মূলধন এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে চলিয়া যায়। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে তাহা সম্ভব নহে। অধিকতর লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও এক দেশেব শ্রম বা মূলধন সহজে অন্য দেশে নিয়োজিত হইতে পারে না। আবাব উৎপাদন ব্যাপারে কতগুলি সুবিধা এক দেশ হইতে অন্য দেশে চালান দেওয়া সম্ভব নহে। জলবায়ু, জমির উর্বরতা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। কখনও কখনও বিভিন্ন দেশেব মধ্যে যে বাণিজ্য, তাহাব উপব সবকার বাধা-নিষেধের সৃষ্টি করিতে পারে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে তাহা সাধারণতঃ হয় না।

শ্রম-বিভাগ এবং বাণিজ্য (Division of Labour and Trade) :

মানুষের মধ্যে শ্রম-বিভাগ আছে। কেহ বস্ত্র উৎপাদন করে, কেহ ধান্য উৎপাদন করে, কেহ বাসন-পত্র তৈয়াব করে। কেহ কেহ একাধিক দ্রব্যও উৎপাদন করে। কিন্তু

নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য কেহই উৎপাদন করে না। নিজের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যই প্রত্যেককে অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। ফলে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন হয়। ক্রয়-বিক্রয় শ্রম-বিভাগের ফল। যদি শ্রম-বিভাগ না থাকিত এবং প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করিত, তবে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন হইত না। আবার ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা আছে বলিয়াই শ্রম-বিভাগ প্রসার লাভ করিয়াছে। তাঁতী তাহার কাপড় বিক্রয় করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস ক্রয় করিতে পারিবে জানিয়াই নিশ্চিন্ত মনে কাপড় বুনিতেছে। কাজেই আমরা বলিতে পারি, একদিকে বাণিজ্য যেমন শ্রম-বিভাগের ফল, অন্যদিকে তেমনই শ্রম-বিভাগ থাকার জন্যই বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতেছে।

দেশে দেশে বা অঞ্চলে অঞ্চলেও শ্রম-বিভাগ আছে। অবশ্য কোন দেশই কেবল একটি বা দুইটি দ্রব্য উৎপাদন করে না। প্রত্যেক দেশই প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া কয়েকটি দ্রব্য উৎপাদন করে। ভারত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রং প্রভৃতি উৎপাদন করিতে পারে না। ইংল্যাণ্ড প্রয়োজনীয় চা, পাট প্রভৃতি উৎপাদন করিতে পারে না। যন্ত্রপাতি, রং প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ইংল্যাণ্ডে। আবার চা এবং পাট উৎপন্ন হয় ভারতে। এইরূপ দেশে দেশেও শ্রম-বিভাগ আছে। ফলে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্যের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক দেশ যদি প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিত, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রয়োজন হইত না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দেশে শ্রম-বিভাগের ফল। আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা আছে বলিয়াই দেশে দেশে শ্রম-বিভাগ প্রসার লাভ করিতেছে। সহজে ভারত হইতে চা এবং পাট ক্রয় করিতে পারিবে জানিয়াই ইংল্যাণ্ড চা এবং পাট উৎপাদন না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে যন্ত্রপাতি, রং প্রভৃতি উৎপাদন করিতেছে। কাজেই আমরা বলিতে পারি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যেমন আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগের ফল, তেমনই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা আছে বলিয়াই আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ প্রসার লাভ করিতেছে।

বিভিন্ন অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য :

তিন প্রকারের অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিতে পারে। পাট কেবল ভারতে এবং পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়। ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার পাটের প্রয়োজন। তাহাদিগকে পাট পাইতে হইলে ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য করিতে হয়। এইরূপে দেখা যায়, একটি দ্রব্য আছে যাহা কেবল কোন বিশেষ দেশে উৎপন্ন হয়। অন্য দেশে তাহা মোটেই উৎপাদন করা যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে অন্য দেশকে সেই দ্রব্য পাইতে হইলে উৎপাদনকারী দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিতে হয়।

আবার আমরা দেখি গম কানাডায় উৎপন্ন হয়, ইংল্যাণ্ডেও হইতে পারে। তবে কানাডায় নানাপ্রকার সুবিধা থাকার ফলে প্রতি টন গমের উৎপাদন ব্যয় ইংল্যাণ্ডের প্রতি টন গমের উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম হয়। এই ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের লোকেদের পক্ষে নিজের দেশে গম উৎপাদন না করিয়া কানাডার গম ক্রয় করা সুবিধাজনক। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা গম উৎপাদনের জন্য যে মূলধন এবং শ্রম নিয়োগ করিত, তাহা অন্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করিবে। কখনও দেখা যায়, কোন একটি দ্রব্য দুই দেশেই উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু নানা সুবিধা থাকার দরুন এক দেশের উৎপাদন-ব্যয় অন্য দেশের উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম। এইরূপ হইলে প্রথম দেশ ঐ দ্রব্য উৎপাদন করিবে ও রপ্তানি করিবে। দ্বিতীয় দেশ নিজে সেই দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া প্রথম দেশ হইতে সে দ্রব্য আমদানি করিবে। নিজে অন্য দ্রব্য উৎপাদন কবিবে। প্রথম দেশের আপেক্ষিক সুবিধা বেশী বলিয়া প্রথম দেশ সে দ্রব্য উৎপাদন করিবে। এই অবস্থায়ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিবে।

আবার দেখা যায়, ইংল্যাণ্ড এবং ডেনমার্ক উভয় দেশেই দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করা সুবিধাজনক। ইংল্যাণ্ডের সুবিধা ডেনমার্কের চাইতে বেশী। কাজেই ইংল্যাণ্ডে ডেনমার্ক অপেক্ষা কম খরচে দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন এবং শ্রম নিয়োগ করিয়া দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিলে যে পরিমাণ লাভ হয়, ঐ পরিমাণ মূলধন এবং শ্রম নিয়োগ করিয়া যন্ত্রপাতি উৎপাদন করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হয়। সেইজন্য ইংল্যাণ্ড দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ডেনমার্ক হইতে ক্রয় করে। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে। এইরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন দেশ অন্য দেশ অপেক্ষা কম ব্যয়ে একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিলেও, সেই দ্রব্য অন্য দেশ হইতে বেশী মূল্যে ক্রয় করিতে পারে। যে-দ্রব্য উৎপাদন করিলে অধিকতর লাভ হয়, সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন করে। অপর দ্রব্য সে দেশ অন্য দেশ হইতে আমদানি করে। এই অপর দ্রব্য নিজের দেশে উৎপন্ন হইলে যে মূল্য দিতে হইত, তাহা অপেক্ষা বেশী মূল্য দিলেও ক্ষতি হয় না।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of International Trade) :

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিলে যে দেশে যে দ্রব্য সুবিধাজনকভাবে উৎপন্ন হয়, সে দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। তাহাতে উৎপাদন-ব্যয় কম হয়। অন্য দেশ কম মূল্যে সেই দ্রব্য পাইতে পারে। কোন দেশ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে না পারিলেও বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। অন্য দেশ হইতে সেই দেশ

সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগের ফলে প্রত্যেক অঞ্চলই বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শী হইতে পারে। ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এক দেশকে প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে আন্তর্জাতিক শান্তির পথ সুগম হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে থাকিলে, কোন কোন অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্যও উভয় দেশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়। কোন কারণে যদি এই দুই দেশের মধ্যে কলহ কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয়, কিংবা কোনও কারণে মাল-চলাচলের পথে বাধা দেখা দেয়, তবে উভয় দেশকেই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। একটি দেশকে বা উভয় দেশকে তখন কোন অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়াই চলিতে হয়।

তাহা ছাড়া অবাধ-আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিতে থাকিলে, সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কোন দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে চেষ্টা করে না। অন্য দেশ হইতে যখন একটি দ্রব্য পাওয়া যায়, তখন নিজের দেশে তাহা উৎপাদন করিবার তেমন আগ্রহ থাকে না।

বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এবং লেন-দেন উদ্বৃত্ত (Balance of Trade and Balance of Payment):

প্রত্যেক দেশই অপর দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত। কোন কোন দ্রব্য নিজ দেশে উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু অংশ অন্য দেশে রপ্তানি করা হয়। বিদেশে রপ্তানি-করা পণ্যদ্রব্যকে দৃশ্য রপ্তানি বা Visible Exports বলা হয়। ভারতে উৎপন্ন চায়ের বা পাটের কিছু অংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। বিদেশে রপ্তানি-করা চা বা পাট ভারতের দৃশ্য রপ্তানির অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন দ্রব্য আবার বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। যে-সকল পণ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়, সেগুলিকে দৃশ্য আমদানি বা Visible Imports বলা হয়। আমাদের দেশে যন্ত্রপাতি, কাগজ প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। এইগুলি আমাদের দৃশ্য আমদানি।

রপ্তানি-করা পণ্যের জন্য বা দৃশ্য রপ্তানির জন্য একটি দেশ অপর দেশের নিকট হইতে মূল্য পায়। আবার আমদানি-করা পণ্যের জন্য বা দৃশ্য আমদানির জন্য সেই দেশ অন্য দেশকে মূল্য দেয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ে মোট দৃশ্য রপ্তানির মূল্য এবং মোট দৃশ্য আমদানির মূল্যের যে পার্থক্য, তাহাকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বা Balance of Trade বলা হয়। যদি দৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য দৃশ্য আমদানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক, তবে ঐ উদ্বৃত্তকে বলা হয় অনুকূল বাণিজ্য

উদ্বৃত্ত বা Favourable Balance of Trade। আবার যদি দৃশ্য আমদানির মোট মূল্য দৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য অপেক্ষা বেশী হয়, তবে ঐ উদ্বৃত্তকে বলা হয় প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বা Unfavourable Balance of Trade। ভারতের রপ্তানি-করা দ্রব্যের মোট মূল্য যদি দশ কোটি টাকা হয় এবং আমদানি-করা দ্রব্যের মোট মূল্য যদি আট কোটি টাকা হয়, তবে ভারতের অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত আছে বলিয়া বলা হইবে। আবার ভারতের রপ্তানি-করা পণ্যদ্রব্যের মোট মূল্য যদি দশ কোটি টাকা হয় এবং আমদানি-করা পণ্যদ্রব্যের মোট মূল্য যদি বার কোটি টাকা হয়, তবে বাণিজ্যের এই উদ্বৃত্তকে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হইবে।

এক দেশ অপর দেশের নিকট হইতে কেবল দ্রব্যই আমদানি বা রপ্তানি করে না। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সেবা বা কাজেরও আমদানি-রপ্তানি হয়। এই প্রকার সেবা বা কাজের জন্যও এক দেশ অন্য দেশকে মূল্য দিয়া থাকে। ভারত কয়েক লক্ষ টন পাট বিদেশে রপ্তানি করিবে। তাহার জন্য ভারত গ্রেট ব্রিটেনের জাহাজের সাহায্য লইবে। ইহার জন্য মূল্য দিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে যে মূল্য দেওয়া হইল তাহা কোন দ্রব্যের জন্য নহে, কাজের জন্য বা সেবার জন্য। ভারত ব্রিটেনের সেবা বা service আমদানি করিল। ইহার জন্য গ্রেট ব্রিটেনের ভারতের নিকট মূল্য পাওনা হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারত দ্রব্য আমদানি করিতে গিযা যদি গ্রেট ব্রিটেনের কোন ব্যাঙ্কের সাহায্য লয়, তবে এই সাহায্যের বাবদে ভারত গ্রেট ব্রিটেনকে মূল্য বা কমিশন দিবে। এই ক্ষেত্রে ভাবত গ্রেট ব্রিটেনের ব্যাঙ্কের সেবা আমদানি করিল। এই ধরনের আমদানি-করা সেবা বা কাজকে কোন দেশের অদৃশ্য আমদানি বা Invisible Import বলা হয়। এই ধরনের রপ্তানি-করা সেবা বা কাজকে কোন দেশের অদৃশ্য রপ্তানি বা Invisible Export বলা হয়। অদৃশ্য আমদানির জন্য বিদেশকে মূল্য দিতে হয় এবং অদৃশ্য রপ্তানির জন্য বিদেশের নিকট মূল্য পাওনা হয়। কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে কোন এক দেশেব দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্যের পার্থক্যকে চলতি হিসাবের খাতে লেন-দেন উদ্বৃত্ত (Balance of Payments on Current Account) বলা হয়। যদি দৃশ্য এবং অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য দৃশ্য এবং অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্য অপেক্ষা বেশী হয়, তবে বলা হয় চলতি হিসাবের খাতে অনুকূল উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আবার যখন দৃশ্য এবং অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্য দৃশ্য এবং অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য অপেক্ষা বেশী হয়, তখন বলা হয় চলতি হিসাবের খাতে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

চলতি হিসাবের খাতে যখন অনুকূল উদ্বৃত্ত হয়, তখন কোন দেশের অপর দেশের নিকট পাওনা থাকে। আবার যখন এই উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হয়, তখন সেই দেশ অপর দেশের নিকট ঋণী থাকে। এই পাওনা বা ঋণ কিভাবে মিটানো যায়, সে-কথার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ এক দেশ অন্য দেশে প্রচলিত মুদ্রায় পাওনা লইতে চাহে না। স্বর্ণ দিয়া এই ঋণ মিটাইতে হয়। কাজেই ঋণী দেশকে পাওনাদার দেশের নিকট স্বর্ণ পাঠাইয়া ঋণ মিটাইতে হয়।

বাস্তবিক পক্ষে স্বর্ণ পাঠাইয়া সেই ঋণ সকল সময় শোধ করা হয় না বা তাহার প্রয়োজনও হয় না। ঋণী দেশ পাওনাদার দেশের নিকট হইতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে। পাওনাদার দেশ তখন তাহাদের দৃশ্য এবং অদৃশ্য আমদানির জন্য যে অর্থ দেনা ছিল, তাহার সঙ্গে ঋণের অর্থ যোগ করে। ফলে বৈদেশিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে উভয়ের অঙ্ক সমান হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝানো যাউক। জাপান হইতে ভারতের দৃশ্য এবং অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্য বার কোটি টাকা। আবার জাপানের নিকট ভারতের দৃশ্য এবং অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য দশ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রে ভারতের পাওনা দশ কোটি টাকা, কিন্তু জাপানের পাওনা বার কোটি টাকা। ভারত জাপানের নিকট হইতে দুই কোটি টাকা স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিল। তাহা হইলে ভারতের দ্রব্য এবং সেবার মূল্য বাবদ পাওনা দশ কোটি টাকা এবং ঋণের বাবদ পাওনা দুই কোটি টাকা যোগ হইল। মোট ভারতের পাওনাও বার কোটি টাকা হইয়া গেল। লেন-দেনের অঙ্ক সমান হইল।

ঋণ করিয়া ঘাটতি মিটানো অনেক দিন চলিতে পারে না। সেইজন্য যে দেশের প্রতিকূল ঘাটতি থাকে, সেই দেশকে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এবং রপ্তানি বাড়াইয়া ঐ ঘাটতি পূরণ করিতে হয়। অবশেষে আমদানি এবং রপ্তানির অঙ্ক সমান হয়। পরিশেষে এক দেশ অপর দেশকে পণ্য দিয়াই পণ্যের মূল্য মিটাইয়া দেয়।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বিশেষভাবে অনুকূল হয়। এই উদ্বৃত্ত ইংল্যাণ্ডের নিকট পাওনা হিসাবে ইংল্যাণ্ডে জমা রাখা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পরে বিশেষতঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে এই উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইতে আরম্ভ করে। নানাপ্রকারের যন্ত্রপাতি, খাদ্যদ্রব্য আমদানির ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে চলতি হিসাবের খাতে লেন-দেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হয় ২৯২ কোটি টাকা। ঘাটতির কিছু অংশ পূরণ করা হয় বিদেশের নিকট হইতে ঋণ এবং সাহায্য গ্রহণ করিয়া। অবশিষ্ট টাকা মিটানো হয় ইংল্যাণ্ডের নিকট জমা টাকা হইতে। ইহার পর রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া এবং কম আবশ্যক দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করিয়া প্রতিকূল লেন-দেনের মোড় ফিরাইবার চেষ্টা

করা হয়। ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। আরও কয়েক বৎসর এই নীতি অবলম্বন করিতে পারিলে, অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইবে আশা করা যায়।

অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) ঃ

এক দেশের লোকেরা যদি বিনা বাধায় অন্য দেশের লোকেদের সঙ্গে বাণিজ্য করিতে পারে, তবে সে বাণিজ্যকে অবাধ বাণিজ্য বলে। দুই দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য বিদ্যমান থাকিলে, কোন দ্রব্যের আমদানি বা রপ্তানির উপর সাধারণতঃ কোন কর বসানো হয় না। যদি কর বসানো হয়, তবে রাজস্বের প্রয়োজনে সামান্য করই বসানো হয়। ভারতের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের অবাধ বাণিজ্য চলিলে, ইংল্যাণ্ডবাসীরা তাহাদের যে-কোন দ্রব্য ভারতে বিক্রয় করিতে পারিবে বা ভারত হইতে ক্রয় করিতে পারিবে। আইন-গত কোন বাধা থাকিবে না। ভারতীয় বণিক ইংল্যাণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে পারিবে। ইংল্যাণ্ডের বণিক ভারত হইতে পাট আমদানি করিতে পারিবে। সাধারণতঃ ইহার জন্য কোন কর দিতে হইবে না। আর্থিক প্রয়োজনে যদি ইংল্যাণ্ড পাট আমদানির উপর কর বসায়, তবে তাহা সামান্যই হইবে। খুব বেশী পরিমাণ কর বসাইলে ইংল্যাণ্ডে ভারতের পাটের মূল্য খুব বেশী হইবে। পাট ব্যবহারকারীরা এত অধিক মূল্যে পাট খরিদ না করিয়া, তাহার পরিবর্তে যাহা দ্বারা পাটের কাজ চলিতে পারে এমন কোন দ্রব্য খরিদ করিবে। বাণিজ্য বন্ধ হইবে। তখন আর অবাধ বাণিজ্য নীতি থাকিবে না।

সংরক্ষণ (Protection) ঃ

কখনও কখনও দেখা যায় এক দেশে একটি শিল্প আছে। নানাপ্রকারের অসুবিধা থাকায় এই শিল্পের উৎপাদন-ব্যয় একটু বেশী। অন্যান্য দুই-একটি দেশেও সেই শিল্প আছে। সে সকল দেশে নানাপ্রকারের সুবিধা থাকার ফলে শিল্পের উৎপাদন-ব্যয় খুব কম। অবাধ বাণিজ্য-নীতি বিদ্যমান থাকিলে যে দেশের উৎপাদন-ব্যয় কম সে দেশ হইতে এই শিল্পজাত দ্রব্য যে দেশে উৎপাদন-ব্যয় বেশী সে দেশে আসিতে থাকিবে। এই আমদানি-করা দ্রব্য দেশে উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় হইবে। লোকেরা কম মূল্যের জিনিস কিনিবে ; দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বেশী বলিয়া কেহই কিনিবে না। ফলে দেশী শিল্প উৎপাদন বন্ধ করিবে এবং লোপ পাইবে। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে যদি কোন দেশ বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে দেশী শিল্পকে বাঁচাইতে চাহে, তবে দেশের সরকার দেশী শিল্পকে দুইটি উপায়ে সাহায্য করিতে পারে। তাহারা বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর উচ্চ হারে কর বসাইতে পারে অথবা দেশী শিল্পকে আর্থিক সাহায্য করিতে পারে। বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর কর বসাইলে সে দ্রব্যের উৎপাদন-

মূল্যের সঙ্গে কর যোগ হইবে। উহাতে বিক্রয়-মূল্য বাড়িবে। এই মূল্য তখন দেশী উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সমান বা বেশী হইবে। এই অবস্থায় লোকেরা দেশী দ্রব্য কিনিবে। দেশী শিল্প ধীরে ধীরে উন্নত হইবে। দেশী শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দিলে শিল্পের মালিকরা তাহাদের শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্য কম মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে। কম মূল্যে বিক্রয় করিলে যে ক্ষতি হয়, সরকারী আর্থিক সাহায্যে তাহারা সে ক্ষতি পূরণ করিতে পারিবে। তখন দেশী দ্রব্য বিদেশী দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। এইরূপ সাহায্য করিয়া দেশী শিল্পকে বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করার নাম সংরক্ষণ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমাদের ভারতে কয়েকটি চিনির কল চিনি উৎপাদন করিতেছিল। জাভা প্রভৃতি দেশের চিনি তখন ভারতে আমদানি হইত। এই সকল দেশে নানা সুবিধা থাকার ফলে চিনির উৎপাদন-ব্যয় খুব কম হইত। ভারতীয় চিনির উৎপাদন-ব্যয় তখন বেশী ছিল। বেশী মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে না পারিলে ভারতীয় চিনি-শিল্প মালিকদের পোষাইত না। তখন অবাধ বাণিজ্য-নীতি বিদ্যমান ছিল। জাভা প্রভৃতি দেশের চিনি ভারতে আসিত এবং কম মূল্যে বিক্রয় হইত। বেশী মূল্যের ভারতীয় চিনি লোকে খরিদ করিতে চাহিত না। ফলে ভারতের চিনি-শিল্প লোপ পাইতে বসিল। তখন ভারত সরকার বিদেশী চিনির আমদানির উপব কর বসাইল। ফলে বিদেশী চিনির দাম বাড়িল। দেশী চিনি-শিল্প বিদেশী চিনি-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার সুযোগ পাইল। ধীরে ধীরে দেশী চিনি-শিল্পের অবস্থা উন্নত হইল। ভারতে চিনির উৎপাদন-ব্যয় কমিল। অবশেষে সংরক্ষণের প্রয়োজন আর রহিল না।

সংরক্ষণের সমর্থনে যুক্তি (Arguments in favour of Protection) ঃ

সংরক্ষণ-নীতির পক্ষে নানা প্রকারের যুক্তি দেখানো হয়। সকল যুক্তি কিন্তু সমান সমর্থনযোগ্য নহে। কেহ কেহ বলে, বিদেশী দ্রব্য আমদানি করিলে দেশের অর্থ বিদেশে যায়। তাহাতে দেশের ক্ষতি হয়। প্রকৃতপক্ষে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্য চলিলে, দ্রব্য দিয়া দ্রব্যের মূল্য শোধ করা হয়। এক দেশ কোন দ্রব্য আমদানি করিলে আর একটি দ্রব্য রপ্তানি করিয়া আমদানি-করা দ্রব্যের মূল্য দেয়। টাকাপয়সা খুব কম ক্ষেত্রেই লেন-দেন হয়। কেহ কেহ বলে, নিজের দেশের শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখাই উচিত। কারণ তাহা নিজের দেশের। তাহাদের মতে বিদেশী দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে কর বসাইয়াও নিজেদের শিল্পকে সংরক্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও মনে রাখা উচিত, এই নীতির ফলে নিজের দেশের লোকেদের অনেক সময় বিনা কারণে অত্যন্ত

অধিক মূল্যে স্বদেশী দ্রব্য কিনিতে হয়। অবশ্য যদি কিছু দিন পরে দেশী শিল্প উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে পারে এবং উৎপাদন-ব্যয় বিদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের সমান করিতে পারে, তবে ক্রেতারা কিছুদিন এ ধরনের অসুবিধা ভোগ করিতে বা ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে।

অনেকে বলে, দেশী শিল্পকে সংরক্ষণ করিলে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হয়। সংরক্ষণের ফলে দেশে নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিলে অনেক লোকের চাকুরি মিলে। নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিলে সেই শিল্পে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, বিদেশ হইতে তাহার আমদানি বন্ধ হয়। কিন্তু ইহাতে অন্য কোন দ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ হয়। কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ম আমদানি রপ্তানির সমান হয়। আমদানি কমিলে রপ্তানিও কমে। তাহাতে যে দ্রব্যের রপ্তানি কমে সে দ্রব্যের উৎপাদন কমে। লোকও সেই শিল্পে কম নিয়োজিত হয়। সেখানে বেকারের সংখ্যা বাড়ে। কাজেই সংরক্ষণের ফলে একদিকে কর্মসংস্থান হয় বটে, অন্য দিকে বেকারের সংখ্যা বাড়ে।

সংরক্ষণের সমর্থনে একটা শক্তিশালী যুক্তি হইল যে, আজকাল প্রত্যেক দেশের পক্ষেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেক জিনিসই বিশেষ করিয়া প্রত্যেক প্রয়োজনীয় জিনিসই যাহাতে দেশে উৎপন্ন হইতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিলে বিদেশ হইতে দ্রব্যাদি আমদানি করা চলে না। ফলে যে দেশ বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানি করে, সে দেশের অসুবিধা হয়। এই কারণে দেশে সকল শিল্প, বিশেষ করিয়া অপরিহার্য দ্রব্য উৎপাদনের শিল্প, গড়িয়া তোলা দরকার। এইজন্য সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয় লইতে হইলে তাহাও করা সঙ্গত।

শিশু-শিল্প-সংরক্ষণের যুক্তিই শিল্প-সংরক্ষণের সব চাইতে বড় যুক্তি। অনেক সময় দেখা যায়, একটি শিল্প কোন দেশে নূতন স্থাপিত হইয়াছে। নূতন অবস্থায় এই শিল্পকে নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ চালাইতে হইতেছে। ফলে উৎপাদনের ব্যয় বেশী হইতেছে। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই শিল্প টিকিতে পারিতেছে না। কিন্তু কিছুদিন টিকিয়া থাকিতে পারিলে ইহার অসুবিধাগুলি দূর হইবে এবং এই শিল্প বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। কাজেই শিশু অবস্থায় ইহাকে বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। এই যুক্তিটি খুব সঙ্গত। অবশ্য এইরূপ শিল্পকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবার পূর্বে কোন দেশকে দেখিতে হইবে যে, এই শিশু-শিল্প পরে সংরক্ষণ ছাড়াই চলিতে পারিবে এইরূপ সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে কিনা। সম্ভাবনা থাকিলেই সংরক্ষণ করা কর্তব্য।

শিল্প-সংরক্ষণের বিরুদ্ধে একথা বলা যায় যে, যদি কোন দ্রব্যের আমদানির উপর কর বসানো হয়, তবে সে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে। যাহারা সে দ্রব্য ক্রয় করে, তাহাদিগকে

অধিক মূল্য দিতে হয়। তাহাতে তাহাদের অসুবিধা হয়। কখনও কখনও কোন শিল্পকে সংরক্ষণ করিবার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। সরকারী রাজস্ব হইতে এই অর্থ দেওয়া হয়। দেশের লোকেদের এই অর্থ যোগাইতে হয়। তাহাদের করভার বাড়ে।

অনেক সময় দেখা যায়, কোন শিল্প সংরক্ষণের সুযোগ পাইলে নানাভাবে সেই সুযোগ স্থায়ী করিয়া পাইতে চাহে। নিজের অবস্থার উন্নতির দিকে মনোযোগ দেয় না। এইরূপ শিল্পকে অনেকদিন সংরক্ষণের সুযোগ দিতে হয়। তাহাতে দেশের ক্ষতি হয়।

কখনও কখনও দেখা যায়, বিদেশী কোন দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক বসাইলে, বিদেশীরাও এই দেশের দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক বসায়। তাহাতে রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। ইংল্যাণ্ডের যন্ত্রপাতির উপর যদি ভারত আমদানি কর বসায়, তবে ভারতীয় চায়ের উপর ইংল্যাণ্ড আমদানি কর বসাইতে পারে। তাহাতে চা-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষতি হয়।

ভারতে বাণিজ্য সংরক্ষণ-নীতি (India's Fiscal Policy)ঃ

অনেক দিন হইতেই ভারত অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে ইহা মঙ্গলজনক নহে। কৃষির উপর নির্ভর করিয়া ভারত চলিতে পারে না। তাহাকে শিল্প-প্রসারের দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। শিল্প স্থাপন এবং তাহার উন্নতি-সাধন করিতে হইলে প্রথম দিকে নূতন শিল্পকে সংরক্ষণের সুবিধা দিতে হয়। এই কথা বিবেচনা করিয়া ১৯২৩ সাল হইতে ভারত সরকার কোন কোন শিল্পকে সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া আরম্ভ করে। ভারত সরকার তখন সংরক্ষণের যে নীতি গ্রহণ করিল, সে নীতির নাম হইল বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি (Discriminating Protection)। সকল শিল্পকে সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া হইবে না। স্থির হইল, যে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, শ্রম, বিদ্যুৎশক্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, যে শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের দেশে চাহিদা আছে, যে শিল্প সংরক্ষণের সাহায্য ছাড়া গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং যে শিল্প কিছুদিন সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করিলে পরে সংরক্ষণের সাহায্য ছাড়াই দেশের চাহিদা মিটাইতে পারিবে, সে রকম শিল্পকে সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া হইবে। কোন্ শিল্প এই সকল শর্ত-পূরণ করিতে পারে এবং কোন্ শিল্প পারে না, তাহা বিচার করিবার জন্য কয়েক জন সদস্য লইয়া একটা ট্যারিফ বোর্ড (Tariff Board) গঠন করা হইল। এই বোর্ড আবেদন-পত্র পরীক্ষা করিয়া সরকারের নিকট সুপারিশ করিত। এই বোর্ডের পরামর্শক্রমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। এই নীতি অনুসারে চিনি-শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রভৃতিকে সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল।

১৯৪০ সালে এই বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতির কিছুটা পরিবর্তন সাধন করা হইল। তখন স্থির হইল, যে-শিল্প ভালভাবে গঠিত সেই শিল্পকে প্রয়োজন হইলে সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া হইবে। ১৯৪৫ সালে এই নীতির আরও একটু পরিবর্তন সাধন করা হইল। তখন স্থির হইল, যে-সকল শিল্প ভালভাবে গঠিত, যে-সকল শিল্প কিছুকাল পরে সংরক্ষণের সুবিধা ছাড়া চলিতে পারিবে এবং যে-সকল শিল্পের স্বাভাবিক সুবিধা আছে ও যে-সকল শিল্প জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া প্রয়োজনীয়, সে সকল শিল্পকে প্রয়োজনবোধে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হইবে।

শিল্প-সংরক্ষণ ব্যাপারে ১৯৫২ সালে নূতন নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। পাঁচ জন সদস্য লইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে। কোন্ শিল্পকে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে এবং কোন্ শিল্পকে দেওয়া যাইতে পারে না, সেই সম্বন্ধে এই শিল্প-কমিশন এখন সুপারিশ করে। বর্তমানে যে-সকল শিল্প দেশের সর্বপ্রকারের আর্থিক উন্নতির সাহায্য করিতে পারে, সে সকল শিল্পকে প্রয়োজন হইলে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। কতগুলি শিল্প আছে যে শিল্পগুলির উপর অন্য শিল্পের প্রসার নির্ভর করে; এইগুলিকে মূল শিল্প (Key Industry) বলে। প্রয়োজন হইলে এই সকল মূল শিল্পকে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হয়। যে-সকল শিল্প যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, প্রয়োজন হইলে এই সকল শিল্পের কথা সংরক্ষণের জন্য বিবেচনা করা হয়। যে-সকল শিল্পে কাঁচা মাল, শ্রম, শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে স্বাভাবিক সুবিধা আছে, জাতীয় স্বার্থে যে-সকল শিল্প প্রয়োজনীয়, যে-সকল শিল্প পরিণত অবস্থায় দেশের চাহিদা পুরাপুরি ভাবে কিংবা আংশিক ভাবে মিটাইতে পারে, সে সকল শিল্পের কথা এখনও সংরক্ষণের জন্য বিবেচনা করা হয়। যে-সকল শিল্প এখনও উৎপাদন আরম্ভ করে নাই, সে সকল শিল্পেরও যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে সেগুলির জন্য সংরক্ষণ-ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ১৯২৫ সালে যে সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাতে ব্যবস্থা ছিল কোন শিল্পকে তিন বৎসরের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করা চলিবে। বর্তমান নীতিতে সময়ের কোন নির্দেশ নাই। বর্তমান নীতি অনুসারে মোটরগাড়ি শিল্প, ব্লিচিং পাউডার শিল্প, কস্টিক সোডা শিল্প প্রভৃতিকে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে ? আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা কি ? (পৃঃ ১৪৮, ১৫০-১৫১)

২। কোন্ অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব ? (পৃঃ ১৪৯-১৫০)

৩। শিল্প-সংরক্ষণ কাহাকে বলে ? শিল্প-সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি দেখাও। (পৃঃ ১৫৪-১৫৭)

৪। ভারতে শিল্প-সংরক্ষণের ব্যাপারে কি নীতি অনুসরণ করা হইতেছে ? (পৃঃ ১৫৭-১৫৮)

৫। অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এবং প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কাহাকে বলে ? (পৃঃ ১৫১-১৫৪)

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারত পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তের দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। গ্রাস, রোম, চীন, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশের নিকট ভারত বস্ত্র, ধাতব দ্রব্য, হস্তিদন্ত, মসলা, রং প্রভৃতি বিক্রয় করিতে এবং ঐ সকল দেশ হইতে খনিজ পদার্থ, পিত্তল, টিন, শীষা, মাদক দ্রব্যাদি আমদানি করিত। মুসলমান যুগে নৌ-বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়াছিল, কিন্তু স্থল-বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। তখনও কাবুল ও কান্দাহারের স্থলপথে পারস্য, চীন এবং ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের স্থল-বাণিজ্য চলিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপ হইতে ভারতে আসিবার সরাসরি বাণিজ্য পথ আবিষ্কৃত হয়। তখন হইতেই বৃটিশ প্রভৃতি জাতির ব্যবসায়িগণ ভারতের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য আরম্ভ করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেষ্টায় সেই সময় ভারতের শিল্পের উন্নতি বিধান হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত নীল, সূক্ষ্ম তুলা-জাত দ্রব্যাদি, রেশম-বস্ত্র প্রভৃতি রপ্তানি করিত এবং মশলা, পশম-জাত দ্রব্যও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করিত।

ভারতের বস্ত্র-শিল্প ব্রিটিশ বস্ত্র শিল্পের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে দেখিয়া গ্রেট ব্রিটেন ধীরে ধীরে তাহাদের নীতির পরিবর্তন সাধন করিল। ফলে ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের পরে ভারত কেবল কাঁচা মাল রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিল এবং বস্ত্রাদি, শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করিতে আরম্ভ করিল। সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হইবার পর ভারতের বহির্বাণিজ্যের পথ আরও প্রশস্ত হইল। আমদানি-রপ্তানি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ভারতে রেলপথ নির্মাণের পর বহির্বাণিজ্যের আরও উন্নতি হইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারত গম, চাউল, চা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য ও তুলা, পাট, তৈলবীজ, চামড়া প্রভৃতি কাঁচা মাল রপ্তানি করিত এবং শিল্প-জাত বস্ত্র, লৌহ- নির্মিত দ্রব্য প্রভৃতি আমদানি করিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতের বহির্বাণিজ্যের কিছু ক্ষতি সাধন করিল। শত্রু দেশগুলির সঙ্গে তখন বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল। নিরপেক্ষ দেশগুলিতে নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু থাকায় ভারতীয় দ্রব্যের ব্যবহার সেই সকল দেশে কমিয়া গেল। বাণিজ্যপোতের অভাব দেখা দেওয়ায় আমদানি রপ্তানি ব্যয় বাড়িয়া গেল। বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা দিল। এই সকল কারণে বহির্বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইল। যুদ্ধের অব্যবহিত কাল পরে আবার বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িতে আরম্ভ করিল। অবশ্য প্রথমদিকে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি বৃদ্ধি পাইল। ফলে ১৯২০-২১ সালে ভারতে

প্রতিকূল বাণিজ্য পরিমাণ হইল চল্লিশ কোটি টাকা। শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্তন হইল এবং ভারতের অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বাড়িতে লাগিল।

ইহার পরেই দেখা দিল বিশ্বব্যাপী মন্দা। ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্য আবার সঙ্কুচিত হইল। ১৯৩৭ সালের পর হইতে আবার বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইল। আমদানি কমিয়া গেল। রপ্তানি মোটামুটি কিছুটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ফলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ভারতের অনুকূলে গেল। এই যুদ্ধের ফলে আরও দুই-একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিল। যুদ্ধের আগে ভারত খাদ্যসামগ্রী এবং কাঁচা মাল রপ্তানি করিত এবং বিদেশ হইতে প্রধানতঃ শিল্প-জাত সম্পূর্ণ দ্রব্য আমদানি করিত। যুদ্ধের ফলে ভারতের মিত্র দেশগুলির সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ বন্ধ হওয়ায় ঐ সকল মিত্র দেশ ভারত হইতে শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে দেশের অভ্যন্তরে শিল্পের সম্প্রসারণ সম্ভব হইল। অপরদিকে কাঁচা মাল রপ্তানি কমিতে আরম্ভ করিল। শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি কমিয়া গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে দেশ-হিসাবেও বাণিজ্যের গতির পরিবর্তন হইল। জাপান এবং জার্মানির সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল। ইংল্যাণ্ড এবং সাম্রাজ্যভুক্ত অপর দেশ-গুলির সঙ্গে বাণিজ্য বাড়িয়া গেল। ১৯৩৮ সালে রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৫২·৭ ভাগ হইত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির সঙ্গে। ১৯৪৫ সালে এই রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া হইল শতকরা প্রায় ষাট ভাগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও বাণিজ্যের উন্নতি হইল।

দ্বিতীয়-যুদ্ধোত্তর অবিভক্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। দ্রব্যের খাতে ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল বেশ মোটা। এই উদ্বৃত্তের সাহায্যে বিদেশে আমাদের যে ঋণ ছিল বা তাহার যে সুদ ছিল তাহা শোধ করা হইত। ইহা হইতে বিদেশী ব্যাঙ্ক প্রভৃতির লভ্যাংশ পাঠান হইত। প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের ব্যয় নির্বাহ হইত। বিদেশী কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রভৃতি দেওয়া হইত এবং ভারত সরকারের জন্য স্বর্ণেব তাল কিনা হইত। আর একটি বিশিষ্টতা ছিল, আগে ভারত বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানি কবিত। ধীরে ধীরে এই সময়ে ভারত স্বর্ণ রপ্তানি শুরু করিল।

ভারত স্বাধীন হইবার পর বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে একটি অর্থপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল। এতদিন ভারত বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সুযোগ পাইতেছিল। এখন হইতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইয়া উঠিল। ভারতের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বাড়িয়া গেল। স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষকে অল্প খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইত। কিন্তু বিভাগের পর ধান এবং গম উৎপাদনকারী বিশিষ্ট কয়েকটি অংশ পাকিস্তানে পড়ায় ভারতে খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিল। লোকসংখ্যা দ্রুত

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফলে বাহির হইতে অধিক পরিমাণে খাদ্য আমদানির প্রয়োজন হইল। অবিভক্ত ভারত প্রভূত পরিমাণে তুলা এবং পাট রপ্তানি করিত। কিন্তু বিভাগের ফলে তুলা এবং পাট উৎপাদনকারী অধিক অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে ভারতকে তুলা এবং পাট আমদানি করিতে হয়। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিশেষতঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে। ফলে দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই বিদেশীরা আমাদের দেশের দ্রব্যাদি ক্রয় করা এখন আর তেমনি লাভজনক মনে করে না। ফলতঃ আমাদের রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে। সর্বশেষে দেখা যায় আমাদের দেশে দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণের চেষ্টা চলিতেছে। অধিক হইতে অধিকতর শিল্প স্থাপন করিতে হইলে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি আমাদের বিদেশ হইতে আনিতে হইতেছে। আমাদের আমদানি বাড়িয়া যাইতেছে। মোটামুটি রপ্তানি কমিয়া আমদানি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইতেছে।

ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকে ভারতের বহির্বাণিজ্য অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল উপনিবেশভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে। স্বাধীন ভারতে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছে। এখন হইতে ব্রিটিশ উপনিবেশভুক্ত জাতিগুলির সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বেশী হইল। যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ও ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

ভারতের বিশেষ বিশেষ আমদানি ও রপ্তানি পণ্য (Chief Articles of India's Import and Export):

আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। খাদ্য, পানীয় এবং তামাক প্রভৃতি দ্রব্যকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কাঁচা মাল এবং অসম্পূর্ণ (unmanufactured) দ্রব্যাদিকে করা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। শেষ শ্রেণীভুক্ত করা হয় সম্পূর্ণরূপে বা অর্ধ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত দ্রব্যকে (finished goods)। প্রথমশ্রেণীভুক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে ভারত খাদ্যশস্য, ডাল, ময়দা, ফল, তরিতরকারি, মদ্য, মশলা, তামাক প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানি করে। দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে ভারত বিদেশ হইতে অধাতব খনিজদ্রব্য, খনিজ তৈল, সব্জী-জাত তৈল, জান্তব তৈল, কাঁচা তুলা, পাট, পশম, কাঠ প্রভৃতি আমদানি করে। তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে ভারত বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি লৌহজাত দ্রব্য, এবং বৈদ্যুতিক সামগ্রী, কাঁচের দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানি করে।

খাদ্যশস্য প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীভুক্ত যেই সকল দ্রব্য ভারত বাহিরে রপ্তানি করে সেগুলির মধ্যে চা, তামাক, মশলা, চিনি, ফল, তরিতরকারি এবং মৎস্য প্রধান। কাঁচা মাল প্রভৃতি

দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে ভারত বিদেশে কয়লা এবং অন্যান্য খনিজ দ্রব্য, আটা, লাক্ষা, কাঁচা চামড়া, লৌহের টুকরা, সব্জী-জাত তৈল, খনিজ তৈল এবং জান্তব তৈল, বীজ, কাঁচা তুলা, পাট এবং পশম প্রভৃতি রপ্তানি করে। তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত যে-সকল দ্রব্য ভারত বাহিরে রপ্তানি করে সেগুলির মধ্যে সূতা এবং তুলা-জাত বস্ত্র, পাট?জাত দ্রব্য, পশম-জাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, ছুরি, কাঁচি, কাঁচ-জাত দ্রব্য, চামড়া, কাগজ, পেস্টবোর্ড, রবার-জাত দ্রব্য এবং মণিহারি দ্রব্যাদি প্রধান।

১৯৫৫-৫৬ সালে ভারত ১৭·৬৮ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিয়াছিল, ১১৪·৫১ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি এবং ২১·২৬ কোটি মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করিয়াছিল। ১৯৬২-৬৩ সালে ১১৭ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য, ৩৭২ কোটি টাকা মূল্যে যন্ত্রপাতি এবং ১০০ কোটি টাকা মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় এই সকল দ্রব্যের আমদানি কিরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আবার ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারত ১১৩·২৭ কোটি টাকা মূল্যের পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছিল, ৫৬·৬৩ কোটি টাকা মূল্যের তুলাজাত দ্রব্য এবং ১০৯·১৪ কোটি টাকা মূল্যের চা রপ্তানি করিয়াছিল। ১৯৬২-৬৩ সালে ভারত ১৫২ কোটি টাকা মূল্যের পাটজাত দ্রব্য এবং ১২৮ কোটি টাকা মূল্যের চা রপ্তানি করিয়াছিল। আমদানির তুলনায় রপ্তানির অবস্থা যে প্রায় অপরিবর্তিত আছে তাহা এই হিসাবেই দেখা যায়। নিচে এই হিসাবের সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া গেল :—

	আমদানি (কোটি টাকা)			রপ্তানি (কোটি টাকা)	
দ্রব্য	১৯৫৫-৫৬	১৯৬২-৬৩	দ্রব্য	১৯৫৫-৫৬	১৯৬২-৬৩
যন্ত্রপাতি	১১৪·৫১	৩৭২·০০	পাট-জাত দ্রব্য	১১৩·২৭	১৫২·০০
খাদ্যদ্রব্য	১৭·৬৮	১১৭·০০	চা	১০৯·১৪	১২৮·০০
রাসায়নিক দ্রব্য	২১·২৬	১০০·০০	তুলা-জাত দ্রব্য	৫৬·৬৩	৪৬·০০

ভারতের বহির্বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশ ঃ

নানা ভাবে পরীক্ষা করিলে আমরা দেখি রপ্তানির ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড আমাদের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ খরিদ্দার। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আমেরিকা। তৃতীয় স্থানের অধিকারী অষ্ট্রেলিয়া। চতুর্থ স্থান কানাডার। আমদানির ক্ষেত্রেও ইংল্যাণ্ড প্রথম স্থানের অধিকারী, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আমেরিকা। এই ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানের অধিকারী ব্রহ্মদেশ, চতুর্থ স্থানের অধিকারী জার্মানি, পঞ্চম স্থান মিশরের এবং ষষ্ঠের অধিকারী অস্ট্রেলিয়া।

ইংল্যাণ্ড হইতে ভারত সূতী কাপড, যন্ত্রপাতি, ঔষধ, ধাতুজাত দ্রব্য, চামড়া পাকা করিবার দ্রব্যাদি, খাদ্য, রং, কাগজ, রবারের দ্রব্য, তামাক প্রভৃতি আমদানি করে।

আবার ভারত পাট, পাট-জাত দ্রব্যাদি, চামড়া, তুলা, চা, পশম, পশম-জাত দ্রব্য, তৈলবীজ, নারিকেলের ছোবড়া-জাত দ্রব্য, কফি, গালা প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করে।

আমেরিকা ভারত হইতে. চামড়া, চট, গালা, তুলা, চা, ফল, সবজী প্রভৃতি ক্রয় করে, আবার ভারত আমেরিকা হইতে রং, কাগজ, তুলা, রবারজাত দ্রব্য, কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতি আমদানি করে।

অস্ট্রেলিয়া হইতে ভারত পশম, গম, ঘোড়া প্রভৃতি আমদানি করে এবং ভারত চটের থলে, সূতী বস্ত্র, চামড়া, চা প্রভৃতি অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি করে। পশ্চিম জার্মানি হইতে ভারত যন্ত্রপাতি এবং চামড়া-জাত দ্রব্য ঔষধ, কাঁচের বাসন, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি আমদানি করে এবং ঐ দেশে পাট, তুলা, চীনা বাদাম, তিসি, চামড়া, গালা, চা প্রভৃতি রপ্তানি করে।

জাপান হইতে ভারত সূতী বস্ত্র, রেশম বস্ত্র, পশমী বস্ত্র, কাঁচেব বাসন, যন্ত্রপাতি, খেলনা, রবার-জাত দ্রব্য, কাগজ প্রভৃতি আমদানি করে। ভারত তুলা, লৌহ, পাট, পাট-জাত দ্রব্য, অভ্র, গালা, চামড়া প্রভৃতি জাপানে রপ্তানি করে।

ব্রহ্মদেশ হইতে ভারত চাউল কোরোসিন, পেট্রোল এবং সেগুন কাঠ আমদানি করে। আবার ভারত সূতী বস্ত্র, পাট-জাত দ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত, চিনি, চা, কয়লা প্রভৃতি ব্রহ্মদেশে রপ্তানি করে।

পাকিস্তান হইতে ভারত কাঁচা পাট, তুলা, চামড়া প্রভৃতি আমদানি করে এবং ভারত কয়লা, কাগজ, লৌহ, ইস্পাত, সরিষার তৈল, চিনি প্রভৃতি পাকিস্তানে রপ্তানি করে।

ভারতের সঙ্গে ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া, চীন, সিংহল প্রভৃতি দেশের ও ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক বিদ্যমান।

আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন :

ভারতের বর্তমান আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই জন্য আমাদের আমদানি কমাইতে হইবে এবং রপ্তানি বাড়াইতে হইবে। দেশের প্রয়োজনে খাদ্যদ্রব্য আরও বেশ কিছু কাল বাহির হইতে আমদানি করিতে হইবে। যন্ত্রপাতির কথাও সেইরূপ। যতদিন পযন্ত ভারতে প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রপাতি প্রস্তুত না হইবে এবং যতদিন পর্যন্ত শিল্প-সম্প্রসারণের গরজ থাকিবে ততদিন যন্ত্রপাতির আমদানিও কমানো চলিবে না। একমাত্র বিলাসদ্রব্যেরই আমদানি কমানো সম্ভব। তাই ভারত সরকার বিলাসদ্রব্য আমদানির উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করিতেছে ও করিবে। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও আমদানির পরিমাণ খুব কমিবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই

রপ্তানি বৃদ্ধি করার চেষ্টাই বেশী করিতে হইবে। সেইজন্য ভারত সরকার রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ না করিয়া উহার প্রসার সাধনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারত সরকার নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিতেছে :—

(১) ভারতীয় শিল্পগুলিকে অধিকতর রপ্তানি-সচেতন করিয়া তোলার চেষ্টা চলিতেছে। পূর্ব দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের নীতি অনুসৃত হইত। এখন ভারতীয় শিল্পগুলি রপ্তানির উপযোগী দ্রব্যাদি উৎপাদনে মনোযোগ দিতেছে।

(২) ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যাদি যাহাতে রপ্তানি-যোগ্য হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হইতেছে। ভেজাল দ্রব্যাদি বা নমুনার সঙ্গে সামঞ্জস্য-হীন দ্রব্যাদি রপ্তানি হইলে বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যের সুনাম নষ্ট হয়। যাহাতে ঐরূপ ভেজাল দ্রব্যাদি বা নমুনার সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিহীন দ্রব্যাদি পাঠান না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হইতেছে।

(৩) রপ্তানি বাণিজ্যের পথের অন্তরায় অপসারণের জন্য লাইসেন্স, শুল্ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে যেন নিয়ন্ত্রণ কম থাকে বা রপ্তানি শুল্ক বেশী না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইতেছে।

(৪) সাধারণতঃ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের ফলে ভারতের সঙ্গে বাহিরের কোন দেশের রাজনৈতিক বিরোধ থাকা স্বাভাবিক নয়। বিরোধ থাকিলেও তাহা যেন রপ্তানির পথে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

(৫) কখনও কখনও খাদ্যদ্রব্যের অভাবহেতু যে-সকল জমিতে সুবিধাজনকভাবে রপ্তানি-যোগ্য দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় সে সকল জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের চেষ্টা হইত। তাহাতে দেশের মোট সম্পদ কমিয়া যায়। সেইজন্য যে জমির উৎপন্ন দ্রব্য অধিক পরিমাণ লাভে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের সাহায্য করে সেই সকল জমিকে যেন অন্য কাজে লাগান না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইতেছে।

রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আরও কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা উচিত। সেইগুলি এইরূপ:—

(ক) আমরা বিভিন্ন দেশে চা, পাট বা সূতী বস্ত্রাদিই সাধারণতঃ রপ্তানি করি। যাহাতে এই রপ্তানির উপযোগী দ্রব্যের সংখ্যা আরও বাড়ে সে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

(খ) বিভিন্ন দেশের চাহিদার উপর নজর রাখা প্রয়োজন। সেই সকল দেশের বাণিজ্য-সংক্রান্ত সকল পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সুবিধা অসুবিধারও সংবাদ রাখা প্রয়োজন। কোন কোন দেশে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব সে সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

(গ) আমাদের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা, পরিবহণ-ব্যবস্থা, বীমা-ব্যবস্থাও যাহাতে রপ্তানী বাণিজ্যের অনুকূল হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ভারতের বহির্বাণিজ্যের কয়েকটি বিশিষ্টতার আলোচনা কর। (পৃঃ ১৫৯-১৬১)

২। কোন কোন দেশের সঙ্গে ভারত বিশেষভাবে কি কি দ্রব্য লইয়া আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে বর্তমানে লিপ্ত আছে? (পৃঃ ১৬২-১৬৩)

৩। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা কি? কি উপায়ে তাহা সম্ভব? (পৃঃ ১৬৩-১৬৫)

ঊনবিংশ অধ্যায়

বাজার
(Market)

যে স্থানে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়, সাধারণ কথায় সেই স্থানকে আমরা বাজার বলি। আমরা কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যহ গিয়া মাছ, তরিতরকারি ক্রয় করি। ঐ স্থানকে আমরা বাজার বলি। কিন্তু আমরা যখন বলি ভূ-সম্পত্তির বাজার বা শ্রমের বাজার, তখন কোন নির্দিষ্ট স্থানের কথা মনে করা চলে না। ভূ-সম্পত্তি কিংবা শ্রম কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া ক্রয়-বিক্রয় হয় না। এমন দ্রব্য আছে যাহার ক্রয়-বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নহে। সেই সকল দ্রব্যের বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝাইলে নিশ্চয়ই ভুল হইবে। এমন দ্রব্য আছে যাহার ক্রেতা এবং বিক্রেতা সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া আছে। তাহারা তার, বেতার বা পত্রের সাহায্যে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল কারণে অর্থবিদ্‌গণ বাজার বলিতে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানকে না বুঝাইয়া এমন একটি এলাকাকে বুঝান, যে এলাকার ক্রেতা-বিক্রেতারা পরস্পরের সঙ্গে সরাসরি ভাবে অথবা ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় যোগাযোগ রক্ষা করে এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। তাহার ফলে ঐ এলাকার বিভিন্ন অংশে মূল্য প্রায় সমান থাকে।

বাজারের বিস্তৃতি (Extent of Market) :

কোন কোন দ্রব্যের বাজার সুদূর-বিস্তৃত। আবার কোন কোন দ্রব্যের বাজার ছোট একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ। বাজারের বিস্তৃতি বা সীমাবদ্ধতা নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

যে দ্রব্য দীর্ঘকালস্থায়ী, বাজার তাহার বিস্তৃত। আবার যে দ্রব্য অল্পক্ষণস্থায়ী তাহার বাজার সীমাবদ্ধ। কাপড়, বাসন-পত্র প্রভৃতি দীর্ঘকালস্থায়ী। কাপড়ের বা বাসন-পত্রের বাজার অনেক বিস্তৃত। ভারতের বস্ত্র-বিক্রেতার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বস্ত্র-ক্রেতা যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে। উভয় স্থলের ক্রেতারা বা বিক্রেতারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। কাজেই কাপড়ের বাজার সুদূর-বিস্তৃত। কিন্তু পাকা ফল স্বল্পকালস্থায়ী। উৎপাদনকারীকে ইহা সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রয় করিতে হয়। ক্রেতাকেও সঙ্গে সঙ্গেই ইহা ভোগ করিতে হয়। কাজেই পাকা ফলের বাজার সুদূর-বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ তেমন নাই।

যে দ্রব্যের চাহিদা ব্যাপক, সে দ্রব্যের বাজারও ব্যাপক। গমের চাহিদা সারা পৃথিবীময়। কাজেই গমের বাজার সারা পৃথিবীময়। যে দ্রব্যের চাহিদা কেবল কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ, তাহার বাজারও সীমাবদ্ধ। মেষের হৃৎপিণ্ড হইতে প্রস্তুত "হ্যাগিস্" নামে একপ্রকার খাদ্যের চাহিদা স্কটলণ্ডে সীমাবদ্ধ। হ্যাগিসের বাজারও স্কটলণ্ডেই সীমাবদ্ধ।

যে দ্রব্য অল্পব্যয়ে অনেক দূরে বহন করা যাইতে পারে, সে দ্রব্যের বাজার সুদূর-বিস্তৃত হয়। দ্রব্যের মূল্যের তুলনায় বহন-ব্যয় যত কম হয়, ততই ভাল। সোনার মূল্যের তুলনায় তাহার বহন-ব্যয় সামান্য। অল্প ব্যয়ে অধিক মূল্যের সোনাও পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বহন করা যায়। কাজেই সোনার বাজার পৃথিবী-জোড়া। মূল্যেরও ব্যবধান খুব কম। আবার যে দ্রব্যের উৎপাদন-মূল্যের অনুপাতে বহন-ব্যয় বেশী, সে দ্রব্যের বাজার সীমাবদ্ধ। ইটের উৎপাদন-মূল্যের তুলনায় বহন-ব্যয় বেশী, সেইজন্য ইটের বাজার সীমাবদ্ধ। এক স্থান হইতে অন্য স্থান ত্রিশ মাইল দূরে হইলেও, এই উভয় স্থানের ইটের মূল্যের ব্যবধান অনেক।

যে দ্রব্যের প্রত্যেকটি একই-রকমের, যাহা কিনিতে গেলে ক্রেতাকে পরীক্ষা করিতে হয় না, তাহার বাজার বিস্তীর্ণ। কোন কোম্পানির যে-কোন শেয়ার সার্টিফিকেট অন্য যে-কোন শেয়ার সার্টিফিকেটের সমান। ক্রেতা যে-কোন নম্বরের সার্টিফিকেট না দেখিয়াই ক্রয় করিতে পারে। পাঁচ শত বা হাজার মাইল দূর হইতেও চিঠিপত্রের সাহায্যে সে উহা ক্রয় করিতে পারে। কাজেই এই শেয়ারের বাজার খুব বিস্তৃত। কিন্তু যে জিনিসের একটি আর একটির মত নহে, তাহার বাজার সীমাবদ্ধ। হাতে তৈয়ারি কাঠের আসবাবপত্র একখানা ঠিক অপর একখানার মত নহে। কাজেই কোন ক্রেতা না দেখিয়া দূরে বসিয়া এই দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। ক্রয় করিতে হইলে তাহাকে বিক্রয়-কেন্দ্রে আসিয়া দেখিয়া ক্রয় করিতে হয়। কাজেই এই দ্রব্যের বাজার সংকীর্ণ।

আজকাল প্রায় সকল দ্রব্যের বাজারই ক্রমে প্রসারিত হইতেছে। পরিবহণ-ব্যয় কমিয়া আসিতেছে। চিঠিপত্র, তার-বেতারের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করাও সহজ হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ক্ষণকালস্থায়ী দ্রব্যকে দীর্ঘকালস্থায়ী করার নানাপ্রকারের ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে বাজারের বিস্তৃতির পথের অন্তরায়ও দূরীভূত হইতেছে। ভারতের আম আজ ইংল্যাণ্ডেও বিক্রী হয়। ডেনমার্কের মাছ এখন ভারতে বিক্রী হয়। এই ভাবে দেখা যায়, প্রায় দ্রব্যেরই বাজার প্রসার লাভ করিতেছে।

বিভিন্ন-প্রকারের বাজার (Different kinds of Market) :

বাজারের বিস্তৃতি অনুসারে বাজারকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে ; যথা—স্থানীয় বাজার, জাতীয় বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজার। কোন দ্রব্যের প্রায় একই মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় যদি কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেই দ্রব্যের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। ইটের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলা যাইতে পারে। উৎপাদন-মূল্যের তুলনায় ইহার পরিবহণ-ব্যয় বেশী। সেইজন্য ইটের প্রায় একই মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় উৎপাদন-অঞ্চলের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। যে দ্রব্যের প্রায় একই মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় একটি গোটা দেশের মধ্যে হইয়া থাকে, তাহার বাজারকে জাতীয় বাজার বলা হয়। ভারতের মহিলাদের পরিধেয় শাড়ির বাজারকে জাতীয় বাজার বলা যায়। কারণ শাড়ির ক্রয়-বিক্রয় সারা ভারতেই হয়। সারা দেশময় মূল্যও প্রায় সমান থাকে। ভারতের বাহিরে শাড়ির ক্রয়-বিক্রয় বড় একটা হয় না। যে যে দ্রব্যের প্রায় একই মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় সমগ্র পৃথিবীময় হইয়া থাকে, তাহার বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয়। স্বর্ণের বাজার আন্তর্জাতিক ; কারণ স্বর্ণের ক্রয়-বিক্রয় সমগ্র পৃথিবীতেই হইয়া থাকে এবং ইহার মূল্যও প্রায় সমান।

প্রতিযোগিতার গভীরতা অনুসারে বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার এবং অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যে দ্রব্যের বাজারে ক্রেতার এবং বিক্রেতার সংখ্যা অনেক, কোন্ ক্রেতা কোন্ মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং কোন্ বিক্রেতা কোন মূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাহা সকল ক্রেতা-বিক্রেতা জানে। সেই দ্রব্যের বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলা হয়। এইরূপ বাজারে দ্রব্যের মূল্য এক হইবে। প্রতিযোগিতার ফলে প্রত্যেক ক্রেতাকেই এক মূল্যে ক্রয় করিতে হয় এবং প্রত্যেক বিক্রেতাকে এক মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। যে দ্রব্যের বাজারে অল্পসংখ্যক বিক্রেতা অথচ অধিকসংখ্যক ক্রেতা থাকে অথবা অল্পসংখ্যক ক্রেতা অথচ অধিকসংখ্যক বিক্রেতা থাকে, সে দ্রব্যের বাজারকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রেতা বিভিন্ন মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে বা বিভিন্ন বিক্রেতা বিভিন্ন মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। বিক্রেতা যদি এক জন হয় এবং ক্রেতা যদি পঞ্চাশ জন হয়, তবে বিক্রেতা ইচ্ছা করিলে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন মূল্য আদায় করিতে পারে। কোন ক্রেতাই তাহার নিকট হইতে বেশী মূল্য আদায় করা হইল বলিয়া অপর বিক্রেতার নিকট যাইতে পারে না। চাউল বা গমের বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার। আবার পুরাতন পুস্তকের বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার।

সময়ের ব্যাপ্তি অনুসারে বাজারকে অল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন বাজারে ভাগ করা হয়। যে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় একদিন বা অনুরূপ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়, সেই দ্রব্যের বাজারকে অল্পকালীন বাজার বলা হয়। মাছের বাজার এইরূপ অল্পকালীন বাজার। মাছের ক্রয়-বিক্রয় অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। অল্প সময়ের মধ্যে মাছের যোগান বাড়ানো কষ্টসাধ্য।

যে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে পারে, সেই দ্রব্যের বাজারকে দীর্ঘকালীন বাজার বলা হয়। দীর্ঘকালীন বাজারে দ্রব্যের চাহিদা অনুসারে যোগান বাড়ানো-কমানো সম্ভব হয়। কাপড়ের বাজার দীর্ঘকালীন বাজার। ইহার যোগান চাহিদা অনুসারে বাড়ানো বা কমানো যাইতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা কারবার :

বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতার কথা বলা হইয়াছে। কয়েকটি শর্ত পূরণ হইলে বাজারের প্রতিযোগিতা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে। ক্রেতা এবং বিক্রেতার সংখ্যা অনেক হইতে হইবে। বিক্রেতার সংখ্যা এত বেশী হওয়া প্রয়োজন যে, যেন কোন একজন বিক্রেতা বাজারের মোট সরবরাহের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। সে বিক্রেতা সরবরাহ করুক বা না করুক, তাহাতে মোট সরবরাহের একটা বিশেষ কমতি-বাড়তি হইবে না। মোট সরবরাহের অতি সামান্য অংশই তাহার আয়ত্তে আছে। আবার ক্রেতার সংখ্যাও এত বেশী হওয়া দরকার, যেন কোন একজন ক্রেতা মোট চাহিদার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাহার চাহিদা মোট চাহিদার বিশেষ বাড়তি-কমতি ঘটাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, বাজারের বিভিন্ন ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে পূর্ণ যোগাযোগের ফলে বিভিন্ন অংশের ক্রেতা-বিক্রেতা বাজারের সামান্য পরিবর্তন সম্বন্ধেও সকলে সম্যক্ অবহিত থাকিবে। তৃতীয়তঃ, ক্রেতা-বিক্রেতাদের আচরণের মধ্যে কোন প্রকারের তারতম্য থাকিবে না। বিক্রেতা যে-কোন ক্রেতার নিকট একই মূল্যে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে। আবার ক্রেতাও একই মূল্যে যে-কোন বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রয় করিতে বাধ্য থাকে। সর্বশেষ যে শিল্প বা বাণিজ্য-সংক্রান্ত দ্রব্যের বাজারের কথা বলা হয়, সেই শিল্প বা বাণিজ্যে নূতন শ্রম বা মূলধনের নিয়োগের পথে অবাধ সুযোগ থাকা প্রয়োজন। নূতন শ্রম বা মূলধন নিয়োগ করার সম্ভাবনা থাকিলেই প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা থাকে। কোন একজন বা কয়েক জন উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা মূল্যের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ক্ষুণ্ণ হয়।

একচেটিয়া কারবার (Monopoly) :

যখন এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাজারে কোন একটি দ্রব্যের সরবরাহের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতে পারে, তখন সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কারবারকে একচেটিয়া কারবার বলা হয়। কলিকাতাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ একমাত্র কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্পোরেশনই করিয়া থাকে। এইজন্য ইহার কারবার একচেটিয়া। একচেটিয়া কারবার একেবারে পূর্ণাঙ্গ হইলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের কোন প্রকার পরিবর্ত দ্রব্য (substitute) থাকে না। কাজেই কোন প্রতিযোগীও বাজারে থাকে না। একচেটিয়া কারবারী ইচ্ছা করিলে ক্রেতাদের নিকট হইতে চড়া মূল্য আদায় করিতে পারে। ইহাতে হয়ত মোট বিক্রয়ের কিছুটা কমতি-বাড়তি হইতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারী নিজ দ্রব্যের মূল্য নিজেই স্থির করিতে পারে।

একেবারে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা যেমন বাজারে থাকা সম্ভব নয়, পূর্ণাঙ্গ একচেটিয়া কারবারও বাজারে থাকা তেমন সম্ভব নয়। এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন এক দ্রব্যের সরবরাহের উপর কর্তৃত্ব করিয়া ঐ দ্রব্যের মূল্য যদৃচ্ছ বাড়াইতে থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত দ্রব্য বাজারে দেখা দিবে, প্রতিযোগী উপস্থিত হইবে: বিদ্যুতের মূল্য খুব বাড়াইয়া দিলে গ্যাসের ব্যবহার, কেরোসিনের ব্যবহার চলিতে থাকিবে। সেইজন্য একচেটিয়া কারবার বলিতে বুঝায় সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগানদার একজন বা এক প্রতিষ্ঠান এবং ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্যের অভাব। ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্যের অভাব বলিতে এ-কথা বুঝায় যে, যদি কোন পরিবর্ত দ্রব্য বাজারে আসে, তবে সে দ্রব্য পৃথক ধরনের এবং সেই দ্রব্যের যোগানও পর্যাপ্ত নহে। এই অবস্থায় একচেটিয়া কারবারী প্রতিযোগিতার কথা মনে না আনিয়াই মূল্য নির্ধারণ করিতে পারে।

প্রশ্ন

১। অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে কি বুঝায়? (পৃঃ ১৬৬)

২। বাজারের বিস্তৃতি কিসের উপর নির্ভর করে? (পৃঃ ১৬৬-১৬৭)

৩। একচেটিয়া কারবার বলিতে কি বুঝায়? (পৃঃ ১৭০)

বিংশ অধ্যায়

অভাব এবং উপযোগ

(Want and Utility)

অভাব (Want) :

আমার একটি ভাল জামা নাই, অথচ আমি একটি ভাল জামা পাইতে চাই। তখন আমি ভাল জামার অভাব বোধ করি। যখন আমাদের কোন দ্রব্য থাকে না অথচ আমরা সেই দ্রব্য পাইতে চাই, তখন আমরা সেই দ্রব্যের অভাব বোধ করি।

আমরা নানা ধরনের দ্রব্যের অভাব বোধ করি। খাদ্য, বস্ত্র, আলো কিংবা বাতাস না থাকিলে, আমাদের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। এইগুলি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়। এই সকল দ্রব্যের অভাব সকল মানুষই অনুভব করে। কেবল বাঁচিয়া থাকা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানুষ যে কাজ করে, সে কাজে তাহাকে দক্ষতা বা নিপুণতা অর্জন করিতে হয়। এই দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে তাহার শীতের দিনে শীতবস্ত্রের প্রয়োজন, গরমের দিনে সময়োপযোগী জামার প্রয়োজন। তাহার শিক্ষার প্রয়োজন, পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। এইগুলি তাহার নিপুণতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয়। দক্ষতা যাহারা কামনা করে, এইগুলির অভাব তাহারা বোধ করে। আবার কেহ কেহ চা, তামাক প্রভৃতিতে এমনভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে যে, এইগুলি না হইলে তাহাদের চলে না। সাধারণ অবস্থায় এইগুলি না থাকিলেও চলে। কিন্তু যাহারা এই সকল দ্রব্যে অভ্যস্ত হইয়াছে, এইগুলি তাহাদের কাছে আচারগতভাবে প্রয়োজনীয়। এইগুলি না থাকিলে তাহারা এইগুলির অভাব বোধ করে। আবার কতগুলি জিনিস আছে যাহা একটু ভালভাবে আরামে বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজন। গরীবদের পক্ষে একটি ঘরে পাঁচ জন বাস করা চলে, গরমের দিনে বৈদ্যুতিক পাখা না হইলে চলে। কিন্তু যাহাদের সঙ্গতি আছে এবং যাহারা আরাম চায়, তাহাদের পাঁচ জনের জন্য কম পক্ষে তিনখানা ঘরের প্রয়োজন। আবার প্রত্যেক ঘরে একখানা করিয়া পাখার প্রয়োজন। তাহারা এই সকল দ্রব্য না থাকিলে এইগুলির অভাব বোধ করে। আবার এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা না হইলে কোন ক্ষতি হয় না, অথচ বিশেষ শখ মিটাইবার জন্য লোকে ব্যবহার করে। সুগন্ধি আতর ব্যবহার না করিলে কাহারও কোন ক্ষতি হয় না। তথাপি ইহা না থাকিলে কেহ কেহ ইহার অভাব বোধ করে। এই অভাবকে বলা যায় বিলাস-সামগ্রীর অভাব। কোন কোন দ্রব্য আছে যাহা এক ব্যক্তির নিকট বিলাসের সামগ্রী আবার অপর ব্যক্তির নিকট

প্রয়োজনীয়। যে মাঠে কাজ করে হাতঘড়ি তাহার নিকট বিলাসের সামগ্রী, কিন্তু যে কারখানার পরিচালক, তাহার নিকট হাতঘড়ি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

অভাবের প্রকৃতি (Nature of Want) :

অভাবের প্রকৃতিতে কয়েকটা বিশিষ্টতা আছে। প্রথমতঃ, আমরা দেখিতে পাই মানুষের অভাবের অন্ত নাই। নানা রকমের দ্রব্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগে মানুষের মনে। বিভিন্ন রকমের অভাবের সংখ্যা এত বেশী যে, কোন ব্যক্তিরই সকল অভাব সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা সম্ভব হয় না। একটি অভাব পূরণ হইলে আর একটি অভাব দেখা দেয়। খাদ্যের অভাব পূরণ হইলে, কাপড়ের অভাব থাকিয়া যায়। কাপড়ের অভাব পূরণ হইলে, বাসগৃহের অভাব দেখা দেয়। বাসগৃহের অভাব পূরণ হইলে, চলাচল করিবার মত যানবাহনের অভাব দেখা দেয়। আবার ডাল-ভাতের অভাব পূরণ হইলে, মাছ-মাংসের অভাব দেখা দেয়। তাহাও পূরণ হইলে দুধ, ছানা, মাখন, ঘৃতের অভাব দেখা দেয়। কাপড়ের অভাব পূরণ হইলে, জামার অভাব দেখা দেয়। তাহাও পূরণ হইলে, জুতার অভাব দেখা দেয়। এই ভাবে দেখা যায়, মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রকমের অসংখ্য অভাব। এই অভাবের সংখ্যা এত বেশী যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে সকল অভাব পূরণ করা সম্ভব নহে। নানা রকমের অভাব-মোচনের জন্যই মানুষ কাজ করে, পরিশ্রম করে। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করিয়াও কেহ তাহার সকল অভাব পূরণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখিতে পাই, কখনও কখনও একটি দ্রব্যের অভাব অনুভব করিলে, মানুষ সঙ্গে সঙ্গে আরও এক বা একাধিক দ্রব্যের অভাব বোধ করে। মানুষ যখন চায়ের অভাব বোধ করে, তখন তাহার সঙ্গে দুধ এবং চিনির অভাবও বোধ করে। কলমের অভাব বোধ করিলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কালির অভাব বোধ করে। এই অভাবগুলিকে সেইজন্য পরস্পরের অনুপূরক অভাব বলা হয়। কলমের চাহিদা বাড়িলে কালির চাহিদা বাড়ে। কলম বেশী বিক্রয় হইলে কালিও বেশী বিক্রয় হইবে। চা যদি বেশী বিক্রয় হয়, তবে চিনি এবং দুধও একটু বেশী বিক্রয় হইবে। তবে যেহেতু দুধ এবং চিনি অন্য কাজে লাগে, সেহেতু দুধ, চিনি বেশী বিক্রয় হইলেই যে চা বেশী বিক্রয় হইবে এমন নহে।

তৃতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে এক ধরনের অভাব কয়েকটি দ্রব্যের যে-কোন একটি দ্রব্য দিয়া পূরণ করা যায়। খাদ্যের অভাব ভাত দিয়া পূরণ করা যায়, আবার রুটি দিয়াও পূরণ করা যায়। বাঙালীরা কাপড় পরিয়া বস্ত্রের অভাব পূরণ করে। ব্রহ্মদেশবাসীরা লুঙ্গি পরিয়া বস্ত্রের অভাব পূরণ করে। লুঙ্গি এবং কাপড় বস্ত্রের অভাব মিটাইবার কাজে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। চাউলের মূল্য যখন

বাড়ে, রুটির মূল্যও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। কারণ চাউলের মূল্য বাড়িলে লোকে রুটি কিনিতে চাহিবে এবং তাহার জন্য রুটির মূল্যও বাড়িবে।

চতুর্থতঃ, যদিও আমরা দেখিতে পাই যে মানুষের নানা রকমের দ্রব্যের অভাব আছে এবং তাহার ফলে আমরা বলিতে পারি যে, অভাবের সংখ্যার শেষ নাই, তথাপি যে-কোন একটি বিশেষ অভাবের একটা সীমা বা অন্ত আছে। কোন ব্যক্তির বস্ত্রের অভাব দশখানা কাপড়ে যদি পূরণ না হয়, তবে পনেরখানা কাপড়ে পূরণ হইবে। কাপড় সংগ্রহ করিতে করিতে সেই ব্যক্তির একটা অবস্থা নিশ্চয়ই আসিবে, যে অবস্থায় সে আর কাপড় পাইতে চাহিবে না। তখন তাহার কাপড়ের অভাব পূরণ হইয়াছে। খাদ্যের দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও সহজে বুঝা যায়। এক ব্যক্তি ক্ষুধার্ত হইয়া রুটির অভাব বোধ করিতেছে। দশ কিংবা পনের কিংবা বিশখানা রুটি খাইবার পর সেই ব্যক্তির এমন একটা অবস্থা আসিবে, যে অবস্থায় সে আর মোটেই রুটির অভাব সেই সময় বোধ করিবে না। তখনকার মত তাহার খাদ্যের অভাব পূরণ হইয়াছে। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই, যদিও সংখ্যার দিক দিয়া মানুষের অভাবের শেষ নাই, তথাপি যে-কোন বিশেষ অভাবের একটা সীমা আছে।

উপযোগের ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্তি (Diminishing Utility) ঃ

দ্রব্যের অভাব-মোচনের ক্ষমতাকে বলা হয় উপযোগ। এই উপযোগের হ্রাসবৃদ্ধির নিয়ম আছে। কোন এক ব্যক্তির পরিধান করিবার মত যে কাপড় ছিল, তাহা সবই ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার কাপড়ের অভাব। কাপড় ক্রয় না করিলেই নয়। কাপড় ক্রয় করিবার জন্য তাহার মনে এখন প্রবল আকাঙ্ক্ষা। মনে করি, সে একখানা কাপড় ক্রয় করিতে পারিয়াছে। তাহার কাপড়ের অভাব কিছুটা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এই অভাব সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয় নাই। তাহার আরও কাপড়ের প্রয়োজন। তাহার মনে আরও কাপড় পাইবার আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু দ্বিতীয় কাপড়খানা পাইবার জন্য তাহার মনে যে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা প্রথম কাপড়খানা পাইবার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা কম তীব্র। তাহার নিকট প্রথম কাপড়খানার প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগ যে-পরিমাণ ছিল, দ্বিতীয় কাপড়খানার প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগ তাহা অপেক্ষা কম। দ্বিতীয় কাপড়খানা ক্রয় করা হইয়া গেলে দেখা যায়, তাহার কাপড়ের অভাব পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু হয়ত তাহার কাপড়ের অভাব সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয় নাই, তাহার মনে আরও কাপড় ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু তৃতীয় কাপড়খানা ক্রয় করিবার জন্য তাহার মনে যে-পরিমাণ আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা দ্বিতীয় কাপড়খানা ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা কম তীব্র। তৃতীয় কাপড়খানার

কাপড়খানার প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগ তাহার নিকট দ্বিতীয় কাপড়খানার প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগ অপেক্ষা কম। এইরূপে দেখা যায়, চতুর্থ কাপড়খানার উপযোগ তৃতীয় কাপড়খানার উপযোগ অপেক্ষা কম।

সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম। কোন দ্রব্য আমরা যখন একটির পর একটি পাইতে থাকি, তখন দেখা যায় পরবর্তী দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগ পূর্ববর্তী দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগ অপেক্ষা কম। আমাদের মনে পূর্ববর্তী দ্রব্য অপেক্ষা পরবর্তী দ্রব্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা কম তীব্র হয়। ইহা অর্থবিদ্যার একটা নিয়ম। এই নিয়মকে বলা হয় **ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি** (Law of Diminishing Utility)।

টাকাপয়সার সাহায্যে উপযোগের মোটামুটি একটা পরিমাণ করা যাইতে পারে। কোন দ্রব্যের বিনিময়ে আমরা কি-পরিমাণ অর্থ দিতে চাই, তাহা দিয়া আমাদের নিকট সেই দ্রব্যের উপযোগ সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করিতে পারি। কোন ব্যক্তি যদি একখানা কাপড় ক্রয় করিতে আট টাকা দিতে রাজী হয়, তবে বলা যায় ঐ ব্যক্তির নিকট সেই কাপড়খানার উপযোগের পরিমাণ আট টাকা। আমাদের পূর্বের দৃষ্টান্তে যদি লোকটি প্রথম কাপড়খানার জন্য আট টাকা দিতে রাজী হয়, তবে সে দ্বিতীয় কাপড়খানার জন্য সাত টাকার বেশী দিতে রাজী হইবে না। কারণ প্রথম কাপড়খানার উপযোগ অপেক্ষা তাহার নিকট দ্বিতীয় কাপড়খানার উপযোগ কম। আবার তৃতীয় কাপড়খানার জন্য সে ছয় টাকার বেশী দিতে রাজী হইবে না। কারণ, তৃতীয় কাপড়খানার উপযোগ তাহার নিকট দ্বিতীয় কাপড়খানার উপযোগ অপেক্ষা কম। চতুর্থ কাপড়খানার জন্য ঐ ব্যক্তি পাঁচ টাকার বেশী দিতে রাজী হইবে না। কারণ, চতুর্থ কাপড়খানার উপযোগ তাহার নিকট তৃতীয় কাপড়খানার উপযোগ অপেক্ষা কম। এই নিয়মটিকে উপরের রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে :—

কখ-কে কাপড়ের সংখ্যা ধরা হইল। এই **কখ**-কে সমান আট ভাগে ভাগ করা
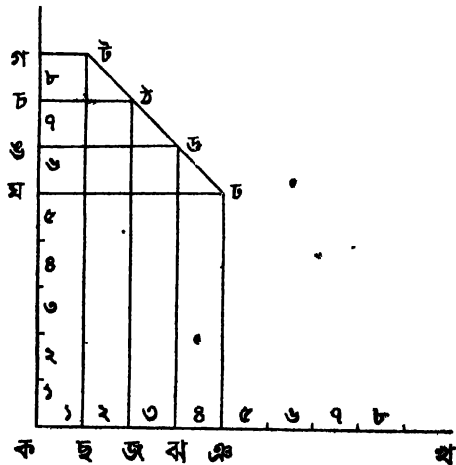
হইল। প্রত্যেকটি ভাগকে একখানা কাপড়ের সূচকরূপে ধরা হইল। আবার কগ-কে কাপড়ের উপযোগ ধরা হইল। ইহাকেও সমান আট ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেকটি ভাগকে কাপড়ের উপযোগের সূচক ধরা হইল। এখন প্রথম কাপড়খানার উপযোগ হইবে ছট অর্থাৎ আট। দ্বিতীয় কাপড়খানার উপযোগ হইবে জঠ অর্থাৎ সাত। তৃতীয় কাপড়খানার উপযোগ হইবে ঝড অর্থাৎ ছয়। চতুর্থ কাপড়খানার উপযোগ হইবে ঞঢ অর্থাৎ পাঁচ। ট ঠ ড ঢ বিন্দুগুলি সংযুক্ত করিলে যে রেখা পাই, তাহা ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতেছে দেখা যায়। এই রেখাকে বলা হয় ক্রমহ্রাসমান উপযোগ রেখা।

আপাতদৃষ্টিতে কখনও কখনও এই হ্রাসমান উপযোগ বিধির ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। কৃপণ ব্যক্তির অর্থলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে। যে মদ্য পান করে, তাহার প্রথম গ্লাস মদের চাইতে দ্বিতীয় গ্লাস মদ পাইবার আকাঙ্ক্ষা বেশী হয়। আবার তৃতীয় গ্লাস পাইবার আকাঙ্ক্ষা দ্বিতীয় গ্লাস পাইবার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা বেশী থাকে। আমরা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব যে, এই ধরনের লোক মোটামুটি অস্বাভাবিক। অর্থবিদ্যা স্বাভাবিক লোকের কার্যকলাপ সম্বন্ধেই বিধির নির্দেশ দেয়।

আবার আমরা দেখিতে পাই, এক ব্যক্তির জলের পিপাসা আছে। তাহাকে বিন্দু বিন্দু জল দিলে প্রথম দিকে সেই ব্যক্তির নিকট পরবর্তী জলবিন্দুর উপযোগ পূর্ববর্তী জলবিন্দুর উপযোগ অপেক্ষা বেশী। এই ক্ষেত্রেও আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে, প্রত্যেকটি দ্রব্যের একবার যাহা পাওয়া যাইবে তাহা উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া দরকার। এই তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে পূর্ণ এক গ্লাস জল দিলে, দ্বিতীয় গ্লাস জলের উপযোগ তাহার নিকট প্রথম গ্লাসের উপযোগ অপেক্ষা নিশ্চয়ই কম হইবে। এমন কি তখনকার মত তাহা উপযোগবিহীনও হইতে পারে। কাজেই আমরা বুঝিতে পারি, এই ব্যতিক্রম বাস্তবিক পক্ষে ব্যতিক্রম নহে।

প্রান্তিক উপযোগ এবং মোট উপযোগ (Marginal Utility and Total Utility) :

একটু পূর্বে আমরা যে ব্যক্তির কথা বলিয়াছি, সে ব্যক্তি প্রথম কাপড়খানা ক্রয় করিতে আট টাকা পর্যন্ত মূল্য দিতে রাজী হইবে। কারণ, তাহার নিকট ঐ কাপড়খানার যে উপযোগ, তাহার মূল্য আট টাকা। দ্বিতীয় কাপড়খানার জন্য ঐ ব্যক্তি সাত টাকার বেশী দিতে রাজী হইবে না। কারণ, ঐ কাপড়খানার উপযোগের মূল্য তাহার নিকট সাত টাকা। সে যদি মোট দুইখানা কাপড় ক্রয় করে, তবে ঐ

দুইখানা কাপড় হইতে সে মোট পনের টাকার পরিমাণ (৮+৭) উপযোগ লাভ করিবে। সে ব্যক্তি যদি আরও একখানা কাপড় ক্রয় করে, তবে তৃতীয় কাপড়খানার জন্য সে ছয় টাকার বেশী দিতে রাজী হইবে না। কারণ, তাহার নিকট ঐ কাপড়খানার উপযোগের মূল্য ছয় টাকা। সে ব্যক্তি যদি মোট তিনখানা কাপড় ক্রয় করে, তবে তাহার নিকট ঐ তিনখানা কাপড়ের মোট উপযোগের মূল্য একুশ টাকা (৮+৭+৬)। একই দ্রব্যের কয়েকটি ক্রয় করা হইলে বা সংগ্রহ করা হইলে, প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক উপযোগের মোট সমষ্টিকে বলা হয় মোট উপযোগ বা সামগ্রিক উপযোগ। উপরের দৃষ্টান্তে প্রথম কাপড়খানার উপযোগ আট, দ্বিতীয় কাপড়খানার উপযোগ সাত। কাজেই এই আট এবং সাতের যোগফল দুইখানা কাপড়ের মোট উপযোগ। এইরূপে আট, সাত এবং ছয়ের যোগফল তিনখানা কাপড়ের মোট উপযোগ (Total Utility)।

আমাদের দৃষ্টান্তে বর্ণিত ব্যক্তি অসংখ্য কাপড় ক্রয় করিবে, এইরূপ মনে করা চলে না। কয়েকখানা কাপড় ক্রয় করা হইয়া গেলে তাহাকে কাপড় ক্রয় করা বন্ধ করিতে হইবে। চতুর্থ কাপড়খানা ক্রয় করিবার পর সে যদি আরও একখানা কাপড় ক্রয় করিবার কথা চিন্তা করে, তবে সে দেখিবে তাহার নিকট ঐ পঞ্চম কাপড়খানার যে উপযোগ আছে, তাহার মূল্য চারি টাকা। বাজারে একই সময়ে বিভিন্ন মূল্যে কাপড় বিক্রয় হয় না। মনে করা যাউক, বাজারে প্রত্যেকখানা কাপড় পাঁচ টাকায় বিক্রী হইতেছে। কাজেই ঐ ব্যক্তি চতুর্থ কাপড়খানা ক্রয় করার পর আর কাপড় ক্রয় করিবে না। কারণ, আর একখানা কাপড় ক্রয় করিলে সে কাপড়খানার জন্য তাহাকে ঐ কাপড়ের উপযোগের অপেক্ষা বেশী মূল্য দিতে হইবে। চতুর্থ কাপড়খানা ক্রয় করিবার সময়ই ঐ কাপড়খানা ক্রয় করিবে কিনা, সে-কথা তাহাকে ভাবিতে হইতেছে। কারণ এই কাপড়খানার উপযোগ এবং মূল্য সমান। ইহা ক্রয়ের পর আর ভাবিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। এই ক্ষেত্রে চতুর্থ কাপড়খানা হইতে যে উপযোগ পাওয়া যাইবে, তাহাই ঐ ব্যক্তির নিকট কাপড়ের প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility)। কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে করিতে যে দ্রব্যটি ক্রয় করিবে কি করিবে না ভাবিয়া শেষে যে দ্রব্যটি ক্রয় করে, সেই দ্রব্য হইতে ঐ ব্যক্তি যে উপযোগ পায় তাহাকে অর্থবিদ্ বলেন 'প্রান্তিক উপযোগ'।

প্রশ্ন

১। অভাবের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (পৃঃ ১৭২-১৭৩)

২। দৃষ্টান্ত দিয়া ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি বুঝাইয়া দাও। (পৃঃ ১৭৩-১৭৫)

৩। মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ কাহাকে বলে ? (পৃঃ ১৭৫-১৭৬)

একবিংশ অধ্যায়

চাহিদা ও যোগান
(Demand and Supply)

চাহিদা (Demand) :

যখন আমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন আমরা তাহা পাইতে আকাঙ্ক্ষা করি। এই পাইবার আকাঙ্ক্ষাকে সাধারণ কথায় চাহিদা বলি। অর্থবিদের নিকট এই চাহিদা কথাটার অর্থ আরও একটু সূক্ষ্ম। কোন কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষাকেই অর্থবিদ্‌গণ চাহিদা বলেন না। একজন দরিদ্র শ্রমিকেরও একখানা মোটরগাড়ি পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু তাহা ক্রয় করিবার মত তাহার সঙ্গতি নাই। যেহেতু ক্রয় করিবার মত সঙ্গতি নাই, সেই হেতু এই দরিদ্র শ্রমিকের মোটরগাড়ি পাইবার আকাঙ্ক্ষা চাহিদা নহে। কোন ব্যক্তির একটি দ্রব্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা, তাহা ক্রয় করিবার মত অর্থ এবং সেই অর্থ ব্যয় করিয়া ঐ দ্রব্য পাইবার আগ্রহ থাকিলে, অর্থবিদ্‌ বলেন এই ব্যক্তির নিকট ঐ দ্রব্যের চাহিদা আছে। আকাঙ্ক্ষা, ক্রয় করিবার সামর্থ্য এবং ইচ্ছা বর্তমান থাকিলেই চাহিদা আছে বলা যায়।

চাহিদার নিয়ম (Law of Demand) :

দ্রব্যের মূল্যের সঙ্গে চাহিদার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যখন কোন দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যায়, তখন ঐ দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। মনে করি, প্রত্যেকটি কমলালেবুর মূল্য দশ পয়সা। তখন এক ব্যক্তি চারিটি কমলালেবু কিনিবে ঠিক করিল। যদি সেই সময় কমলালেবুর মূল্য কমিয়া নয় পয়সা হয়, তবে ঐ ব্যক্তি আরও অধিক কমলালেবু কিনিবে। মনে করি, সে পাঁচটি কমলালেবু কিনিবে। কমলালেবুর মূল্য কমিয়া আট পয়সা হইলে, সেই ব্যক্তি এইবার আরও অধিক কমলালেবু কিনিবে। মনে করি, সে ছয়টি কমলালেবু কিনিবে। মূল্য কমিয়া প্রত্যেকটি সাত পয়সা হইলে, ঐ ব্যক্তি এইবার সাতটি কমলালেবু কিনিবে। মূল্য আরও কমিয়া যদি প্রত্যেকটি ছয় পয়সা হয়, তবে সেই ব্যক্তি আটটি কমলালেবু কিনিবে। এই ভাবে প্রত্যেকটি পাঁচ পয়সা হইলে সেই ব্যক্তি নয়টি এবং চারি পয়সা হইলে দশটি কমলালেবু কিনিবে।

অঙ্কের সাহায্যে ইহা এই ভাবে দেখানো যাইতে পারে :—

মূল্য	চাহিদা	মূল্য	চাহিদা
১০ পয়সা	৪	৬ পয়সা	৮
৯ „	৫	৫ „	৯
৮ „	৬	৪ „	১০
৭ „	৭		

এইরূপ আচরণের কারণ আছে। ঐ ব্যক্তির নিকট চতুর্থ কমলালেবুর উপযোগের পরিমাণ ছিল দশ পয়সা। হ্রাসমান উপযোগ বিধির নিয়মে পঞ্চম কমলালেবুর উপযোগ নয় পয়সার বেশী হইবে না। কাজেই মূল্য যতক্ষণ প্রত্যেকটি দশ পয়সা থাকে, ততক্ষণ সেই ব্যক্তি পঞ্চম কমলালেবুটি ক্রয় করিবে না। কিন্তু মূল্য কমিয়া প্রত্যেকটি নয় পয়সা হইলে, ঐ ব্যক্তির পঞ্চম কমলালেবুটি কিনিবার আগ্রহ হইবে। আবার ষষ্ঠ কমলালেবুর উপযোগের পরিমাণ ঐ ব্যক্তির নিকট আট পয়সা। যতক্ষণ প্রত্যেকটির মূল্য নয় পয়সা থাকিবে, ততক্ষণ ঐ ব্যক্তি পঞ্চম কমলালেবুটি ক্রয় করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে। কিন্তু প্রত্যেকটির মূল্য আট পয়সা হইলে, ঐ ব্যক্তি ষষ্ঠ কমলালেবুটি ক্রয় করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইবে। এইরূপে দেখা যায়, মূল্য কমিয়া গেলে চাহিদা বাড়ে।

অন্য আর একটি কারণেও মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে। লোকের আর্থিক অবস্থার তারতম্য আছে। এমন কয়েক জন লোক থাকিতে পারে, যাহাদের দশ পয়সা করিয়া কমলালেবু ক্রয় করার সামর্থ্য নাই। মূল্য কমিলে আর্থিক দিক দিয়া তাহারা কমলালেবু ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে। তাহারাও তখন কমলালেবু ক্রয় করিবে। কাজেই মূল্য কমিলে কমলালেবুর ক্রেতা বাড়িবে। ফলে চাহিদা বাড়িবে।

আবার মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমিয়া যায়। মনে করি, প্রত্যেকটি কমলালেবুর মূল্য চারি নয়সা। তখন কোন এক ব্যক্তি দশটি কমলালেবু ক্রয় করে। যদি মূল্য বাড়ে এবং প্রত্যেকটি কমলালেবু পাঁচ পয়সা হয়, তবে ঐ ব্যক্তি কম-সংখ্যক কমলালেবু কিনিবে। মনে করি, সে নয়টি কমলালেবু কিনিবে। প্রত্যেকটির মূল্য ছয় পয়সা হইলে সেই ব্যক্তি আরও কম-সংখ্যক কমলালেবু কিনিবে। এইবার সে আটটি কমলালেবু কিনিবে। আবার প্রত্যেকটির মূল্য সাত পয়সা হইলে সাতটি,

আট পয়সা হইলে ছয়টি, নয় পয়সা হইলে পাঁচটি এবং দশ পয়সা হইলে চারিটি কমলালেবু কিনিবে।

মূল্য	চাহিদা	মূল্য	চাহিদা
৪ পয়সা	১০	৮ পয়সা	৬
৫ "	৯	৯ "	৫
৬ "	৮	১০ "	৪
৭ "	৭		

মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমিবারও কারণ আছে। পূর্বোক্ত ব্যক্তির নিকট দশম কমলালেবুর উপযোগের পরিমাণ চারি পয়সা। কিন্তু নবম কমলালেবুর উপযোগ পাঁচ পয়সা এবং অষ্টম কমলালেবুর উপযোগ ছয় পয়সা। প্রত্যেকটির মূল্য পাঁচ পয়সা হইলে, দশম কমলালেবুর মূল্য উহার উপযোগ অপেক্ষা বেশী হইবে। কাজেই সে ব্যক্তি নবম কমালেবুটি কিনিয়াই ক্ষান্ত হইবে। আবার প্রত্যেকটির মূল্য ছয় পয়সা হইলে, ঐ ব্যক্তি নবম কমলালেবুটি কিনিবে না। কারণ নবম কমলালেবুটির মূল্য তাহার উপযোগ অপেক্ষা বেশী হইবে। সে অষ্টম কমলালেবুটি কিনিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে। এইভাবে মূল্য যত বাড়িবে, চাহিদা ততই কমিবে।

ইহারও অন্য আর একটি কারণ আছে। অবস্থার তারতম্যবশতঃ প্রত্যেকটির মূল্য চারি পয়সা হইতে বাড়িয়া পাঁচ পয়সা হইলে কয়েক জন লোক দেখিবে, কমলালেবু ক্রয় করা তাহাদের সাধ্যের অতীত। তাহারা তখন কমলালেবু কিনিবে না। আবার প্রত্যেকটির মূল্য ছয় পয়সা হইলে, ঐ মূল্যে কমলালেবু ক্রয় করা আরও কয়েক ব্যক্তির সাধ্যের অতীত হইবে। তখন কমলালেবুর ক্রেতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চাহিদা আরও কমিবে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand) :

মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে। আবার মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে। এই বাড়তি-কমতির হার সকল ক্ষেত্রে সমান নহে। চাউল বা লবণের মূল্য খুব বাড়িলেও চাহিদা খুব কমে না। এইগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। চাউল বা লবণ না হইলে মানুষের চলে না। কাজেই মূল্য খুব বৃদ্ধি পাইলেও, মানুষকে প্রায় সমান পরিমাণেই এইগুলি কিনিতে হইবে। এক ব্যক্তির পরিবারে মাসে এক কুইণ্টাল চাউল আর তিন কিলোগ্রাম লবণের প্রয়োজন। চাউলের মূল্য বা লবণের মূল্য দ্বিগুণ হইলেও ঐ ব্যক্তিকে এক কুইণ্টাল চাউল এবং তিন কিলোগ্রাম লবণ কিনিতে হইবে।

মূল্য খুব বাড়িলে অপব্যয় বন্ধ করিবে, অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন হয়ত কমাইবে। তাহাতে চাউল বা লবণের প্রয়োজন সামান্য কমিবে। চাহিদাও সামান্য কমিবে। আবার চাউল বা লবণের মূল্য কমিয়া অর্ধেক হইলেও, সেই ব্যক্তি প্রায় এক কুইন্টাল চাউল এবং তিন কিলোগ্রাম লবণই কিনিবে। মূল্য কমিলে অপব্যয় বন্ধ করার জন্য যত্নবান হইবে না, অতিথি-অভ্যাগতগণের আপ্যায়ন একটু বাড়িবে। ফলে চাহিদা একটু বাড়িবে। পাঁচ কিলোগ্রাম চাউল এবং এক কিলোগ্রাম লবণ হয়ত বেশী কিনিবে। যে-সকল দ্রব্যের মূল্য বেশী বাড়িলে বা কমিলে চাহিদা সামান্য বাড়ে বা কমে, সেই সকল দ্রব্যের চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক (inelastic) চাহিদা বলা হয়। অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

আবার দেখা যায়, কোন কোন দ্রব্যের মূল্য সামান্য পরিমাণে বাড়িলে বা কমিলে, ঐ দ্রব্যের চাহিদা বেশ কমে বা বাড়ে। ঝরনা কলমের কথা ধরা যাউক। প্রত্যেকটি ভাল ঝরনা কলমের মূল্য পনের টাকা। এই মূল্যে এক শতটি ঝরনা কলমের চাহিদা আছে। মূল্য যদি কমিয়া বার টাকা হয়, তবে দুই শতটি ঝরনা কলমের চাহিদা হইবে। অনেকেই শখ মিটাইবার জন্য ঝরনা কলম কিনিবে। আবার যদি মূল্য বাড়িয়া সতের টাকা হয়, তবে পঞ্চাশটি কলমের চাহিদা থাকিবে। যাহারা শখ করিয়া ঝরনা কলম কিনিবে ভাবিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই এই ঝরনা কলম কিনিবে না। যে-সকল দ্রব্যের মূল্য সামান্য বাড়িলে বা কমিলে চাহিদা বেশী পরিমাণে কমে বা বাড়ে, সেই সকল দ্রব্যের চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক (elastic) চাহিদা বলা হয়। শখের দ্রব্যাদির চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

কোন দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক, তাহা নির্ণয় করিবার মোটামুটি একটা সহজ উপায় আছে। মনে করা যাউক, প্রত্যেকটি কমলালেবুর মূল্য আট পয়সা। এই মূল্যে মোট ৬০০০ হাজার কমলালেবু বিক্রয় হয়। কমলালেবুর জন্য মোট ব্যয় হয় ৬০০০ × ৮ = ৪৮০০০ পয়সা, অর্থাৎ ৪৮০৲ টাকা। কমলালেবুর মূল্য কমিয়া যদি প্রত্যেকটি ছয় পয়সা হয়, তবে মনে করি মোট ৯০০০ হাজার কমলালেবু বিক্রয় হয়। এইবার কমলালেবুর জন্য মোট ব্যয় হয় ৯০০০ × ৬ = ৫৪০০০ পয়সা, অর্থাৎ ৫৪০৲ টাকা। কমলালেবুর জন্য মোট ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইল। এই কমলালেবুর মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া যদি প্রত্যেকটি দশ পয়সা হয়, তবে মনে করি মোট ৪০০০ হাজার কমলালেবু বিক্রয় হয়। কমলালেবুর জন্য এইবার মোট ব্যয় হয় ৪০০০ × ১০ = ৪০০০০ পয়সা, অর্থাৎ ৪০০৲। কমলালেবুর জন্য মোট ব্যয় পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গেল। এই ক্ষেত্রে দেখা গেল, কমলালেবুর মূল্য কমিলে কমলালেবুর জন্য মোট ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়।

আবার মূল্য বাড়িলে মোট ব্যয় পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। কমলালেবুর চাহিদাকে তাহা হইলে বলা হয় স্থিতিস্থাপক। কোন দ্রব্যের মূল্য কমিলে যদি সেই দ্রব্যের জন্য মোট ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া যায়, এবং মূল্য বাড়িলে যদি সেই দ্রব্যের জন্য মোট ব্যয় কমিয়া যায়, তবে সেই দ্রব্যের চাহিদাকে বলা যায় **স্থিতিস্থাপক**।

আবার মনে করি, চাউলের মূল্য প্রতি কুইন্টাল ৪০৲ টাকা। তখন মোট চাউল বিক্রয় হয় ১০০০০ কুইন্টাল। চাউলের জন্য মোট ব্যয় হয় ৪,০০,০০০৲ টাকা। মনে করি, চাউলের মূল্য বাড়িয়া প্রতি কুইন্টাল ৫০৲ টাকা হইল। এখন প্রায় সম-পরিমাণ চাউলই বিক্রয় হইবে। তবে লোকে চাউলের অপব্যয় বন্ধ করিবে। অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়ন কমাইবে। তাহাতে মোট চাউলের চাহিদা কমিয়া ৯০০০ কুইন্টাল দাঁড়াইবে। চাউলের জন্য মোট ব্যয় হইবে ৯০০০ × ৫০ = ৪,৫০,০০০৲ টাকা। মূল্য বাড়িয়া যাওয়ার ফলে মোট ব্যয়ও বাড়িল। আবার মনে করি, চাউলের মূল্য কমিয়া প্রতি কুইন্টাল ৩০৲ টাকা হইল। এইবার চাউলের চাহিদা সামান্য বাড়িবে। বেশী মূল্যের চাউলের ব্যাপারে যে-পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা হইত, কম মূল্যের চাউলের ব্যাপারে সে-পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা হইল না। ফলে মনে করি, ১১০০০ কুইন্টাল চাউল বিক্রয় হইবে। চাউলের জন্য মোট ব্যয় হইবে ১১০০০ × ৩০৲ = ৩,৩০,০০০৲ টাকা। মূল্য কমিয়া যাওয়ায় মোট ব্যয়ও কমিল। এইবার বলিব চাউলের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। যে দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক সে দ্রব্যের জন্য মোট ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বাড়ে, এবং মূল্য কমিলে সেই দ্রব্যের জন্য মোট ব্যয় পূর্বাপেক্ষা কমে।

যোগান (Supply):

কোন একটি দ্রব্য যদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে বলা হয় সেই দ্রব্যের যোগান বেশী। আবার কোন দ্রব্য যদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া না যায়, তবে বলা হয় সেই দ্রব্যের যোগান কম। কোনও দ্রব্যের প্রাপ্যতাকে বলে **যোগান**। বাজারে প্রচুর মাছ পাওয়া গেলে বলা হয় মাছের যোগান বেশী। আবার মাছ যদি কম পাওয়া যায়, তবে বলা হয় মাছের যোগান কম। প্রাপ্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতা আবার চাহিদার মতই মূল্যের উপর নির্ভর করে। মাছের কিলোগ্রাম আজ তিন টাকা। মাছের যোগান তাই কম। যাহারা মাছ কিনিবে তাহারা যদি মাছের কিলোগ্রাম চারি টাকা করিয়া কিনিতে আগ্রহ দেখায়, তবে কাল মাছের যোগান বাড়িবে। এমন অনেক বিক্রেতা ছিল যাহারা তিন টাকা কিলোগ্রাম দরে মাছ বিক্রয় করিতে রাজী ছিল না। কাল যখন মাছ তিন টাকা কিলোগ্রাম দরে বিক্রয় হইতেছিল, তখন তাহারা

তাহাদের পুকুর হইতে মাছ ধরে নাই। কিন্তু যখন তাহারা বুঝিতে পারিল মাছের কিলোগ্রাম চারি টাকা করিয়া বিক্রয় হইবে, তখন তাহারা তাহাদের পুকুরের মাছ ধরিবে এবং সে মাছ বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনিবে। ফলে মাছের যোগান বাড়িবে। আবার যখন মূল্য কমিবে, অনেক লোক মাছ বিক্রয় না করিয়া তাহাদের পুকুরেই রাখিয়া দিবে। তখন যোগানও কমিবে। এই ভাবে মূল্যের বাড়তি-কমতির সঙ্গে যোগানেরও বাড়তি-কমতি দেখা যায়।

যোগানের নিয়ম (Law of Supply):

পূর্বের আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে যোগান বাড়ে, আর মূল্য কমিলে যোগান কমে। আরও দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা পরিষ্কার করিয়া দেখানো যাইতে পারে। প্রতিটি কমলালেবুর মূল্য যদি ছয় পয়সা হয়, তবে মনে করি বাজারে ৫০০ শত কমলালেবুর যোগান আছে। কমলালেবুর মূল্য যদি বাড়িয়া প্রতিটি সাত পয়সা হয়, যাহারা বাগানের কমলালেবু বিক্রয় করিবে কিনা ভাবিতেছিল, তাহাদের কয়েক জন কমলালেবু বিক্রয় করিতে রাজী হইবে। তখন ছয় শত কমলালেবু যোগান হইবে। আবার যদি প্রতিটি কমলা-লেবুর মূল্য আট পয়সা করিয়া হয়, তবে তখনও যাহারা বাগানের গাছ হইতে আরও কমলালেবু পাড়িবে কিনা ভাবিতেছিল, তাহাদের কয়েক জন এইবার কমলালেবু বিক্রয় করিতে রাজী হইবে। তখন কমলালেবুর যোগান বাড়িয়া সাত শত হইবে। এইরূপে মূল্য যত বাড়িতে থাকিবে, যোগান ততই বাড়িবে।

আবার মূল্য কমিতে থাকিলে যোগানও কমিতে থাকিবে। মূল্য যখন প্রতিটি কমলালেবু ছয় পয়সা, তখন যোগান ৫০০ শত বলিয়া ধরা হইয়াছিল। যদি কমলালেবুর মূল্য কমিয়া প্রতিটি পাঁচ পয়সা হয়, তবে যাহাদের কমলালেবু তখনই বিক্রয় না করিলে নষ্ট হইয়া যাইবে তাহারা বিক্রয় করিবে। এমন কি কেহ কেহ পাকা কমলালেবু কোল্ড স্টোরেজে রাখিয়া দিবে। ফলে যোগান কমিয়া যাইবে। তখন হয়ত উহা চারি শতে দাঁড়াইবে। আবার যদি মূল্য আরও কমিয়া প্রতিটি চারি পয়সা হয়, তবে বিক্রেতারা কমলালেবু ধরিয়া রাখিবার নূতন কৌশল বাহির করিয়া বাজারের যোগান কমাইয়া দিবে। তখন যোগান দাঁড়াইবে তিন শত।

ছকের সাহায্যে ইহা এই ভাবে দেখানো যাইতে পারে :—

মূল্য		যোগান	মূল্য		যোগান
প্রতিটি ছয়	পঃ	৫০০	প্রতিটি পাঁচ	পঃ	৪০০
প্রতিটি সাত	পঃ	৫০০	প্রতিটি চারি	পঃ	৩০০
প্রতিটি আট	পঃ	৭০০			

প্রশ্ন

১। চাহিদা কাহাকে বলে ? চাহিদার নিয়ম দৃষ্টান্তসহকারে বুঝাইয়া দাও। (পৃঃ ১৭৭-১৭৯)

২। স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদা কাহাকে বলে ? (পৃঃ ১৭৯-১৮১)

৩। যোগান বলিতে কি বুঝ ? যোগানের নিয়ম দৃষ্টান্তসহকারে বুঝাইয়া দাও। (পৃঃ ১৮১-১৮৩)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ

মূল্য এবং দাম (Value and Price) :

অর্থবিদ্‌দের নিকট মূল্য এবং দামের পার্থক্যের কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। কোন দ্রব্যের বিনিময়ে অপর কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহা দিয়া সেই দ্রব্যের মূল্য ঠিক হয়। সে হিসাবে আমরা বলিতে পারি, একখানা কাপড়ের মূল্য দুই কিলোগ্রাম মাছ অথবা দশ কিলোগ্রাম চাউল অথবা এক জোড়া জুতার সমান। কোন দ্রব্যের বিনিময়ে কি পরিমাণে টাকাপয়সা পাওয়া যাইবে, তাহা দিয়া এই দ্রব্যের দাম স্থির হইবে। একখানা কাপড়ের বিনিময়ে ছয় টাকা কিংবা এক জোড়া জুতার বিনিময়ে দশ টাকা পাওয়া গেলে, কাপড়ের দাম ছয় টাকা বা জুতার দাম দশ টাকা হইবে।

বাজার, প্রতিযোগিতা এবং দাম (Market, Competition and Price) :

বাজারে প্রত্যেক দ্রব্যেরই ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকে। একদিকে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়, আবার অপর দিকে বিক্রেতাদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা হয়। ক্রেতাদের মধ্যে কোন দ্রব্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, আবার বিক্রেতাদের সেই দ্রব্য বিক্রয় করিবার আগ্রহ থাকে। হিন্দুদের বিবাহের জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন আছে। মনে করি, কোন এক নির্দিষ্ট দিনে অনেক বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে। ফলে অনেক গরদের কাপড়ের প্রয়োজন হইয়াছে। ক্রেতারা বাধ্য হইয়া কিনিবার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতেছে। বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তেমন কোন লক্ষণ নাই। কারণ কাপড় ধীরে ধীরে বিক্রয় হইলেও তেমন কোন ক্ষতির কারণ নাই। এই ক্ষেত্রে ক্রেতারা সকলেই একটু অধিক মূল্য দিয়া গরদের কাপড় কিনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে দাম বৃদ্ধি পাইবে।

আবার এমন হইতে পারে যে, কোন কারণে গঙ্গাতে একদিন প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়িয়াছে। ক্রেতারা অন্যদিনের মতই মাছের জন্য স্বাভাবিক পরিমাণ আগ্রহ দেখাইতেছে। কিন্তু অধিক পরিমাণে মাছ ধরা পড়ায় এবং বেশী ক্ষণ মাছ ধরিয়া রাখা সম্ভব নয় বলিয়া মাছের ব্যবসায়ীরা মাছ বিক্রয় করিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইবে এবং পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা করিবে। ফলে দাম কমিবে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং বাজার দাম (Perfect Competition and Market Price) ঃ

বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সংখ্যা অনেক থাকে। তাহাদের উভয় শ্রেণীর মধ্যেই প্রতিযোগিতা থাকে। বাজারে কি দামে কোন্ দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে তাহা সকলে জানে। এ অবস্থায় যে-কোন সময়ে একটি দ্রব্যের একটি মাত্র দাম থাকিতে পারে। যদি এমন হয় যে, এক বিক্রেতা নয় টাকায় একটি দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে এবং অন্য এক বিক্রেতা ঐ দ্রব্যের জন্য দশ টাকা দাম দাবী করিতেছে, তখন সকল ক্রেতাই যে ব্যক্তি নয় টাকা দামে বিক্রয় করিতেছে তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিবে। বাধ্য হইয়া যে ব্যক্তি দশ টাকা দাম চাহিতেছিল, তাহাকে দাম কমাইয়া নয় টাকায় নামিতে হইবে; না হয় বিক্রয় বন্ধ করিতে হইবে। এইরূপে দেখা যায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে একটি দ্রব্যের মূল্য যে-কোন সময়ে দুই রকম হইতে পারে না।

বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে কিভাবে কোন্ দ্রব্যের মূল্য স্থির হয়, এইবার সেই কথা আলোচনা করা হউক। একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে, দামের সঙ্গে যে-কোন দ্রব্যের চাহিদা এবং যোগানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোন দ্রব্যের দাম কমিলে তাহার চাহিদা বাড়ে, দাম বাড়িলে চাহিদা কমে। আবার দাম বাড়িলে যোগান বাড়ে এবং দাম কমিলে যোগান কমে। এই নিয়ম দুইটির কথা মনে রাখিয়া আমরা মূল্যের সঙ্গে চাহিদার সম্পর্ক দেখাইয়া একটি চাহিদার তালিকা (Demand Schedule) এবং দামের সঙ্গে যোগানের সম্পর্ক দেখাইয়া একটি যোগানের তালিকা (Supply Schedule) প্রস্তুত করিতে পারি।

মনে করি, আলুর দাম প্রতি কুইন্টাল কুড়ি টাকা। এখন ক্রেতারা এই দামে মোট ৪,০০০ কুইন্টাল আলু কিনিতে চাহিবে। আলুর দাম কমিয়া যদি আঠার টাকা হয়, তবে চাহিদা বাড়িবে। ক্রেতারা ৫০০০ কুইন্টাল আলু কিনিবে। দাম কমিয়া ষোল টাকা হইলে ক্রেতারা ৬,০০০ কুইন্টাল আলু কিনিবে। ক্রেতারা এই ভাবে দাম চৌদ্দ টাকা হইলে ৭,০০০ কুইন্টাল, বার টাকা হইলে ৮,০০০ কুইন্টাল, দশ টাকা হইলে ৯,০০০ কুইন্টাল এবং আট টাকা হইলে ১০,০০০ কুইন্টাল আলু কিনিতে চাহিবে। দাম যখন খুব বেশী থাকে, তখন কেবল যাহাদের প্রয়োজন খুব বেশী তাহারা কিনে। দাম একটু কমিলে যাহাদের প্রয়োজন আরও একটু কম ছিল, তাহারাও কিনিবে। দাম কমিলে এই ভাবে চাহিদা বাড়িতে থাকে।

আবার যোগানের দিক হইতে দেখিলে দেখা যায়, যখন দাম প্রতি কুইন্টাল কুড়ি টাকা, তখন বিক্রেতারা মোট ১০,০০০ কুইন্টাল আলু বিক্রয় করিতেছে। যখন

দাম আরও একটু কমিয়া আঠার টাকা হয়, তখন বিক্রেতাদের আগ্রহ কমে। তখন তাহারা মোট ৯,০০০ কুইন্টাল আলু বিক্রয় করে। বিক্রেতারা দাম ষোল টাকা হইলে ৮,০০০ কুইন্টাল, চৌদ্দ টাকা হইলে ৭,০০০ কুইন্টাল, বার টাকা হইলে ৬,০০০ কুইন্টাল, দশ টাকা হইলে ৫,০০০ কুইন্টাল এবং আট টাকা হইলে ৪,০০০ কুইন্টাল আলু বিক্রয় করিতে চাহিবে। বেশী দামে সকলেই বিক্রয় করে। দাম একটু কমিলে যাহাদের বিক্রয় করার গরজ বেশী, তাহারাই বিক্রয় করে। অপরে বিক্রয় করে না। দাম আরও কমিলে গরজ যাহাদের খুব বেশী, তাহারাই বিক্রয় করিবে। ফলে যোগান আরও কমিবে ; এই ভাবে দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে যোগান কমে।

চাহিদা এবং যোগানের তালিকা ছকের সাহায্যে আমরা এইরূপে দেখাইতে পারি :—

দাম	ক্রেতারা যত কুইন্টাল কিনিবে	বিক্রেতারা যত কুইন্টাল বিক্রয় করিবে
২০৲	৪,০০০	১০,০০০
১৮৲	৫,০০০	৯,০০০
১৬৲	৬,০০০	৮,০০০
১৪৲	৭,০০০	৭,০০০
১২৲	৮,০০০	৬,০০০
১০৲	৯,০০০	৫,০০০
৮৲	১০,০০০	৪,০০০

চিত্রের সাহায্যে আমরা যোগান এবং চাহিদার তালিকাকে এই ভাবে দেখাইতে পারি :—(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

এক্ষেত্রে কখ আলুর পরিমাণের সূচক এবং কগ আলুর দামের সূচক। চচ চাহিদার রেখা এবং যয যোগানের রেখা। দাম যত কমিবে আলুর চাহিদার পরিমাণ তত বাড়িবে এবং যোগানের পরিমাণ তত কমিবে। মূল্য যেখানে চৌদ্দ টাকা, সেখানে সাত হাজার কুইন্টাল আলুর চাহিদা হইবে এবং আলুর যোগানও সাত হাজার কুইন্টাল হইবে।

যদি বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে,তবে যে দামে যোগানের পরিমাণ চাহিদার পরিমাণের সমান হইবে সেই দামই বাজার-দাম হইবে। আমাদের আলুর দৃষ্টান্তে প্রতি কুইন্টাল চৌদ্দ টাকাই আলুর বাজার-দর হইবে। যদি চৌদ্দ টাকা না হইয়া বার টাকা হয়, তবে ক্রেতারা ৮,০০০ কুইন্টাল আলু কিনিতে চাহিবে, কিন্তু বিক্রেতারা ৬,০০০ কুইন্টাল আলু বিক্রয় করিতে রাজী হইবে। বার টাকায় হয়ত আরো কিছু

আলু বিক্রয় হইবে। কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা কম হওয়ায় ক্রেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হইবে। ফলে আলুর দাম চড়িয়া কুইন্টাল আবার চৌদ্দ টাকা হইবে। আবার যদি চৌদ্দ টাকা না হইয়া আলু প্রতি কুইন্টালের দাম ষোল টাকা হয়, ক্রেতাদের
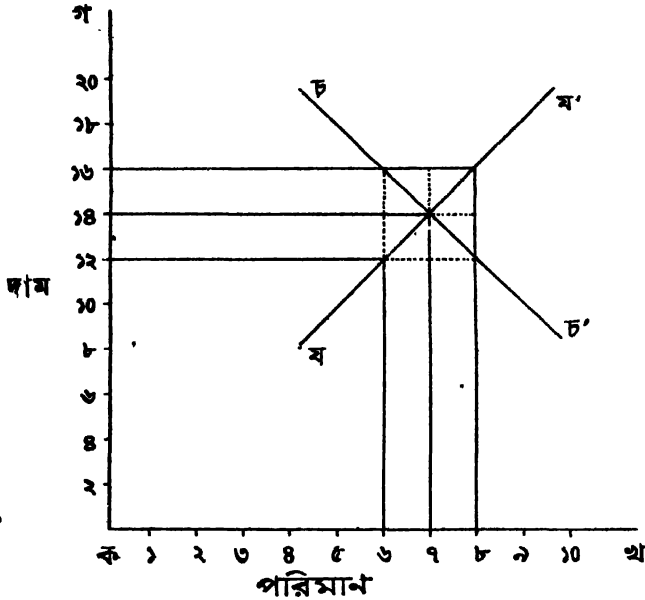
আগ্রহ কমিয়া যাইবে। বিক্রেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিবে। ফলে আলুর দাম কমিয়া চৌদ্দ টাকা হইবে। আমাদের চিত্রে দামের রেখার বার-এর বিন্দু হইতে সম্মুখের দিকে সরল রেখা টানিলে আমরা দেখি উহা যোগানের রেখাকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, চাহিদার রেখাকে তাহা অপেক্ষা দূরে ছেদ করে। ঐ সরল রেখা যোগান এবং চাহিদার রেখাকে যে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেই সেই বিন্দু হইতে নিম্নদিকে সরল রেখা টানিলে আমরা দেখি বার টাকা দরে যোগান হয় ৬,০০০ কুইন্টাল অথচ চাহিদা হয় ৮,০০০ কুইন্টাল। অনুরূপভাবে দামের রেখার ষোলের বিন্দু হইতে সম্মুখের দিকে সরল রেখা টানিলে আমরা দেখি ঐ সরল রেখা চাহিদার রেখাকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, যোগানের রেখাকে উহা অপেক্ষা দূরে ছেদ করে। ঐ সরল রেখা যে যে বিন্দুতে চাহিদা এবং যোগানের রেখাকে ছেদ করিল, সেই সেই বিন্দু হইতে নিম্নের দিকে সরল রেখা টানিলে আমরা দেখি, ষোল টাকা দরে চাহিদার পরিমাণ হয় ৬,০০০ কুইন্টাল অথচ যোগান হয় ৮,০০০ কুইন্টাল। চৌদ্দ টাকা দরে চাহিদা এবং যোগানের পরিমাণ সমান হয়। যে দামে যোগানের পরিমাণ চাহিদার

পরিমাণের সমান হয়, সেই দামেই বাজার-দাম এবং সেই দামকে বলা হয় স্থিতিশীল দাম।

প্রত্যেক দিন একই বাজার-দাম না থাকিতে পারে। সামান্য কম-বেশী হইতে পারে। একদিন হয়ত ক্রেতাদের আগ্রহ খুব কম হইতে পারে। ফলে চাহিদার পরিমাণ কম হইবে। অথবা বাজারে হঠাৎ কোন কারণে প্রচুর আমদানি হইতে পারে। এই অবস্থায় বিক্রেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে দাম কমিয়া যাইবে। আবার কোন কারণে হঠাৎ চাহিদা বাড়িয়া গেলে অথবা আমদানি হঠাৎ কমিয়া গেলে, ক্রেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হইবে; ফলে দাম বাড়িয়া যাইবে।

স্বাভাবিক দাম ও বাজার দাম (Normal Price and Market Price) :

যদিও যে-কোন এক সময় বাজারের দাম সামান্য উঠা-নামা করিতে পারে, আমরা দীর্ঘকালের কথা বিবেচনা করিলে দেখিতে পাই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দাম প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। প্রতিদিনের বাজার-দর উক্ত প্রায়-অপরিবর্তিত দামের অল্প বেশী বা কম হয়। মনে করি, সাধারণ পরিধানের মত ধুতি প্রত্যেকখানি ছয় টাকা দামে বিক্রয় হইতেছিল। হঠাৎ কোন কারণে ধুতির চাহিদা বাড়িয়া গেল, বাজার-দর একটু বাড়িবে। বিক্রেতাদের লাভ বেশী হইবে, উৎপাদনকারীরা উৎসাহ পাইবে। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা উৎপাদন বাড়াইয়া ফেলিবে। দাম আবার নামিয়া ছয় টাকা বা তাহার কাছাকাছি আসিবে। আবার কোন কারণে ধুতির চাহিদা কমিয়া গেল। দামও ছয় টাকা অপেক্ষা কম হইল। বিক্রেতাদের এবং উৎপাদনকারীদের লোকসান হইতে লাগিল। উৎপাদনকারীরা নিরুৎসাহ হইয়া উৎপাদন কমাইয়া ফেলিবে। ফলে যোগানও কমিবে। আবার মূল্য বাড়িয়া ছয় টাকা বা তাহার কাছাকাছি হইবে। কোনও দ্রব্যের দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রায় যে দাম থাকে, তাহাকে বলা হয় স্বাভাবিক দাম (Normal Price) এবং কোন বিশেষ সময়ে যে দাম থাকে, তাহাকে বাজার দাম (Market Price) বলা হয়। আমাদের উপরের এই দৃষ্টান্তে ধুতির ছয় টাকা হইল স্বাভাবিক দাম।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকিলে কোন দ্রব্যের স্বাভাবিক দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা স্বাভাবিক দাম বেশী হইলে পুরাতন উৎপাদনকারীরা উৎপাদন বাড়াইবে। নূতন উৎপাদনকারীরা উৎপাদন আরম্ভ করিবে। তখন আবার যোগান বাড়িয়া যাইবে। দাম কমিয়া যাইবে। আবার যদি স্বাভাবিক দাম উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম হয় তবে কোন কোন উৎপাদনকারী উৎপাদন বন্ধ

কমিবে, কেহ কেহ উৎপাদন কমাইবে। যোগান কমিবে। দাম বাড়িবে। এইরূপে দেখা যায়, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। দীর্ঘ সময়কার দামই স্বাভাবিক দাম।

সময় এবং দ্রব্যের দর (Time and Price) :

কোন দ্রব্যের দর নিরূপণের ব্যাপারে চাহিদা এবং যোগান এই উভয়ের প্রভাবই আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের প্রভাব সকল সময় সমান নহে। কখনও চাহিদাব প্রভাব বেশী হয়। কখনও আবার যোগানের প্রভাব বেশী হয়। সময়ের বিস্তারের উপর ইহা প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে। আমরা প্রথম অল্প সময়ের কথা ধরি। বাজারে আজ যে পরিমাণ মাছের আমদানি হইয়াছে; তাহা আজিকার দিনের মত অপরিবর্তনশীল। বাড়ানোও চলিবে না, কমানোও চলিবে না। এই অবস্থায় যদি চাহিদা বেশী হয়, তবে মূল্য বেশী হইবে। যদি চাহিদা কম হয়, তবে মূল্য কম হইবে। সময় যদি এইরূপ অল্প হয়, তবে দামের উপর চাহিদার প্রভাবই বেশী হয়।

এইবার দীর্ঘ সময়ের কথা বিবেচনা করা যাউক। পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে চাহিদার সামান্য প্রভাবে মূল্য সামান্য উঠা-নামা করিবে। কিন্তু এই সামান্য উঠা-নামা উৎপাদন-ব্যয়ের কাছাকাছিতেই হইবে। দীর্ঘ সময়ে মূল্য নিরূপণে যোগানের প্রভাবই বেশী হইবে। কারণ দীর্ঘকালের জন্য চাহিদা প্রায় স্থির কিন্তু যোগান বাড়ানো-কমানো চলে। চাহিদা এবং যোগান যখন উভযেই পরিবর্তনশীল, তখন মূল্য চাহিদা এবং যোগান এই উভযের প্রভাবে স্থির হয়। কিন্তু একটি যখন স্থির থাকে তখন অন্যটির প্রভাবে মূল্য স্থির হয়। যদি যোগান স্থির থাকে, তবে চাহিদার প্রভাবে মূল্য স্থির হয। আবার যদি চাহিদা স্থির থাকে, তবে যোগানের প্রভাবে মূল্য স্থির হয়। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত অর্থবিদ্ পণ্ডিত মার্শাল একটি সুন্দর উপমার অবতারণা করিয়াছেন। কাঁচির দুইখানা ব্লেড থাকে। যখন দুইখানা ব্লেডই সমান চলিতে থাকে, তখন কাটার কাজটা উভয় ব্লেডই সম্পন্ন করে। আবার যখন একখানা ব্লেডকে স্থির রাখিয়া কাটার কাজ করা হয়, তখন দ্বিতীয় ব্লেডখানা কাটার কাজ করে। দাম নিরূপণে চাহিদা এবং যোগানের প্রভাব ঠিক এইরূপ।

উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়ম এবং দাম (Cost of Production and Price)

যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো যায় তখন দেখা যায়, কোন ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় কমে, কোন ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় পূর্বের মতই থাকে, আবার কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বেশী হয়। আমরা

কোন একটি কাপড়ের কলের কথা বিবেচনা করিতে পারি। এই কলে ১০০ খানা কাপড় উৎপন্ন হইলে প্রত্যেকখানা কাপড়ের জন্য চারি টাকা ব্যয় হয়। যদি সেই কাপড়ের কলে ১০০০খানা কাপড় উৎপন্ন হয়, তবে প্রত্যেকখানা কাপড়ের জন্য ব্যয় হয় তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা। এই ক্ষেত্রে দেখা যায়, উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে প্রত্যেকটি উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য কম ব্যয় হয়। উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের হারের হ্রাসের নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়-বিধি (Law of Diminishing Cost) বলা হয়। অন্যভাবে ইহাকে বলা হয় ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন-বিধি (Law of Increasing Return)। হাতে একশতখানা টেবিল তৈয়ার করা হইলে প্রত্যেকখানা টেবিলের জন্য ২৫৲ টাকা ব্যয় হয়। একহাজারখানা টেবিল তৈয়ার করিলেও প্রত্যেকখানার জন্য প্রায় ঐ ২৫৲ টাকাই ব্যয় হয়। এই ক্ষেত্রে দেখা যায়, উৎপাদন-বৃদ্ধি করা হইলেও প্রত্যেকটি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে। উৎপাদন-বৃদ্ধি বা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-ব্যয়ের হারের সমানুপাতিক বৃদ্ধি ও হ্রাসের নিয়মকে সমহার উৎপাদন-ব্যয়-বিধি (Law of Constant Cost) বলা হয়। আবার মনে করি; কোন জমিতে ১০০ কুইণ্টাল ধান্য উৎপাদন করিলে প্রত্যেক কুইণ্টালের জন্য দশ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু যদি ঐ জমিতে ১২৫ কুইণ্টাল ধান্য উৎপন্ন করা হয়, তবে প্রত্যেক কুইণ্টালের জন্য বার টাকা ব্যয় হয়। এই ক্ষেত্রে উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটির উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া গেল। উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-ব্যয় হারের অনুপাত অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধির নিয়মকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়-বিধি (Law of Increasing Cost) বলা হয়। অন্যভাবে ইহাকে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন-বিধি বা (Law of Decreasing Return) বলা হয়।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, দীর্ঘ সময়ের জন্য উৎপাদন-ব্যয় দাম নির্ধারণ করে। এখন দেখিলাম, উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় কমে, কোন দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় সমান থাকে। আবার কোন কোন দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়। এই বিভিন্ন অবস্থায় কিভাবে দাম ঠিক হয়, তাহা আমাদের দেখা প্রয়োজন।

কাপড়ের উৎপাদন বাড়িলে প্রত্যেকখানা কাপড়ের উৎপাদন-ব্যয় কমে। এখন যদি কোন কারণে কাপড়ের চাহিদা বাড়ে, তবে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িবে। গড়পড়তা কাপড়ের উৎপাদন-ব্যয় কমিবে। ফলে দীর্ঘ সময়ে কাপড়ের দাম চাহিদার বৃদ্ধি সত্ত্বেও কমিয়া যাইবে। যদি কাপড়ের চাহিদা কমে, দীর্ঘ সময়ে কম উৎপন্ন হইবে। প্রত্যেকখানা কাপড়ের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িবে। ফলে দীর্ঘ সময়ে দাম বাড়িবে। উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে যে দ্রব্যের

উৎপাদন-ব্যয় কমে, সে দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে দীর্ঘ সময়ে দাম কমে এবং চাহিদা কমিলে দীর্ঘ সময়ে দাম বাড়ে।

• টেবিলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও প্রত্যেকখানার জন্য উৎপাদন-ব্যয় সমান থাকে। টেবিলের চাহিদা বাড়িলে বা কমিলে দীর্ঘ সময়ে যোগান বাড়িবে বা কমিবে। কিন্তু উৎপাদন-ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি দামের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না। উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে যে দ্রব্যের প্রত্যেকটির উৎপাদন-ব্যয় সমান থাকে, চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধিতে দীর্ঘ সময়ের জন্যও এই দ্রব্যের দামের কোন পরিবর্তন হয় না।

ধান্যের উৎপাদন বাডাইতে গেলে প্রত্যেক কুইণ্টাল ধান্যের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ধান্যের যদি চাহিদা বাড়ে, তবে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উৎপাদন বাড়ানো চলে। কিন্তু প্রত্যেক কুইণ্টাল ধান্যের উৎপাদন-ব্যয় বেশী হয়। ফলে ধান্যের চাহিদা বাড়িলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ধান্যের দর বাড়ে। আবার যদি ধান্যের চাহিদা কমে, তবে উৎপাদন কমিবে। তাহাতে প্রত্যেক কুইণ্টাল ধান্যের উৎপাদন-ব্যয় কমিবে। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে চাহিদা কমিলে দাম কমিবে। উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে যে দ্রব্যের প্রত্যেকটির উৎপাদন-ব্যয়-বৃদ্ধি পায়, সে দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়ে এবং চাহিদা কমিলে দাম কমে।

প্রশ্ন

১। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্য কিভাবে নিরূপিত হয়? (পৃঃ ১৮৪-১৮৮)

২। স্বাভাবিক দাম কাহাকে বলে? বাজার দামের সঙ্গে স্বাভাবিক দামের সম্বন্ধ কি? (পৃঃ ১৮৮-১৮৯)

৩। উৎপাদন-ব্যয়ের বিভিন্ন নিয়ম কিভাবে স্বাভাবিক দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে? (পৃঃ ১৮৯-১৯১)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

একচেটিয়া কারবার ও মূল্য নির্ধারণ

(Monopoly and Price Determination)

কোন এক দ্রব্যের মোট যোগানের উপর এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব থাকিলে, সেই ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া কারবার আছে বলিয়া বলা হয়। পূর্ণাঙ্গ একচেটিয়া কারবার বড় একটা থাকে না। অপর কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের হয়ত ঐ দ্রব্যের সামান্য অংশের যোগানের উপর কর্তৃত্ব থাকিতে পারে, কিংবা ঐ দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্যও কিছুটা বাজারে থাকিতে পারে। তবে ঐ একচেটিয়া কারবারীর ঐ দ্রব্যের যোগানের উপর এমন কর্তৃত্ব থাকে যাহার ফলে সে অন্য কাহারও যোগানকে এবং পরিবর্ত দ্রব্যের অস্তিত্বকে অবহেলা করিতে পারে।

সকল কারবারের মালিকই চাহে তাহার লাভের পরিমাণ বাড়াইতে। একচেটিয়া কারবারীও তাহাই চায়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক কারবারীকে বাজার দরে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। বাজার দর অপেক্ষা বেশী মূল্য দাবী করিলে, সেই কারবারীর নিকট হইতে কেহ কোন দ্রব্য ক্রয় করে না। একচেটিয়া কারবারী ইচ্ছা করিলে মূল্য বাড়াইয়া দিতে পারে। ইচ্ছামত সে দ্রব্যের যোগান বাড়াইতে কমাইতে পারে। কিন্তু চড়া মূল্যে বিক্রয় করা তাহার উদ্দেশ্য নহে; তাহার উদ্দেশ্য লাভ বেশী করা। যদি মূল্য কমাইলেও লাভ বেশী হয়, তবে সে মূল্য কমায়। স্বভাবতঃই অল্প মূল্যে অধিক বিক্রয় করিয়া অধিক লাভ করাই তখন সে ভাল মনে করে। কাজেই একচেটিয়া কারবারী সকল সময়ই যে উচ্চ মূল্য দাবী করিবে তাহা নহে।

ক্রেতারা মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তন করে। ক্রয়ের পরিমাণ দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। যে দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক তাহার মূল্য একটু কমিলে চাহিদা অনেক বাড়িবে, আবার মূল্য একটু বাড়িলে চাহিদা অনেক কমিবে। আবার যে দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, তাহার মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব চাহিদার উপর সামান্য থাকে। দ্রব্যের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে মূল্য কমাইয়া অনেক বিক্রয় করিয়া একচেটিয়া কারবারী বেশী লাভ করে। আবার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে, মূল্য বাড়াইয়া প্রায় সম-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সে বেশী লাভ করে।

একচেটিয়া কারবারীর মূল্য-নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটা চাহিদার তালিকা প্রস্তুত করা চলে :—

বিদ্যুতের মূল্য প্রতি ইউনিট ৫০ পঃ হইলে, বিদ্যুতের চাহিদা এবং বিক্রয় হইবে ১০০০ ইউনিট
" " " " ৪৪ " " " " " " " ১৫০০ "
" " " " ৩৭ " " " " " " " ২৫০০ "
" " " " ৩১ " " " " " " " ৩৩০০ "
" " " " ২৫ " " " " " " " ৪৫০০ "

আমরা মনে করিতে পারি, বিদ্যুৎ যে-পরিমাণেই উৎপন্ন হউক না কেন, উৎপাদন-ব্যয় প্রতি ইউনিট ২৩ পয়সা। প্রতি ইউনিট ৫০ পয়সা করিয়া মূল্য স্থির করিলে বিক্রয় হইবে ১০০০ ইউনিট, লাভ হইবে ১০০০×২৭(৫০−২৩) অর্থাৎ ২৭০০০ পয়সা। প্রতি ইউনিট ৪৪ পয়সা করিয়া মূল্য স্থির হইলে বিক্রয় হইবে ১৫০০ ইউনিট, লাভ হইবে ১৫০০×২১(৪০−২৩) অর্থাৎ ৩১৫০০ পয়সা। প্রতি ইউনিট ৩৭ পয়সা করিয়া মূল্য স্থির করিলে বিক্রয় হইবে ২৫০০ ইউনিট এবং লাভ হইবে ২৫০০×১৪(৩৭−২৩) অর্থাৎ ৩৫০০০ পয়সা। আবার প্রতি ইউনিট ৩১ পয়সা মূল্য স্থির করিলে বিক্রয় হইবে ৩৩০০ ইউনিট এবং লাভ হইবে ৩৩০০×৮ ৩১−২৩) অর্থাৎ ২৬৪০০ পয়সা। প্রতি ইউনিট ২৫ পয়সা করিয়া বিক্রয় মূল্য স্থির করিলে বিক্রয় হইবে ৪৫০০ ইউনিট এবং লাভ হইবে ৪৫০০×২ (২৫−২৩) অর্থাৎ ৯০০০ পয়সা। এই ক্ষেত্রে দেখা গেল, প্রতি ইউনিট ৩৭ পয়সা করিয়া মূল্য স্থির করিলে লাভ সর্বাধিক হয়। কাজেই একচেটিয়া কারবারী প্রতি ইউনিটের মূল্য ৩৭ পয়সা স্থির করিবে। মূল্য বাড়াইলেও তাহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কিন্তু তাহাতে তাহার লাভ হইত না। সেইজন্য ৪৪ পয়সা বা ৫০ পয়সা না করিয়া সে মূল্য ৩৭ পয়সা স্থির করিল।

পূর্বের দৃষ্টান্তে উৎপাদন বাড়ানো হইলেও মূল্য প্রতি ইউনিট সমান থাকিবে ধরা হইয়াছে। কিন্তু উৎপাদন বাড়াইলে কোন ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটের উৎপাদন-ব্যয় কমিতে পারে, বাড়িতেও পারে। সমান প্রায় কোন ক্ষেত্রেই থাকে না। যে-কোন ক্ষেত্রেই একচেটিয়া কারবারীর নীতি একই থাকিবে। সে সর্বাধিক লাভ করিবার চেষ্টা করিবে। যদি মূল্য খুব কম করিয়া সর্বাধিক লাভ হয়, সে তাহাই করিবে। আবার যদি মূল্য বাড়াইলে সর্বাধিক লাভ হয়, তবে সে মূল্য বাড়াইবে।

বৈষম্যমূলক একচেটিয়া কারবার (Discriminating Monopoly) :

একচেটিয়া কারবারী তাহার দ্রব্যের জন্য একই সময় বিভিন্ন মূল্য আদায় করিতে পারে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হয় না। একচেটিয়া কারবারী বিভিন্ন

মূল্যে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিলে, তাহার কারবারকে বৈষম্যমূলক একচেটিয়া কারবার বলা হয়। তিন-প্রকার ক্ষেত্রে এইরূপ পৃথক মূল্য আদায় করা যাইতে পারে। একচেটিয়া কারবারী ইচ্ছা করিলে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন মূল্য দাবী করিতে পারে। ক্রেতা অনন্যোপায় বলিয়া তাহাকে দাবী-করা মূল্যই দিতে হয়। এই ধরনের আচরণকে ব্যক্তিগত বৈষম্যমূলক মূল্য নির্ধারণ (Personal Discrimination) বলা হয়। চিকিৎসক ইচ্ছা করিলে ধনীদের নিকট হইতে দরিদ্রদের অপেক্ষা বেশী ফী লইতে পারে। আবার একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। ইহাকে স্থানগত বৈষম্যমূলক মূল্য নির্ধারণ (Local Discrimination) বলা হয়। একচেটিয়া কারবারী কখনও কখনও দরিদ্র-অধ্যুষিত অঞ্চলে মূল্য একটু কম রাখিয়া বিত্তবান ব্যক্তিদের এলাকায় মূল্য অধিক রাখে। আবার ক্রেতারা বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য যখন একই দ্রব্য ক্রয় করে, একচেটিয়া কারবারী বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মূল্য আদায় করিতে পারে। তাহার এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণকে বলা হয় ব্যবহারগত বৈষম্যমূলক মূল্য নির্ধারণ (Use Discrimination)। কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী বাড়ীতে আলো এবং পাখার জন্য যে হারে বিদ্যুতের মূল্য লয়, কারখানায় যন্ত্র চালাইবার জন্য তদপেক্ষা অনেক কম হারে মূল্য লয়।

বৈষম্যমূলক মূল্য নির্ধারণে একচেটিয়া কারবারীকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, যেন দ্রব্যের পুনরায় বিক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকে। যে ব্যক্তি অল্প মূল্যে ক্রয় করিল সে ব্যক্তি যদি তাহা পুনরায় বিক্রয় করিবার সুযোগ পায়, তবে এই ক্রেতার নিকট হইতে অল্প মূল্যে অন্য ক্রেতারা ক্রয় করিবে। একচেটিয়া কারবারী তাহার বৈষম্যমূলক নীতি কার্যকরী করিতে পারিবে না। যে ক্ষেত্রে এইরূপ সম্ভাবনা না থাকে, সে-ক্ষেত্রেই একচেটিয়া কারবারী বৈষম্যমূলক মূল্য আদায় করে।

প্রশ্ন :

১। একচেটিয়া কারবার কাহাকে বলে? একচেটিয়া কারবারে কিভাবে মূল্য নির্ধারণ হয়?
(পৃ: ১১২-১১৩)

২। একচেটিয়া কারবারে বৈষম্যমূলক মূল্য নির্ধারণ কিরূপে হয়? কখন ইহা সম্ভব হয়?
(পৃ: ১১৩-১১৪)

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বণ্টন

(Distribution)

বণ্টন (Distribution) :

ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন—এই চারিটি উৎপাদনের উপাদান। বিভিন্ন উপাদান যদি একই ব্যক্তির হাতে থাকে, তবে উৎপন্ন দ্রব্য সেই ব্যক্তির প্রাপ্য হয়। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে আছে। জমির মালিক এক ব্যক্তি, অন্য আর এক ব্যক্তি মূলধনের মালিক, আবার শ্রমের মালিক শ্রমিকগণ। সংগঠনকারী বিভিন্ন সূত্র হইতে ঐ তিন প্রকারের উপাদান সংগ্রহ করিয়া উৎপাদনের কার্য পরিচালনা করে। উৎপাদনের ফলে যে আয় হয়, তাহাতে বিভিন্ন উপাদানেরই পাওনা অংশ থাকে। যেহেতু এই উপাদান বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকারে থাকে, সেহেতু জাতীয় আয় বণ্টনের কথা উঠে। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় এই বণ্টন অপরিহার্য।

বণ্টন খুব জটিল ব্যাপার। কোন উৎপাদনে কিরূপ পাওনা হইবে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন কাজ। বণ্টনের নীতি লইয়া শ্রমিকের সঙ্গে ধনিকের বিবাদ অনেকদিন ধরিয়া চলিতেছে। তাহাতে কখনও কখনও উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। যেখানে এ বিবাদ কম, সেইখানে উৎপাদন-কার্য সহজে সম্পন্ন হইতেছে।

বণ্টনের মূল নীতি (Principles of Distribution) :

উৎপাদনের কাজে বিভিন্ন উপাদান সাহায্য করে। এই উপাদানগুলির যথাযথ মূল্য দেওয়াই বণ্টনের উদ্দেশ্য। অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য যেভাবে স্থির হয়, উৎপাদনের উপাদানগুলির মূল্যও সেইভাবেই স্থির হয়। কোন দ্রব্যের মূল্য স্থির হয় তাহার যোগান এবং চাহিদার দ্বারা। শ্রমের কত মজুরি হইবে তাহা শ্রমের চাহিদা এবং যোগান দ্বারা স্থির হইবে। মূলধনের জন্য কি মূল্য বা সুদ দিতে হইবে, তাহাও মূলধনের চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা ঠিক হইবে। চাহিদা বাড়িলে মূল্য বাড়ে। যোগান বাড়িলে মূল্য কমে।

শ্রমের মূল্যের কথা ধরা যাক। কাপড়ের চাহিদা বাড়িলে কাপড়-উৎপাদনকারীরা কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইবে এবং অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিবে। শ্রমিকের চাহিদা বাড়িল বলিয়া মজুরি বাড়িবে। আবার যদি শ্রমিকের সংখ্যা

বাড়ে, তবে মজুরি কমিবে। কোন কারখানার মালিক ততক্ষণ পর্যন্ত অধিকতর শ্রমিক নিয়োগ করিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ নিযুক্ত শ্রমিকের উৎপাদন অপেক্ষা অধিক মূল্য তাহাকে না দিতে হয়। যখন মালিক দেখে, আর একজন শ্রমিক নিযুক্ত করিলে সেই শ্রমিকের উৎপাদন তাহাকে যে মজুরি দিতে হয় তাহা অপেক্ষা কম হইবে, তখন সে আর শ্রমিক নিয়োগ করিবে না। এইভাবে বিচার করিয়া মালিক যে শ্রমিককে সর্বশেষ নিযুক্ত করে সে ব্যক্তি মোট উৎপাদনের উপর যতখানি উৎপাদন যোগ করিতে পারে, তাহাই ঐ শ্রমিকের প্রান্তিক উপযোগ। চাহিদা নির্ভর করে এই প্রান্তিক উপযোগের উপর। সকল উপাদানের চাহিদা এইরূপ প্রান্তিক উপযোগের উপর নির্ভর করে।

সকল দ্রব্যের যোগান কিন্তু একই নিয়মের অধীন নহে। ভূমির যোগান প্রায় নির্দিষ্ট, বাড়ানো-কমানো সম্ভব নহে। শ্রমের পরিমাণ নির্ভর করে জনসংখ্যার বাড়তি-কমতির উপর। মূলধনের যোগান নির্ভর করে মানুষের সঞ্চয় করিবার এবং সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিবার প্রবৃত্তির উপর। সংগঠকের যোগান নির্ভর করে ঝুঁকি লইবার আগ্রহের উপর। কাজেই যোগানের ক্ষেত্রে যে-কোন একটি নিয়ম কার্যকর নহে।

যোগান যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে চাহিদার উপর উপাদানের মূল্য নির্ভর করে। আবার চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে যোগানের উপর উপাদানের মূল্য নির্ভর করে। উভয় যদি পরিবর্তনশীল হয়, তবে উভয়ের যুক্ত প্রভাবে উৎপাদনের উপাদানের মূল্য ঠিক হয়।

জমি ও খাজনা (Land and Rent):

জমি প্রকৃতির দান। মানুষ ইহার পরিমাণ সামান্যই বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। প্রকৃতির দান হওয়া সত্ত্বেও জমি ব্যবহারের জন্য মূল্য দিতে হয়। কারণ ইহার যোগান সীমাবদ্ধ। ভাল জমি পাইবার জন্য চাষীরা প্রতিযোগিতা করে। সেইজন্য ভাল জমির মালিক খাজনা আদায় করিতে পারে।

খাজনার আর একটি কারণ আছে। জমির উৎপন্ন ফসল হ্রাসমান উৎপন্ন নিয়মের অধীন। একখণ্ড জমিতে অধিক হইতে অধিকতর শ্রম এবং মূলধন নিয়োগ করিলে ফসল-বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। কাজেই একখণ্ড জমিতে অধিকতর শ্রম এবং মূলধন নিয়োগ না করিয়া অন্য জমি চাষ করা কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয়; তখন নূতন জমির চাহিদা হয়। জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কাজেই জমির মালিক নূতন জমির জন্য খাজনা আদায় করে।

বিভিন্ন জমির উর্বরতা বিভিন্ন পরিমাণের। এমন জমি আছে যাহা চাষ করিলে চাষীর প্রচুর লাভ হয়। আবার এমন জমি আছে যাহা চাষ করিলে চাষীর যে ব্যয় হয়, সে পরিমাণ ফসল সে পায় না। সে জমি চাষ হয় না। এমন জমি আছে যাহা চাষ করিলে চাষী অন্ততঃ তাহার সকল দিককার খরচ পোষাইতে পারে। এই ধরনের জমিকে বলে প্রান্তিক জমি। যে প্রান্তিক জমি চাষ করে, তাহাকে ঐ জমি চাষের জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। কিন্তু যে জমি প্রান্তিক জমি অপেক্ষা ভাল, সে জমি চাষ করিবার জন্য চাষীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। ঐ জমির চাষীকে চাষের জন্য মূল্য দিতে হয়। এই মূল্যই অর্থবিদের ভাষায় জমির খাজনা।

যেহেতু বিভিন্ন জমির উর্বরতা বিভিন্ন প্রকারের, যেহেতু বিভিন্ন জমির খাজনার পরিমাণও বিভিন্ন। একখণ্ড জমি চাষ করিয়া এক ব্যক্তির বিভিন্ন খরচ মিটাইবার পর ১০০৲ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিল। আর একখণ্ড জমি চাষ করিয়া ঐ ব্যক্তির বিভিন্ন খরচ মিটাইয়া ১২৫৲ উদ্বৃত্ত থাকে। প্রথম জমির খাজনা ১০০৲ টাকা, কিন্তু দ্বিতীয় জমির খাজনা ১২৫৲ টাকা।

জমির ফসল হইতে বিভিন্ন খরচ মিটাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সম্পূর্ণ অংশই খাজনা হিসাবে জমির মালিককে দিতে হয়। যদি কোন রায়ত বা চাষী সম্পূর্ণ না দিতে চাহে, তবে চাষী বা রায়তের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে শেষ পর্যন্ত তাহাকে সম্পূর্ণটাই দিতে হয়। সম্পূর্ণটাই জমির খাজনা।

খাজনার উৎপত্তি (Origin of Rent) ঃ

বিখ্যাত ধনবিজ্ঞানী রিকার্ডোর মতে জমির মৌলিক এবং অবিনশ্বর শক্তির জন্য খাজনা দিতে হয়। যে জমির এই শক্তি যত বেশী, সেই জমির খাজনা তত বেশী। একখণ্ড জমি অপর একখণ্ড জমি অপেক্ষা উর্বর। উর্বরতর জমির চাষী বেশী ফসল পায়। এই অধিকতর ফসলের অংশই খাজনা।

খাজনার কিরূপে উৎপত্তি হয়, তাহা একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে। মনে করা যাক, একটি নূতন দেশ আবিস্কৃত হইল। সেখানে কয়েক জন কৃষক যাইয়া চাষ-আবাদ আরম্ভ করিল। যে জমিতে অল্প পরিশ্রমে অল্প মূলধনে অধিক ফসল হইবে, প্রথমতঃ কৃষকগণ সেই উর্বর জমিগুলিই চাষ করিল। প্রয়োজন-অনুরূপ ভাল জমি ছিল বলিয়া খাজনার কোন প্রয়োজন হইল না।

ক্রমে লোকসংখ্যা বাড়িল। অধিকতর খাদ্যের প্রয়োজন হইল। নূতন জমি চাষের প্রয়োজন হইল। প্রথম শ্রেণীর ভাল উর্বর জমিতে ইতিপূর্বে চাষ হইয়া গিয়াছে। অপেক্ষাকৃত খারাপ জমি বা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে এইবার চাষ আরম্ভ

করিতে হইল। একই পরিমাণ শ্রম এবং মূলধন নিয়োগ করিয়া প্রথম শ্রেণীর জমিতে বিঘা প্রতি যে ফসল পাওয়া যাইত, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে তদপেক্ষা কম ফসল পাওয়া যাইবে। মনে করা যাউক, ত্রিশ টাকা পরিমাণ শ্রম এবং মূলধন নিয়োগ করিলে প্রথম শ্রেণীর এক বিঘা জমিতে পনের কুইণ্টাল ধান পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে দশ কুইণ্টাল ধান পাওয়া যায়। বাজারে ধানের মূল্য অন্ততঃ প্রতি কুইণ্টাল তিন টাকা হইবে। তাহা না হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কেহ চাষ করিবে না। প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া এক জন কৃষক এক বিঘা জমির ধান বিক্রয় করিয়া পঁয়তাল্লিশ টাকা পাইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া এক জন কৃষক এক বিঘা জমির ধানের জন্য ত্রিশ টাকা পাইবে। প্রথম শ্রেণীর জমির চাষীর খরচ বাদে পনের টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির চাষীর কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। তাহার জমিকে বলা হয় প্রান্তিক (marginal) জমি। যে জমির উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়া কৃষক কেবল তাহার খরচটাই উঠাইতে পারে, সে জমিকে বলা হয় প্রান্তিক জমি। প্রান্তিক জমি এবং ভাল জমির উৎপন্ন ফসলের পার্থক্যকে ভাল জমির খাজনা বলা হয়।

প্রান্তিক জমির উৎপন্ন ফসলের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের সমান। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে তখনই দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির চাষ আরম্ভ হইল, যখন ধানের মূল্য তিন টাকা হইবে। প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা ফসলের মূল্য নির্ধারণ হয়। প্রান্তিক জমির খাজনা নাই। কাজেই খাজনা প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। খাজনা মূল্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। যে জমির খাজনা বেশী, সে জমির মালিক খাজনাবিহীন বা কম খাজনার জমির মালিক অপেক্ষা বেশী মূল্যে ফসল বিক্রয় করিতে পারে না। সকলের ফসলের মূল্যই সমান।

ফসলের মূল্য বাড়িলে খাজনা বাড়ে। আমাদের পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে ঐ নূতন দেশে লোকসংখ্যা যদি আরও বৃদ্ধি পায়, তবে ধানের চাহিদা বাড়িবে। মূল্য কুইণ্টাল প্রতি চারি টাকা হইবে। তখন কৃষকগণ তৃতীয় শ্রেণীর জমির চাষ আরম্ভ করিবে। এই জমিতে ত্রিশ টাকার শ্রম এবং মূলধন নিয়োগ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে সাড়ে সাত কুইণ্টাল ফসল পাইবে। এই ফসলের মূল্য ত্রিশ টাকা। এই জমি এখন প্রান্তিক জমি। এইবার প্রথম শ্রেণীর জমির ফসল বিক্রয় করিয়া পাওয়া যাইবে ষাট টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির ফসল বিক্রয় করিয়া পাওয়া যাইবে চল্লিশ টাকা। কাজেই প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা বাড়িয়া ত্রিশ টাকা (৬০৲—৩০৲) হইল, আর যে জমির খাজনা ছিল না সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির খাজনা হইবে দশ টাকা (৪০৲—৩০৲)। কাজেই দেখা যায়, লোকসংখ্যা বাড়িলে বা ফসলের মূল্য বাড়িলে খাজনা বাড়ে।

গৃহ-নির্মাণের জমির খাজনা (Rent for Building Land) :

চাষের জমির খাজনা নির্দিষ্ট হয় তাহার উর্বরতার দ্বারা। যে জমি যত বেশী উর্বর, সেই জমির খাজনা তত বেশী। কিন্তু গৃহ-নির্মাণের জন্য যে জমি, তাহার খাজনা উর্বরতার উপর নির্ভর করে না। তাহার খাজনা নির্ভর করে অবস্থানের উপর। যে জমির অবস্থান যত ভাল, সেই জমির খাজনা তত বেশী। যাহারা আফিসের জন্য গৃহ নির্মাণ করিতে চাহে, তাহারা বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যে স্থানে আছে সে স্থানের জমির জন্য অধিকতর খাজনা দিবে। সৌখিন ব্যক্তি যে অঞ্চলে সৌখিন লোকের বাস, সে অঞ্চলের জমির জন্য অধিকতর খাজনা দিবে। বাসের জমির খাজনা উর্বরতার উপর নির্ভর না করিয়া নির্ভর করে তাহার অবস্থানের উপর।

অনুপার্জিত মূল্য-বৃদ্ধি (Unearned rent) ঃ

কখনও কখনও দেখা যায়, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি, রাস্তাঘাটের উন্নতি প্রভৃতির ফলে এক অঞ্চলে জমির মূল্য বাড়িয়া যায়। এই ধরনের মূল্যবৃদ্ধির জন্য জমির মালিককে কোন প্রকার চেষ্টাই করিতে হয় নাই। বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের পার্শ্ববর্তী স্থানের জমির মূল্য কয়েক বৎসর পূর্বে সামান্যই ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে দুর্গাপুর লৌহ-নগর গড়িয়া উঠিল। ফলে জমির চাহিদা বাড়িল। পার্শ্ববর্তী স্থানের জমিগুলির মূল্য বাড়িয়া গেল। এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য এই সকল জমির মালিককে কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই। এই ধরনের মূল্যবৃদ্ধি, যাহা মালিকের কোন চেষ্টার ফলে না হইয়া বাহিরের নানা ধরনের উন্নতির ফলে হয়, তাহাকে অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি বলে।

প্রশ্ন

১। খাজনার উৎপত্তি এবং প্রকৃতি বর্ণনা কর। (পৃঃ ১৯৬-১৯৮)

২। খাজনার উপর জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফল কি ? (পৃঃ ১৯৮)

৩। মূল্যের সঙ্গে খাজনার কি সম্বন্ধ ? (পৃঃ ১৯৯)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রম ও মজুরি

(Labour and Wages)

উৎপাদন-কার্য সম্পাদনের জন্য উৎপাদনকারীকে শ্রম নিয়োগ করিতে হয়। নানা প্রকারে যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের এবং ব্যবহারের ফলে প্রত্যেক কারখানায় পূর্বাপেক্ষা কম শ্রম নিয়োজিত হয়। কিন্তু কারখানার আয়তন এবং সংখ্যা বাড়িয়াছে। কাজেই মোট শ্রমের নিয়োগ কমে নাই বরং অনেক বাড়িয়াছে। শ্রমের জন্য শ্রমিককে যে মূল্য দিতে হয়, তাহাকে বলা হয় মজুরি।

শ্রমের মজুরি দুই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। সময়ের হিসাবে শ্রমের মজুরি দেওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে যত দিন যত ঘণ্টা শ্রম নিয়োগ করা হইল, প্রতিদিন বা প্রতি ঘণ্টার জন্য নির্দিষ্ট হারে মজুরি দেওয়া হয়। আবার কাজের হিসাবে শ্রমের মজুরি দেওয়া যায়। কোন শ্রমিক যদি হাজার গজ কাপড় বোনে, প্রতি গজের জন্য নির্দিষ্ট হারে তাহাকে মজুরি দেওয়া চলে। প্রথমটিকে বলা হয় সময়-মজুরি (Time wage) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় কর্মানুগ মজুরি (Piece wage)।

শ্রমের মজুরিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ বা টাকাপয়সা পাওয়া যায়, তাহা আর্থিক মজুরি (Money wage) এবং শ্রমের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় যে-সকল সামগ্রী ও সুবিধা পাওয়া যায়, তাহাই শ্রমের আসল মজুরি (Real wage)। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কিংবা এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে গেলে দেখা যায়, কখনও কখনও কোন শ্রমিক বেশী আর্থিক মজুরি পায়। কিন্তু আসল মজুরি কমিয়া যায়। যেমন ধরা যাউক, একজন শ্রমিক নিজ গ্রামে কাজ করিলে দৈনিক দুই টাকা মজুরি পায়। সে কলিকাতায় কাজ করিলে দৈনিক তিন টাকা পায়। কলিকাতায় আর্থিক মজুরি গ্রামের আর্থিক মজুরি অপেক্ষা বেশী। কিন্তু কলিকাতায় তিন টাকায় যে-সকল প্রয়োজনীয় জিনিস ও সুবিধা পাওয়া যায়, গ্রামে দুই টাকায় তাহা অপেক্ষা বেশী জিনিস ও সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে। ফলে কলিকাতায় আর্থিক মজুরি বেশী হইলেও, আসল মজুরি কম হইতে পারে। শ্রমিকদের কাছে আর্থিক মজুরি অপেক্ষা আসল মজুরিই অধিক বিবেচনার বিষয়।

শ্রমের কয়েকটি বিশিষ্টতা আছে। শ্রম শ্রমিকের অংশ বিশেষ। মূলধন কিংবা

জমির মালিকানা হস্তান্তরিত করা যায়। কিন্তু শ্রমের মালিকানা হস্তান্তরিত করা যায় না। মালিক হইতে মূলধনকে বা জমিকে পৃথক করা চলে। শ্রমিক হইতে শ্রমকে পৃথক করা চলে না।

মূলধন, জমি কিংবা অন্য দ্রব্য আজ বিক্রয় না করিয়া কাল বিক্রয় করা চলে বা দুইদিন পরে বিক্রয় করা চলে। কিন্তু শ্রম একদিন যদি বিক্রয় না হয়, তবে সেদিনের শ্রম নষ্ট হয়। সেইজন্য শ্রমিকদের পক্ষে অপেক্ষা করা চলে না। এইজন্য দরাদরিতে শ্রমিকের দিকটা একটু দুর্বল।

শ্রমের চাহিদা বাড়িলে যোগান বাড়ানো সময়সাপেক্ষ। সেইজন্য শ্রমের চাহিদা বাড়িলে শ্রমিকের পক্ষে বেশী মূল্য পাওয়া একটু সহজ। চাহিদা কমিলে যোগানও সঙ্গে সঙ্গে কমানো চলে না। ইহার ফলে চাহিদা কমিলে শ্রমের মূল্য কমিয়া যায়।

মজুরি নির্ণয় পদ্ধতি :

মজুরি নির্ণয় পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে লোকেরা মনে করিত যে পরিবারের সকলের সাধারণ ভাতকাপড় যোগাইবার জন্য একজন শ্রমিকের দৈনিক যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা তাহার মজুরির সমান। নিজের এবং নিজ পরিবারের সাধারণ ভাতকাপড় যোগাইতে যদি তাহার দৈনিক তিন টাকা ব্যয় হয় তবে তাহার দৈনিক মজুরিও তিন টাকা হইবে। যদি মজুরির হার এতদপেক্ষা বেশী হয় তবে অধিক-সংখ্যক মজুর বিবাহ করিবে। তাহাদের সন্তানের সংখ্যা বাড়িবে। ফলে কিছুকালের মধ্যেই শ্রমিকের যোগান বাড়িবে। যোগান বাড়িলে মূল্য কমিবে। পরিণামে মজুরি দৈনিক তিন টাকায় দাঁড়াইবে। আবার কখনও যদি মজুরি তিন টাকার কম হয় তখন তাহার পরিবারের কেহ কেহ অর্ধাহারে বা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ফলে শ্রমের যোগান কমিয়া যাইবে। যোগান কমিলে মূল্য বাড়িবে। পরিণামে মজুরি আবার তিন টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে। সাময়িকভাবে মজুরির হ্রাসবৃদ্ধি হইলেও পরিণামে মজুরি তিন টাকাতে দাঁড়াইবে। কাজেই তাহাদের মতে মজুরি শ্রমিকের নিজের এবং তাহার পরিবারের লোকেদের সাধারণ ভাবে জীবনধারণের মত প্রয়োজনীয় অর্থের সমান হইবে।

তাহাদের এই মতবাদ গ্রহণ করা চলে না। মজুরি বৃদ্ধি পাইলেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মজুরি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেই জনসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় একথা সত্য নহে। বর্তমান যুগের শ্রমিকরা কেবল সাধারণ ভাবে জীবনধারণোপযোগী আয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। কাজেই আয় বাড়িলেই তাহারা লোকসংখ্যা বাড়াইতে স্বতঃই আগ্রহশীল হয় না। আবার লোকসংখ্যা বাড়িলেই আয় কমে না। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের

বিভিন্ন দেশে লোকসংখ্যা বেশ বাড়িয়াছে, অথচ ইয়োরোপবাসীদের আয় নিম্নতম জীবনধারণোপযোগী আয় অপেক্ষা অধিকই রহিয়া গিয়াছে। এইসব কারণে এই মতবাদকে কেহ আর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করে না।

আবার কেহ কেহ মনে করেন যে শ্রমিকের মজুরি এমন হওয়া চাই যাহাতে শ্রমিক তাহার নিজ জীবনধারণের মান বজায় রাখিতে পারে। সকল শ্রমিকের জীবনধারণের মান এক নহে। কাহারও জীবনধারণের মান উচ্চ, কাহারও জীবনধারণের মান নিম্ন। যাহার জীবনধারণের মান উচ্চ, তাহার মজুরির হার উচ্চ, যাহার জীবনধারণের মান নিম্ন, তাহার মজুরির হার নিম্ন। এই মতের সমর্থকরা বলেন যে, যে-শ্রমিকের জীবনধারণের মান উচ্চ, জীবনধারণের মান বজায় রাখিতে যে পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন সে পরিমাণ মজুরির কম মজুরিতে সে তাহার শ্রম যোগাইবে না। এই মতবাদে কিছুটা পরোক্ষ সত্য নিহিত আছে। কোন শ্রমিকের জীবনধারণের মান উচ্চ বলিয়াই মালিক তাহাকে অধিকতর হারে মজুরি দিতে স্বীকৃত হইবে না। অবশ্য অন্য কারণে এই ধরনের শ্রমিক অন্য অপেক্ষা উচ্চ হারে মজুরি পাইয়া থাকে। মালিক শ্রমিককে মজুরি দেয় তাহার উৎপাদন-ক্ষমতার জন্য। যে শ্রমিক অধিকতর উৎপাদন করে বা অধিকতর কর্মকুশলী সে শ্রমিককে মালিক উচ্চহারে মজুরি দেয়। কর্মকুশলতা কিছু পরিমাণে জীবনধারণের মানের উপর নির্ভর করে। যে শ্রমিকের জীবনধারণের মান উচ্চ সে পুষ্টিকর খাদ্য পায়, উত্তম ধরনের বস্ত্র পরিধান করে, ভাল বাড়ীতে বাস করে, ভাল রকমের শিক্ষা পায়। কাজেই সে অধিকতর কুশলী হয়। অধিকতর কুশলী বলিয়াই মালিক তাহাকে উচ্চতর হারে মজুরি দেয়। কাজেই দেখা যায় জীবনধারণের মানের প্রভাব মজুরির উপর প্রত্যক্ষ নহে, পরোক্ষ।

জীবনধারণের মান উচ্চ হইলে অন্যদিক দিয়াও অবশ্য মজুরির হার বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে। জীবিকানির্বাহের মান উচ্চ হইলে বর্তমান যুগের শ্রমিকরা পরিবারের আয়তন কমাইতে চায়। জন্মের হার কমে। ফলে শ্রমের যোগান কম হয় এবং শ্রমের মূল্য অর্থাৎ মজুরির হার বেশী হয়।

উপরের এই আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে উচ্চহারে মজুরি না পাইলে শ্রমিকগণ সাধারণতঃ তাহাদের জীবনধারণের উচ্চ মান বজায় রাখিতে পারে না। মান উচ্চ রাখিতে পারিলেই তাহাদের কুশলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তখন মালিক তাহাদিগকে উচ্চতর হারে মজুরি দেয়। কেবল জীবনধারণের মান উচ্চ বলিয়াই উচ্চ হারে কেহ মজুরি দাবী করিতে পারে না। সেই উচ্চতর মান যদি কুশলতা বাড়ায় তবেই উচ্চতর মজুরির দাবী গ্রহণযোগ্য হয়।

অন্যান্য উপাদানের মত শ্রমের মূল্যও চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভর করে।

চাহিদা বাড়িলে মূল্য বাড়ে। চাহিদা কমিলে মূল্য কমে। আবার যোগান বাড়িলে মূল্য কমে। যোগান কমিলে মূল্য বাড়ে। যেহেতু যোগানের বাড়তি-কমতি সময়সাপেক্ষ, চাহিদাই মূল্যের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

শ্রমিকের চাহিদা নির্ভর করে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের উপর। একজন সংগঠক আট জন শ্রমিক নিযুক্ত করে। সে এখন নবম শ্রমিক নিয়োগের কথা ভাবিতেছে। নবম শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন বাড়িবে। নয় জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন হইতে আট জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন বাদ দিলে, নবম শ্রমিক কি উৎপাদন করিল, তাহা বুঝা যাইবে। এখন এই নবম শ্রমিককে যে মূল্য দিতে হইবে, তাহা তাহার উৎপাদনের সমান। দশম শ্রমিককে যে মূল্য দিতে হইবে, সে মূল্য দশম শ্রমিকের উৎপাদন অপেক্ষা বেশী হইবে। সংগঠক দশম শ্রমিক নিয়োগ করিবে না। এই ক্ষেত্রে নবম শ্রমিকের উৎপাদনই প্রান্তিক উৎপাদন। এই প্রান্তিক উৎপাদন চাহিদার দিক হইতে শ্রমের মূল্য স্থির করে। শ্রমের মূল্য শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়।

শ্রমের যোগান স্থির হয় জীবনধারণের নির্দিষ্ট মান এবং সেই মান বজায় রাখিয়া জীবনধারণের ব্যয়ের উপর। যখন শ্রমের মূল্য এই ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয় তখন শ্রমের যোগান বাড়ে। যখন শ্রমের মূল্য এই ব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তখন শ্রমের যোগান কমে। শ্রমের মূল্যের ঝোঁক এই ব্যয়ের সমান হওয়ার দিকে।

যেহেতু যোগান এবং চাহিদা শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করে, আমরা বলিতে পারি, স্বাভাবিক অবস্থায় জীবনযাত্রার মান এবং অপর দিকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ে সমান হয়। শ্রমের মূল্য যখন এইরূপ থাকে, তখন শ্রমের যোগান এবং চাহিদা সমান হয়। শ্রমিকের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে সাধারণতঃ সর্বক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরির হার সমান হয়। মজুরির পার্থক্য থাকিলে যে শিল্পে মজুরি বেশী, শ্রমিকরা সে শিল্পে ভিড় করিবে। ফলে সেখানে মজুরি কমিবে।

এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে কিংবা এক কাজ হইতে অন্য কাজে যাইবার সুবিধা থাকিলে, সকল শিল্পে বা কাজে মজুরি সমান হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ সুবিধা থাকিলেও, মজুরির তারতম্য থাকে। অপ্রীতিকর কাজের জন্য মজুরি বেশী দিতে হয়। সেইজন্য ঝাড়ুদারের মাহিনা সাধারণ মজুরের মাহিনা অপেক্ষা বেশী। যে কাজ শিখিতে সময় এবং অর্থ ব্যয় হয়, সে কাজের মজুরি বেশী দিতে হয়। যে কাজ অস্থায়ী তাহার জন্য স্থায়ী কাজের মজুরির চাইতে বেশী মজুরি দিতে হয়। আফিসের পিয়নের চাকুরি স্থায়ী, রাজমিস্ত্রীর কাজ অস্থায়ী; বিশেষতঃ সারা বৎসর রাজমিস্ত্রীর কাজ চলে না। সে জন্য রাজমিস্ত্রীর মজুরির হার বেশী। যে কাজ দায়িত্বপূর্ণ, সে কাজের জন্য বেশী

মজুরি দিতে হয়। এইরূপ দেখা যায়, এক প্রকার পরিশ্রমের কাজ হইলেও এবং এক কাজ হইতে অন্য কাজে যাওয়া সম্ভব হইলেও; কোন কোন কাজের জন্য অন্য কাজ অপেক্ষা বেশী মজুরি দিতে হয়।

শ্রমিক সংঘ—যৌথ দরাদরি (Trade Union & Collective bargaining) :

শ্রমের নিয়োগকারী শ্রমিককে প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরি দিতে পারে। প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের অধিক মজুরি দিতে হইলে, নিয়োগকর্তা অধিকতর শ্রমিক নিয়োগ করে না। কিন্তু সাধারণতঃ শ্রমের নিয়োগকারী প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য অপেক্ষা শ্রমিককে কম মূল্য দেয় বা কম দিতে চেষ্টা করে। শ্রমিকগণ কতগুলি অসুবিধা ভোগ করে বলিয়া কম মজুরি গ্রহণ করিয়াও কাজ করিতে স্বীকার করে। অন্যান্য দ্রব্য একদিন ধরিয়া রাখিলে নষ্ট না-ও হইতে পারে। কিন্তু শ্রম ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই। শ্রমিক একদিন কাজ না করিলে তাহার সেই দিনের শ্রম নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা খারাপ বলিয়া তাহারা অপেক্ষা করিতে পারে না। অপেক্ষা করিলে হয়ত উপবাসী থাকিতে হইবে। সেজন্য ন্যায্য পাওনা অপেক্ষা কম পাইলেও তাহাদিগকে কখনও কখনও কাজ করিতে হয়। বিশেষতঃ শ্রমিকের সংখ্যা বেশী বলিয়া সকল সময় ভয় থাকে, একজন কাজ না করিলে অপর আর একজন কাজ করিবে। শ্রমিকের এই সকল অসুবিধার সুযোগ লইয়া শ্রমের নিয়োগকারী শ্রমিককে প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য দিতে চেষ্টা করে।

শ্রম-নিয়োগকারীদের এই চেষ্টা রোধ করিবার জন্য শ্রমিকগণ একতাবদ্ধ হইয়া শ্রমিক সংঘ গঠন করে। শ্রমিক সংঘ দরাদরি করিয়া শ্রম-নিয়োগকারীর নিকট হইতে শ্রমের প্রান্তিক মূল্যের সমান মজুরি আদায় করিবার চেষ্টা করে। ইহাকে যৌথ দরাদরি বলা হয়। যে-কোন একজন শ্রমিক দুর্বল। কিন্তু সকল শ্রমিক একত্র হইয়া সংঘ গঠন করিলে, এই সংঘ শক্তিশালী হইয়া দরাদরি করিতে পারে। শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করে। ফলে শ্রমিক সংঘের নির্দেশ অমান্য করিয়া কোন শ্রমিক নির্দিষ্ট মজুরির কম মজুরিতে কাজ করে না। বিশেষতঃ প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া সংঘ কৃত্রিম সংখ্যাল্পতা সৃষ্টি করে। তখন শ্রম-নিয়োগকারীকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের সমান মজুরি দিতে হয়। শ্রমিক সংঘ গঠনের মাধ্যমে যৌথ দরাদরির ফলে শ্রমিক তাহার পাওনা আদায় করে।

শ্রমিক সংঘ দুই প্রকারের কাজ করে। প্রথমতঃ, এই সংঘ শ্রমিকদের মধ্যে নানা প্রকারের কল্যাণমূলক কাজ করে। হাসপাতাল স্থাপন করে, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে, খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এইগুলি কখনও

সংঘের নিজ অর্থে স্থাপিত হয়। কখনও বা নিয়োগকারীকে এইগুলি স্থাপন করিতে বাধ্য করা হয়। শ্রমিক সংঘ কর্মচ্যুত শ্রমিকের ভাতার ব্যবস্থা করে, তাহার পুনর্নিয়োগের চেষ্টা করে। এইগুলি শ্রমিকদের মধ্যে কল্যাণমূলক কাজ। শ্রমিক সংঘের দ্বিতীয় কার্য হইল যৌথ দরাদরির মাধ্যমে মজুরি-বৃদ্ধির চেষ্টা এবং কার্যের শর্তাবলীর উন্নতি-সাধনের চেষ্টা। এইগুলিকে সংঘের সংগ্রামমূলক কার্য বলা হয়। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য শ্রমিক সংঘ কথাবার্তা (negotiation) চালায়, আপসের (conciliation) চেষ্টা করে, সালিশীর (arbitration) ব্যবস্থা করে, এবং সর্বশেষ হাতিয়ার হিসাবে ধর্মঘট পরিচালন করে। শেষ হাতিয়ার ধর্মঘট প্রয়োগের অর্থাৎ যৌথভাবে কর্ম-বিরতির মাধ্যমে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে সংঘই নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই এই হাতিয়ার প্রয়োগে শ্রমিক সংঘকে অত্যন্ত সতর্ক হইতে হয়। একথা মনে করিতে হইবে, যে-কোন অস্ত্রই প্রয়োগ করা হউক না কেন, প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের অধিক মজুরি কখনই স্থায়িভাবে আদায় করা সম্ভব হইবে না। যদি শ্রম কোন দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের অতি সামান্য অংশ হয়, তবে কখনও কখনও শ্রম-নিয়োগকারী ধর্মঘট এড়াইবার জন্য শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য অপেক্ষা বেশী মজুরি দিতে রাজী হয়। আবার উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় অর্থাৎ মূল্য সামান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও যদি চাহিদার পরিমাণ না কমে, তবে এই ক্ষেত্রেও শ্রমিক সংঘ চাপ দিয়া মজুরি বাড়াইতে পারে। মালিক এইরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদন দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া তাহাদের ক্ষতি পূরণ করিবে।

ভারতের শ্রমিক সংঘ (Trade Union in India) :

ভারতে শ্রমিক সংঘের জন্ম হয় বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর। তৎকালীন দুর্মূল্যতা ছিল ইহার কারণ। যুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল, অথচ অনুপাতে মজুরির হার বাড়ে নাই। ফলে শ্রমিকগণ আর্থিক অসুবিধায় পড়ে। এই সময় ভারতে জাতীয় আন্দোলন জোরাল হইয়া উঠিয়াছিল। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আত্ম-সচেতনতা প্রবল হইয়া উঠিল। শ্রমিকগণ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংঘ গড়িয়া তুলিতে লাগিল। ধীরে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া উঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শ্রমিক সংঘ আরও শক্তিশালী হয়। ফলে প্রায় সকল শিল্পেই শ্রমিক সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। সরকার আইন পাস করিয়া এইগুলির গঠনের কার্যে সহায়তা করিয়াছে।

এতকাল কার্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ভারতের শ্রমিক সংঘ সুসংগঠিত বা শক্তিশালী নয়। তাহার যে-সকল কারণ আছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ক) আমাদের দেশের শ্রমিক সংঘের সদস্যগণ অশিক্ষিত। লেখাপড়া না

জানার ফলে শ্রমিক সংঘের প্রয়োজনীয়তা বা বিভিন্ন দেশে এই ধরনের সংঘের কার্যাবলী সম্বন্ধে ইহারা অজ্ঞ। ফলে শ্রমিক সংঘের কার্যে ইহারা উৎসাহ দেখায় না।

(খ) ভারতের শ্রমিকগণ দরিদ্র। শ্রমিক সংঘের কাজ চালাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়। শ্রমিক সংঘের সদস্যগণ দরিদ্র বলিয়া উহারা ঐ অর্থ যোগাইতে পারে না। নিয়মিত চাঁদা দেওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন, কখনও কখনও অসম্ভব। অথচ অর্থ এই ধরনের সংগঠনের অপরিহার্য সম্বল।

(গ) শ্রমিকদের মধ্যে উপযুক্ত নেতার অভাব। নেতৃত্বের জন্য যে সংগঠন শক্তি, বিচক্ষণতা, বিচার—বিবেচনা বা শিক্ষা থাকা দরকার তাহা তাহাদের নাই। ফলে বাহিরের লোক সংঘের নেতৃত্ব করে। এই বাহিরের নেতা অনেক সময় কোন দল বিশেষের স্বার্থে সংঘের কাজ পরিচালিত করে। শ্রমিক সংঘের স্বার্থ ফলে ক্ষুণ্ণ হয়।

(ঘ) শ্রমিকগণ বিভিন্ন দেশ হইতে আগত। তাহারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। ফলে তাহাদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগান কঠিন। শিল্পের মালিকরা এই অবস্থার সুযোগ নিয়া শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং সফল হয়।

(ঙ) আমাদের দেশের শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কার্য করে না। ইহারা কেবল ধর্মঘট সংগঠক এবং পরিচালনকারী সংঘে পরিণত হইয়াছে। শ্রমিকদের জনহিতকর কোন কাজ করিবার মত অর্থ এবং সামর্থ্যের কোনটাই তাহাদের নাই।

এই সকল নানা কারণে আমাদের দেশের শ্রমিক সংঘ এখনও সুষ্ঠু সংস্থারূপে পরিণত হয় নাই। ফলে শ্রমিকগণও পূর্ণমাত্রায় আকৃষ্ট হইতেছে না।

প্রশ্ন

১। প্রকৃত মজুরি বলিতে কি বুঝায়? প্রকৃত মজুরি এবং আর্থিক মজুরির মধ্যে তারতম্য কি? (পৃঃ ২০০-২০১)

২। মজুরি কি ভাবে সম্পর্ক হয়? (পৃঃ ২০১ ২০৪)

৩। জীবনধারণের মানের সঙ্গে মজুরির সম্পর্ক কি? (পৃঃ ২০৩ ২০৪)

৪। বিভিন্ন শিল্পে বা নিয়োগ ক্ষেত্রে মজুরির হারের তারতম্য হয় কেন? (পৃঃ ২০৪-২০৫)

৫। শ্রমিক সংঘের উদ্দেশ্য এবং কাজ কি? (পৃঃ ২০৪ ২০৫)

৬। মজুরির উপর শ্রমিক সংঘের কার্যের প্রভাব কি? (পৃঃ ২০৪ ২০৫)

৭। ভারতীয় শ্রমিক সংঘের দুর্বলতা কোথায়? (পৃঃ ২০৫-২০৬)

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

সুদ ও মুনাফা

(Interest and Profit)

মূলধন ঃ সুদ ঃ

মূলধন উৎপাদনের অন্যতম উপাদান। মূলধনের জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তাহাকে বলা হয় সুদ। মূলধন বলিতে উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি বুঝায়। কিন্তু ইহা এত রকমের হইতে পারে যে, একটির জন্য নির্দিষ্ট হার অন্যটির হার হইতে পৃথক হইতে বাধ্য। একই রকমের হার নির্দেশ করিবার জন্য বণ্টনের ক্ষেত্রে শিল্প কিংবা ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থ বা টাকাপয়সাকে মূলধন বলিয়া গণ্য করা হয়। অর্থ বা টাকাপয়সা ব্যাপকভাবে মূলধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। কি যন্ত্রপাতি, কি কাঁচা মাল—সব-কিছুই অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায়। সেইজন্য অর্থ বা টাকাপয়সাকে মূলধন বলিয়া গণ্য কবিলে কোন অসুবিধা হয় না।

সুদ কিভাবে নিরূপণ করা হয়, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে মোট সুদ এবং নিট সুদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, তাহা বলা প্রয়োজন। অনেক সময় সুদ আদায়ের জন্য মহাজনকে হিসাব-পত্র রাখিতে হয়, তাগিদ দিতে হয়। কখনও কখনও সুদ বা মূলধন আদৌ আদায় হইবে কিনা তাহা অনিশ্চিত থাকে। এই ক্ষেত্রে মহাজনকে ঝুঁকি লইতে হয়। এই হিসাব-পত্র রাখা, তাগিদ দেওয়া এবং ঝুঁকি লওয়ার জন্য মহাজনের যে পাওনা, তাহাও সুদের মধ্যে সাধারণতঃ ধরা হয়। এই সব হিসাবের মধ্যে গণ্য করিয়া যে অর্থ পাওনা হয়, তাহা মোট সুদ। অর্থবিদ্‌গণ সুদ বলিতে নিট সুদের কথাই মনে করেন। তাহারা আদায় করিবার, হিসাব রাখিবার এবং ঝুঁকি লইবার জন্য দেয় টাকা মোট সুদ হইতে বাদ দিয়া যাহা থাকে, তাহাকেই সুদ বা নিট সুদ বলিয়া গ্রহণ করে।

এই সুদ নির্ভর করে মূলধনের চাহিদা এবং যোগানের উপর। মূলধনের চাহিদা বাড়িলে সুদের হার বাড়ে। মূলধনের চাহিদা কমিলে সুদের হার কমে। আবার যোগান বাড়িলে সুদের হার কমে, যোগান কমিলে সুদের হার বাড়ে।

চাহিদা নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের উপর। প্রান্তিক উৎপাদন যখন সুদের সমান হয়, তখন ব্যবসায়ী বা শিল্পের মালিক আর অধিক মূলধন নিয়োগ করে না;

নিয়োগ করিলে ক্ষতি হয়। অবশ্য এই অবস্থায় যদি মূলধনের যোগান বাড়ে তবে সুদের হার কমে, তখন আরও অধিক মূলধন নিয়োজিত হয়।

মূলধনের যোগান নির্ভর করে সঞ্চয় করিবার শক্তি এবং বিনিয়োগের ইচ্ছার উপর। সঞ্চয়ের শক্তি নির্ভর করে উদ্বৃত্তের উপর। বিনিয়োগের ইচ্ছা নির্ভর করে সুদের হারের উপর। সুদের হার বৃদ্ধি হইলে লোকে অর্থ বিনিয়োগ করিতে আগ্রহশীল হয়। কম হইলে উদাসীন হয়।

সুদের হার কাজেই নির্ভর করে একদিকে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের উপর, অন্যদিকে লোকের সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা এবং বিনিয়োগের ইচ্ছার উপর।

নিম্নে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সুদ নির্ধারণের উপায় দেখানো হইল :—

সুদের শতকরা হার	মূলধনের চাহিদা	মূলধনের যোগান
১০	২০,০০০৲	৫০,০০০৲
৯	২৫,০০০৲	৪৫,০০০৲
৮	৩০,০০০৲	৪০,০০০৲
৭	৩৫,০০০৲	৩৫,০০০৲
৬	৪০,০০০৲	৩০,০০০৲
৫	৪৫,০০০৲	২৫,০০০৲

সুদের হার যখন শতকরা দশ টাকা, তখন মূলধনের চাহিদা ২০,০০০ টাকা, যোগান ৫০,০০০ টাকা। সুদের হার কমিয়া নয় টাকা হইলে চাহিদা বাড়িয়া হইবে ২৫,০০০ টাকা, কিন্তু যোগান কমিয়া হইবে ৪৫,০০০ টাকা। সুদের হার আরও কমিয়া শতকরা আট টাকা হইলে চাহিদা আরও বাড়িবে কিন্তু যোগান আরও কমিবে। তখন চাহিদা হইবে ৩০,০০০ টাকা আর যোগান হইবে ৪০,০০০ টাকা। সুদের শতকরা হার যখন কমিয়া সাত টাকা হইল, তখন চাহিদা বাড়িয়া ৩৫,০০০ টাকা হইল, যোগানও কমিয়া ৩৫,০০০ টাকা হইল। সাত টাকা সুদে যোগান এবং চাহিদা সমান হইল। কাজেই সুদের হার সাত টাকাতেই ঠিক হইল। সুদের হার কমিয়া ছয় টাকা হইলে চাহিদা বাড়িয়া ৪০,০০০ টাকা হইবে কিন্তু যোগান কমিয়া ৩০,০০০ টাকা হইবে। কাজেই সুদের হার সাত টাকার কম হইবে না। সেইরূপ সাত টাকার বেশীও হইবে না; কারণ তখন আবার চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী হইবে। সুদের হার সাত টাকার কম হইলে, নিয়োগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়িবে, সুদ তখন কমিয়া সাত টাকায় স্থির হইবে।

সংগঠক : মুনাফা (Entrepreneur : Profit) :

উৎপাদনের জন্য সংগঠক যে পুরস্কার পায়, তাহাই সংগঠকের মুনাফা বা লাভ। উৎপাদন-কার্য পরিচালনা করিবার জন্য সংগঠককে পরিশ্রম করিতে হয় এবং ঝুঁকি লইতে হয়। এই শ্রম, এই ঝুঁকির জন্য সংগঠক যাহা পায় তাহাই তাহার লাভ।

মজুরি, খাজনা বা সুদের একটা নির্দিষ্ট হার থাকিতে পারে। যে সংগঠন করে, সে এই নির্দিষ্ট হারে মজুরি, সুদ এবং খাজনা দেয়। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা তাহার প্রাপ্য মুনাফা বা লাভ। ইহা অনিশ্চিত, কাজেই লাভের কোন নির্দিষ্ট হার নাই। এমনও হইতে পারে যে, এক বৎসর মোটেই লাভ হইল না, এমন কি ক্ষতিই হইল।

মোট উৎপন্ন দ্রব্য হইতে খাজনা, সুদ এবং মজুরি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা মোট লাভ। এই মোট লাভের ভিতর সংগঠকের নিজ জমি ও মূলধনের প্রাপ্য খাজনা এবং সুদও আছে। এই খাজনা এবং সুদ মোট লাভ হইতে বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা নিট লাভ।

পরিচালনা, দেখাশুনা প্রভৃতির জন্য সংগঠকের যে পরিশ্রম হয়, তাহার পারিশ্রমিক নিট লাভের মধ্যে ধরা হয়। তাহা ছাড়া সংগঠক উৎপাদনের জন্য যে ঝুঁকি নেয়, তাহার জন্যও তাহার যাহা প্রাপ্য হয় তাহাও নিট সুদের মধ্যে ধরা হয়। তাহা ছাড়া অনেক সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি আকস্মিক কারণে সংগঠক যে অতিরিক্ত অর্থ পায়, তাহাও তাহার নিট লাভের মধ্যে ধরা হয়। কখনও কখনও কোন সংগঠক একটি একচেটিয়া ব্যবসায় বা শিল্প পরিচালনা করে। এই সুবিধার জন্য তাহার যে লাভ হয়, তাহাও নিট লাভের মধ্যে ধার্য। শেষোক্ত দুইটি কারণে যে লাভ হয় তাহা আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক কারণে হয়। সেইজন্য স্বাভাবিক লাভের মধ্যে এই দুইটি ধরা হয় না।

প্রশ্ন

১। মোট সুদ এবং নিট সুদের মধ্যে পার্থক্য কি? (পৃঃ ২০৭)

২। সুদ কিভাবে নির্ধারিত হয়? (পৃঃ ২০৭-২০৮)

৩। মুনাফার সঙ্গে অন্যান্য উৎপাদনের উপাদানের আয়ের কি পার্থক্য? (পৃঃ ২০৯)

পরিভাষা

অ

অগণতান্ত্রিক—undemocratic
অতিদীর্ঘকালীন বাজার—secular market
অত্যল্পকালীন বাজার—very short-period market
অত্যুন্নত—highly developed
অদৃশ্য রপ্তানি ও আমদানি—invisible export and import
অধিকার-পৃচ্ছা—*quo warranto*
অনগ্রসর অঞ্চল—backward area
অনন্য—exclusive
অন্তর্নিয়োগ শিক্ষা—training-on-job
অনিবদ্ধ মূলধন—floating capital, non-specific capital
অনিশ্চিত ব্যয়-তহবিল—contingency fund
অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত—favourable balance of trade
অনুকূল লেন-দেন-উদ্বৃত্ত—favourable balance of payments
অনুচ্ছেদ—articles
অনুমোদনসিদ্ধ (নাগরিক)—naturalized (citizen)
অনুসন্ধানকারী দল—study group
অনুৎপাদনশীল—unproductive
অনুৎপাদনশীল ঋণ—unproductive debt
অন্তঃশুল্ক—excise duty
অপরিশুদ্ধ—gross
অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা—unplanned economy
অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা—inconvertible paper currency
অপ্রচুর—scarce
অপ্রাচুর্য—scarcity
অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা—imperfect competition
অপূর্ণাঙ্গ যুক্তরাষ্ট্র—quasi-federal state
অবস্তুগত—non-material
অবাধ বাণিজ্য—free trade
অবাধলভ্য—free
অভাব—wants
অভাবের সঙ্গতি—coincidence of wants
অভিজাততন্ত্র—aristocracy
অভিজাতশ্রেণী—patricians
অভাব হইতে মুক্তি—freedom from want
অভিভাবক পরিষদ্—Trusteeship Council (U. N.)
অরাজকতা—anarchy
অর্থ কমিশন—Finance Commission
অর্থদপ্তর—finance department
অর্থনৈতিক—economic
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্—Economic and Social Council (U. N.)
অর্থনৈতিক খাজনা—economic rent
অর্থবিদ্যা—economics
অর্থ-ব্যবস্থা—economic system
অর্থনৈতিক বিপ্লব—economic revolution
অর্থনৈতিক সংগঠন—economic organisation
অর্থনৈতিক সমস্যা—economic problem

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা—economic liberty
অর্থসাহায্য—bounty, grants-in-aid, subsidy
অর্ধ-নিয়োগ—underemployment
স্বল্পোন্নত অঞ্চল—underdeveloped area or region
স্বল্পোন্নত দেশ—underdeveloped country
অল্পকালীন বাজার—short-period market
অসাধু প্রতিযোগিতা—unfair competition
অসীম দায়—unlimited liability
অসীম বিহিত মুদ্রা—unlimited legal tender money
অস্থায়ী বিচারক—ad hoc judges
অস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থা—temporary equilibrium position
অস্থায়ী ভারসাম্যের দাম—temporary equilibrium price
অহস্তান্তরযোগ্য—non-transferable
অংশ—organ, unit
অঙ্গরাজ্য—constituent unit
অংশীদার—partner
অংশীদারী—partnership

আ

আইন—law
আইনাভিজ্ঞ—jurist
আইন-গত অধিকার—legal rights
আইন-গত ধারণা—legal idea
আইন প্রণয়ন—legislation, law-making
আইন-সভা—legislature
আইনসঙ্গত স্বাধীনতা—legal liberty
আইনের অনুশাসন—rule of law
আকর—ore
আকস্মিক মুনাফা—windfall profit
আকাঙ্ক্ষা—desiredness
আঞ্চলিক—territorial, regional
আঞ্চলিক পরিষদ্—territorial council, zonal council
আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ—territorial division of labour
আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী—territorial army
আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য—regional autonomy
আত্যন্তিক চাষ—intensive cultivation
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—right of self-determination
আন্তঃরাজ্য পরিষদ্—Inter-State Council
আন্তর্জাতিক—international
আন্তর্জাতিকতা—internationalism
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান—international organisation
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান—International Trade Organisation (ITO)
আন্তর্জাতিক বিচারালয়—International Court of Justice
আন্তর্জাতিক তহবিল—International Monetary Fund (IMF)
আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ—International Labour Organisation (ILO)
আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ্—United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)
আনুগত্য—allegiance
আপিল এলাকা—appellate jurisdiction

আপেক্ষিক—relative
আপেক্ষিক দক্ষতা—comparative advantage
আপেক্ষিক ব্যয়—comparative cost
আপেক্ষিক মজুরি—relative wages
আপেক্ষিক মূল্য—relative value
আপোষ—conciliation
আবগারী শুল্ক—excise duty
আবাদী শিল্প—plantation industry
আভ্যন্তরীণ—internal
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য—domestic trade, internal trade
আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা—internal sovereignty
আমদানি—import
আলোচনা—discussion, commentaries
আর্থিক আয়—money income
আর্থিক নীতি—economic policy
আর্থিক মজুরি—money wages
আর্থিক মূলধন—money capital
আশাবাদী—optimist
আসল টাকাকড়ি—actual money
—income
আয়-কর—income-tax

উ

উচ্চতর—senior
উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি—consumers' surplus
উন্নয়নমূলক কার্য—development services
উন্নয়ন ব্লক—development block
উন্নয়নের গতি—pace of development
উন্নয়নমূলক ব্যয়—development expenditure
উপ-অঞ্চল—sub-area
উপজাতি—tribe
উপদল—faction
উপাদান—factor
উপদেষ্টা কমিটি—advisory committee
উপপরিষদপাল—Deputy Speaker
উপবিধি—bye-law
উপযোগ—utility
উপযোগের তহবিল—store of utility
উপযোগের স্রোত—flow of utility
উপরাষ্ট্রপতি—Vice-President
উপরিস্থ কর—super tax
উষ্ণমণ্ডলীয়—tropical
উৎকর্ষ—efficiency
উৎপন্নের বিধি—law of returns
উৎপাদক—producer
উৎপাদকের উদ্বৃত্ত—producer's surplus
উৎপাদিকাশক্তি—productivity
উৎপাদন—production
উৎপাদনের উপাদান—factors of production
উৎপাদনের উপাদানের আয়—factor income
উৎপাদন-ব্যয়—cost of production
উৎপাদন শুল্ক—excise duty
উৎপাদনের লক্ষ্য—target of production
উৎপাদনশীল—productive
উৎপাদনশীল ঋণ—productive debt
উৎপাদনশীলতার নীতি—canon of productivity
উৎপ্রেষণ—*certiorari*
উৎস—sources

ঋ

ঋণ—loan, credit, debt
ঋণজনিত ব্যয়—debt services

ঋণদান সমিতি—credit society
ঋণ-নিয়ন্ত্রণ—credit control
ঋণপত্র—credit instruments
ঋণবরাদ্দ-নীতি—rationing of credit
ঋণ-ব্যবস্থা (গ্রামীণ)—credit system (rural)
ঋণ-মূলধন—loan capital
ঋতুগত বেকারত্ব—seasonal unemployment

এ

এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি—single-purpose society
একক—unit
এককেন্দ্রিক—unitary
একজাতীয় রাষ্ট্র—mononational State
একচেটিয়া কারবার (বিভেদমূলক)—monopoly (discriminating)
একচেটিয়া কারবারী—monopolist
একচেটিয়া প্রতিযোগিতা—monopolistic competition
একদেশতা—localisation
একধাতুমান—monometallic standard
একধাতু রৌপ্যমান—monometallic silver standard
একনায়ক—dictator
একনায়কতন্ত্র—dictatorship
একনায়কতন্ত্রী—dictatorial
একপরিষদসম্পন্ন—unicameral
একবার ব্যবহার্য দ্রব্য—single-use goods
এক-মালিক—single-owner
এলাকা—jurisdiction

ঐ

ঐতিহাসিক মতবাদ—Historical Theory
ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ—Divine Origin Theory

ঔ

ঔপনিবেশিক—colonial

ক

কথাবার্তা চালানো—negotiation
কর—tax
কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব—non-tax revenue
করপ্রদানের ক্ষমতা—taxable capacity
কর-রাজস্ব—tax-revenue
কর্মগত বণ্টন—functional distribution
কর্মপ্রচেষ্টা—efforts
কর্মবিভাগ—division of labour
কর্মসূচী—programme
ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি—Law of Increasing Returns
ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি—Law of Increasing Cost
ক্রমবিকাশ—evolution
ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় বিধি—Law of Diminishing Cost
ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় বিধি—Law of Decreasing Cost
ক্রয়শক্তি—purchasing power
কাগজী মুদ্রা—paper money
কাগজী মুদ্রামান—paper money standard
কাঁচা মাল—raw materials
কাঠামো—structure
কাম্য—optimum
কাম্যতা—desiredness
কাম্য অনুপাত—optimum proportion

কাম্য উৎপাদন—optimum production
কাম্য জনসংখ্যা—opimum population
কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান—optimum firm
কারবার—firm
কারিগরী—technical
কার্যকরী—operative
কার্যকাল—tenure
কার্য পরিদর্শক—overseer
ক্রান্তীয়—tropical
ক্লিয়ারিং হাউস ব্যবস্থা—clearing house system
ক্রিয়াশীল—active
কুটির শিল্প—cottage industry
কৃষি আয়কর—agricultural income-tax
কেনাবেচা—transaction
কেন্দ্রীয় কৃত্যক—All-India Services
কেন্দ্রীয় সংগঠন—central organisation

খ

খসড়া—draft
খাজনা—rent
খাজনাতত্ত্ব—theory of rent
খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ—food-rationing
খাদ্য সরবরাহ—food supply
খাদ্য-সমস্যা—food problem
খাদ্যাহরণ জীবন—food-gathering life
খাদ্যোৎপাদন জীবন—food-producing life
খুচরা দাম—retail price
খোলা বাজারে কারবার—open market operations

গ

গণ-উদ্যোগ—initiative
গণতন্ত্র—democracy
গণতান্ত্রিক—democratic
গণভোট—referendum
গড় উৎপাদন-ব্যয়—average cost of production
গড়পড়তা—average (*per capita*)
গতিশীল—mobile
গতিশীলতার নীতি—principle of progression
গাণিতিক প্রগতি—arithmetical progression
গুণগত—qualitative

ঘ

ঘাটতি—deficit
ঘাটতি অঞ্চল—deficit area
ঘাটতি ব্যয়—deficit financing

চ

চক্রীদল—clique, coterie
চতুর্পর্যায়ী পরিকল্পনা—point-four programme
চরম—absolute
চলতি আমানত—demand deposit
চলতি মূলধন—circulating capital
চলতি হিসাবের খাতে লেন-দেন-উদ্বৃত্ত—balance of payments on current account
চাহিদা—demand
চাহিদা-রেখা—demand curve
চাহিদা-সূচী—demand schedule
চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা—income-elasticity of demand
চাহিদা-দাম—demand price
চাহিদার সূত্র—law of demand

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—elasticity of demand
চুংগি—octroi
চুক্তি অনুযায়ী খাজনা—contract rent
চেক—cheque
চেতনাসম্পন্ন—enlightened

ছ

ছদ্ম বেকারত্ব—disguised unemployment

জ

জনগোষ্ঠী—clan, party
জনপ্রিয় পরিষদ্—popular chamber
জনমত—public opinion
জনপাল কৃত্যক—public services
জনাধিক্য—overpopulation
জন্মসূত্র—natural-born
জন্মস্থান-নীতি—*jus loci, jus soli*
জনস্বাস্থ্য—public health
জনসংখ্যা—population
জমা আমানত—savings deposit
জমার অনুপাত—reserve ratio
জমির (জোতের) সংহতিসাধন—consolidation of holdings
জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক—land mortgage bank
জলবায়ু—climate
জরুরী আইন—ordinance
জাতি—nation, race
জাতিগত—racial
জাতিগত বৈশিষ্ট্য—racial qualities
জাতীয় আয়—national income
জাতীয় উন্নয়ন—national development
জাতীয় উৎপাদন—national product
জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান—National Defence Academy
জাতীয় ব্যয়—national outlay
জাতীয় মূলধন—national capital
জাতীয় রাষ্ট্র—Nation-State
জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনী—National Cadet Corps (N. C. C.)
জাতীয় সমাজ—national society
জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা—National Extension Service (N. E. S.)
জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা—national self-sufficiency
জাতীয় স্বাধীনতা—national liberty
জাতীয়করণ—nationalisation
জাতীয়তাবাদ—nationalism
জ্যামিতিক প্রগতি—geometric progression
জীববিজ্ঞানী—biologist
জীবন-সংগ্রাম—struggle for existence
জীবনযাত্রার মান—standard of living
জীবনযাত্রার স্তর—level of living
জুয়া—gambling
জোত—holding
জোতের অসম্বদ্ধতা—fragmentation of holdings

ট

টাকাকড়ি—money
টাকাকড়ির কার্য—functions of money
টাকাকড়ির মূল্য—value of money

ড

ডিবেঞ্চার—debenture

ত

তত্ত্ব—theory
তত্ত্বগত—theoretical
তপশীলভুক্ত জনগোষ্ঠী—scheduled tribes

তপশীলভুক্ত জাতি—scheduled castes
তপশীলভুক্ত (তপশীলী) ব্যাঙ্ক—scheduled bank
তপশীল-বহির্ভূত ব্যাঙ্ক—non-scheduled bank
তমসুক—bonds
ত্যাগের সমতা—equality of sacrifice
তেজী (অবস্থা)—boom
তেজী বাজার—boom market

দ

দক্ষতা—skill
দল—party, clan
দলীয় সরকার—party government
দলীয় মনোবৃত্তি—party spirit
দ্রব্য—goods
দ্রব্য-বিনিময়—barter
দাম—price
দায়—liability
দায়রা জজ—sessions judge
দ্বি-দলীয় প্রথা—bi party system
দ্বি-ধাতুমান—bi-metallic
দ্বি-পরিষদ্‌সম্পন্ন—bi-cameral
দ্বি-বিক্রেতা প্রতিযোগিতা—duopoly
দায়িত্বশীল (পার্লামেন্টীয়)—responsible (parliamentary)
দীর্ঘকালীন বাজার—long-period market
দূত—consul, ambassador
দূতাবাস—consulate, embassy
দৃশ্য-আমদানি—visible import
দৃশ্য রপ্তানি—visible export
দেনাপাওনার মান—standard of deferred payment
দেশীয় ব্যাঙ্ক—indigenous bank
দৈনন্দিন—ordinary

ধ

ধন—wealth
ধনতান্ত্রিক—capitalistic
ধনতান্ত্রিক রূপ—capitalistic form
ধনবৈষম্য—inequality of wealth
ধর্মঘট—strike
ধর্মীয় রাষ্ট্র—theocratic State
ধ্বংসাত্মক (নাশকতামূলক) কার্য—sabotage
ধাতব মুদ্রা—metallic money
ধাতব মুদ্রামান—metallic standard

ন

নগর-রাষ্ট্র—city-State
নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান—improvement trust
নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা—river valley project
নাগরিক—citizen
নাগরিক জীবন—civic life
নাগরিকতা—citizenship
নামসর্বস্ব—nominal
নায়ক—leader
ন্যায্য মজুরি—fair wage
ন্যায়—justice
ন্যায়বিচার—equity
ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি—natural law
নিদর্শক মুদ্রা—token coin
নিবদ্ধ মূলধন—sunk capital, specific capital
নিবারক নিরোধ—preventive detention
নিম্নতর—junior
নিম্নতর আদালত—subordinate court
নিরাপত্তা—security
নিরাপত্তা পরিষদ—Security Council

নির্দেশ—writ
নির্দেশমূলক নীতি—Directive Principles
নির্দিষ্ট ভূখণ্ড—territory
নির্বাচন—choice, election
নির্বাচন কমিশন—Election Commission
নির্বাচকমণ্ডলী—electorate
নির্বাহী বাস্তকার—executive engineer
নির্লিপ্ততা—indolence
নিশ্চয়তার নীতি—canon of certainty
নিষ্ক্রিয় অংশীদার—sleeping partner
নিয়ন্ত্রণ—check, control
নিয়মতান্ত্রিক শাসক—constitutional head
নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা—parliamentary government
নিয়োগ-সংস্থা—employment exchange
নিখুঁত—absolute, pure
নীট—net, pure
নীতি--canon, principle
ন্যূনতম জীবনধারণ—subsistence level
ন্যূনতম জীবনধারণের মান—minimum subsistence standard
ন্যূনতম মজুরি—minimum wage
নৈতিক অধিকার—moral right
নৈতিক প্রণোদন—moral suasion
নৌ-বাহিনী—navy
নৌ-বাহিনীর প্রধান (অধ্যক্ষ)—Chief of the Naval Staff

প

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—Five Year Plan
পণ্য—commadity, merchandise
পণ্যোৎপাদন—commodity production
পদচ্যুতি—recall
পরমাদেশ—*mandamus*
পরামর্শদান এলাকা—advisory jurisdiction
পরিকল্পনা—project, planning
পরিকল্পনা অঞ্চল—project area
পরিকল্পনা কমিশন—Planning Commission
পরিকল্পনা কাঠামো—plan-frame
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা—planned economy
পরিচালক—director
পরিচালন—operation
পরিচালিত মুদ্রা—managed money
পরিচালনা—management
পরিচালকমণ্ডলী—board directors
পরিতৃপ্তি—satisfaction
পরিধি—extent
পরিবর্ত-দ্রব্য—substitute
পরিবর্তনশীলতার নীতি—canon of elasticity
পরিবর্তনীয়—convertible
পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা—convertible paper money
পরিবেশ—environment, atmosphere
পরিবহণ ও সংসরণ—transport and communication
পরিমাণগত—quantitative
পরিশুদ্ধ—pure
পরিষদ্—council
পরিষদপাল—Speaker
পরোক্ষ গণতন্ত্র—indirect democracy

পশুপালন—animal husbandry
পাইকারী দাম—wholesale price
পালটি শস্য উৎপাদন—rotation of crops
পার্লামেণ্ট—Parliament
পিতৃতান্ত্রিক—patriarchal
পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ—Patriarchal Theory
পুঁজিপতি—capitalist
পুঁজিবাদ—capitalism
পুনরুৎপাদন-ব্যয়—cost of reproduction
পুনর্বাট্টা—rediscount
পুরঃশুল্ক—octroi
পুষ্টিকারিতা—nutritional
পূর্ণাঙ্গ বাজার—perfect market
পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা—perfect competition
পূর্ব-নির্দিষ্ট আয়—predetermined income
পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যয়—predetermined expenditure
পৃথকীকরণ—separation
পৃথকীকৃত—differentiated
পৌনঃপুনিক মূলধন—recurring circulating capital
পৌর—urban
পৌর-কর্তব্য—civic duties
পৌর-চিকিৎসক—civil surgeon
পৌরবিজ্ঞান—Civics
পৌরসংঘ—municipality
প্রকৃত আয়—real income
প্রকৃত মজুরি—real wage
প্রক্রিয়া—process
প্রজা—subject
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র—direct democracy
প্রতিকূল—unfavourable
প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র—representative democracy
প্রতিনিধিমূলক মুদ্রা—representative money
প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা—representative government
প্রতিরক্ষা—defence
প্রতিরক্ষা দপ্তর—Defence Department
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী—Defence Minister
প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ—defensive type of protection
প্রতিরোধ—prohibition
প্রতিরোধকারী উৎপাদন-শুল্ক—prohibitive excise duties
প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ—preventive check
প্রতিশ্রুতি পত্র—promissory note
প্রতিযোগিতা—competition
প্রতীক্ষা—waiting
প্রথা—custom
প্রথাগত আইন—customary law
প্রধান কর্মকর্তা—chief executive
প্রধান কর্মসচিব—Secretary-General
প্রধান ধর্মাধিকরণ—Supreme Court
প্রপন্নাধিকার—court of wards
প্রমোদ কর—entertainment tax
প্রস্তাবনা—Preamble
প্রাকৃতিক অবস্থা—State of Nature
প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য—natural resources
প্রাকৃতিক পরিবেশ—natural environment
প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ—positive check
প্রাকৃতিক সম্পদ—natural resources
প্রাথমিক লাভ—immediate gain
প্রান্তিক—marginal

প্রান্তিক আয়—marginal profit
প্রান্তিক উপযোগ—marginal utility
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়—marginal cost of production
প্রান্তিক জমি—marginal land
প্রান্তিক মুনাফা—marginal profit
প্রাপ্তবয়স্ক—adult
প্রামাণিক মুদ্রা—standard coin

ফ

ফৌজদারী আদালত—criminal court

ব

বণ্টন—distribution
বন্দী-প্রত্যক্ষিকরণ—*habeas corpus*
বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান—port trust
বরাদ্দ—quota
বরাদ্দ-নীতি—rationing
বর্ণভেদ প্রথা—caste system
বহু-উদ্দেশ্যমূলক—multi-purpose
বহুজাতীয় রাষ্ট্র—multi-national State
বহুদলীয় ব্যবস্থা—multi-party system
বলপ্রয়োগ মতবাদ—Theory of Force
বস্তুগত—material
বাজার—market
বাজার-দাম—market price
বাজার বসার জায়গা—market place
বাট্টা—discount
বাণিজ্য—commerce
বাণিজ্য-শুল্ক—customs
বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত—balance of trade
বাণিজ্যিক—commercial
বাণিজ্যিক পদ্ধতি—commercial system
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক—commercial bank
বাণিজ্যিক সংগঠন—trade organisation
বাধ্যতামূলক সঞ্চয়—forced savings
বাস্তব মূলধন—concrete capital, real capital
বাহ্যিক—external
বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা—external sovereignty
বিকল্প—alternate
বিকৃত রাষ্ট্র—perverted State
বিচার বিভাগ—judiciary
বিক্রয়যোগ্য—marketable
বিক্রয়-কর—sales-tax
বিচারমূলক সংরক্ষণ—discriminating protection
বিচারের রায়—judicial decisions
বিদেশীয়—alien
বিধান পরিষদ্—legislative council
বিধানসভা—legislative assembly
বিধি—law
বিনিময়—exchange
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ—exchange control
বিনিময় ব্যাঙ্ক—exchange bank
বিনিময়-মূল্য—value-in-exchange
বিনিময়ের মাধ্যম—medium of exchange
বিনিয়োগ—investment
বিনিয়োগ অভ্যাস—investment habit
বিনিয়োগকারী—investor
বিবর্তন—evolution
বিবর্তনবাদ—Evolutionary Theory
বিভিন্ন জাতীয়—heterogeneous
বিবেচনা-সাপেক্ষ খসড়া—tentative draft

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার—discriminating monopoly
বিমান-বাহিনী—air force
বিলম্বিত—deferred
বিলম্বিত শোধ—deferred payment
বিলাস-দ্রব্য—luxuries
বিশ্বব্যাঙ্ক—World Bank
বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান—World Health Organisation (WHO)
বিশেষ অনুমতি—special leave
বিশেষজ্ঞ কর্মী—specialised expert
বিশেষীকরণ—specialisation
বিশেষীকৃত—specialised
বিশেষীকৃত স্থায়ী মূলধন—specialised fixed capital, specialised fixed equipment
বিহিত মুদ্রা—legal tender money
বৃত্তি—stipend
বৃহদায়তন শিল্প—large-scale industry
বেকারত্ব—unemployment
বেকার সমস্যা—unemployment problem
বেসরকারী উদ্যোগী—private sector
বেসামরিক শাসন-পরিচালনা—civil administration
বৈচিত্র্য আনয়ন—diversification
বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক—foreign exchange bank
বৈদেশিক মুদ্রা—foreign exchange
ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি—private property
ব্যক্তিগত বণ্টন—personal distribution
ব্যক্তিগত মূলধন—private capital
ব্যক্তিগত মূল্য পৃথকীকরণ—personal discrimination
ব্যক্তিগত সঞ্চয়—personal savings
ব্যক্তিগত সম্পদ—individually owned wealth
ব্যক্তিগত স্বার্থ—private interest
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ—individualism
ব্যবহার-মূল্য—value-in use
ব্যবসায়—business
ব্যয়—cost. expenditure
ব্যয়-কর—expenditure tax
ব্যয়সংক্ষেপ—economies
ব্যয়সংক্ষেপের নীতি—canon of economy
ব্যাখ্যাকর্তা—interpreter
ব্যাপক—comprehensive, extensive
ব্যাপক চাষ—extensive cultivation
ব্যাপক চাহিদা—wide demand
ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা—banking system
ব্যাঙ্কের আমানত—bank deposit
ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট টাকাকড়ি—bank money

ভ

ভারসাম্য—equilibrium
ভারসাম্য-দাম—equilibrium price
ভারী শিল্প—heavy industry
ভ্রাতৃভাব—fraternity
ভ্রাম্যমাণ—nomadic
ভিত্তি বৎসর—base year
ভূমিদাস—serf
ভূমি-রাজস্ব—land revenue
ভূমি-সংস্কার—land reforms
ভোক্তা—consumer
ভোগ—consumption
ভোগদ্রব্য—consumers' goods, consumption goods
ভোগ্য (পণ্য) দ্রব্যক্রেতা—consumer
ভোগোদ্বৃত্ত—consumers' surplus
ভোটাধিকার—franchise, suffrage

ম

মজুরি—wages
মজুরিতত্ত্ব—theory of wages
মতবাদ—theory
মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী—middleman
মন্দাজনিত বেকারত্ব—cyclical unemployment
মন্দাবস্থা—depression
মন্ত্রি-পরিষদ্—Council of Ministers
মন্ত্রিসভা—Cabinet
মহাধর্মাধিকরণ—high court
মাথাপিছু—*per capita*
মাথাপিছু আয়—*per capita* income
মাতৃতান্ত্রিক—matriarchal
মান—standard
মানসিক—subjective
মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয়—friendly aliens
মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা—mixed economy
মুদ্রা— coin, currency
মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রাঙ্কন – currency and coinage
মুদ্রামান—monetary standard
মুদ্রাস্ফীতি—inflation
মুনাফাতত্ত্ব—theory of profit
মূলধন—capital
মূলধন খাতে ব্যয়—expenditure on capital account
মূলধন গঠন—capital formation
মূলধন-দ্রব্য—producers' goods, production goods, capital goods
মূলধন-বৃদ্ধি—accumulation of capital
মূলধন-লাভ—capital gains
মূলধন-লাভকর—capital gains tax
মূলধনপ্রদানকারী অংশীদার—share-holders
মূলধনের হিসাবের খাতে—on capital account
মূল শিল্প—key industry, basic industry
মূল্য—value
মূল্যতত্ত্ব—theory of value
মূল্যস্তর—price level
মূল্যস্থিতিকরণ—price stabilisation
মূল্যের পরিমাপ—measure of value
মূল্যের শ্রমতত্ত্ব—Labour Theory of Value
মেয়াদী আমানত—time deposit
মোট—gross
মোট আয়—gross income
মোট উপযোগ—total utility
মোট জাতীয় উৎপাদন—gross national product
মোট মুনাফা—gross profit
মোট সুদ—gross interest
মৌলিক অধিকার—fundamental rights

য

যন্ত্রপাতি—machinery
যুক্তরাষ্ট্রীয়—federal
যুগ্ম তালিকা—concurrent list
যুদ্ধনায়ক—war-lord
যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী শিল্প—strategic industry
যোগান—supply
যোগান-দাম—supply price
যোগান-রেখা—supply curve
যোগান-সূচী—supply schedule
যোগানের সূত্র—law of supply
যৌথ দরাদরি—collective bargaining
যৌথ দায়িত্ব—joint responsibility
যৌথ-পরিবার—joint family

যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্ক—joint stock bank
যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ—Syndicalism
যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান—joint stock company

র

রক্ষণশীল—conservative
রক্ষাকবচ—safeguards
রক্তের সম্পর্ক—kinship
রক্তের সম্পর্ক নীতি—*jus sanguinis*
রপ্তানি—export
রাজতন্ত্র—monarchy
রাজনৈতিক দল—political party
রাজস্ব খাতে ব্যয়—expenditure on revenue account
রাজস্ব দপ্তর—treasury
রাজ্যকৃত্যক—State Services
রাজ্য-তালিকা—State List
রাজ্যপাল—Governor
রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন—State Reorganisation Commission
রাজ্যসভা—Council of States
রাজ্যসংঘ—Union of States
রাষ্ট্র—State
রাষ্ট্রকৃত্যক—public services
রাষ্ট্রদ্রোহিতা—sedition
রাষ্ট্রমন্ত্রী—Minister of State
রাষ্ট্রপতি—President
রাষ্ট্রপতি-শাসিত—presidential
রাষ্ট্র-পরিচালনা—State-management
রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার—political rights
রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা—political consciousness
রাষ্ট্রনৈতিক দল—political party
রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন—political organisation
রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা—political liberty
রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ কমিশন—Public Service Commission
রাষ্ট্রহীন—Stateless
রাষ্ট্রীয় ধর্ম—State religion
রাষ্ট্রীয় মালিকানাকরণ—nationalisation
রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ—State socialism
রাষ্ট্রের ইচ্ছা—will of the State
রীতি—convention
রূপগত উপযোগ—form utility
রোপণ শিল্প—plantation industry

ল

লক্ষ্য—target
লিখিত মূল্য—face value
লেখ—writ
লেন-দেন—transaction
লেন-দেন-উদ্বৃত্ত—balance of payments
লোকসভা—House of the People

শ

শক্তি—power
শক্তিজোট—power bloc
শান্তিশৃঙ্খলা—peace and security
শাসক—administrator
শাসন—administration
শাসন-ব্যবস্থা—government administration
শাসন-বিভাগ—executive
শাসনতান্ত্রিক সুবিধা—administrative expediency
শিল্প—industry
শিল্প-প্রতিষ্ঠান—firm

শিল্পব্যাঙ্ক—industrial bank
শিল্পগত ভিত্তি—industrial base
শিক্ষানবিস—apprentice
শিক্ষানবিসি—apprenticeship
শোষণ—exploitation
শ্রম—labour
শ্রম-বিভাগ—division of labour
শ্রমিক সমবায়—confederation of labour
শ্রমিক-সংঘ—trade union, guild

স

সক্রিয়—active
সঞ্চয়—savings
সঞ্চয়মূলক—cumulative
সঞ্চয়ের ইচ্ছা—will to save
সঞ্চয়ের ক্ষমতা—power to save
সঞ্চয়ের ভাণ্ডার—store of value
সতর্কতা—vigilance
সদর কার্যালয়—headquarters
সভাপতি—chairman
সভাসমিতি—platform
সমজাতীয়—homogeneous
সমবায়—cooperation (co operation)
সমবায়িক—cooperative (co-operative)
সমাজ—society
সমাজ-কল্যাণকর—social welfare
সমাজজীবন—social-life
সমাজবিজ্ঞানী—sociologist
সমাজতন্ত্রবাদ—socialism
সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা—Socialist Pattern of Society
সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত—socialistic bias
সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা—Community Development Projects
সমতার নীতি—canon of equality
সম্পত্তি—asset
সম্পদ—wealth
সম্পদকর—wealth tax
সমষ্টিগত সম্পদ—collectively owned capital
সময়গত উপযোগ—time utility
সমহারে উৎপন্নের বিধি—Law of Constant Returns
সমানুপাতিক কর—proportional tax
সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব—proportional representation
সম্ভাবনা—potentiality
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—United Nations
সম্মিলিত সরকার—coalition government
সরকারী—government
সরকারী আয়—public income
সরকারী আয়-ব্যয়—public finance
সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র—public sector
সরকারী ঋণ—public debt
সরকারী ব্যয়—public expenditure
সরল সূচক-সংখ্যা—simple index numbers
সরলতার নীতি—canon of simplicity
সর্বজনীন (প্রাপ্তবয়স্কের) ভোটাধিকার—universal (adult) suffrage
সর্বহারা—proletariat
সর্বহারার বিপ্লব—proletarian revolution
সর্বাধিককরণ—maximisation
সর্বাগ্রগণ্য অংশ—preference share
সর্বাধিনায়কত্ব—supreme command
সসীম দায়—limited liability
সহজে চেনার যোগ্যতা—cognisability
সহায়ক শিক্ষার্থিবাহিনী—Auxiliary Cadet Corps

সংখ্যাগরিষ্ঠতা—majority
সংগ্রামমূলক কার্য—militant function
সংঘজীবন—organised life
সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ—guild socialism
সংঘর্ষ—friction
সংঘাতজনিত বেকারত্ব—frictional unemployment
সংবিধান—constitution
সংরক্ষণ—protection, maintenance
সংরক্ষণ নীতি—fiscal policy
সংরক্ষণমূলক খাদ্য—protective food
সংরক্ষণমূলক শুল্ক—protective duty
সংসদ—Parliament
সংসরণ-ব্যবস্থা—communication system
সংহতি—consolidation
জাতীয় —national
রাষ্ট্র দপ্তর—Home Department
স্বর্ণ দাবিপত্র—gold certificate
স্বর্ণপিণ্ড মান—gold bullion standard
স্বর্ণ বিনিময় মান—gold exchange standard
স্বর্ণমুদ্রা মান—gold currency standard, gold circulation standard
স্বর্ণমূল্য—gold value
স্বর্ণ-সমতা-মান—gold parity standard
স্বল্পবিক্রেতা প্রতিযোগিতা—oligopoly
স্বয়ংনিযুক্ত—self-employed
স্বয়ংসম্পূর্ণতা—self-sufficiency
সাধারণ অংশ—ordinary share
সাধারণ দানকর—general gift tax
সাধারণ মুনাফা—normal profit
সাধারণ বিভাগ—General Assembly (U. N.)
সাধারণতন্ত্র—republic
সাধারণতান্ত্রিক—republican
সামগ্রিক নিরাপত্তা—collective security
সামগ্রিক মূলধন—collective capital
সামগ্রিক সম্পত্তি—collective wealth
সামন্ততন্ত্র—feudalism
সামন্ত যুগ—feudal age
সামাজিক অধিকার—civil rights
সামাজিক চুক্তি মতবাদ—Social Contract Theory
সামাজিক নিরাপত্তা—social security
সামাজিক মূলধন—social capital
সামাজিক স্বাধীনতা—social liberty
সামাজিক সংগঠন—social organisation
সাম্য—equality
সাম্যবাদ—communism
সাম্যবাদী—communist
সাম্যবাদী সমাজ—communistic society
সাম্যাবস্থায় সুদের হার—equilibrium rate of interest
সার্বভৌম—sovereign
সার্বভৌম ক্ষমতা—sovereignty
সার্বভৌমিকতা—sovereignty
সালিশী বিচার—arbitration
সাংস্কৃতিক—cultural
সাংস্কৃতিক সংগঠন—cultural organisation
স্থানগত উপযোগ—place utility
স্থানগত পৃথকীকরণ—local discrimination

স্থানান্তর গমন—migration
স্থানান্তর প্রেরণের সুবিধা—portability
স্থানান্তরে অর্থপ্রেরণের সুবিধা—remittance facilities
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা—local self-government
স্থায়িত্ব—durability
স্থায়ী—durable
স্থায়ী বসবাস—domicile
স্থায়ী মূলধন—fixed capital
স্থিতিস্থাপক—elastic
স্নাতকোত্তর—post-graduate
স্বাতন্ত্র্যনীতি—principle of independence (autonomy)
স্বাদেশিকতা—partriotism
স্বাধীন—free
স্বাধীনতা—freedom, liberty
স্বাভাবিক উপযোগ—elementary utility, natural utility
স্বাভাবিক দাম—normal price
স্বল্পোন্নত (অঞ্চল, দেশ প্রভৃতি)—underdeveloped (area, country, etc.)
স্বাস্থ্যাধিকারক—health officer
স্বায়ত্তশাসন—self-government
সুনাগরিকতা—good citizenship
সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক—hindrances to good citizenship
সুনাম—goodwill
সুবিধা—benefit
সুবিধার নীতি—canon of convenience
সুসংবদ্ধ—organised
সুষম উন্নয়ন—balanced development
সুষম খাদ্য—balanced diet
সুষম শিল্প-ব্যবস্থা—balanced industrial system
সূক্ষ্মতা—precision
সূত্র—law
সেচ—irrigation
সেনা-বাহিনী—army
সেনানিবাস সংঘ—cantonment board
সেবাগত উপযোগ—service utility
সেবামূলক কার্য—services
স্বেচ্ছামূলক—voluntary
স্বৈরাচার—despotism
স্বৈরাচারী—despot
সৌভ্রাত্রমূলক কার্য—fraternal functions

হ

হস্তান্তর-পাওনা—transfer payment
হস্তান্তরযোগ্য—transferable
হিসাব-নিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি—money of account
হুণ্ডি—bill of exchange

উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার

HUMANITIES GROUP

1960

ECONOMICS : First Paper (*Answer any six questions*)

1. Explain how price is determined in the market under perfect competition.

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কিরূপে মূল্য নির্ধারিত হয় ? (পৃঃ ১০৫-১০৭)

2. Discuss the functions and utility of Trade Unions. What are the principal weaknesses of trade union movement in India.

শ্রমিক সংঘের কার্য এবং প্রয়োজনীয়তা কি ? ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের বিশেষ অসুবিধা কি ? (পৃঃ ৫-৭)

3. What is meant by 'co-operation' ? Describe the different types of co-operative societies which prevail in India.

সমবায় বলিতে কি বুঝান হয় ? ভারতে বিভিন্ন সমবায় সমিতির রূপ বর্ণনা কর। (পৃঃ ৭৭-৭৯)

4. What is capital ? What measures would you adopt to increase the accumulation of capital in India ?

মূলধন কি ? ভারতে মূলধন বৃদ্ধির জন্য কি উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন ? (পৃঃ ৫৩-৫৪ এবং ৫৬-৫৭)

5. Give a brief account of the aims and objectives of India's Five Year Plans.

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে বর্ণনা কর। (পৃঃ ৯৬-৯৭)

6. What is inflation ? How does inflation affect businessmen and wage earners ?

মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে ? ব্যবসায়ী এবং শ্রমিকদের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কি রূপ ? (পৃঃ ১৪৪-১৪৫)

7. Comment on the advantages and limitations of production by joint-stock companies.
যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানের অধীনে উৎপাদন পরিচালনার সুবিধা এবং অসুবিধার আলোচনা কর। (পৃ: ৭৩-৭৫)

8. Discuss the functions of a Central Bank.
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর আলোচনা কর। (পৃ: ১৩২-১৩৪)

9. What are the principal features of an underdeveloped economy ? Illustrate your answer with special reference to Indian conditions.
স্বল্পোন্নত আর্থিক-ব্যবস্থার প্রধান কারণ কি ? ভারতের অবস্থা হইতে দৃষ্টান্ত দাও। (পৃ: ৯৬-৯৭)

10. Indicate the importance of the village and small-scale industries in your economy. What measures would you suggest so that they may develop side by side with our large-scale industries ?
আমাদের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ক্ষুদ্র এবং গ্রামীণ শিল্পের স্থান নির্ণয় কর। বৃহদাকার শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন গ্রামীণ শিল্পের উন্নতি-বিধানের উপায় নির্দেশ কর। (পৃ: ৮৬-৮৭)

11. Define a tax. Discuss the merits and defects of direct and indirect taxes ?
করের একটি সংজ্ঞা দাও। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-করের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা কর। (পৃ: ১১৪-১১৬)

CIVICS : Second Paper

Group A (*Answer any three questions*)

1. Define a State. Is West Bengal a State according to your definition ? Explain your answer.
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। তোমার সংজ্ঞা অনুসারে পশ্চিম বঙ্গ কি একটি রাষ্ট্র ? তোমার উত্তরের ব্যাখ্যা কর। (পৃ: ১৪-১৫)

2. Explain what you mean by Democracy. What are its merits and defects ?
গণতন্ত্র কি ? গণতন্ত্রের গুণ এবং ত্রুটি কি ? (পৃঃ ২৬, ২৮-২৯)

3. Why is it considered desirable to separate the powers of the legislative, executive and judicial organs of a government ?
আইন-বিভাগ, শাসন-বিভাগ এবং বিচার-বিভাগকে পৃথক করা বাঞ্ছনীয় কেন ? (পৃঃ ৩৮-৪০)

4. Define a citizen. What are the hindrances to good citizenship ?
নাগরিকের সংজ্ঞা কি ? উৎকৃষ্ট নাগরিকত্বের পথে অন্তরায় কি ? (পৃঃ ৫৯, ৬৩-৬৫)

5. What is meant by Liberty ? How is it related to Law ?
স্বাধীনতার অর্থ কি ? আইনের সঙ্গে স্বাধীনতার সম্বন্ধ কি ? (পৃঃ ৮০-৮১)

Or, Distinguish between unitary and federal forms of government. Is India unitary or federal ?
এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য কি ? ভারত কি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, না ইহা একটি যুক্তরাষ্ট্র ? (পৃঃ ৩১, ৩৩-৩৪)

Group B (*Answer any three questions*)

6. "India is Sovereign Democratic Republic." Explain what it means.
"ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রিপাবলিক" বলিতে কি বুঝায় ? (পৃঃ ৯৯-১০১)

7. Indicate the powers of the President of Indian Union. How is he elected ?
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলি বর্ণনা কর। তিনি কিভাবে নির্বাচিত হন? (পৃঃ ১১১-১১৩)

8. What are the powers and functions of the Legislature of West Bengal ?
পশ্চিম বঙ্গের আইন-সভার কার্য এবং ক্ষমতা বর্ণনা কর। (পৃঃ ১২৫-১২৭)

9. State the composition and functions of the Supreme Court of India.

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন এবং কার্য বর্ণনা কর। (পৃঃ ১৩৮-১৩৯)

10. What are the fundamental rights of the Indian citizen under the Constitution of India ?

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কি? (পৃঃ ১০১-১০৩)

11. Describe the constitution and functions of District Boards in India.

ভারতে জেলা বোর্ডের গঠন এবং কার্যাবলী বর্ণনা কর। (পৃঃ ১৪৫-১৪৬)